ইবনে ইসহাক

সীরাতে রসূলুল্লাহ্ (সা)

শহীদ আখন্দ অনূদিত

সীরাতে রসূলুল্লাহ্ (স:): ইবনে ইসহাক
শহীদ আখন্দ অনূদিত

অনুবাদ ও সংকলন নং: ২০
ই. ফা. বা. প্রকাশনা: ১৩৬৬

প্রথম প্রকাশ:

মাঘ ১৩৭৭

SIRATE RASUL (S): The Life of Hazrat Muhammad (S) written by Ibn Ishaq, translated by Shahid Akhand into Bengali

প্রকাশকের কথা

মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবনকে কেন্দ্র করে যত পুস্তক এ যাবত বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছে, তন্মধ্যে ইবনে ইসহাক প্রণীত সীরাত গ্রন্থটি অন্যতম। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় ব্যুৎপত্তি থাকলেও মহানবী (সা)-এর প্রাচীনতম প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ সীরাতু রসূলিল্লাহ্‌র রচয়িতা হিসাবে তিনি সমধিক পরিচিত। প্রাথমিক যুগের সীরাত গ্রন্থ হিসেবে এর একটা আলাদা মর্যাদা ও স্থান রয়েছে। বলতে গেলে তাঁকে অনুসরণ করেই পরবর্তীকালের সীরাত গ্রন্থসমূহ প্রণীত হয়েছে। এ দিক দিয়ে তাঁকে সীরাত শাস্ত্রের পথিকৃৎ বলা যায়। তবে তাঁর রচিত পাণ্ডুলিপি ইবনে হিশামের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। মূলত মহানবী (সা)-এর জীবনী ও ইসলামের সোনালী যুগের ইতিহাসের সাথে সর্বপ্রকার ঘটনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও সংকলনে তাঁর জীবনের একটা বিরাট অংশ ব্যয় হয়েছিল।

বইটি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষাভাষীর সামনে এটার তরজমা পেশ করেছেন জনাব শহীদ আখন্দ। অনুবাদের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল ও সাবলীল। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অত্র পুস্তকটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে সুধী পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহ্‌র দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছে।

অনুবাদকের নিবেদন

আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ৮৫ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫১ হিজরীতে (ভিন্নমতে ৭৬৭ খৃস্টাব্দে) বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। ইনি সংক্ষেপে ইবনে ইসহাক নামে মহানবী (সা)-এর প্রাচীনতম প্রামাণ্য জীবনী 'সীরাতু-রসূলুল্লাহ্'-এর রচয়িতা হিসেবে পরিচিত। এঁর মূল গ্রন্থ সংরক্ষণ করা হয়নি। তাঁর গ্রন্থের যে চারটি অনুলিপি করা হয়েছিল তার মধ্যে দুটো করেছিলেন এঁর ছাত্র আল-বাক্কাই। তারই একটি অনুলিপি সম্পাদনা করেছিলেন ইবনে হিশাম (মৃত্যু ২১৮ হিজরী)। সম্পাদনার খাতিরে কোথাও তিনি মূল গ্রন্থের পাঠ সংক্ষেপ করেছেন, কোথাও বিশ্লেষণ করেছেন আবার কোথাও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন। অতএব ইবনে ইসহাকের মূল 'সীরাতু রসূলুল্লাহ্ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের মূল সূত্র ইবনে হিশাম সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থটি।

যৌবনকাল ইবনে ইসহাক মদীনায় অতিবাহিত করেন। তারপর মিসর ও ইরাক যান। তাঁর জীবনের ধ্যান-ধারণা, কামনা-বাসনা সব নিবেদিত ছিল হযরত মুহাম্মদের (সা) জীবনী ও ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার ঘটনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও সংকলনে। তাঁর সেই সাধনা ও নিষ্ঠার ফসল সীরাত।

ইবনে ইসহাকের জীবনীগ্রন্থের তৎকালে কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না সত্য, কিন্তু এর পূর্বসূরি বেশ কিছু মাগাযী পুস্তকের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। মাগাযী হলো আরবী সাহিত্যে প্রচলিত ধর্মযুদ্ধ সম্পর্কিত বীরত্বব্যঞ্জক ইতিহাস। এগুলো কবে রচিত হয়েছিল তা সঠিক করে জানা যায় না। হিজরী প্রথম শতকে মাগাযী ও অন্যান্য বিবরণী রচনা প্রসঙ্গে বেশ কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা তাঁদের জ্ঞান সম্পর্কে নোট লিখে দিয়ে গেছেন উত্তরপুরুষের হাতে। এঁদের নোটের এবং বিবরণীর এবং অন্যান্য সূত্রের সাহায্য ইবনে ইসহাক তাঁর গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রধান পুরুষরা হচ্ছেন ঃ

১. খলীফা উসমানের (রা) পুত্র আবান (হিজরী ২০–১০০)ঃ ইনি তাঁর পিতৃহন্তার বিরুদ্ধে অভিযানে তাল্হা ও জুবায়রের সঙ্গে শরীক হয়েছিলেন।

২. উরওয়া ইবনে আল-জুবায়র ইবনে আল-আওয়াম (হিজরী ২৩—৯৪) : ইনি খলীফা আবু বকরের (রা) কন্যা আসমার পুত্র। ইনি এবং এঁর ভাই আবদুল্লাহ্ নবী করীমের (সা) সহধর্মিণী এবং তাঁদের নিকটাত্মীয়া হযরত আয়েশার (রা) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ইসলামের প্রথম দিককার ইতিহাসের উপর ইনি অতুলনীয় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক কখনো কোন তথ্য জানতে চাইলে এঁর শরণাপন্ন হতেন।

৩. শুরাহ্ ইবনে সা'দ : ইনি একজন মুক্ত দাস ছিলেন।

৪. ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (হিজরী ৩৪—১১০) : পারস্যের অধিবাসী, পরে ইয়ামনে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন।

৫. আসিম ইবনে উমর ইবনে কাতাদা আল-আনসারী (মৃত্যু আনুমানিক ১২০ হিজরী) : মহানবীর (সা) যুদ্ধাভিযান সম্বন্ধে ইনি দামাশকাসে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দিতেন। পরে তাঁর শিষ্যেরা সেগুলো লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছিলেন।

৬. মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম (হিজরী ৫১—১২৪) : মক্কার এক সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। আবদুল মালিক, হিশাম ও ইয়াযিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ইনি একটি মাগাযী পুস্তক লিখেছিলেন।

৭. আবদুল্লাহ্ ইবন আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম (মৃত্যু ১৩০ বা ১৩৫ হিজরী) : ইনি উমর ইবনে আবদুল আযীয কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে হাদীসের সংকলন তৈরী করেছিলেন। তাঁর সংকলিত হাদীসের বিশেষ সূত্র ছিলেন আমর বিনতে আবদুর রহমান।

৮. আবুল আসওয়াদ মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে নওফেল (মৃত্যু ১৩১ বা ১৩৭ হিজরী) : ইনি একটি মাগাযী পুস্তক লিখে গেছেন।

৯. মূসা ইবনে উকবা (৫৫—১৪১ হিজরী) : ইনি ছিলেন আল-জুবায়র পরিবারের একজন মুক্ত দাস। ইনি ইবনে ইসহাকের সমসাময়িক।

এই সমস্ত সূত্র ও উৎসের সাহায্যে ইবনে ইসহাক মহানবীর যে সীরাত রচনা করেন তা এইসব মাগাযী সাহিত্যের ধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল এবং আপন বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত ছিল। তিনি সনাতন

মাগাযী ধরনে সীরাত লিখেন নি, বরং মহানবীর জীবনী লেখার সম্পূর্ণ নতুন একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রবর্তিত পদ্ধতি পরবর্তী কালে সীরাত সাহিত্যের পথ প্রদর্শকরূপে পরিগণিত হয়। ইনি রসূল করীমকে (সা) একটি ঐতিহাসিক বিবর্তনের নায়করূপে চিত্রিত করেন, যে বিবর্তন চূড়ান্ত পরিণতি পরিগ্রহ করে ইসলামের অভ্যুদয়ে। প্রথমে তিনি আরব ও মক্কা নগরীর ইতিহাস লিখেন। তারপর হযরত মুহাম্মদের (সা) বংশ, বনু কুরায়শের ইতিহাস এবং সবশেষে তাঁর সংগ্রাম, ইসলাম প্রচার ও চূড়ান্ত বিজয়ের কাহিনী বর্ণনা করেন।

সীরাত রচনায় ইবনে ইসহাক এর তথ্যগত বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। অসংখ্য বর্ণনার পূর্বে 'অনেকে বলেন' 'তারা বলেন' শব্দগুলো তিনি ব্যবহার করেছেন। এ সবক্ষেত্রে ইবনে ইসহাক বর্ণনার সত্যাসত্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না। এই বর্ণনা একদিকে যেমন অসত্য হতে পারে, তেমনি আবার সত্যও হতে পারে। এমনি করে অনেক স্থানে শেষ বর্ণনার শেষে তিনি বলেছেন, 'এই বর্ণনার সত্যাসত্য আল্লাহ্ জানেন' অর্থাৎ এর মোক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি কোন ঝুঁকি নেন নি।

সীরাতের প্রথম ইংরেজী প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ খৃস্টাব্দে লণ্ডন থেকে। অনুবাদক এ. গীলাউম। বর্তমান অনুবাদ উক্ত ইংরেজী অনুবাদ অনুসরণ করে করা হয়েছে।

সীরাত, কুরআন, সুন্নাহ্, আরবী ভাষা ও ইতিহাস সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই বললেই চলে। তবু আমি এই দুঃসাহসী অনুবাদ কর্মে ব্রতী হয়েছিলাম প্রথমত, মহাপুরুষ মহানবীর (সা) প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্য নিয়ে এবং দ্বিতীয়ত, ইবনে ইসহাক বিরচিত মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সা) প্রাচীনতম প্রামাণ্য জীবনী বাংলা ভাষাভাষী ধর্মপ্রাণ মুমিনদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। এই গ্রন্থ পাঠে তাঁদের ধর্মজ্ঞানের পিপাসা কিছু পরিমাণে নিবৃত্ত হলেও আমি আমার শ্রম সফল হয়েছে বলে ধরে নেবো। আমার স্বীকৃত অজ্ঞতার কারণে অথবা অসাবধানতাবশত অনুবাদে ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। ছোট হোক, বড় হোক কোথাও কোন ভুল ধরা পড়লে তা যদি আমাকে বা গ্রন্থের প্রকাশককে সহৃদয় পাঠক দয়া করে জানিয়ে দেন, তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

ঢাকা, রমযান, ১৩৯৯ হিজরী
আগস্ট, ১৯৮০ খৃস্টাব্দ

শহীদ আখন্দ

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম পর্ব

হযরতের (সা) বংশক্রম

ইসলাম-পূর্ব সময় থেকে ঐতিহ্য-বিবরণ

হযরতের (সা) শৈশব কৈশোর

তাঁর যৌবন

আল্লাহ্ পরম করুণাময় দয়াময়
তাঁর নামে শুরু করি
সমস্ত প্রশংসা তাঁর, তিনি বিশ্বচরাচরের মালিক,
আমাদের নেতা হযরত মুহম্মদ (সা) তাঁর পরিবার
এবং তাঁর সমস্ত অনুসারীদের উপর
আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হোক

আদম (আ) থেকে হযরত মুহম্মদ (সা) পর্যন্ত প্রামাণ্য বংশক্রম

ব্যাকরণবিদ জ্ঞানী পুরুষ আবু মুহম্মদ আবদুল মালিক ইবনে ১ হিশাম বলেন ঃ

এই পুস্তক রসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনী।

হযরত মুহম্মদ (সা)-এর পিতা ছিলেন আবদুল্লাহ্। আবদুল্লাহ্ ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিব (অন্য নাম শায়বা) অর্থাৎ আবদুল মুত্তালিব (শায়বা)-এর পুত্র। এমনি করে আবদুল মুত্তালিব (শায়বা) ইবনে হাশিম (অন্য নাম আমর), ইবনে আবদ্ মানাফ (অন্য নাম আল-মুগীরা), ইবনে কুসাই (অন্য নাম যায়দ), ইবনে কিলাব ইবনে মুররা, ইবনে কা'ব, ইবনে লুআই ইবনে গালিব, ইবনে ফিহ্র, ইবনে মালিক, ইবনে আন-নাদর, ইবনে কিনানা, ইবনে খুজায়মা, ইবনে মুদরিকা (অন্য নাম আমির), ইবনে ইলিয়াস, ইবনে মুদার, ইবনে নিযার, ইবনে মা'আদ, ইবনে আদনান, ইবনে উদ্দ (অথবা উদাদ) ইবনে মুকাওওয়াম, ইবনে নাহুর, ইবনে তায়রাহ্, ইবনে ইয়ারুব, ইবনে ইয়াশজুব, ইবনে নাবিত, ইবনে ইসমাইল, ইবনে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ ইবনে তারিহ (অন্য নাম আযর), ইবনে নাহুর, ইবনে সারুগ, ইবনে রা'উ, ইবনে ফালিখ, ইবনে আইবার, ইবনে শালিখ, ইবনে আরফাখশাদ, ইবনে সাম, ইবনে নূহ, ইবনে লামব, ইবনে মাত্তুশালাখ, ইবনে আখনুখ।

---

১. ইবনে অর্থ পুত্র। আবদুল মালিক ইবনে হিশাম অর্থ হিশামের পুত্র আবদুল মালিক।

তাঁরা বলেন,[১] ইনিই ইদ্রিস পয়গম্বর ছিলেন, সত্যমিথ্যা আল্লাহ্ জানেন (আদমের সন্তানদের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁকেই নবুয়ত দেওয়া হয় এবং সর্বপ্রথম তাঁকেই কলমী লেখা প্রদান করা হয়), ইবনে ইয়ার্দ, ইবনে মাহলিল, ইবনে কাইনান, ইবনে ইয়ানিশ, ইবনে শিছ, ইবনে আদম।

হযরত ইসমাঈলের (আ) বংশক্রম

হযরত ইবরাহীমের (আ) পুত্র হযরত ইসমাঈলের ছিল বারোজন পুত্র-সন্তান। তাঁরা হলেন নাবিত (জ্যেষ্ঠ), কাইদর, আদবুল, মাবশা, মিশ্মা, মাশি, দিম্মা, আদর, তায়মা, ইয়াতুর, নাবিশ এবং কাইদুমা। এঁদের মাতা ছিলেন রা'লা, রা'লার পিতা ছিলেন মুদাদ ইবনে আমর আল-জুরহুমি। জুরহুম ছিলেন ইয়াকতান ইবনে আইবার ইবনে শালিখের পুত্র। আর ইয়াকতান ছিলেন কাহতান ইবনে আইবার ইবনে শালিখ। বর্ণিত আছে—হযরত ইসমাঈল ১৩০ বছর জীবিত ছিলেন। মৃত্যুর পর পবিত্র কা'বা অঙ্গনে তাঁর মাতা হাজেরার সমাধির পাশে তাঁকে কবর দেওয়া হয়।

মুহম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে শিহাব আল-জুহ্রি আমাকে বলেছেন যে, আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক আল আনসারি (আস-সুলামি নামেও পরিচিত ইনি) তাঁকে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ বলেছেন, "তোমরা মিসর জয় করলে পরে মিসরের মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। কারণ ওরা আমাদের আত্মীয়তা ও আশ্রয় দাবী করতে পারে।" রসূলুল্লাহ 'তারা আমাদের আত্মীয়' বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন জিজ্ঞেস করলে আল-জুহ্রি আমাকে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ জবাব দিয়েছিলেন, ইসমাঈলের মাতা হাজেরা ছিলেন তাঁদের বংশের সন্তান।

১. তাঁরা বলেন, 'অনেকে বলেন' ইত্যাদি বলে যা বলা হয়—ধরে নিতে হবে লেখক তাতে সন্দেহ পোষণ করেন। এইরূপ বর্ণনা সত্য হতে পারে, অসত্যও হতে পারে।

আদ ইবনে আউস ইবনে ইরাম ইবনে শাম ইবনে নূহ এবং আবির ইবনে ইরাম ইবনে শাম ইবনে নূহের দুই পুত্র দামুদ এবং জাদিস এবং লাবিদ ইবনে সাম ইবন নূহের পুত্র তাসম, ইমলাক এবং উমায়েম—এ'রা সবাই আরব ছিলেন। নাবিত ইবনে ইসমাঈলের পুত্র হলেন ইয়াসজুব। এর পরবর্তী ধারা হলো ইয়ারুব—তায়বা—নাহুর—মুকাওয়াম—উদাদ—আদনান।

আদনানের সময় থেকে ইসমাঈল থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন বংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আদনানের ছিল দুই পুত্র—মা'দ এবং আক্ক। মা'দের চার পুত্র—নিজার, কুদা (প্রথম পুত্র বলেঃ তাকে আবু কুদা বলা হতো)—কাউনুস এবং আইয়াদ। কুদা চলে গিয়েছিলেন ইয়ামানে হিমায়ের ইবনে সাবার কাছে। সাবারের অন্য নাম ছিল আবদু শাম্স্; কিন্তু তাঁকে সাবা বলা হতো, কারণ আরবদের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম কাউকে বন্দী করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন ইয়াসজুব ইবনে ইয়ারুব ইবনে কাহ্তান। মা'দ বংশের ওয়াকিবহাল সূত্রের মতে কাউনুস ইবনে মা'দের কোন সন্তান-সন্ততি বাঁচে নি। আল-হিরার সম্রাট আন-নুমান ইবনে আল-মুন্যির এই বংশের সন্তান ছিলেন। এই নুমান ছিলেন কাউনুস ইবনে মা'দ বংশের। আমাকে একথা বলেছেন আল-জুহ্রি।

ইয়াকুব ইবনে উতবা ইবনে আল-মুগীরা ইবনে আখনাস আমাকে আরো একটি সংবাদ দিয়েছেন। বনি জুরায়খের আনসারদের এক শেখ তাঁকে বলেছিলেন, উমর বিন আল-খাত্তাব আন-নুমান বিন আল-মুনযিরের তলোয়ার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যুবায়র ইবনে মাতিম ইবনে আদি ইবনে নওফল ইবনে আবু মানাফ ইবনে কাসারকে ডেকে পাঠান। তারপর তিনি এলে পরে সেই তলোয়ার তাঁর কোমরে পরিয়ে দেন। উমর বিন আল-খাত্তাব সমস্ত কুরায়শদের মধ্যে বংশ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ঠিক কুরায়শদের মধ্যে কেন, সমস্ত আরবদের মধ্যে বংশ সম্বন্ধে তাঁর চেয়ে বেশী আর কেউ জানতেন না। তিনি দাবি করতেন, বংশ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে তাঁর গুরু ছিলেন এই বিষয়ের উপর আরবদের শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত আবু বকর। এই আন-নুমানের পরিচয়

জানতে চাওয়া হলে যুবায়র বলেছিলেন, তিনি কাউনাস ইবনে মা'দের বংশের লোক। তবে অন্যান্য আরবরা কিন্তু অন্য কথা বেশ জোর দিয়ে বলেন। তাঁদের মতে আন-নুমান ছিলেন রাবি ইবনে নসরের লাখম বংশের লোক। সত্যমিথ্যা অবশ্য সব আল্লাহ্ জানেন।

ইয়ামনের রাজা রাবি ইবনে নসরের কথা এবং শিক্ক ও সাতি নামে দুই ভবিষ্যদ্বক্তার কাহিনী

ইয়ামনের রাজা রাবি ইবনে নসর ছিলেন আসল তুব্বা বংশের লোক। এক সাংঘাতিক স্বপ্ন দেখে তিনি ভীষণ ভীত হয়ে পড়েছিলেন। স্বপ্নের ভয়াল প্রভাব থেকে কিছুতেই তিনি মুক্ত হতে পারছিলেন না। তখন তিনি রাজ্যের সমস্ত ভবিষ্যদ্বক্তা, যাদুকর, তান্ত্রিক জ্যোতিষ ডাকালেন।

বললেন, 'আমি এক ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেছি। সেই স্বপ্ন দেখা অবধি আমি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারছি না। এই স্বপ্ন কি, এর মানে কি আপনারা আমাকে বলুন।'

তাঁরা সবাই বললেন, 'স্বপ্নটা কি বলুন, আমরা তার মানে আপনাকে বলে দেবো।'

রাজা বললেন, 'স্বপ্নের কথাই যদি আমি বলে দিলাম, তাহলে তো আপনাদের ব্যাখ্যা আমি বিশ্বাস করতে পারবো না। কারণ যিনি আমার স্বপ্নের মানে জানেন, তিনি আমার স্বপ্নটিকেও জানেন, স্বপ্নের কথা আমার তাকে বলতে হবে না।'

তখন ওদের একজন পরামর্শ দিলেন, তাহলে শিক্ক ও সাতিহকে ডেকে আনলে ভাল হয়। কারণ, তাঁরা অনেক গুণী মানুষ, সবার চেয়ে বেশী জানেন। তাঁরাই তাঁর প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন।

সাতিহ্‌র প্রকৃত নাম ছিল রাবি ইবনে রাবি'আ ইবনে মাসুদ ইবনে মাজিন ইবনে যিব ইবনে আদি ইবনে মাজিন গাসসান। শিক্ক ছিলেন শিক্ক

ইবনে সাব ইবনে ইয়াসকুর ইবনে রুহ্‌ম ইবনে আফরাক ইবনে কাসার ইবনে আবকার ইবনে আনমার ইবনে নিজার। আনমার ছিলেন বাজিলা এবং খাত'আম-এর পিতা।

রাজা তাঁদের ডেকে পাঠালেন। প্রথমে এসে পৌঁছলেন সাতিহ্। তার কাছে রাজা সমস্ত বিষয় আবার বর্ণনা করলেন। শেষে বললেন, 'আপনি যদি আমার স্বপ্নের কথা জানেন, তাহলে তার অর্থও আপনি জানেন।'

সাতিহ্ পদ্যে জবাব দিলেন ঃ

আপনি একটি অগ্নিশিখা দেখেছেন,
আসছে সমুদ্র থেকে।
সমস্ত নিম্নভূমির উপর পড়ল সে আগুন এসে
এবং গিলে নিল ওখানে যা ছিল সব।

রাজা বললেন, ঠিক তাই, এই তিনি দেখেছেন। তাহলে এর অর্থ কি? সাতিহ জবাব দিলেন ঃ

কসম লাভা অঞ্চলের সাপের,
আপনার রাজ্যের সমস্ত ইথিওপিয়ানরা
রাজা হবে আবিয়ান থেকে জুরাস সবখানে।

রাজা খুব ভাবনায় পড়লেন, বড় দুঃসংবাদ বটে। জিজ্ঞেস করলেন, কখন ঘটবে এসব? তাঁর সময়ে? নাকি তার পরে? সাতিহ পদ্যেই জবাব দিলেন, এখন থেকে ষাট কি সত্তর বছর পরে। ওইসব নবাগতদের রাজ্য কি টিকবে না? না, টিকবে না, সত্তর বছর কি তারো কিছুদিন পরে তা নির্মূল হয়ে যাবে। তখন তাদের হয় হত্যা করা হবে, নয় তাড়িয়ে দেওয়া হবে। কে করবে সে কাজ? ইরাম ইবনে 'ইয়াজান আসবেন এডেন থেকে তাদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য। ইয়েমেনে তাদের একটিকেও আস্ত রাখবেন না তিনি। আরো প্রশ্ন করে জানা গেল তাদের রাজ্যও টিকবে না। বিশুদ্ধ একজন নবী আসবেন তাঁর কাছে। দৈববাণী আসবে উপর থেকে, তিনিই

যবনিকা ঘটাবেন ঐ রাজ্যের; সেই নবী হবেন গালিব ইবনে ফিহ্র ইবনে মালিক ইবনে আন-নাযরের বংশধর। তাঁর রাজত্ব সময়ের শেষ সীমানা পর্যন্ত স্থায়ী হবে। সময়ের কি কোন শেষ সীমানা আছে ? রাজা জিজ্ঞেস করলেন : জবাব দিলেন সাতিহ্, জি, আছে। সেইদিন প্রথম এবং শেষ একসঙ্গে মিলিত হবে, পুণ্যবান সুখের জন্য, পাপী দুঃখের জন্য।

রাজা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি যা বলছেন সব সত্য ?'
সব সত্য। অন্ধকার, গোধূলি
রাত্রিশেষ ভোর, সকলের নামে দিব্য
যা বলেছি আমি, সব সত্য।

তারপর এলেন শিক্ক। তাঁর কাছেও রাজা সমস্ত বিষয় বর্ণনা করলেন, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সাতিহ যা বলে গেছেন তার বিন্দু বিসর্গ প্রকাশ করলেন না। তিনি পরীক্ষা করতে চান দুজনে ঠিক একই রকম ব্যাখ্যা দেন কি না। শিক্ক বললেন :

আপনি একটি অগ্নিশিখা দেখেছেন
আসছে সমুদ্র থেকে।
পাহাড় আর অরণ্যের মাঝখানে সে আগুন পড়ল এসে
গিলে নিল সে জীবন্ত সব কিছু।

রাজা বুঝলেন ওদের দুজন এক এবং অভিন্ন কথা বলেছেন। তফাৎ আছে কেবল কিছু শব্দ চয়নের। শিক্ককে তিনি ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। শিক্ক বললেন :

সমভূমির মানুষের নামে আমার প্রতিজ্ঞা
আপনার রাজ্যের কৃষ্ণকায় শক্তিশালী হবে
কেড়ে নেবে আপনার সন্তানকে আপনার কোল থেকে
আবিয়ান থেকে নজরান সবখানে রাজা হবে তারা।

যে সব প্রশ্ন রাজা সাতিহ্‌কে করেছিলেন, সবগুলো তিনি শিক্ককে করলেন। তিনি জানলেন তার আমলের পর :

তাদের ভেতর থেকে পরম প্রতাপশালী আসবেন একজন মহা খ্যাতিমান।
তিনি সবাইকে নিক্ষেপ করবেন গভীর লজ্জায়।

তিনি হবেন ঃ

বয়সে যুবক, হীনবল নন, নন নীচ
আপন নিবাস যু ইয়াজান থেকে তিনি আসবেন
ইয়ামানের সম্মুখ দিয়ে কেউ যাবে না ফিরে।

যে সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন তার পূর্ববর্তী ভবিষ্যদ্বক্তা সাতিহ্, তিনিও সবগুলোর জবাব দিয়ে যেতে লাগলেন। তার সাম্রাজ্যের যবনিকা পড়বে একজন নবীর হাতে। সেই নবী ধর্মপ্রাণ মানুষের জন্য, পুণ্যবান মানুষের জন্য নিয়ে আসবেন সত্য আর ন্যায়ের বাণী। তাঁর অনুসারীদের হাতেই থাকবে রাজ্যরক্ষার দায়িত্ব কিয়ামতের দিন পর্যন্ত। কিয়ামতের সেই দিনে আল্লাহর ঘনিষ্ঠ জনকে পুরস্কার দেওয়া হবে, সেই দিন বেহেশত থেকে দাবী-দাওয়া আসবে, সে দাবী-দাওয়ার কথা কেবল মাত্র মৃতজন আর বুদ্ধিমান জন শুনতে পাবে। সমস্ত মানুষ জমায়েত হবে নির্ধারিত স্থানে। আল্লাহ্ভীরু জন আল্লাহ্র আশীর্বাদ পাবে, অনুগ্রহ পাবে। সমস্ত মহাবিশ্ব এবং পৃথিবী এবং এই দুয়ের মধ্যবর্তী ছোট বড় তাবৎ বস্তুর নামে আমি শপথ করে সত্য কথা বর্ণনা করলাম—এই সত্যে কোন প্রকার সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

এই দুইজন ভবিষ্যদ্বক্তার বর্ণনা রাবিআ ইবনে নসরের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করল। তিনি তাঁর পুত্র ও পরিবারবর্গকে সংসারের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস সহ পাঠিয়ে দিলেন ইরাকে। ইরাকের সম্রাট সাবুর ইবনে খুররাজাদকে সম্বোধন করে একটা চিঠি দিলেন তাদের হাতে—অনুরোধ করলেন, সম্রাট যেন তাদের আলহিরায় বসবাস করতে দেন।

আন-নুমান ইবনে আল-মুনযির ছিলেন এই রাজার বংশধর। ইয়ামনের বংশক্রম ও ঐতিহ্যধারা অনুযায়ী তাঁর পরিচয় হলো ঃ আন-

নুমান ইবনে আল-মুনযির ইবনে আন-নুমান ইবনে মুনযির ইবনে আমর ইবনে আদি ইবনে রাবি'আ ইবনে নসর।

আবু করিব তিবান আসাদ ইয়ামন রাজ্য দখল করে নিলেন: তাঁর ইয়াসরিব অভিযান

রাবি'আ ইবনে নসরের মৃত্যুর পর সমস্ত ইয়ামন রাজ্যের শাসনভার পড়ল এসে হাসান ইবনে তিবান আসাদ আবু করিবের হাতে। তিবান আসাদ ছিলেন তুব্বা বংশের শেষ ব্যক্তি। তাঁর পিতা কুলি করিব ইবনে যায়দ ছিলেন প্রথম তুব্বা। যায়দ ছিলেন যায়দ ইবনে আমর যুলআস'আর ইবনে আবরাহা যুল মানার ইবনে আল রিশা ইবনে আদি ইবনে সায়ফি ইবনে সাবা আল আসগর ইবনে কাব—কাহাফ আল জুলম—ইবনে যায়দ ইবনে সাহিল ইবনে আমর ইবনে কায়েস ইবনে মাবিয়া ইবনে জুসাম ইবনে আবদু শামস্ ইবনে ওয়ালি ইবনে আল গাউস ইবনে কাতান ইবনে আরিব ইবনে যুহায়ের ইবনে আয়মান ইবনে আল-হামাইসা ইবনে আল-আরানজাজ। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন হিমায়ের ইবনে সাবাল আকবর ইবনে ইয়ারুব ইবনে ইয়াশজুব ইবনে কাহতান।

তিবান আসাদ আবু করিবই মদীনায় গিয়েছিলেন এবং ওখান থেকে দুজন ইহুদী রাব্বিকে (পণ্ডিত) নিয়ে গিয়েছিলেন ইয়ামনে। তিনি পবিত্র মক্কার পবিত্র কাবাগৃহকে সুসজ্জিত করেছিলেন এবং কাপড় দিয়ে তা ঢেকে দিয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল রাবি'আ ইবনে নসরের পূর্ববর্তী কাল।

পূর্বদেশ থেকে আসার সময় তিনি মদীনার উপর দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মদীনায় কারো কোন ক্ষতি করেন নি। বরং তৎপুত্রকে মদীনায় রেখে গিয়েছিলেন। সেই পুত্রকেই বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করা হয়েছিল। সেই হত্যার শোধ নেওয়ার জন্য আবার তিনি এলেন মদীনায়। উদ্দেশ্য সমস্ত নগর ধ্বংস করে দেবেন, নির্বংশ করে দেবেন

এর সমস্ত বাসিন্দাদের। কেটে নষ্ট করবেন এর সমস্ত খেজুর গাছ। তখন এই জাতি এক হলো। দাঁড়ালো এই নেতার পেছনে। নেতার নাম আমর ইবনে তাল্লা। বনি আন-নজরের ভ্রাতা তিনি। বনি আমর ইবনে মাবদুলের লোক। আন-নজরের আসল নাম ছিল তায়েম আল্লা ইবনে তালবা ইবনে আমর ইবনে আল-খারাজ ইবনে হারিসা ইবনে তালবা ইবনে আমর ইবনে আমীর।

বনি আদি ইবনে নাজার বংশের আহমার তুব্বার কিছু অনুসারীকে নিয়ে মদীনা এসেছিলেন। একদিন তাদেরই একজনকে আক্রমণ করে বসলেন আহমার। রাগের মাথায় মারতে মারতে তাকে মেরেই ফেললেন। লোকটার অপরাধ, আহমারের খেজুর গাছ থেকে সে খেজুর পেরে নিচ্ছিল। হাতে দা ছিল। তাই দিয়ে আঘাত করলেন আহমার। বললেন যার গাছ, খেজুর তার। লোকটা মরে গেল।

এই ঘটনায় ক্ষেপে গেল তুব্বার লোকজন। যুদ্ধ লেগে গেল দুই দলের মধ্যে। মদীনাবাসীরা কিন্তু বেশ জোরের সঙ্গে একটা কথা বলতেন। বলতেন, তুব্বাদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হতো দিনের বেলায়। কিন্তু রাতের বেলায় তারা মেহমানের মতো ঠিকই খাতির করতেন তাদের। এসব দেখে তুব্বারা অবাক। তারা বলাবলি করতে লাগল : আল্লাহ্র কসম, দারুণ ভালো মানুষ এরা, অসম্ভব দরাজ দিল।

এমনি যুদ্ধের ভেতর দিয়ে তুব্বা যখন তাদের অধিকারে, তখন কুরায়জা বংশের দুজন ইহুদী পণ্ডিত এসেছিলেন ওখানে। কুরায়জা বানু নাযির আন-নাযযাম এবং আমর (ডাক নাম ঝোলা ঠোঁট)। এঁরা ছিলেন আল-খাযরাজ ইবনে আল সারি আস-সাউমান ইবনে আস সিবতে ইবনে আল ইয়াসা ইবনে সা'দ ইবনে লাবি ইবনে খায়র ইবনে আন নাযযাম ইবনে তানহুম ইবনে আযর ইবনে ইজরা ইবনে হারুন ইবনে ইমরান ইবনে ইয়াসার ইবনে কাহাত ইবনে লাবি ইবনে ইয়াকুব অন্যনাম ইসরাঈল ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্র পুত্র—এঁরা ছিলেন,

পুরুষানুক্রমে জ্ঞানী লোক। তাঁরা জানতে পারলেন রাজা শহর ধ্বংস করে দিতে চান, নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান এর সমস্ত লোকজনকে। তাঁরা গিয়ে রাজাকে বললেনঃ 'এ কাজ করবেন না জাঁহাপনা। যদি করেন বড় দুঘটন ঘটে যাবে। ফলে ইচ্ছা করলেও আর আপনি তা করতে পারবেন না। মাঝখান থেকে আমাদের ভয় হচ্ছে ওদের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দেবেন কেবল।' রাজা জিজ্ঞেস করলেন, এরকম আশংকার ভিত্তি কি। তাঁরা বললেন, ভবিষ্যতে কুরায়শদের মধ্যে একজন নবী আসবেন। সেই নবী ইয়াস্‌রিবে হিজরত করবেন। ইয়াস্‌রিবই হবে সেই নবীর বাড়ি, এখানেই তিনি চির বিশ্রাম নেবেন। রাজা দেখলেন এই লোকগুলো অনেক জানে শুনে, ওদের অনেক গোপন কথা জানা আছে। তাদের কথা তিনি বিশ্বাস করলেন। নগর ধ্বংস করার মতলব ত্যাগ করলেন তিনি। ত্যাগ করলেন মদীনা শহর। সেই ইহুদী পণ্ডিতদের ধর্ম গ্রহণ করলেন রাজা।

খালিদ ইবনে আবদাল উজ্‌জা ইবনে গাজিয়া ইবনে আমর ইবনে আউফ ইবনে গুনম ইবনে মালিক ইবনে আন-নজর গর্ব করলেন আমর ইবনে তাল্লা সম্বন্ধে এমনি ভাষায়ঃ

তিনি কাঁচা বয়সের সব মোহ ত্যাগ করেছেন,
নাকি সেসব ভুলেই গেছেন ?
নাকি পান করে নিয়েছেন সব মধু ?
যৌবন কি বস্তু তোমার মনে আছে ?
যৌবন ছিল এক যুবকের যুদ্ধ,
যে যুদ্ধ প্রদান করে অভিজ্ঞতা।
ইমরান কিংবা আসাদকে জিজ্ঞেস করো
ভোরের শুকতারার সঙ্গে কখন এসেছিলেন
আবু করিব, সঙ্গে তার বিপুল বাহিনী
লম্বা কোর্তায় আবৃত, দুর্গন্ধবহ দেহ
তারা জিজ্ঞেস করল কাকে আমরা ধরব

বানূ-আউফ, না বানূ-নজীরকে ?
ধরবে বানূ-নজীরকেই,
আমরা আমাদের মৃর্দার জন্য প্রতিশোধ চাই।
তারপর আমাদের যোদ্ধারা গেলেন তাদের ধরতে,
তারা অসংখ্য, বৃষ্টিধারার মতো.
তাদের সঙ্গে ছিলেন আমর ইবনে তাল্লা
(তার সম্প্রদায়ের স্বার্থে আল্লাহ্ তাঁকে দীর্ঘায়ু করুন)।
রাজার মতন উঁচা সর্দার তিনি , কিন্তু যে রাজা
তার শক্তিকে চেনে না সে ই শুধু তার সঙ্গে লাগতে যাবে।

এই আনসার সম্প্রদায় দাবি করেন, ইহুদীদের যে দলটি তাদের সঙ্গে বসবাস করতো, তাদের উপরই ছিল তুব্বার যত রোষ। কেবল তাদেরই তিনি ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সবাই মিলে তাদের রক্ষা করল। তারপর এক সময় তুব্বা আপন কাজে চলে গেলেন। তাঁর ভাষায় তিনি বলেছিলেনঃ

তিনি মনের ভেতর ক্রোধ নিয়ে চলে গেলেন,
ইয়াসরিবের দুই ইহুদী দল, ক্রোধ তাঁর তাদের উপর,
তাদের উপর গজব নাযিল হওয়া উচিত।

তুব্বা এবং তার সম্প্রদায় ছিল পৌত্তলিক। ইয়ামন যাওয়ার জন্য তিনি মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন। মক্কা ইয়ামন যেতে পথে পড়ে। উসফান আর আমাজের মাঝামাঝি জায়গায় যেতে হুদায়ল ইবনে মুদরিকা ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুদার ইবনে নিজার ইবনে সাদ -এর কিছু লোক তাঁকে এসে ধরল। বলল, 'জাঁহাপনা, অনেক ধনরত্ন আছে এক জায়গায় আমরা জানি। আগের কোন রাজার নযর পড়েনি তার উপর। আপনাকে সেই ধন-রত্নের কাছে আমরা নিয়ে যাবো কি ? ওখানে আছে মণিমুক্তো, পোখরাজ, চুনি, সোনা, রূপা।' রাজা বললেন, নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে। তারা বলল,

জায়গাটা হলো মক্কা নগরে। একটি মন্দির আছে ওখানে। মন্দিরের ভেতরে লোকজন পূজা করে প্রার্থনা করে। হুদায়লদের আসল উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু রাজাকে ধ্বংস করা। তারা জানতো কোন রাজা সেই মন্দিরকে অশ্রদ্ধা করলে তাকে মরতে হবেই। রাজা তাদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তিনি তখন দূত পাঠালেন দুই ইহুদী পণ্ডিতের কাছে। এ বিষয়ে তাঁদের কি মত জানতে চাইলেন। ইহুদী পণ্ডিত জানালেন—ওদের মতলব খারাপ। ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য সৈন্য-সামন্ত সমেত রাজাকে ধ্বংস করে দেওয়া। তাঁরা বললেন, এতদঞ্চলে একমাত্র এটিই আল্লাহ্‌র মসজিদ। ওদের কথামতো এই মসজিদ যদি আপনি ধ্বংস করেন তাহলে আপনার সমস্ত লোক ধ্বংস হয়ে যাবে।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেনঃ তাহলে তিনি ওখানে গিয়ে কি করবেন? তাঁরা বললেনঃ মক্কার লোক যা সচরাচর করে থাকেন, তাই তিনি করবেন। মসজিদ তাওয়াফ করবেন, মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন, মাথার চুল কর্তন করবেন এবং যতক্ষণ ওখানে থাকেন ততক্ষণ অত্যন্ত ছোট ও নম্র হয়ে থাকবেন।

কিন্তু তাঁকে তাঁরা যা করতে বলছেন নিজেরা তা করেন না কেন? রাজা জানতে চাইলেন। তাঁরা বললেন—আসলে এই পবিত্র ঘর তো তাদের পিতা ইবরাহীমের ইবাদতের স্থান। কিন্তু ওখানকার লোকজন এর ভেতরে যে অসংখ্য মূর্তি স্থাপন করে রেখেছেন। ওরা ওখানে যে রক্তপাত ঘটায় তা-ই তাদের জন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এক বিরাট অন্তরায়। ওরা অপবিত্র বহু-ঈশ্বরবাদী ইত্যাদি জাতীয় আরো বহু কথা তারা বললেন।

রাজা ওদের কথা বিশ্বাস করলেন। কারণ তাদের কথা ছিল বিশ্বাসযোগ্য। তিনি তখন হুযায়লের লোকজনদের ডাকলেন। তাদের হাত কাটলেন, পা কাটলেন। তারপর যাত্রা শুরু করলেন মক্কার দিকে। মক্কায় পেঁৗছে তিনি কাবাঘর তাওয়াফ করলেন, কুরবানী দিলেন, মাথার চুল কাটলেন। ওখানে তিনি ছয়দিন থাকলেন। এই ছয়দিন তিনি কুরবানী

দিলেন, কুরবানীর গোশত লোকজনের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। ওখানকার লোকজনের মধ্যে তিনি মধুও বিতরণ করলেন।

রাজা একদিন স্বপ্নে আদেশ পেলেন, মসজিদ তাকে ঢেকে দিতে হবে। তিনি মসজিদ ঢেকে দিলেন খেজুর পাতার পাটি দিয়ে। আবার আদেশ পেলেন আরো ভালো করে ঢাকতে হবে কাবাঘর। এবার তিনি কাবাঘর আচ্ছাদিত করলেন ইয়ামনি বস্ত্র দিয়ে। স্বপ্নে তিনি তৃতীয়বারে আদেশ পেলেন, আরো সুন্দর করে ঢাকতে হবে কাবাঘর। তখন তিনি আরো মিহিন, আরো দামী ডোরাকাটা, ইয়ামনি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন সম্পূর্ণ কা'বাঘর। জনশ্রুতি আছে—এমনি করে তুব্বাই সর্বপ্রথম গেলাফ বানিয়ে দিয়েছিলেন কাবাঘরের জন্য। রাজা কাবাঘরের জুরহুমি মুত-ওবীদের আদেশ দিয়েছিলেন, এই গেলাফ পরিষ্কার রাখতে হবে। এর ধারে-কাছে রক্ত, মৃতদেহ অথবা মেয়েলোকের নাপাক কাপড় আনা চলবে না। এই ঘরের জন্য তিনি একটা দরজা বানিয়ে দিলেন। দরজায় তালা লাগানোর বন্দোবস্ত করলেন।

আল-আহাব ইবনে তাবিনা ইবনে জাদিমা ইবনে আউফ ইবনে নসব ইবনে মুআবিয়া ইবনে বকর ইবনে হাওয়াযিন ইবনে মানসুর ইবনে ইকরিমা ইবনে খাসাফা ইবনে কায়েস ইবনে আলানের কন্যা সুবায়া ছিলেন আবদ মানাফ ইবনে কাব ইবনে সাদ ইবনে তায়ম ইবনে মুররা ইবনে কাব ইবনে লুআই ইবনে গালিব ইবনে ফিহ্র ইবনে মালিক ইবনে নযর ইবনে কিনানার স্ত্রী। সুবায়ার পুত্রের নাম ছিল খালিদ। খালিদকে তিনি মক্কার পবিত্রতার কথা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বলে দিয়েছিলেন ওখানে কোন অপরাধ বা অপকর্ম করা নিষেধ। যেমন করে তুব্বা ওখানে গিয়েছিলেন, একে একে কি রকম অবস্থায় সব কাজ সমাধা করেছিলেন পুত্রের কাছে তার বর্ণনা দিয়েছিলেন। পুত্রের প্রতি সুবায়ার উপদেশ ছিল নিম্নরূপ :

মক্কায়, বৎস, ছোট হোক বড়ো হোক কাউকে অত্যাচার করবে না।
এর পবিত্রতা রক্ষা করবে, পাগলামো করবে না।
মক্কায় যে কুকর্ম করবে তার কপালে দুঃখ আছে।

তার মুখ পুড়বে, আগুনে দগ্ধ হবে গাল তার।
আমি জানি মক্কায় যে অপকর্ম করবে সে নিপাত যাবে।
এখানে কোন দুর্গ নির্মিত হয় নি তবু আল্লাহ্ দুর্ভেদ্য করেছেন একে।
আল্লাহ্ এখানে পাখীদের অবাধ্য করে রেখেছেন সাবির পাহাড়ে
নিরাপদ সব বুনো ছাগল।

তুব্বা এসেছিল এর বিরুদ্ধে কিন্তু পরে নকসী কাপড়ে এর সব
প্রাসাদ দিয়েছিলেন ঢেকে।

তার সব গর্ব খর্ব করেছিলেন আল্লাহ্ ওখানে
সুতরাং সে তার ওয়াদা রক্ষা করল,
নগ্নপদে প্রবেশ করল ওখানে, আঙ্গিনায় জড়ো হয়েছিল
তার দুহাজার উট।
উটকে সে খেতে দিল ছাকা মধু খাঁটি বার্লি পানি।
হস্তীবাহিনীকে নির্মূল করেছেন আল্লাহ
বিরাট সব পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে তাদের দেহে
এবং আল্লাহ দূর-দূরান্তে তাদের সব সাম্রাজ্য ধ্বংস করেছেন
পারস্যে, খাজারে সবখানে।
কাজেই সে কাহিনী যখন বলা হয় মন দিয়ে তুমি শুনবে
এবং কিসের কি পরিণাম বুঝতে চেষ্টা করবে।

তারপর তিনি তাঁর সৈন্য-সামন্তসহ ইয়ামনের পথে রওয়ানা হলেন। সঙ্গে দুই ইহুদী পণ্ডিত। দেশে পেঁৗছে তিনি স্বদেশবাসীদের তাঁর নতুন ধর্মে দীক্ষিত হবার জন্য আহ্বান জানালেন। তখন কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না। তারপর যখন সেই নতুন ধর্ম সমস্ত অগ্নি পরীক্ষায় জয়ী হলো তখন সবাই তাঁর পথে এলো অর্থাৎ তাঁর বিশ্বাসকে আপন বিশ্বাস হিসাবে গ্রহণ করল।

আবু মালিক ইবনে সালাবা আবু মালিক আল কুরাজি আমাকে বলেছেন যে তিনি ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্‌কে বর্ণনা

করতে শুনেছেন যে তুব্বা যখন ইয়ামনের সন্নিকটে আসেন তখন হিমইয়ারীরা তার পথ রুখে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল তারা তাকে ইয়ামনে ঢুকতে দেবে না। কারণ তিনি তার ধর্ম ত্যাগ করেছেন। তিনি বললেন, নতুন ধর্ম তোমাদের ধর্মের চেয়ে অনেক ভাল। কাজেই এই ধর্ম তোমরা গ্রহণ কর। কোন কিছু স্থির হলো না অনেকক্ষণ। তারপর ঠিক হলো অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে ফয়সালা হবে। ইয়ামনিদের মতে আগুন দিয়ে যে কোন বিবাদ মীমাংসা করা যায়। তাদের মতে আগুন দোষীকে পুড়ে, নির্দোষ অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসে আগুনের ভেতর থেকে। কাজেই ইয়ামনিদের লোকজন তৈরী হলো তাদের বিগ্রহ আর পূজার উপাচার নিয়ে। দুই ইহুদী পণ্ডিত নেকলেসের মতো ঝুলালেন কিতাব তাদের গলায়। যেখানে আগুন জ্বালানোর কথা ওখানে এলেন তারা। আগুন যখন জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। ইয়ামনিরা ভয়ে ছুটে বের হয়ে এলো। কিন্তু তাদের সমর্থকরা তা মানল না বরং সোল্লাসে উৎসাহ দিতে থাকল, শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য অনুনয় বিনয় করতে লাগল। তারা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আগুন এসে তাদের গ্রাস করল, পুড়ে ভস্ম করল তাদের বিগ্রহ, পূজার অন্যান্য পবিত্র উপাচার এবং সবশেষে যারা এইসব ধারণ করে দাঁড়িয়েছিল তাদের। আর দুই ইহুদী পণ্ডিত বের হয়ে এলেন আগুনের ভিতর থেকে পবিত্র গ্রন্থ গলায় নিয়ে ঘামে ভিজে গেছে সর্ব অঙ্গ কিন্তু অক্ষত। এইসব দেখে হিমইয়ারীরা রাজার ধর্ম গ্রহণ করল। ইয়ামনের ইহুদীবাদের এই হলো গোড়াপত্তনের ইতিহাস।

অন্য একজন কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলেছে আমাকে। তিনিও একজন খবর সংগ্রাহক। বলেছেন, দুই পক্ষ কেবলমাত্র আগুনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল আগুনকে পিছু হটিয়ে দেওয়ার জন্য। কারণ তাদের ধারণা ছিল, যে আগুনকে হটাতে পারে সে-ই জয়ী, সে-ই বিশ্বাসের পাত্র। হিমইয়ারীরা এগিয়ে এল আগুনকে তাড়ানোর জন্য, আগুন তাদের তেড়ে এল। আগুনের তাপ তারা সহ্য করতে পারল না। ওরা পিছিয়ে

এল। পরাজিত। তারপর এগিয়ে এলেন দুই ইহুদী পন্ডিত, তাদের পবিত্র গ্রন্থ তৌরাত থেকে আবৃত্তি করতে করতে। যেই তারা কাছে গেলেন আগুনের তেজ কমে গেল, আগুন পিছু হটতে শুরু করল। পিছু হটতে হটতে এক সময় যেখান থেকে শুরু হয়েছিল আগুনের সেইখানে চলে গেল। হিময়ারীরা তখন তাদের ধর্ম গ্রহণ করল।

এই দুটো বিবরণের কোন্‌টা যে সত্য তা একমাত্র আল্লাহ্‌ বলতে পারেন। রিয়াম ছিল তাদের আর একটি পবিত্র মন্দির। ওখানে তারা বহু ঈশ্বরের পূজো করতো। বলি দিত। ওখান থেকে তারা দৈববাণী লাভ করতো। দুই ইহুদী পন্ডিত বললেন, এটা হলো এক শয়তানের কান্ড-কারখানা। এরা নিয়ত লোকজনদের প্রতারিত করছে ধর্মের নামে। এদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার। রাজা তাতে রাযী হলেন। ভেতরে ছিল একটা কালো কুকুর। কুকুরটাকে বের করে এনে তাকে তাঁরা হত্যা করলেন। ইয়ামনীরা এই কাহিনীই সাধারণত বলে থাকে। তারপর তারা মন্দির চুরমার করে দিল। কেউ কেউ আমাকে বলেছে, মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে এখনো সেই কুকুরের রক্ত লেগে আছে।

তাবাঈর ভাষ্য, তুব্বা তাঁর অভিযানের বর্ণনা যে ভাষায় দিয়েছিলেন তা নিচে দেওয়া হলো। এখানে তিনি তাঁর অভিযানের কথা বলেছেন। মদীনা এবং কা'বা শরীফ সম্বন্ধে তিনি কি করতে চেয়েছিলেন, আর প্রকৃতপক্ষে হুদায়লের লোকজনের কি হাল তিনি করেছিলেন, কেমন করে পবিত্র ঘরকে তিনি পবিত্র করেছিলেন, যেমন করে তাকে শ্রদ্ধা করতেন, আল্লাহ্‌র রসূল সম্পর্কে দুই ইহুদী পন্ডিত কি তাকে বলেছিলেন, সব কিছুর বর্ণনা দিয়ে তিনি কবিতা লিখেছিলেন ঃ

হৃদয়, তোমার ঘুম নষ্ট কেন, যন্ত্রণাবিদ্ধ চোখের মতো ?
কেন তুমি ভুগছো অনন্ত অনিদ্রায়,
ইয়াস্‌রিবের দুই ইহুদী জাতির প্রতি বিক্ষুব্ধ তুমি কেন,
যে ইহুদীদের কিয়ামতের আযাবই সমুচিত শাস্তি ?
আমি যখন মদীনায় ছিলাম প্রবাসে

চমৎকার সুন্দর ঘুম হতো আমার
আমি ঘর বেঁধেছিলাম এক পাহাড়ে
আল আকিক আর বাকিউল, খারকাদ পর্বতের মাঝখানে।
সেই উপত্যকা পর্বত পেছনে ফেলে এসেছি,
রেখে এসেছি খোলা লোনা সমতল,
এসেছে ইয়াসরিবে, আমার বুক
রাগে জ্বলে, ওরা আমার ছেলেকে হত্যা করেছে।
কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছি আমি,
শক্ত অমোঘ শপথ আমার সে
'আমি ইয়াসরিবে গিয়ে ওখানে
একটা খেজুর গাছও আস্ত রাখবো না, তা সে চারাই হোক
আর ফলবতীই হোক।'

তার পর এলেন কুরায়জা গোত্র থেকে
এক বিজ্ঞ ইহুদী জ্ঞানী পুরুষ, ভীষণ তাঁকে মানে ইহুদীরা
বললেন, 'এই সংরক্ষিত শহর থেকে তফাৎ থাক,
কারণ মক্কার কুরায়শদের নবী আসল মানুষ।'
তখন আমি ওদের মাফ করে দিলাম, বিনা বাক্যে,
ওদের ছেড়ে দিলাম হাশরের বিচারের কাছে,
ছেড়ে দিলাম আল্লাহ্র হাতে, তার ক্ষমার ভিখারী আমি,
শেষ বিচারের দিনে আমি নরকের আগুন থেকে বাঁচতে চাই।
আমার কিছু লোক আমি ওখানে রেখে এলাম,
তারা গণ্যমান্য লোক, বীর যোদ্ধা এবং,
এরা হিসাব করে বিজয়ের পথে এগিয়ে যায়।
এই ব্যবস্থার ফলে মুহাম্মদের প্রভুর কাছ থেকে পুরস্কার পেতে পারি,
আশা আছে।

আমি জানতাম না সেই পবিত্র মন্দিরের খবর,
মক্কার উপত্যকায় ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নিবেদিত,

হুযায়লের দাসেরা এসে তার কথা আমাকে বলল

আমি তখন আল মসনদের উপরে জামদানের আলদাফে ছিলাম।

'মক্কার প্রাচীন সম্পদ ধরে আছে সেই ঘর

মণি মুক্তা ধন-রত্ন!' তারা বলল আমাকে।

আমি সেই ধন লুট করতে যাবো তখন আমার প্রভু বললেন, না।

কারণ ঈশ্বর চান না তাঁর নিজস্ব ঘর ধ্বংস হোক,

আমি আমার সংকল্প ত্যাগ করলাম,

লোকগুলোকে আমি উপলব্ধি করতে দিলাম।

আমার আগে জুলকারনায়ন মুসলমান ছিলেন,

বিজিত রাজায় পূর্ণ ছিল দরবার তাঁর,

পূবে পশ্চিমে তাঁর সাম্রাজ্য ছিল বিস্তৃত, তবু তিনি

জ্ঞানী সাধুর সদুপদেশ ভিক্ষা করতেন।

তিনি দেখতেন সূর্য ডুবে যায়

কাদা আর পূতিগন্ধ ডোবায়।

তারো আরো আগে আমার ফুফু বিলকিস

তাদের শাসন করতেন, তারপর হুদহুদ পাখি এলো ফুফুর কাছে।

তার পুত্র হাসান ইবনে তিবানের রাজত্ব ঃ তার ভাইকে হত্যা করল আমর, তার বৃত্তান্ত

তার পুত্র হাসান ইবনে তিবান আসাদ আবু করিব সিংহাসনে বসেই ইয়ামনীদের সাহায্যে আরব আর পারস্য পদানত করার জন্য যাত্রা করল। ওরা ইরাকে এক জায়গায় এসে উপনীত হলো যখন, তখন হিময়ারী আর ইয়ামনীরা বেঁকে বসল। তারা বলল, তারা আর অগ্রসর হবে না। তারা দেশে ফিরে যাবে। দেশে আছে তাদের পরিবার-পরিজন। ওরা তখন আমর নামে তাদের এক ভাইয়ের শরণাপন্ন হলো। আমরও সেনা-বাহিনীতে তাদের সঙ্গে ছিল। তাকে বলল, সে যদি তার ভাইকে হত্যা

করে তাহলে তারা তাকে রাজা বানাবে। আর তখন তাকে দেশে আপন করে ফিরিয়ে নিতে হবে তাদের।

আমর বলল, বেশ, তাই হবে।

ওরা তখন সবাই মিলে চক্রান্ত করল। দলে সবাই ছিল। ছিল না কেবল হিমায়রের যুরুঝান। যুরুঝান তাদের নিষেধ করল। কিন্তু কেউ তার কথা শুনল না। যুরুঝান তখন কবিতা লিখেন:

নিদ্রার বদলে অনিদ্রা চায় কে?
সেই সুখীজন রাত্রে যার ঘুম হয় নিশ্চিন্ত-সুন্দর
বিশ্বাসঘাতকতা করেছে হিমায়র যদিও,
আল্লাহ্ যুরুঝানকে নির্দোষ বলে মেনে নেবেন।

এই দলীল তিনি খামে ভরে তাতে সীল মারলেন। তারপর নিয়ে এলেন আমরের কাছে। বললেন, 'এটা আপনি রাখুন, আপনার কাছে আমি আমানত রাখলাম।'

আমর তার ভাই হাসানকে অতঃপর হত্যা করলেন। ফিরে এলেন ইয়ামনে লোকজন সহ। একজন হিময়ারী ভীষণ অভিভূত হয়ে গেলেন এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে। তিনি বললেন:

প্রাচীন কালেও
কোন চক্ষু দেখে নি
হাসানের হত্যার মতো কোন ঘটনা!
তার সঙ্গে যুদ্ধ হতে পারে ভেবেই তাকে হত্যা করা হলো।
তারপর দিন তারা বলল, 'সব খতম'।
তোমার মৃত্যু আমাদের জন্য সর্বোত্তম বস্তু, কারণ জীবিত তুমি
আমাদের রাজা হতে, কারণ তোমরা সবাই রাজার জাত।
হিময়ারী ভাষায় 'লাবাবি, লাবাবি' শব্দের অর্থ ঠিক আছে।

আমর ইবনে তিবান ইয়ামনে ফিরে এলেন। রাতে তাঁর ঘুম হয় না। কঠিন অনিদ্রা রোগ তাঁকে কাহিল করে রাখলো। ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন

তিনি। ডাক্তার-কোবরেজ-জ্যোতিষ-গণক—সবাই তাঁর অবস্থার কথা জানতো। তাঁর কি হয়েছে তিনি তাদের কাছে জানতে চাইলেন।

তাদের একজন বলল, 'আপনি যেভাবে আপনার ভাইকে হত্যা করেছেন, এই রকম বিশ্বাসঘাতকতা করে কেউ কারো ভাইকে বা নিকট -আত্মীয়কে হত্যা করে কোনদিন ঘুমোতে পারে নি। অনিদ্রার অসুখ কোনদিন তাকে ছাড়ে নি।'

একথা শোনার পর আমর রাজ্যের যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত মানুষ তাঁকে তাঁর ভাই হাসানকে হত্যা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাদের সবাইকে হত্যা করা শুরু করলেন। হত্যা করতে করতে আমর এলেন যুরুঞয়ানের কাছে। যুরুঞয়ান বললেন, তিনি নির্দোষ এবং তার প্রমাণ আমরের কাছেই আছে। সেই যে একটা কাগজ তিনি আমরের হাতে দিয়েছিলেন, সেই কাগজই যুরুঞয়ানের নির্দোষিতার প্রমাণ। আমর সেই কাগজ আনালেন। কবিতাটি পড়লেন। পড়েই যুরুঞয়ানকে ছেড়ে দিলেন। কারণ তিনি কবিতা পড়ে বুঝতে পারলেন, যুরুঞয়ান তাঁকে উচিত পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমরের মৃত্যুর পর হিময়ার রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সমস্ত জনগণ বিভিন্ন দলে শতধাবিভক্ত হয়ে গেল।

লাখনিয়া যু-শানাতির ইয়ামনের সিংহাসন দখল করার বিবরণ

লাখনিয়া ইয়ানুফ যু-শানাতির নামে একজন হিময়ারী শক্তিশালী হয়ে উঠলো। কোন রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। রাজপরিবারের সমস্ত প্রধান ব্যক্তিকে হত্যা করল। তাদের সবাইকে বেইযযত করল প্রকাশ্যে। এই ব্যক্তি সম্পর্কে একজন হিময়ারী লিখেছেন ঃ

হিময়ার তার সন্তানদের হত্যা করে রাজপুত্রদের পাঠায় নির্বাসনে
আপন হাতে আপন লজ্জা ডেকে আনে,
খামখেয়ালে বিনষ্ট করে তার সমস্ত সম্পদ।
তার চেয়ে বড় ক্ষতি তার ছিল তার ধর্মচ্যুতি।

এমন করে তার আগে বহু জাতির সর্বনাশ হয়েছে
এমনি অবিচার আর অন্যায় আচরণের পরিণাম হিসাবে।

লাখনিয়া ভীষণ খারাপ চরিত্রের লোক ছিল। সমকামিতা ছিল তার অন্যতম দোষ। রাজপরিবারের তরুণদের সে তলব করতো। নিয়ে যেতো তাকে বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্মিত এক ঘরে, ওখানে তার সঙ্গে খারাপ কাজ করতো। এমনি করে যাতে সে তরুণ তার উপর দিয়ে আর রাজত্ব না করতে পারে তার ব্যবস্থা করে রাখতো। কাজ সমাধা করে সে তার উপরতলার ঘর থেকে যেতো নিচের তলায়। ঠোঁটের ফাঁকে খিলাল। নিচের তলায় থাকতো প্রহরী আর সৈন্য-সামন্ত। লাখনিয়ার মুখে খিলাল দেখেই বুঝতো কাজ সমাধা হয়েছে। কাজকর্ম করার পর তরুণকে ছেড়ে দেওয়া হতো এবং তাকে চরম লজ্জা ও অপমানের চিহ্ন সর্ব অঙ্গে বহন করে যেতে হতো প্রহরীদের সামনে। লোকজনের সামনে। একদিন লাখনিয়া ডেকে পাঠাল হাসানের ভাই তিবান আসাদের পুত্র জুরা যুনুয়াসকে। হাসানকে হত্যা করার সময় সে খুব ছোট ছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে সে সচ্চরিত্র ও প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন তরুণে পরিণত হলো।

দূত যখন তাকে ডাকতে এল তখনই সে বুঝতে পারল কি উদ্দেশ্যে ডাকা হয়েছে। সে রওয়ানা হলো। সঙ্গে নিল ছোট ধারালো একটা চাকু। লুকিয়ে রাখল সেটা জুতোর সোলের নীচে। তারপর গেল লাখনিয়ার কাছে।

সেই ঘরে ওকে রেখে সবাই চলে যেতেই লাখনিয়া তাকে ধরল। পলকে যুনুয়াস ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। সঙ্গে সঙ্গে চাকুটা বসিয়ে দিল তার বুকে। লাখনিয়া মারা গেল সঙ্গে সঙ্গে। যুনুয়াস দেহ থেকে মাথাটা কেটে নিয়ে তা রাখল জানালার উপরে, যেখান থেকে নীচে প্রহরীদের দেখা যায়। তারপর তাঁর মুখের ভেতরে গুঁজে দিল খিলাল। তারপর সে বেরিয়ে চলে এল প্রহরীদের কাছে। কর্কশ স্বরে প্রহরীরা জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে।

'ওই মস্তককে জিজ্ঞেস করো, কি হয়েছে।' সে বলল। ওরা জানালার দিকে তাকাল। দেখল ওখানে পড়ে আছে লাখনিয়ার ছিন্ন মস্তক।

ওরা তখন যূনুয়াসকে ধরে বসল। বিনীত কণ্ঠে বলল, "আপনাকে আমাদের রাজা হতে হবে। আর কেউ রাজা হবে না এখানে। আপনি ওই বেতমিজ শয়তান লোকটার হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছেন।"

যুনুয়াসের রাজত্ব

তাঁকে তারা রাজা বানালো। হিময়ারের সমস্ত লোক দলমত নির্বিশেষে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করল। তিনিই ছিলেন সর্বশেষ ইয়ামনী রাজা। তিনিই খন্দক তৈরী করেছিলেন। তিনি যোশেফ নামে পরিচিত ছিলেন। বেশ কিছু কাল তিনি রাজত্ব করেছিলেন।

নজরানে কিছু লোক ঈসা ইবনে মরিয়মের ধর্মাবলম্বী ছিল। ওরা গসপেল অনুসরণ করতো। তারা খুব পুণ্যবান আর ন্যায়বান লোক ছিল। তাদের দলপতির নাম ছিল আবদুল্লা ইবনে আল-সামির। এই ধর্মের প্রধান উৎস-স্থল ছিল নজরান। নজরান তখন সমস্ত আরব দেশের কেন্দ্রস্থল ছিল। ওখানকার লোকজন, শুধু ওখানকার কেন, সমস্ত আরবের লোকই তখন ছিল পৌত্তলিক। ওখানে ফায়মিউন নামে একজন খৃস্টান এসে বসবাস শুরু করেন এবং তাঁর ধর্মে সমস্ত অধিবাসীদের ধর্মান্তরিত করেন।

নজরানে খৃস্টধর্মের সূচনা

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ নামে একজন ইয়ামনীর বরাত দিয়ে আল আখনাস গোত্রের আল-মুগিরা ইবনে আবু লাবিদ নামে একজন মুক্ত দাস আমাকে বলেছেন, নজরানে যে খৃস্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত হলো তার মূলে ছিলেন ফায়মিউন। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, অত্যন্ত উৎসাহী এবং তপস্বী লোক। তার প্রার্থনার নাকি জবাব পাওয়া যেতো। ফল পাওয়া যেতো।

ফায়মিউন শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াতেন। এক শহরে পরিচিত হয়ে গেলে পরে চলে যেতেন অন্য শহরে। যা উপার্জন করতেন, তা-ই

দিয়ে গ্রাসাচ্ছাদন করতেন। তিনি পেশায় একজন নির্মাতা ছিলেন। কাদার ইট দিয়ে ঘর তৈরী করতেন। রোববার দিন ছিল তাঁর ছুটির দিন। ওই দিন তিনি কোন কাজ করতেন না। মরুভূমিতে একটি জায়গায় তিনি যেতেন, গিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রার্থনা করতেন। সিরিয়ার এক গ্রামে তিনি তাঁর কাজ করছিলেন তখন। লোক সংসর্গ থেকে দূরে। তখন ওখানকার সালিহ নামে এক লোক তাঁকে তন্ন তন্ন করে পর্যবেক্ষণ করতেন। সালিহ তাঁর প্রতি ভীষণ ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। এতটা আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, ফায়মিউনের অজান্তে তিনি তাঁকে অনুসরণ করতেন সর্বত্র। ছায়ার মতো। যেখানে ফায়মিউন যেতেন, সেখানেই তিনি যেতেন। একদিন এক রোববার সালিহ ফায়মিউনকে অনুসরণ করতে করতে মরুভূমিতে গিয়ে হাযির হলেন। সালিহ্ এক জায়গায় নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন। এমন এক জায়গায়, যেখান থেকে তিনি ফায়মিউনকে দেখতে পাচ্ছিলেন কিন্তু ফায়মিউন সালিহকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। ফায়মিউন প্রার্থনায় দাঁড়ালেন। তখন একটা তিন্নিন সাত শুঁড়আলা সাপ তার দিকে ছুটে এল। ফায়মিউন সাপটাকে দেখলেন, দেখে ওটাকে অভিসম্পাত দিলেন। অভিসম্পাত দিতেই সঙ্গে সঙ্গে সাপটা মরে গেল। সালিহ কেবল সাপটাকেই দেখলেন, কিন্তু সাপটা যে মরে গেল সেটা লক্ষ্য করতে পারলেন না। ঘটনাটা দ্রুত ঘটে গেল। কাজেই সালিহ ফায়মিউনের বিপদের কথা চিন্তা করে আর নিজকে সামলাতে পারলেন না, চীৎকার করে উঠলেন : "সাবধান ! ফায়মিউন, একটা তিন্নিন আপনার দিকে যাচ্ছে।"

ফায়মিউন সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি প্রার্থনায় যেমন ছিলেন, তেমনি রইলেন, তেমনি প্রার্থনা সমাপ্ত করলেন। সালিহ্‌কে যেন তিনি দেখতেই পেলেন না। তারপর রাত নামল। তিনি ওখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হলেন। তিনি জানলেন, তিনি ধরা পড়ে গেছেন। সালিহ জানলেন, তিনি তাকে দেখতে পেয়েছেন। কাজেই সালিহ তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন।

বললেন, "ফায়মিউন, আপনি জানেন আপনাকে আমি ভীষণ ভালবাসি। এতো ভাল আমি আর কাউকে বাসি না। আমি আপনার কাছে কাছে থাকতে চাই। যেখানে যান সেখানে যেতে চাই।"

ফায়মিউন বললেন, "আপনার মর্জি। তবে আপনি তো জানেন আমি কেমন করে জীবন ধারণ করি। আমার মতো কষ্টের জীবন যদি আপনি যাপন করতে পারেন, খুব ভাল।"

সালিহ থেকে গেলেন তাঁর সঙ্গে। গ্রামের লোক আস্তে আস্তে তাঁর সমস্ত গোপন রহস্য জানতে থাকল। কারণ কঠিন অসুখের কোন রোগীর সঙ্গে পথে দৈবাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে, তিনি তার জন্য দোয়া করতেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাল হয়ে যেতো সে রোগী। কিন্তু কোন অসুস্থ মানুষকে দেখার জন্য ডাকলে তিনি তাকে দেখতে যেতেন না।

গ্রামের এক লোকের পুত্র ছিল অন্ধ। লোকটা ফায়মিউনকে তাকে দেখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। কিন্তু ফায়মিউন গেলেন না। বলে পাঠালেন—তিনি কোথাও রোগী দেখতে যান না। তবে তিনি বাড়ি নির্মাণ করেন, তার বদলে মজুরী নেন। তখন সেই লোক তার ঘরের ভিতর ছেলেকে একটা কাপড় দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে শুইয়ে রাখল। তারপর গেল ফায়মিউনের কাছে। গিয়ে বলল তার বাড়িতে কিছু কাজ আছে, তিনি যদি গিয়ে করে দেন, যা মজুরী তিনি দাবী করবেন তাই সে দেবে। লোকটার বাড়িতে গিয়ে ফায়মিউন জিজ্ঞেস করল, কাজটা কি। লোকটা কাজের বর্ণনা দিল। তারপর হঠাৎ পুত্রের দেহ থেকে কাপড়টা সরিয়ে নিল একটানে।

বলল, "এই হাল ঈশ্বরের এক সন্তানের ফায়মিউন। ওর জন্য আপনি দোয়া করুন।"

ফায়মিউন দোয়া করলেন।

বালক সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে বসল।

ফায়মিউন দেখলেন, সবখানে তিনি ধরা পড়ে গেছেন। তিনি গ্রাম ত্যাগ করে চলে গেলেন। সঙ্গী হলেন সালিহ।

সিরিয়ার ভিতর দিয়ে পদব্রজে হাঁটছিলেন দুজন। একটা বিরাট গাছের নিচে যেতেই গাছের ওদিক থেকে একজন লোক বলে উঠল, "আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। বারবার আমি বলছিলাম, 'কখন তিনি আসবেন?' তারপর আমি আপনার কণ্ঠ শুনলাম। জানলাম, আপনি এসেছেন। আমি এক্ষুনি মরব। আমি মরলে পরে আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আমার জন্য প্রার্থনা না করে আপনি যাবেন না।"

লোকটা সত্যিই মারা গেল এরপর। ফায়মিউন ওখানে দাঁড়িয়ে কবর না দেওয়া পর্যন্ত তার জন্য প্রার্থনা করলেন। তারপর তিনি আবার যাত্রা শুরু করলেন। সঙ্গে সালিহ।

তাঁরা এসে পৌঁছলেন আরব দেশে। আরবরা তাঁদের আক্রমণ করল। একটা কাফেলা তাদের নিয়ে গেল নজরানে। ওখানে তাদের বিক্রি করে দিল দাস হিসাবে।

নজরানের অধিবাসীরা তখন আরবদের ধর্ম অনুসরণ করতো। বিরাট এক খেজুর গাছকে পূজা করতো তারা। প্রতি বৎসর উৎসব হতো। উৎসবের দিনে খেজুর গাছে ঝুলিয়ে দিতো সবচেয়ে সুন্দর মিহি কাপড়। ঝুলিয়ে দিত রমণীদের অলংকার। তার পর তারা ছুটে বেরিয়ে যেতো ওখান থেকে, সারাদিন মত্ত থাকতো গাছের পূজায়, নিবেদিত প্রাণ।

এক সম্ভ্রান্ত লোকের কাছে বিক্রি করা হলো ফায়মিউনকে। সালিহ্ বিক্রিত হলেন অন্য এক খান্দানের কাছে।

তার পর হলো কি, ফায়মিউনকে যে ঘরে রাখা হতো, সেই ঘরে বসে রাতের বেলা তিনি গভীর মনোনিবেশে প্রার্থনা করতেন। প্রার্থনা করার সময় সমস্ত বাড়ি উজ্জ্বল আলোয় ঝলোমলো হয়ে যেতো। অথচ কোথাও কোন বাতি ছিল না। তাঁর মনিব এতে ভীষণ বিস্মিত হলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি তার ধর্ম।"

ফায়মিউন তাকে তাঁর ধর্মের কথা বললেন। বললেন তারা সবাই ভুল করছেন। খেজুর গাছ না পারে রক্ষা করতে, না পারে মারতে। আর তিনি যদি আল্লাহ্‌র নামে গাছটাকে বদদোয়া দেন, গাছটাকে আল্লাহ্ ধ্বংস করে দেবেন। কারণ আল্লাহ্ এক, তাঁর কোন শরীক নেই।

তাঁর প্রভু বললেন, "তাই করো তবে। যদি তা করতে পারো, আমরা তোমার ধর্ম গ্রহণ করবো, আমাদের বর্তমান ধর্ম বর্জন করবো।"

নিজেকে তিনি পবিত্র করলেন। দুই বার প্রার্থনা করলেন। গাছকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে কাকুতি মিনতি করলেন। আল্লাহ্ এক প্রবল ঝড় পাঠিয়ে দিলেন। ঝড় গাছকে সমূলে উৎপাটিত করে ভুলুণ্ঠিত করলো। এরপর নজরানের অধিবাসিগণ তাঁর ধর্ম গ্রহণ করল এবং তিনি ঈসা ইবনে মরিয়মের ধর্মের অনুশাসন তাদের অবহিত করলেন। পরে অবশ্য তাদের উপর বিপদ আপতিত হয়েছিল, তাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। দুইটি ধর্ম পাশাপাশি অবস্থান করলে সচরাচর যা ঘটে তাই ঘটল। আরব ভূমি নজরানে এই হলো খৃস্টধর্ম প্রতিষ্ঠার মূলকথা। নজরানের লোকের কাছে শোনা এই হলো ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ্‌র বর্ণনা।

আবদুল্লাহ ইবনে আল-সামির এবং আরো অনেকেই খন্দকে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলেন

ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদ আমাকে বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে কাব আল কারাজির বরাত দিয়ে নজরানের এক ভদ্রলোকও আমাকে বলেছেন একথা। বলেছেন ওরা সবাই মূর্তিপূজা করতো। বিরাট বড় শহর নজরান। ওখানে আশেপাশের সমস্ত এলাকা থেকে লোক এসে জমায়েত হতো। ওখানে এক গ্রামে থাকতো এক যাদুকর। নজরানের সব যোয়ানদের সে শিখাতো যাদুবিদ্যা। ফায়মিউন এলেন ওখানে। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ যে নামে ডাকতেন তাকে, তারা কেউ তাঁকে সে নামে ডাকল না। বলতো, সেই লোকটা। সেই যে সেই লোকটা এসেছিল, সে। নজরান আর যাদুকরের

গ্রামের মাঝখানে তাঁবু বাঁধলেন ফায়মিউন। নজরানের লোকজন যাদুকরের কাছে পাঠাতো তাদের তরুণ সন্তানদের, যাদুবিদ্যা শিখবার জন্য। আল-সামির পাঠালো তার ছেলেকে। ছেলে যখন সেই লোকটার তাঁবুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল হেঁটে, শুনতে পেল লোকটা প্রার্থনা করছে। লোকটার গভীর মনোনিবেশ আর নিষ্ঠা দেখে দারুণ অভিভূত হলো ছেলে। তারপর থেকে ছেলে ওখানেই যেতো। বসে থাকতো অনেকক্ষণ। শুনতো তাঁর কথা। তারপর এমনি করতে করতে একদিন সে মুসলমান[১] হয়ে গেল। মুসলমান হয়ে গেলেন, আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করলেন, তাঁর ইবাদত করতে শুরু করলেন। ইসলাম সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করে করে সব জ্ঞান তিনি আয়ত্ত করলেন, তার পর একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় নাম কি?'

তিনি আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড়ো নাম জানতেন। কিন্তু বললেন না। চেপে গেলেন। বললেন, 'নওযোয়ান, সে নাম বললে তুমি তা সহ্য করতে পারবে না। তুমি তা শোনার মতো শক্তি এখনো সংগ্রহ করতে পারো নি।'

এদিকে আল-সামির কিন্তু জানত না যে, তার পুত্র আবদুল্লাহ সেই যাদুকরের কাছে যাচ্ছেন না। আবদুল্লাহ্ যখন দেখলেন, তাঁর ওস্তাদ যে জ্ঞানের জন্য তিনি অস্থির হচ্ছেন সে জ্ঞান দিচ্ছেন না, তার দুর্বলতাকে ভয় পাচ্ছেন। তখন তিনি কতগুলো কাঠি সংগ্রহ করলেন। যখনই ওস্তাদ তাকে আল্লাহ্‌র কোন নাম বলতেন, সেই নাম সেই কাঠিতে তিনি লিখে রাখতেন। সবগুলো নাম এমনি করে এক একটি কাঠিতে লিখে নিলেন। তারপর একটা আগুন জ্বালালেন। এক এক করে সেই নাম লেখা সব কাঠি আগুনে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তারপর এল সেই কাঠির পালা, যে কাঠিতে ছিল আল্লাহ্‌র সেরা নাম। আগুনে নিক্ষেপ করতেই সে কাঠি লাফ মেরে বেরিয়ে এল। আগুন তাকে স্পর্শ করল না। সেই কাঠি নিয়ে তিনি এলেন ওস্তাদের কাছে। বললেন, যে নাম তিনি তাঁর কাছে গোপন করেছেন, সে নাম তিনি জানেন। ওস্তাদ জিজ্ঞেস

১. বিশুদ্ধ খৃস্টধর্ম আর ইসলাম অভিন্ন। কুরআন, ৩ : ৪৫।

করলেন, কেমন করে তিনি জানতে পেরেছেন? কেমন করে সেই গোপন সংবাদ বের করেছেন, সব তিনি খুলে বললেন।

ওস্তাদ বললেন, 'নওযোয়ান দোস্ত, যা তুমি জেনেছো, তা কাউকে বলবে না। তোমার বুকের ভেতরে রাখবে। পারবে কিনা জানি না, তবু আমি বলছি, একথা কাউকে তুমি বলো না।'

এরপর থেকে আবদুল্লাহ ইবনে আল-সামির নজরানে এলে যখন কোন অসুস্থ লোকের সাক্ষাৎ পেতেন, তাকে বলতেন, 'আল্লাহ্‌র বান্দা, আল্লাহ্‌র একত্বকে তুমি মেনে নেবে? আমার ধর্ম তুমি গ্রহণ করবে? যদি করো তাহলে আমি দোয়া করবো, তুমি ভাল হয়ে যাবে।'

অসুস্থ লোক রাযী হয়ে যেতো। আল্লাহ্‌র একত্বে ঈমান আনতো। মুসলমান হতো। তখন তিনি দোয়া করতেন এবং ভাল হয়ে যেতো অসুস্থ লোক। এমনি করে একদিন দেখা গেল নজরানে আর রোগী নেই। সবাই ভাল হয়ে গেছে। সবাই তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেছে।

রাজার কানে গেল সে সংবাদ। রাজা তাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'তুমি আমার নগরের সব মানুষকে খারাপ করছো। ওরা সব আমার বিরুদ্ধে চলে গেছে। ওরা আমার ধর্ম, আমার বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছে। তোমাকে আমি সমুচিত শিক্ষা দেবো।' তিনি জবাব দিলেন, 'আমাকে শিক্ষা দেওয়ার সাধ্য আপনার নেই।' রাজা তাঁকে বিরাট উঁচু এক পাহাড়ে নিয়ে গেলেন। উঁচু পাহাড় থেকে সোজা তাঁকে নিচে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু তিনি মাটিতে পড়লেন এতো উঁচু থেকে, দিব্যি অক্ষত।

অতঃপর রাজা তাঁকে নিক্ষেপ করলেন, অতল সমুদ্রে। সে সমুদ্র থেকে কেউ জীবিত ফিরে আসে নি। ফিরে এলেন আবদুল্লাহ্। নিরাপদে। রাজার সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে আবদুল্লাহ্ রাজাকে বাগে পেলেন। বললেন, আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস না করলে, তাঁর ধর্ম গ্রহণ না করলে রাজা কিছুতেই তাকে হত্যা করতে পারবেন না। আর যদি রাজা ঈমান আনেন, তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি তাঁকে হত্যা করার ক্ষমতা লাভ করবেন।

রাজা তখন আল্লাহ্‌র একত্বে ঈমান আনলেন, আবদুল্লাহ্‌র ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করলেন। রাজার হাতে ছিল একটা লাঠি। তাই দিয়ে মৃদু আঘাত করলেন আবদুল্লাহ্‌কে। তাতেই আবদুল্লাহ্ মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে রাজাও মারা গেলেন।

এই ঘটনার পর নজরানের সব লোক আবদুল্লাহ্ আল-সামিরের ধর্ম, ঈসা ইবনে মরিয়ম প্রচারিত গস্‌পেল ও আইন অনুযায়ী গ্রহণ করল। পরবর্তীকালে তাদের সহ-ধর্মাবলম্বীদের উপর মহাবিপদ নেমে এসেছিল। সেই বিপদ থেকে তারাও বাঁচতে পারে নি।

নজরানে খৃস্টধর্ম প্রচারের এই হলো মূল কথা। আল্লাহ্ মালিক। আসলে কি কি প্রকৃতপক্ষে ঘটেছিল তা তিনিই জানেন। এই হলো মুহম্মদ ইবনে কা'ব আল-কারাজির বর্ণনা। এই হলো আবদুল্লাহ্ ইবনে আল-সামির সম্বন্ধে নজরানের জনৈক লোকের বিবরণ। প্রকৃত ঘটনার খবর আল্লাহ্ ভাল জানেন।

যুনুয়াস এসেছিল তাদের সবার বিরুদ্ধে। লোক-লস্কর সৈন্য সামন্ত নিয়ে। বলল, হয় তার কথা শুনতে হবে, নয় মৃত্যু বরণ করতে হবে। তারা মৃত্যু বরণ করে নেবে বলে তৈরী হলো। কাজেই সে খন্দক কাটল তাদের জন্য। আগুনে পুড়িয়ে মারল অনেককে। তরবারির আঘাতে হত্যা করল কাউকে কাউকে। কাউকে কেটে টুকরো টুকরো করল। এমনি করে বিশ হাজার মানুষ হত্যা করল সে।

যুনুয়াস আর তার সৈন্য-সামন্ত সম্বন্ধে রসূল (সা)-এর কাছে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

> শাশ্বত লা'নত পড়েছিল খন্দক-অলাদের উপর
> তাদের জ্বালানি-প্রজ্বলিত আগুন,
> তার লেলিহান শিখা যতই উঠছিল উপরে
> ততই শোচনীয় হচ্ছিল মুমিনের যন্ত্রণা।
> ওরা নিকটেই বসে প্রত্যক্ষ করছিল এ যন্ত্রণাদায়ক কর্মকান্ড।

তাদের উপর নির্যাতন চালানো হলো।
কারণ, তারা বিশ্বাস করতো
সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, প্রশংসাযোগ্য আল্লাহ্‌কে।[১]

যাদের হত্যা করে যুনুয়াস তাদের মধ্যে ছিলেন তাদের নেতা এবং ইমাম আবদুল্লাহ্ ইবনে আল-সামির।

আবদুল্লা ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাজম আমাকে বলেছেন যে, তিনি শুনেছেন, উমর বিন খাত্তাবের সময়ে নজরানের একজন লোক নজরানের পুরনো ধ্বংসাবশেষ খুড়তে গিয়েছিলেন, জমিটাকে চাষের উপযুক্ত করার জন্য। তখন সেই লোক এক কবরের ভিতরে আবিষ্কার করে আবদুল্লাহ্ আল-সামিরকে। আবদুল্লাহ আল-সামির বসা অবস্থায় ছিলেন, মাথায় একটি আঘাতের উপর দুই হাত শক্ত করে ধরা ছিল। তাঁর হাত সরাতেই ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো রক্ত। তারা তাঁর হাত ছেড়ে দিতেই সেই ক্ষতস্থানে চলে গেল হাত। বন্ধ হয়ে গেল রক্ত পড়া। তাঁর হাতে একটা আংটি ছিল, তাতে লেখা ছিল 'আল্লাহ্ আমার প্রভু'। উমরের কাছে এই সংবাদ পাঠানো হলে উমর বলেছিলেনঃ 'তিনি যেমন আছেন তেমনি থাকতে দিন। কবর দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিন।' তাঁর হুকুম তামিল করা হয়েছিল।

দাউদ যু-থালাবান, আবিসিনীয় আধিপত্যের সূচনা এবং যে আরিয়াত ইয়ামনের ভাইসরয় হয়েছিলেন তাঁর ইতিহাস

দাউস যু-থালাবান নামে সাবার একজন লোক পালিয়ে গিয়েছিলেন। ঘোড়ায় চড়ে। মরুভূমিতে কোন্ দিকে যে তিনি গিয়েছিলেন কেউ তাঁকে ধরতে পারল না। যেতে যেতে তিনি পেঁৗছলেন গিয়ে বাইজেনটাইন রাজার দরবারে। যুনুয়াসের সমস্ত কীর্তির কথা রাজাকে বললেন। বললেন, যুনুয়াস আর তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি লড়বেন।

১. কুরআন, ৮৫ঃ ৪।

রাজার সাহায্য চান তিনি। রাজা বললেন, তার রাজ্য তো অনেক দূরে। এতো দূর থেকে কেমন করে সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্য করা যায়। তার চেয়ে বরং তিনি আবিসিনিয়ার রাজাকে পত্র লিখে দেবেন। সেখানকার রাজা খৃস্টান। তাছাড়া তার রাজ্য ইয়ামনের কাছাকাছি। রাজা আবিসিনিয়ার রাজাকে পত্র লিখলেন। বলে দিলেন, দাউসকে সাহায্য করুন। তার হয়ে প্রতিশোধ নিন।

রাজার পত্র নিয়ে দাউস গেলেন নিগাসের কাছে। নিগাস তার সঙ্গে পাঠালেন সত্তুর হাজার আবিসিনিয়ান, আরিয়াত নামে এক সেনাপতির নেতৃত্বে। (তাবারির মতে রাজা তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন, দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোককে হত্যা করতে হবে, দেশের এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল জ্বালিয়ে দিতে হবে, জয় করা হয়ে গেলে এক-তৃতীয়াংশ মহিলা আর বাচ্চাকে বন্দী করতে হবে।) সৈন্যদলের সঙ্গে ছিল আবরাহা নামে এক লোক। তার ডাকনাম ছিল 'ভাঙ্গা-মুখ'। দাউস যুথালামানের সঙ্গে আরিয়াত সমুদ্র পার হয়ে পেঁছিলেন এসে ইয়ামনে। যুনুয়াসের পেছনে কিছু অনুগত লোক ছিল। হিময়ারি এবং অন্যান্য গোত্রের। তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে সে তাদের বাধা দিল। যুদ্ধ চলো। যুদ্ধে পরাজিত হলো যুনুয়াস। রণে ভঙ্গ দিয়ে তারা পলায়ন করল। যুনুয়াস যখন দেখল তার আর উপায় নেই, তখন সে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল সমুদ্রের দিকে। ঢুকল সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে। প্রথমে অল্প পানিতে। পরে গভীর পানিতে। গভীর অতলে তলিয়ে গেল যুনুয়াস। যুনুয়াসকে এর পরে কেউ কোথাও দেখে নি। ইয়ামনে প্রবেশ করলেন আরিয়াত। দখল করলেন ইয়ামন। (তাবারির মত অনুযায়ী নিগাসের হুকুম তিনি তামিল করেছিলেন, সঙ্গে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলেন এক-তৃতীয়াংশ মহিলা আর শিশু-কিশোর। ওইখানে তিনি কিছুদিন রয়ে গিয়েছিলেন, তাঁবেদার করেছিলেন ওখানকার সমস্ত লোকজনকে।)

আবিসিনীয়দের নিয়ে দাউসের রণে ঝাঁপিয়ে পড়া সম্বন্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শী ইয়ামনী লিখেছিলেন ঃ

দাউসের মতো নয়, যেমন করে তিনি ঘোড়ার জিনে করে সব কিছু নিয়ে এসেছিলেন, তেমন করে নয়।

এখন পর্যন্ত ইয়ামনে সে কথা প্রবাদের মতো হয়ে আছে।

হিময়ারী যুজাদান লিখেছেন : (তাবারির মতে তাদের পূর্ব গৌরবের পর যেভাবে তারা বেইজ্জত হয়েছিল, যেভাবে আরিয়াত তাদের সিলহীন, বায়নুন এবং গুমদান প্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিল, তাই বর্ণনা করতে চেয়েছেন যুজুদান)

ধীরে ! যা ঘটেছে অশ্রু তা স্মরণ করতে পারবে না আর
যারা মরে গেছে তাদের কথা ভেবে কি লাভ আর।
বায়নুনের কোন প্রস্তর নেই, কোন চিহ্ন নেই,
সিলহিনের পর কেউ কি আর বানাবে এমন প্রাসাদ ?

বায়নুন, সিলহিন আর গুমদান ছিল ইয়ামনি প্রাসাদ। আরিয়াত ধ্বংস করে দিয়েছিলেন সেগুলো। ওরকম প্রাসাদ একটিও আর আস্ত রাখেন নি তিনি।

যুজুদান আরো লিখেছেন :

শান্তি, ঠিক তোমাকে ! তুমি আমাকে ফেরাতে পারবে না
আমার উদ্দেশ্য থেকে
তোমার গঞ্জনা আমার থুতু শুকিয়ে আনে !
অতীত দিনের গানের মূর্চ্ছনা চমৎকার ছিল
যখন আকণ্ঠ পান করতাম মধুরতম পবিত্রতম সুরা।
উদ্দাম সুরাপান লজ্জার নয়
যদি আচরণ আমার নিন্দনীয় না হয় বন্ধুর কাছে
মৃত্যুকে পারে না কেউ রোধ করতে
সে কেবল হাতুড়ের সুগন্ধ ঔষধ গিলতে পারে।
নিভৃত আশ্রমের কোন পুরোহিত উড়তে পারে না
সহজে অসীম আকাশে উড়ে যেখানে শকুনি।

গুমদানের চুড়োর কথা শুনেছো তো ঃ
সুউচ্চ পাহাড় থেকে এসেছে সে নীচে নেমে
সুনিপুণ কারুকার্যে, প্রস্তর-খচিত
পরিচ্ছন্ন সিক্ত মসৃণ আবরণে
ভোরের বাতি চমক খেলে তার দেহে
বিদ্যুৎশিখার মতো।
তার দেয়ালের পাশে উজ্জ্বল পাম গাছ
সুপক্ক ফলের ভার নিয়ে শোভা পায়।
একদার নতুন প্রাসাদ এখন ভস্মে পরিণত
সমস্ত সৌন্দর্য তার অগ্নিশিখা কুরে খেয়ে গেল।
অবনত যুনুয়াস তার মহান প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেল,
উচ্চারণ করে গেল সতর্কবাণী, তোমাদের বিপদ আসন্ন।

এই বিষয়ে ইবনুল যিবা আল তাকাফি বলেন ঃ
মৃত্যু আর জরা থেকে নিস্তার নেই, জীবনের শপথ,
জীবন নয় বন্ধন, মানুষের পালানোর ঠাঁই নেই, আশ্রয় নেই
হিময়ার জাতি ধ্বংস হলে পরে মহাবিপদের আঘাতের পাশে একটি সকাল
ঝলসে হাজার হাজার বর্শাধারী মেঘভার আকাশের মতো,
তাদের গর্জন প্রতিরোধ স্তব্ধ করে দিয়েছিল
যোদ্ধারা পালিয়ে গেল তাদের দেহের দুর্গন্ধ বহন করে
তারা এল, বালুকণার মতো অসংখ্য ডাকিনা শুষে নিল সব গাছের রস।

আমর ইবনে মাদি কারিব আল-জুবায়দির বিবাদ ছিল কায়স ইবনে মাকশুহ আল-মুরাদির সঙ্গে। তিনি যখন শুনলেন কায়েস তাঁকে শাসিয়েছে, তখন তাঁর হিময়ারদের হৃত গৌরবের কথা মনে পড়ল। তিনি বললেনঃ

ভয় দেখাচ্ছো যে তুমি যুরওয়ান নাকি ?
অথবা যুনুয়াস তুমি, তার ক্ষমতার দিনের ?
তোমার আগে বহু ছিল মানুষ ঐশ্বর্যবান

মানুষের ভিতরে মজবুত শিকড় তাদের সাম্রাজ্যের।
"আদের দিনের মতই প্রাচীন
দারুণ দুর্ধর্ষ, নিদারুণ অত্যাচারী,
তবু তারা ধ্বংস হয়ে গেল,
আর সে হলো পথের ভিখারী।

আবরাহা ইয়ামনে ক্ষমতা দখল করলেন, হত্যা করলেন আরিয়াতকে

ইয়ামনে কয়েক বছর আরিয়াত রাজত্ব করেন। তারপর আবিসিনিয়ান আবরাহা তাঁর কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। সমস্ত আবিসিনীয় দল দুইভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল আরিয়াতের সমর্থক, অন্যদল আবরাহার। যুদ্ধ যখন লাগবে-লাগবে ভাব তখন আবরাহা আরিয়াতের কাছে এক প্রস্তাব পাঠালেন। যুদ্ধ করে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি করে কি লাভ। এর চেয়ে দুইজনের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হোক না, যে জিতবে সে ই হবে সমস্ত সৈন্য-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি! আরিয়াত প্রস্তাবে সম্মত হলেন। আবরাহা এগিয়ে গেলেন তার মুকাবিলা করতে। বেঁটে মোটা মানুষ খৃস্টধর্মে বিশ্বাসী আবরাহা। আরিয়াত বর্শা হাতে এগিয়ে আসছেন তাঁর দিকে। বিশালকায় লম্বা সুদর্শন আরিয়াত। আতাওদা নামে আবরাহার এক যোয়ান সঙ্গী ছিল, সে রইল তার পেছনে। পেছন দিক থেকে কোন আক্রমণ এলে তা থেকে রক্ষা করবে আবরাহাকে। আরিয়াত বর্শা তুলে নিলেন, নিক্ষেপ করলেন আবরাহার দিকে। বর্শা এসে আঘাত করল আবরাহার কপালে, দুভাগ হয়ে গেল ভুরু, নাক, চোখ আর মুখ। এজন্যই আবরাহাকে আল-আশরাম বা ভাঙ্গামুখ বলা হয়। তখন আতাওদা আবরাহার পেছন থেকে বেরিয়ে এসে আরিয়াতকে আক্রমণ করলেন। আরিয়াত নিহত হলেন। আরিয়াতের সৈন্য আবরাহার দলে যোগ দিল। ইয়ামনের সমস্ত আবিসিনীয় তাঁকে নেতা বলে মেনে নিল। (তাবারির মতেঃ তখন আতাওদা চীৎকার করে উঠলঃ 'যে আতাওদাকে আপনি দেখছেন, সে বড় বেতমিজ, হারামজাদা।' অর্থাৎ বলতে চাইল, আবরাহার দাস আরিয়াতকে

হত্যা করেছে। আল-আশরাম জিজ্ঞেস করলেন, কি সে চায়। কারণ যদিও নিজেই হত্যাকারী, তবু তাকেই খুনের দাম দিতে হবে। তখন আতাওদা তার কাছ থেকে ইয়ামনের প্রধান কর্মকর্তার পদটি চেয়ে নিল।) আরিয়াতকে হত্যা করার জন্য খুনের দাম পরিশোধ করলেন আবরাহা। (তাবারির মতেঃ এই সমস্ত কাণ্ড-কারখানা ঘটেছে নিগাসের অজ্ঞাতসারে।)

এইসব সংবাদ যখন নিগাসের কানে গেল, তিনি ক্ষেপে আগুন হয়ে গেলেন। বললেনঃ 'সে আমার আদেশ ছাড়া আমার আমীরকে আক্রমণ করেছে, হত্যা করেছে ?'

নিগাস কসম খেলেন, আবরাহাকে তিনি ছাড়বেন না, তার রাজ্য মিসমার করবেন, তার কেশ মুণ্ডন করবেন। আবরাহা একথা জেনে ফেললেন। তখন তিনি নিজেই মাথার চুল কামিয়ে ন্যাড়া হয়ে গেলেন। তারপর একটি চামড়ার ব্যাগে ভরলেন ইয়ামনের মাটি। তারপর তা পাঠালেন নিগাসের কাছে এক পত্রসহ। পত্রে লিখলেনঃ "জাঁহাপনা, আরিয়াত আপনার দাস ছিল। আমিও আপনার গোলাম। আপনার আদেশ নিয়ে আমাদের ঝগড়া হলো। আপনার হুকুম সকলের শিরোধার্য হওয়া উচিত। কিন্তু আমি তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিলাম। তার চেয়ে বেশী কঠিন ছিলাম। আবিসিনীয়দের ব্যাপারে তার চেয়ে আমি অনেক বেশি সিদ্ধহস্ত ছিলাম। রাজার কসমের কথা আমি যেই জানতে পারলাম, তৎক্ষণাৎ আমি আমার সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করে ফেলেছি। আমার মাথার সব চুল আমার দেশের মাটি ভর্তি একটি থলে সহ এই আপনার কাছে পাঠালাম জাঁহাপনা। আপনি অনুগ্রহ করে দুটো জিনিসই আপনার পায়ের তলায় রেখে আমার সম্পর্কে আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন।'

নিগাসের কাছে এই বার্তা পেঁছলে পরে, পত্র পড়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন তিনি। আবরাহার সব দোষ ক্ষমা করে দিলেন। তাঁকে প্রত্যুত্তরে লিখলেন, পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত আবরাহা ইয়ামনে থাকবে। কাজেই ইয়ামনে থেকে গেলেন আবরাহা। (তাবারির মতে, আবরাহা যখন দেখলেন নিগাস তার সব দোষ মাফ করে দিয়েছেন, তাকে ইয়ামনের শাসনকর্তা

বানিয়েছেন, তখন তিনি আবু মুররা ইবনে যু-ইয়াজানের লোক লস্কর পাঠিয়ে তার স্ত্রী রায়হানা বিনতে আলকামা ইবনে মালিক ইবনে জায়দ ইবনে কাহলানকে ধরে নিয়ে এলেন। আবু মুররা ছিল একজন যু-জাদান। রায়হানার গর্ভে তার একটি সন্তান ছিল মাদিকারিব নামে। রায়হানার গর্ভে আবরাহার ছিল দুই সন্তান। একটি পুত্র, মাসরুক। অন্যটি কন্যা, বাসবাস।। আবু মুররা পালিয়ে গেল। তার দাস আতাওদা ইয়ামানে তার কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছিল পুরোদমে। তারপর একদিন খাতামের জনৈক হিমায়র তাকে হত্যা করল। এই সংবাদ গেল আবরাহার কানে। আবরাহা ছিল মহৎ চরিত্রের মানুষ। মিতাচারী খৃস্টান। তিনি লোকজনদের বললেন, এইবার তাদের ভাল দেখে একজন কর্মকর্তা বেছে নেওয়া উচিত। এমন একজন লোক বের করা উচিত যার আত্মসংযম আছে। জানালেন, তিনি যদি জানতেন, তাঁর উপকারের পরিণামে এমনি এক পুরস্কার সে বেছে নেবে, তাহলে তাকে আদৌ তিনি কোন পুরস্কার দিতেন না। আর কোন রক্তপাত নয়। আতাওদাকে হত্যা করার জন্য কোন বদলা তিনি নেবেন না।)

হস্তিবাহিনীর ইতিহাস ও পঞ্জিকা-প্রণেতার কাহিনী

আবরাহা সানা-তে এক গির্জা তৈরী করলেন। তখনকার দিনে পৃথিবীতে কোথাও এমন সুন্দর গির্জা আর ছিল না। নিগাসকে তিনি পত্র লিখলেন, 'আমি আপনার জন্য এক গির্জা নির্মাণ করেছি জাঁহাপনা। এমন গির্জা আর কেউ কোনদিন কোন রাজার জন্য তৈরী করে নি। সমস্ত আরব হাজীদের এই গির্জায় না আনা পর্যন্ত আমি বিশ্রাম নেবো না।'

তার এই পত্র সম্বন্ধে বলাবলি করতে লাগল আরবরা। একজন পঞ্জিকা-প্রণেতা রেগেমেগে একেবারে আগুন। তিনি ছিলেন বনি ফুকায়ম ইবনে আদি ইবনে আমির ইবনে সালাবা ইবনে আল-হারিস ইবনে মালিক ইবনে কিনানা ইবনে খুজায়মা ইবনে মাদ্রিকা ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুদার গোত্রের। জাহিলিয়া যুগে এই পঞ্জিকা-প্রণেতারা কোন্ মাস কতো দিনে

হবে তা গুণে বের করে দিতেন। পঞ্জিকা (ক্যালেণ্ডার) ঠিক রাখার জন্য তারা কখনো কোন পবিত্র মাসকে অশুভ বলে ঘোষণা করতেন। আবার কখনো একই কারণে অপবিত্র মাসকে পবিত্র বলে ঘোষণা করতেন। এ'দের সম্বন্ধেই আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

'কোন পবিত্র মাস স্থগিত করা অতিরিক্ত কুফরি। এই কুফরিতেই কাফিরা কুপথের দিকে পরিচালিত হয়। এক বছর তারা কোন একটি মাসকে পবিত্র বানায়, আবার একই মাসকে পরের বছর অপবিত্র ঘোষণা করে। এমনি করে তারা আল্লাহ্ যে মাসকে পবিত্র করেছেন তার সংখ্যা পূরণ করে।' (কুরআন ৯ ঃ ৩৭)

আরবদের মধ্যে বর্ষ গণনার এই পদ্ধতি প্রথম প্রবর্তন করে আল-কালাম্মাস। আল-কালাম্মাস হলো হুযায়ফা ইবনে আবদ ফুকায়ম ইবনে আদি ইবনে আমির ইবনে সালাবা ইবনে আল-হারিস ইবনে মালিক ইবনে কিনানা ইবনে খুজায়মা। তার পরে আবাদ তার পথ অনুসরণ করে। তারপর তাকে অনুসরণ করে তার বংশধর কালা, উমাইয়া, আউফ এবং আবু ছুমামা জুনদা ইবনে আউফ। আবু ছুমামা জুনাদা ছিলেন সিঁড়ির শেষ ব্যক্তি। কারণ তার সময়েই ইসলাম চলে আসে। হজ্জ সমাধা করার পর সব আরবরা তার কাছে এসে জমায়েত হতো। তখন আবু ছুমামা জুনাদা চারটি মাসকে পবিত্র ঘোষণা করতো। মাস চারটি হলো রজব, জিলকদ, জিলহজ্জ আর মহররম। কোন সময়কে মুক্ত রাখতে চাইলে সে মহররমকে মুক্ত করে রাখতো এবং তার স্থলে সফর বসিয়ে দিতো; যাতে করে পবিত্র মাসের সংখ্যা চারটি ঠিক থাকে। তারা মক্কা থেকে ফিরে যেতে চাইলে সে বলে উঠতো ঃ 'হে আল্লাহ্, আমি সফর মাস এদের জন্য খালি করে রেখেছি, প্রথম সফর। অন্য সফর মাস আমি পরের বছরের জন্য তুলে রেখেছি।'

এমনি ধারা মাস নির্ধারণ করার বাহাদুরি সম্পর্কে বনি ফিরাস ইবনে গনম ইবনে সালাবা ইবনে মালিক ইবনে কিনানা গোত্রের উমায়র ইবনে কায়স জাদলুত তিয়ান মুখে মুখে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন ঃ

মাদ জানে আমরা সব ভালমানুষ, সব খান্দানী মানুষ
প্রতিশোধ নিতে চাইলে কে নিস্তার পেয়েছে আমাদের হাত থেকে?
কাকে আমরা ঘোল খাওয়াই নি?
আমরা কি নই জ্যোতিষ মাদের জাত, যারা পবিত্র মাসকে
অপবিত্র বানাতে পারে?

কিনানবাসীরা তাদের প্রচেষ্টা চালাতে লাগল। তারপর সে এল গির্জায়। গির্জা সে নোংরা করল, অবমাননা করল। তারপর ফিরে গেল আপন দেশে। এই সংবাদ আবরাহার কানে গেল। তিনি অনুসন্ধান করলেন। জানলেন, গির্জার অসম্মান করেছে এক আরব। সে এসেছিল মক্কা থেকে, যে মক্কায় আরবরা হজ্ব করে। আবরাহা যে ভয় দেখিয়েছিল, আরবদের তীর্থস্থান মক্কা থেকে এই গির্জায় নিয়ে আসবেন, তাতেই সে ক্ষিপ্ত হয়ে এই কাজ করেছে। বুঝাতে চেয়েছে, এই গির্জা সম্মানের যোগ্য নয়।

রাগে উন্মাদ হয়ে গেলেন আবরাহা। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, এই মসজিদে (মন্দিরে) তিনি যাবেন, এবং তা ধ্বংস করবেন। (তাবারির মতে, আবরাহার সঙ্গে কিছু আরব ছিল, তারা লুটপাটের আশায় এসেছিল তাঁর সঙ্গে। এদের মধ্যে ছিল মুহম্মদ ইবনে খুজাই ইবনে খুজাবা আল জাকওয়ানি, আস-সুলামি। আর ছিল তার ভাই কায়েস সমেত গোত্রের আরো কিছু লোকজন। আবরাহার সঙ্গে যখন ছিল ওরা, তখন আবরাহা একটা ভোজের আয়োজন করে। সবাইকে তাতে দাওয়াত করেন আবরাহা। আবরাহা উট-দুম্বার অণ্ডকোষ খেতেন। কাজেই যখন দাওয়াত দেওয়া হলো, সবাই বলল, 'ইয়াল্লা, এই জিনিস যদি খাই, আরবরা কোনদিন আমাদের ক্ষমা করবে না।'

তখন মুহম্মদ উঠে আবরাহার কাছে গেল। বলল, 'জাঁহাপনা' এই যে আমাদের এই উৎসবের জন্য আপনি ভোজ দিচ্ছেন, এই উৎসবে কিন্তু আমরা কেবল রানের আর বুকের মাংস খাই।'

আবরাহা বললেন, তারা যা চান তাই তিনি পাঠিয়ে দেবেন। কারণ এই ভোজে তাদের দাওয়াত করার একমাত্র উদ্দেশ্য তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। তারপর আবরাহা মুহম্মদের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিলেন একটা। বললেন, তাকে মুদারের আমীর নিযুক্ত করা হলো। তাকে আদেশ দিলেন তিনি দেশের সবখানে গিয়ে লোকজনদের বলবেন, তিনি যে গির্জা তৈরী করেছেন, তাতে যেন সবাই হজ্জ করতে আসে।

মুহম্মদ হুকুম তামিল করার জন্য কিনান পর্যন্ত আসতেই নিম্নাঞ্চলের লোকজন টের পেয়ে গেল কি জন্য তিনি এসেছেন। তারা হুদায়লের উরওয়া ইবনে হাইয়াদ আল মিলাসি নামে একজনকে পাঠাল তাকে মারতে। উরওয়া তাকে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করল। তার সঙ্গে ছিল তার ভাই কায়েস। কায়েস পালিয়ে চলে গেল আবরাহার কাছে। আবরাহাকে সব ঘটনা খুলে বলল। সব শুনে রাগে উন্মত্ত হয়ে গেলেন আবরাহা। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, বনি কিনান তিনি আক্রমণ করবেন—ধ্বংস করবেন তাদের মন্দির। আবিসিনীয়দের তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আদেশ দিলেন। তারপর হাতী নিয়ে ধেয়ে গেলেন সবেগে।

এই সংবাদ পেয়ে আরবরা ভয় ও উৎকণ্ঠায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, তারা যখন জানতে পেরেছে আবরাহা আল্লাহ্‌র পবিত্র ঘর কা'বা ধ্বংস করতে চায়, তাকে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দেওয়া অবশ্যকর্তব্য।

ইয়ামনের ক্ষমতাশালী একটি গোত্রের যুনফর তাঁর লোকজনদের আহ্বান করলেন। ডাকলেন যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক অন্যান্য গোত্রের আরবদের। বললেন, আল্লাহ্‌র পবিত্র ঘর ধ্বংস করতে আসছে আবরাহা, যারা তাকে বাধা দিতে প্রস্তুত তারা তার সঙ্গে যোগ দিতে পারে। কিছু কিছু লোক তাকে সমর্থন করল। যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে যুনফর আর তার অনুসারীরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। যুনফর বন্দী হলেন। তাঁকে নিয়ে আসা হলো আবরাহার কাছে। যখন তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে তখন তিনি

প্রাণভিক্ষা চাইলেন। তাঁর অঙ্গুহাত-মারলে তো তিনি মরেই যাবেন। কিন্তু তাঁকে জীবিত রাখলে তিনি তার অনেক উপকারে আসবেন।

আবরাহা তাঁকে তাঁর প্রাণ ভিক্ষা দিলেন। তবে শৃঙ্খলে বন্দী করে রাখলেন তাঁকে। খুব দরাব শরীর ছিল তাঁর।

তায়েফ অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগলেন আবরাহা। খাসআমে তাকে বাধা দিল নুফায়েল ইবনে হাবিব আল খাসআমি। তার সঙ্গে ছিল সাহরান আর নাহিস গোত্র এবং অন্যান্য কিছু আরব গোত্র। নুফায়েল পরাজিত ও বন্দী হলেন। আবরাহা তাঁকে হত্যা করতে যাবেন—তখন নুফায়েল বললেন, "আমাকে হত্যা করবেন না, জাঁহাপনা। কারণ আরব দেশে আমি আপনার পথপ্রদর্শক হবো। আমার এই দুই হাত খাসআমের সাহরান আর নাহিস জাতি। তারা আপনি যা বলবেন তাই করবে।"

আবরাহা তাঁকে মুক্ত করে দিলেন।"

আবরাহাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন নুফায়েল। তায়েফে এলে পরে তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন মাসউদ ইবনে মুয়াত্তিব ইবনে মালিক ইবনে কা'ব ইবনে আমর ইবনে সাদ ইবনে আউফ ইবনে সাকিফ। সঙ্গে সাকিফ গোত্রের সমস্ত লোক। সাকিফের নাম ছিল কাসি ইবনে আন-নাবিত ইবনে মুনাব্বিহ ইবনে মানসুর ইবনে ইয়াকদুম ইবনে আফসা ইবনে দুমি ইবনে আইয়াদ ইবনে নিজার ইবনে মাদ ইবনে আদনান। উমাইয়া ইবনে আবুস সালত আস-সাকাফী বলেন ঃ

> আমার লোকজন হলো আইয়াদ, আশেপাশে ওরা থাকে, অথবা এখানেই ওরা ছিল, তাদের উট হালকা[১] হয়ে গেছে যদিও। এরা যখন চরে বেড়ায় দিগন্ত বিস্তৃত ইরাকের বনভূমি ওদের হয়ে যায়—তা ছাড়া তারা লিখতে জানে, পড়তে জানে।

১. উট হালকা হয়ে যায়, বেশী মেহমানকে দুধ দিতে গিয়ে। বেশি করে দোহন করা হয় বলে।

তিনি আরো বলেন ঃ

আমাকে জিজ্ঞেস করেন যদি, লুবায়না, আমি কে, কি আমার পেশা আমি তাহলে একটা সত্য কথা বলব। আমার কাসির পিতা আন-নাবিতের বংশধর ইয়াকদুমের পুত্র মানসুর আমাদের পূর্ব-পুরুষ।

তারা তাঁকে বলল, 'জাঁহাপনা, আমরা আপনার গোলাম, অনুগত এবং সংবদ। আপনার সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ নেই। আমাদের মন্দির, মানে আল-লাতের মন্দির তো আপনি চাচ্ছেন না। আপনি চাচ্ছেন মক্কার মন্দির। আমরা আপনাকে লোক দেব, সেই লোক আপনাকে পথ চিনিয়ে ওখানে নিয়ে যাবে।'

তখন রাজা তাদের কোন ক্ষতি করলেন না। এগিয়ে চললেন সামনের দিকে।

আল-লাত ছিল তাইফের এক মন্দির। মক্কায় যেমন কা'বা সম্মান, তাই [illegible] তেমনি [illegible]। তারা রাজার সাথে আবু রিজালকে পাঠাল। রাজাকে মক্কা নিয়ে যাবে পথ দেখিয়ে। আবু রিজাল রাজাকে আল-মুগাম্মাস পর্যন্ত নিয়ে আসতে পেরেছিল। তারপর ওখানে সে মারা যায়। [illegible] আবু রিজালের কবরে পাথর মেরেছিল। আল-মুগাম্মাসের পথে কবরে এখনো আরবরা পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে।

ওখানে এসে আবরাহা আল-আসওয়াদ ইবনে মাকসুদ নামে একজন আবিসিনিয়কে কিছু অশ্বারোহী সৈন্যসহ পাঠালেন একেবারে মক্কা পর্যন্ত। আল-আসওয়াদ ইবনে মাফসুদ রাজার কাছে পাঠিয়েছিল তিহামা, কুরায়শ ও অন্যান্য গোত্র থেকে লুণ্ঠিত মালামাল। মালামালের মধ্যে ছিল আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিমের দুইশত উট। আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম তখন কুরায়শদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় শেখ ছিলেন একজন। প্রথমদিকে কুরায়শ, কিনানা আর হুদায়ল গোত্র এবং অন্যান্য লোকজন

১. আল-মুগাম্মাসও লেখা হয়েছে কোন কোন জায়গায়। মক্কা থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে।

যুদ্ধ করার কথা চিন্তা করেছিল। কিন্তু যখন দেখল—যুদ্ধ করে কিছু হবে না, কারণ তাদের পর্যাপ্ত শক্তি নেই, তখন সে মতলব ত্যাগ করল।

হুনাতা নামে একজন হিময়ারীকে আবরাহা পাঠালেন মক্কায়। মক্কায় সবচেয়ে সম্মানিত, সবচেয়ে বড় যে শেখ তাকে অনুসন্ধান করে বের করতে হবে, বলতে হবে—আবরাহা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন নি। এসেছেন ওই মন্দির ধ্বংস করতে। তারা যদি কোন বাধা না দেয় তাহলে কোন রক্তপাত হবে না। আর তিনি যুদ্ধ যদি পরিহার করতে চান তাহলে যেন হুনাতার সঙ্গে চলে আসেন।

মক্কায় পেঁছিল হুনাতা। খবর নিয়ে জানল, ওখানকার সবচেয়ে সম্মানিত নেতা হলেন আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই। তাঁর কাছে গেল হুনাতা। আবরাহার বার্তা তাঁকে প্রদান করল।

আবদুল মুত্তালিব বললেন, 'আল্লাহ জানেন, আমরা তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই না। কারণ সে শক্তি আমাদের নেই। এটা আল্লাহ্‌র ইবাদতের স্থান। তাঁর বন্ধু ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনা স্থান। অন্ততঃ আমরা তা-ই জানি। তিনি যদি আবরাহার হাত থেকে এটা রক্ষা করেন তাহলে তাঁর প্রার্থনা গৃহ থাকবে, তাঁর উপাসনা-স্থান থাকবে। আর যদি আবরাহাকে এই ঘর নষ্ট করতে দেন, আমাদের কিছু করবার নেই।'

হুনাতা বলল, তাঁকে তার সঙ্গে যেতে হবে আবরাহার কাছে। তার উপর সেই হুকুম আছে।

আবদুল মুত্তালিব তার এক পুত্রসহ গেলেন আবরাহার শিবিরে। ওখানে গিয়ে যু-নফর কোথায় আছেন, কি সংবাদ তার নিলেন। যুনফর তাঁর বন্ধু লোক। তারপর গেলেন তাঁকে দেখতে। যুনফর তখন বন্দী। যু-নফরকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন তাঁর বিপদে সে কোন সাহায্য করতে পারে কি না।

যুনফর জবাব দিলেন, 'যে লোক রাজার হাতে বন্দী, যে কোন মুহূর্তে যাকে হত্যা করা হতে পারে, সে কী কাজে লাগবে ? আমি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারব না। তবে হাতীশালের পরিচারক উনায়েস আমার দোস্ত। আমি ওর কাছে লোক পাঠিয়ে আপনার কথা বলব, খুব ভাল করে বলব, যেন সে রাজার সঙ্গে আপনার মুলাকাত করিয়ে দেয়। যা বলবার আপনিই রাজাকে বলবেন উনায়েস পারলে রাজার কাছে আপনার জন্য সুপারিশ করবে।'

যুনফর উনায়েসের কাছে লোক পাঠালেন। বলল, 'আবদুল মুত্তালিব কুরায়শদের সর্দার। মক্কার পবিত্র কূপের তত্ত্বাবধায়ক। সমভূমির লোকজন আর পাহাড়ের বুনো জন্তু-জানোয়ার আবদুল মুত্তালিব সবার খেদমত করেন, খাদ্য যোগান। তিনি এখানে এসেছেন। রাজা তাঁর দুইশত উট নিয়ে এসেছেন। রাজার সঙ্গে তিনি দেখা করবেন। তুমি রাজার অনুমতি আনিয়ে দেবে এবং সাধ্যমতো তাঁকে সাহায্য করবে।'

উনায়েস জবাব পাঠাল, যুনফর যা যা বলেছে সব সে করবে। তারপর উনায়েস রাজার কাছে গেল। বলল, আবদুল মুত্তালিব খুব জরুরী একটা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চান। আবরাহা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হলেন।

আবদুল মুত্তালিব ছিলেন সুদর্শন, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও অত্যন্ত আত্ম-মর্যাদাসম্পন্ন লোক। আবরাহা তাঁকে দেখামাত্র অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করলেন। এত ভদ্র ব্যবহার আবরাহা কারো সঙ্গে করেন না। তিনি কিছুতেই তাঁকে তাঁর নিচে কোন আসনে বসতে দেবেন না। অথচ রাজকীয় সিংহাসনে তাঁর পাশে তাঁকে বসতে দেবেন এবং আবিসিনীয়রা তা দেখবে, তা-ও হয় না। সুতরাং তিনি সিংহাসন ছেড়ে নিচে নেমে এলেন। নিচে কার্পেটের উপর আবদুল মুত্তালিবের পাশে বসলেন।

রাজা দোভাষীকে বললেন তিনি কি চান জিজ্ঞেস করতে। জবাব এল রাজা তাঁর দু'শ উট নিয়ে এসেছেন, তিনি তা ফেরত চান।

দোভাষীর মাধ্যমে আবরাহা বললেন, 'আপনাকে দেখে আমি খুব খুশী হয়েছিলাম। এখন যে কথা বললেন তা শুনে আর খুশী থাকতে পারলাম না। আপনার দু'শ উট নিয়ে এসেছি আমি, সে বিষয়ে আপনি কথা বলতে চান? আপনার ধর্ম, আপনার চৌদ্দপুরুষের উপাসনাগৃহ আমি যে ধ্বংস করে দিতে এলাম সে বিষয়ে কিছু বলবেন না?'

আবদুল মুত্তালিব জবাব দিলেন, 'আমি আমার উটের মালিক। ঐ মসজিদেরও একজন মালিক আছেন, সেই মালিকই তা রক্ষা করবেন।' রাজা বললেন, তা সে রক্ষা করতে পারবে না তার হাত থেকে।

তখনআবদুল মুত্তালিব বললেন, 'দেখা যাবে। আপনি আমার উট ফেরত দিন।'

কোন কোন পণ্ডিত বলেন, আবরাহা হুনাতাকে পাঠালে পরে আবদুল মুত্তালিব যখন তাঁর কাছে যান, তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন ইয়ামুর ইবনে নুফাতা ইবনে আদি ইবনে আদ-দুওয়াইল ইবনে বকর ইবনে আবদে মানাত ইবনে কিনানা। ইনি তখন বনি বকরের প্রধান ছিলেন। আর গিয়েছিলেন খালিদ ইবনে ওয়াসিলা। ইনি হুযায়ল গোত্রের প্রধান ছিলেন। এ'রা সবাই আবরাহার কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যদি তিনি চলে যান এবং কাবাঘর ধ্বংস না করেন তাহলে তাঁরা নিম্নভূমিতে যত উট দুম্বা আছে তার এক-তৃতীয়াংশ আবরাহাকে দিয়ে দেবেন। কিন্তু আবরাহা তাঁদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। একথা কতদূর সত্য তা আল্লাহ্ জানেন। যাই হোক, আবরাহা আবদুল মুত্তালিবকে তাঁর সব উট কিন্তু ফিরিয়ে দিলেন।

ও'রা সব চলে গেলেন শিবির ছেড়ে। ফিরে গেলেন মক্কায় কুরায়শ-দের কাছে। তাদের কাছে সব খুলে বললেন। সবাইকে মক্কা ত্যাগ করে পর্বতের শৃঙ্গে ও পাহাড়ের গিরিপথে নিরাপদ ও সুবিধা মতো জায়গায় অবস্থান করতে বললেন, যাতে করে সৈন্যদের বাড়াবাড়ি থেকে সবাই বাঁচতে পারে।

আবদুল মুত্তালিব কাবাঘরের লোহার কড়ায় হাত রেখে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন কুরায়শ। তাঁরা সবাই আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছেন। আবরাহা আর তার সৈন্যবাহিনীর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কাকুতি মিনতি করছেন। সাহায্য চাইছেন।

কাবাঘরের কড়ায় হাত রেখে আবদুল মুত্তালিব বললেন ঃ

ইয়াল্লা, মানুষ তার ঘর রক্ষা করে, তুমি তোমার ঘর রক্ষা কর।
তাদের শক্তি আর কৌশল আগামী কাল যেন তোমার ঘর নষ্ট না করে।

ইকরিমা ইবনে আমির ইবনে হাশিম ইবনে আবদ্ মানাফ ইবনে আবদ আদ-দার ইবনে কুসাই বলেন ঃ

ইয়াল্লা, আল-আসওয়াদ ইবনে মাকসুদকে তুমি শিক্ষা দাও,
গলায় দড়ি লাগানো একশ উট নিয়ে গেল সে,
হীরা ছাবির আর মরুর ভিতরে
সে তাদের আটকে রাখল, অথচ কথা দিল তারা বাইরে চরে খাবে,
তারপর সে তাদের তুলে দিয়ে দিল কালো বর্বরদের হাতে
তার উপর থেকে সব করুণা প্রত্যাহার করো, সব প্রশংসার যোগ্য তুমি আল্লাহ্।

তারপর ছেড়ে দিলেন আবদুল মুত্তালিব কাবাঘরের দরজার কড়া। কুরায়শ গোত্রের সকলের সঙ্গে উঠলেন গিয়ে পর্বতের চূড়ায়। সুবিধা-জনক জায়গা বেছে নিলেন, যাতে করে মক্কা দখল করার পর আবরাহা কি করে না করে সব দেখতে পান।

সকাল বেলায় আবরাহা নগরীর ভিতরে প্রবেশ করার জন্য তৈরী হলেন। যুদ্ধের জন্য হাতী সাজল, সৈন্য সাজল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কাবাঘর ধ্বংস করেই তিনি ইয়ামন ফিরে যাবেন। তাঁর হাতীর নাম ছিল মাহমুদ। মাহমুদ যখন মক্কার দিকে মুখ করল নুফায়েল ইবনে হাবিব তার পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর হাতীর একটা কান টেনে নিয়ে কানের ভেতরে বলল ঃ 'নতজানু হও মাহমুদ, আর না হয় যেখান থেকে এসেছো সেখানে ফিরে যাও, কারণ তুমি এখন আল্লাহ্‌র পবিত্র ভূমিতে আছো!'

হাতীর কান ছেড়ে দিতেই সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। প্রাণপণে দৌড়ে নুফায়েল চলে গেল পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের চূড়ার দিকে। সৈন্যরা হাতীকে মারল তবু হাতী উঠল না, বসেই রইল। লোহার দণ্ড দিয়ে তার মাথায় আঘাত করল লোকজন, পেটে লোহার শিক ঢুকিয়ে দিল, ভীষণ করে আঁচড়ে দিল। তবু হাতী উঠল না। তারপর ওরা যেই হাতীর মুখ ইয়ামনের দিকে ঘুরিয়ে দিল, অমনি হাতী উঠে দাঁড়িয়েই দৌড় দিল ইয়ামনের দিকে। ওরা হাতীর মুখ উত্তর দিকে ঘুরাল, হাতী দৌড়ল। পূর্বদিকে ঘুরাল তখনও হাতী দৌড়ল। কিন্তু যখনই কাবার দিকে ঘুরায় তার মুখ, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে সে।

তারপর আল্লাহ্ সমুদ্র থেকে পাখি পাঠালেন। ছোট পাখি, বড় পাখি। দুই-পুচ্ছ বিশিষ্ট কোনটা, কোনটা গানের পাখি। ওরা প্রত্যেকে তিনটা করে পাথর নিয়ে এল। একটা ঠোঁটে ধরে আর দুটো দুই পায়ের নখরে ধরে। মটর আর মসুরের মতো পাথর। যার গায়ে পড়েছে পাথর সে-ই মরেছে অবধারিত। কিন্তু সবার গায়ে পড়েনি পাথর আবার। যে পথে এসেছিল তারা সে পথে পালিয়ে গেল। যাওয়ার সময় একবাক্যে সবাই নুফায়েল ইবনে হাবিবকে ডাকছিল পথ দেখানোর জন্য।

নুফায়েল যখন দেখল, কী শাস্তি আল্লাহ্ নাযিল করেছেন তাদের উপরে, তখন সে বলল ঃ

আল্লাহ্ ধরতে চান যাকে সে পালাবে কোথায় ?
আল-আশরাম তো বিজিত, জয়ী নয়!

নুফায়েল আরো বলল ঃ

আমাদের শুভেচ্ছা নাও রুদায়না !
আজ ভোরে তোমাকে দেখে নয়ন সার্থক আমাদের !
[তোমার ইন্ধন-ইচ্ছুক কাল রাতে এসেছিল,
কিন্তু তাকে দেবো এমন কিছুই ছিল না যে আমাদের]

তুমি যদি দেখতে, কিন্তু তুমি দেখবে না, রুদায়না,
মুহাসসাবের ১ দিকে আমরা যা দেখেছি,
যদি দেখতে তাহলে আমাকে তুমি ক্ষমা করতে, আমার কাজের প্রশংসা করতে।

যা এসেছে এবং চলে গেছে তা দেখে ভুরু কুঁচকাতে না।
পাখিদের দেখামাত্র আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলাম,
ভয় হলো, পাথর আমাদের উপরে না পড়ে।
সবাই নুফায়েলকে ডাকছিল,
যেন ওই আবিসিনীয়ের কাছে কোন ঋণ আছে আমার।

ওরা পালাচ্ছিল, আর পথের ধারে কেবল পড়ে যাচ্ছিল। পড়ে যাচ্ছিল, আর মারা যাচ্ছিল প্রতিটি পানির গর্তের ধারে ওরা মরছিল। সমস্ত শরীরে আঘাত পেয়েছিল আবরাহা। সবাই ধরাধরি করে ওকে যখন বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল, একটা একটা করে তার সব কটা আঙ্গুল খসে পড়ে যাচ্ছিল। যেখানে আঙ্গুল ছিল সেখানে হলো দুষ্ট ক্ষত, পুঁজে আর রক্তে ভরা। অবস্থা এমন হয়েছিল, ওকে যখন সানাতে আনা হলো তখন তাকে দেখাচ্ছিল সদ্য-ফোটা পাখির বাচ্চার মতো। লোকে বলে, যখন তার মৃত্যু হয়, তখন কলিজা দেহ ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছিল।

সেনাবাহিনী থেকে পলাতক সৈনিক, সেনাবাহিনীর শ্রমিক এবং অন্যান্য লোকজন মক্কায় থেকে গিয়েছিল। তারা পরে কেউ শ্রমিক, কেউ মেষপালক হিসেবে কাজ নিয়েছিল।

ইয়াকুব ইবনে উতবা আমাকে বলেছেন যে, কে যেন তাকে বলেছিলেন, সেবারই মক্কায় প্রথম এবং আরবদেশে প্রথম হাম এবং বসন্ত হয়। আমরা সেই বছর থেকেই তেতো ধরনের ওষুধির গাছ মক্কায় জন্মাতে দেখা যায়।

---

১. মক্কা ও মদীনার মাঝখানে একটি স্থান।

আল্লাহ্ যখন মুহম্মদ (সা)-কে প্রেরণ করেন, তিনি [মুহাম্মদ (সা)] বিশেষ করে কুরায়শদের কাছে তাঁর মহত্ত্ব ও অনুগ্রহের কথা এবং তাদের অবস্থান ও স্থায়িত্ব রক্ষা করার জন্য আবিসিনীয়দের প্রতি তার বিরূপ ব্যবহারের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খক্রমে বর্ণনা করেন, 'আপনারা কি দেখেন নি কেমন করে আপনাদের প্রভু হাতীর মালিকদের প্রতি ব্যবহার করেছিলেন? তাদের সমস্ত ছলাকলাকে তিনি ব্যর্থতায় পরিণত করেন নি? এবং তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তারা তাদের উপর কংকর নিক্ষেপ করেছিল। তারপর তিনি তাদের ভক্ষিত শস্যকণার মতো করে দিয়েছিলেন।'[১]

তারপর আবার বলেছেন, 'যেহেতু কুরায়শদের আসক্তি আছে, আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের। সুতরাং তারা ইবাদত করুক এই গৃহের রক্ষকের, যিনি তাদের ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন, বিভীষিকা থেকে নিরাপদ রেখেছেন।'[২] তার অর্থ আল্লাহ্র নেকনজর আছে তাদের উপর, তারা যদি তার করুণা গ্রহণ করতে চায়, তাহলে তাদের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকা দরকার।

আমাকে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু বকর আবদুর রহমান ইবনে সাদ ইবনে জুরারার কন্যা আমারার মাধ্যমে বলেছেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, 'আমি হাতীর নেতা এবং তার সহিসকে অন্ধ এবং খোঁড়া অবস্থায় মক্কার পথে পথে হেঁটে হেঁটে খাবারের জন্য ভিক্ষা করতে দেখেছি।'

হাতীর গল্প নিয়ে কবিতা

আল্লাহ্ যখন আবিসিনীয়দের মক্কা থেকে বহিষ্কার করে দিলেন, শোধ নিলেন তাদের উপর, তখন কুরায়শদের প্রতি আরবদের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তারা বলতে লাগল, 'এঁরা হলেন আল্লাহ্র বান্দা। আল্লাহ্ তাঁদের হয়ে যুদ্ধ করেছেন। তাদের শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করেছেন।' এই

১. সূরা ১০৫
২. সূরা ১০৬।

বিষয়ের উপর অনেক কবিতা রচনা করল তারা। এমনি একজন কবি ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে আল জিবরারা ইবনে আদি ইবনে কায়েস ইবনে আদি ইবনে সাদ ইবনে সাহম ইবনে আমর ইবনে হুসায়স ইবনে কাব ইবনে লুয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফিহ্র। তাঁর কবিতা:

মক্কাভূমি থেকে চলে যাও
কারণ প্রাচীনকাল থেকে কোনদিন এর পবিত্রতা লঙ্ঘিত হয়নি।
যখন পবিত্র করা হলো একে, সৃষ্টি পূর্ণতা পায়নি তখনো।
কোন শক্তিমত্ত কোনদিন আক্রমণ করেনি একে।
হাবসীদের সেনাপতিকে জিজ্ঞেস করো কি সে দেখেছে।
যে দেখেছে সে বলবে, যে জানে না তাকে।
ষাট হাজার লোক ঘরে ফেরে নি
আহত যারা তারাও বাঁচে নি ঘরে ফেরার পর।
আজ আর জুরহুম তাদের আগে মক্কাতেই ছিল।
আল্লাহ্ সব মানুষের নাগালের বহু ঊর্ধ্বে রেখেছেন একে।

'আহত যারা তারাও বাঁচে নি ঘরে ফেরার পর' বলতে আবরাহাকে বুঝানো হয়েছে। আবরাহাকে ওরা বহন করে নিয়ে গিয়েছিল ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায়। তারপর তেমনি অবস্থায় সানা'য় সে মারা গেল।

আরেকজন কবি আবু কায়েস ইবনে আল-আসলাত আল-আনসারি আল-খাতমি—। তিনি সায়ফি নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন:

হাবসী হাতীর দিনে সে ছিল তারই কর্ম।
যতই সামনে ঠেলে তাকে ততই মাটি কামড়ে থাকে সে,
তার বাহুতে লোহার শিক ঢুকিয়ে দিল তারা,
দুটুকরা করে ভেঙ্গে দিল নাক।
চাকু ব্যবহার করল চাবুকের মতো।
পিঠে ওরা সেই চাকু চালাল যখন, পিঠে ক্ষত হয়ে গেল।
যে পথে এসেছিল সে সেপথেই গেল চলে।

অবিচারের বোঝা বহন করল ওদের সমস্ত লোক।
আল্লাহ্ বাতাস পাঠালেন, এক সঙ্গে অজস্র কংকর
ভেড়ার বাচ্চার মত ওরা সব গায়ে গায়ে জড়ো হলো দিশেহারা,
অথচ চীৎকার করল সোমথ ভেড়ার মতোই।

আবূ কায়েস ইবনে আল-আসলাত আরো বলেছে :
উঠো, প্রার্থনা করো, তোমার প্রভুর কাছে, গায়ে হাত বুলাও
পর্বত বেষ্টিত এই মসজিদের চারকোণে।
তিনি এক মোক্ষম পরীক্ষা দিলেন
সেনাপতি আবু ইয়াকসূমের দিবসে।
তার অশ্বারোহী ছিল সমতল ভূমে, পদাতিক ছিল তার
দূর পাহাড়ের গিরিপথে।
সিংহাসনের প্রভুর সাহায্য যখন পেঁছিল তোমাদের কাছে,
তার সেনাবাহিনী তাদের প্রতিহত করল, প্রস্তর নিক্ষেপ করল, ধূলোয়
ঢেকে দিল সবাইকে।
দ্রুত লেজ গুটিয়ে পালাল তারা,
তাদের বাহিনী থেকে মাত্র কয়েকজন ফিরেছিল আপনজনের কাছে।

তালিব ইবনে আবু তালিব ইবনে আবদুল মুত্তালিব বলেছেন :
জান না কি ঘটেছিল দাহিসের যুদ্ধে ?
কি ঘটেছিল আবু ইয়াকসূমের বাহিনীর ললাটে
যখন তারা সব গিরিপথ ভরে ছিল ?
সেই আল্লাহ্, একমাত্র শক্তি এক, সহায় না হলে
তোমরা কেউ তোমাদের জীবন বাঁচাতে পারতে না।

হাতী এবং ইবরাহীমের হানাফী ধর্ম সম্পর্কে আবু আস-সালত ইবনে আবু রাবি আস-সাকাফী বলেছেন :
আমাদের প্রভুর আলামত উজ্জ্বল দারুণ।
অবিশ্বাসীদেরই কেবল সন্দেহ তাতে।

দিন এবং রাত্রি সৃষ্টি করা হলো,
সব সুন্দর পরিষ্কার, তার সব গণনা স্থিরীকৃত।
তারপর দয়াময় প্রভু দিবসকে উন্মোচিত করলেন
সূর্য দিয়ে, তার রশ্মি দেখা গেল সবখানে
তিনি হাতী আল-মুগাম্মাসে শক্ত করে ধরে রাখলেন,
ও মাটিতে সেঁদিয়ে গেল, যেন কেউ তার পায়ের শিরা কেটে দিয়ে খোঁড়া করে দিয়েছে।
তার শুঁড় বেঁকে গোল হয়ে গেল, নিশ্চল হয়ে রইল সে;
কাবকাবের পাহাড় থেকে ছিটকে এল এক বিশাল পাথর।
তার চারধারে এল কিণ্ডার রাজা, সৈনিক এবং
যুদ্ধের সমস্ত শক্তিমান শকুনেরা।
ওরা সে পাথর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল,
সোজা পালাল, সবাই, সবার পা ভাঙ্গা।
আল্লাহ্‌র চোখের দেখায় কিয়ামতের দিন সব ধর্মের
সর্বনাশ নামবে, নামবে না কেবল হানীফের ধর্মের।

আবরাহার মৃত্যুর পর তার পুত্র ইয়াকসুম আবিসিনিয়ার রাজা হলো। (তাবারির মতে, হাবসীদের হাতে হিময়ার এবং ইয়ামনের সমস্ত গোত্র লাঞ্ছিত হয়েছিল। তারা তাদের মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়, পুরুষদের কতল করে এবং দোভাষী হিসেবে কাজ করার জন্য নিয়ে যায় জোয়ানদের। ইয়াকসুম ইবনে আবরাহার মৃত্যুর পর তার ভাই মাসরুক ইবনে আবরাহা ইয়ামনে আবিসিনীয়দের রাজা হয়।

সায়েফ ইবনে জুইয়াজানের ভ্রমণ এবং ইয়ামনে ওয়াহরিজের শাসন

ইয়ামনের মানুষ অনেকদিন অত্যাচার সহ্য করল। তারপর হিময়ার গোত্রের সায়েফ ইবনে ইয়াজান, যে নাকি আবু মুররা নামেও পরিচিত ছিল, গেল বাইজান্টাইন সম্রাটের কাছে। তার কাছে তার সমস্যার কথা

খুলে বলে অভিযোগ করল। বলল, হাবসীদের ওখান থেকে তাড়িয়ে ওই দেশ দখল করে নিতে। তাকে বলল, তার ইচ্ছামত একটা সেনাবাহিনী পাঠালেই চলবে, তাতেই ইয়ামন সাম্রাজ্য তিনি পেয়ে যাবেন।

সম্রাট তার অনুরোধে কর্ণপাত করলেন না। তখন সে গেল আন-নুমান ইবনে আল-মুনযিরের কাছে। আন-নুমান ছিলেন আল-হিরা ও ইরাকের আশেপাশের এলাকায় কোসরোস-এর গভর্নর। সে হাবসীদের সম্বন্ধে তার অভিযোগ পেশ করল। আন-নুমান জানালেনঃ প্রতি বছর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কোসরোস-এর কাছে যান দেখা করতে। তিনি সায়েফকে সেই সময় পর্যন্ত থেকে যেতে বললেন। সময় এলে পরে নুমান সায়েফকে নিয়ে গেলেন কোসরোসের কাছে এবং পরিচয় করিয়ে দিলেন।

কোসরোস যে দরবারে বসতেন সেখানে ছিল তার রাজমুকুট। কথিত আছে তাঁর মুকুটটা ছিল বিরাট বাটির মতো, তা খচিত ছিল মণি মুক্তো পোখরাজ ইত্যাদি রত্ন-মানিক্যে। এইসব মণি-মুক্তো সোনা আর রুপার ফাঁকে ফাঁকে বসানো ছিল। দরবারের গম্বুজ থেকে একটা সোনার চেনে ঝুলানো থাকতো সেই মুকুট। এত ওজন ছিল মুকুটের। সম্রাটের ঘাড় তার ওজন সহ্য করতে পারত না। সিংহাসনে বসার আগে লুকিয়ে থাকতেন এক দামী আল-খাল্লার ভেতরে। সিংহাসনে বসার পর মুকুট চাপিয়ে দেওয়া হতো তার মাথায়। তারপর সিংহাসনে আরাম করে বসার পর আলখাল্লা সরিয়ে নেওয়া হতো। প্রথম দর্শনে বসাই ভয়ে ও বিস্ময়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়তো। তাঁর সামনে যেতেই সায়েফ ইবনে জুইয়াজান নতজানু হয়ে বসে পড়ল।

সায়েফ বলল ঃ জাহাঁপনা, আমাদের দেশ দাঁড়কাকেরা দখল করে নিয়েছে।
কোসরোস বললেন ঃ কোন দাঁড়কাক? হাবসী না সিন্ধিয়ান?
হাবসী জাঁহাপনা! আমি আপনার কাছে এসেছি সাহায্যের জন্য।
সাহায্য করে আপনি আমার দেশের রাজা হোন জাঁহাপনা।
তিনি বললেন ঃ তোমার দেশ অনেক দূরে। আমাকে আকর্ষণ করার

মতো কিছু নেই সে দেশে। আরবদেশে নিয়ে আমার পারস্যের সেনা-বাহিনীকে আমি বিপদে ফেলতে পারি না। আর কেন যে তা করব তারও কোন যুক্তি দেখি না আমি।'

রাজা তাকে দশ হাজার রৌপ্যমুদ্রা এবং সুন্দর একটা লম্বা কোর্তা উপহার দিলেন।

সায়েফ বাইরে গিয়েই উক্ত মুদ্রা লোকজনের কাছে অবাধে বিতরণ করা শুরু করল। ছোট ছোট ছেলেরা, গোলাম ও বাদীরা সে মুদ্রা নেওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি শুরু করে দিল। এই ঘটনা রাজার কানে গেল। রাজা খুব অবাক হলেন। এতো বড়ো অস্বাভাবিক ঘটনা।। তিনি সায়েফকে ডাকালেন।

বললেন, 'রাজার দেওয়া উপহার তুমি বিলিয়ে দিচ্ছো?'

সায়েফ বলল, 'এই রূপা আমার কি কাজে লাগবে? আমার দেশের সব পাহাড় সোনার আর রূপার।'

সায়েফ একথা বলল রাজার লোভকে জাগ্রত করার জন্য।

তার কথা শুনে কোসরোস তার মন্ত্রীদের ডাকলেন। এই লোক আর তার পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাদের পরামর্শ চাইলেন।

একজন বলল, রাজার কয়েদখানায় অনেক বন্দী আছে, তাদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে। তাদের যদি তিনি এই লোকের সঙ্গে পাঠান, আর তারা যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যায়, তাহ'লেও তো কথা সেই একই দাঁড়াবে। কারণ তাদের তো মরবার জন্যই রাখা হয়েছে। মৃত্যুই তাদের নিয়তি। এই লোকটার সঙ্গে পাঠালে তারা যদি সে দেশ জয় করতে পারে, তাহলে রাজার সাম্রাজ্য বাড়বে। কোসরোস তখন কয়েদখানায় যত মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত কয়েদী ছিল সবাইকে পাঠাল সায়েফের সঙ্গে। ওদের সংখ্যা ছিল আটশ।

তাদের সেনাপতি করেছিলেন ওয়াহ্‌রিজ নামে একজন লোককে। ওয়াহ্‌রিজ খুব পাকা বয়সের লোক আর সদ্বংশজাত।

আটটা জাহাজে করে তারা রওয়ানা হলো। এর মধ্যে দুটো গেল ডুবে। ছয়টা পেঁছিল এডেন বন্দরে।

যত পারল লোক এনে সায়েফ জড়ো করল ওয়াহ্‌রিজের কাছে। বলল, 'আমার পা আর আপনার পা দুই সাথী। আমরা মরলে একসঙ্গে মরব। জয় করলে একসঙ্গে জয় করব।'

'ঠিক আছে'—ওয়াহ্‌রিজ বলল।

ইয়ামনের রাজা মাসরুক ইবনে আবরাহা এল তার বাহিনী নিয়ে বাধা দিতে। ওয়াহ্‌রিজ তার এক ছেলেকে পাঠিয়ে দিল মুকাবিলা করতে। উদ্দেশ্য, তাদের রণকৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হবে তার। যুদ্ধে তার পুত্র মৃত্যুবরণ করল। এতে তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়ল ওয়াহ্‌রিজ।

সব সৈন্য সজ্জিত হলো। তাদের সারিবদ্ধ করে রাখা হলো যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি।

ওয়াহ্‌রিজ বলল, 'কোন লোকটা ওদের রাজা আমাকে দেখিয়ে দাও।'

ওরা বলল, 'ওই যে হাতীর উপরে একটা লোক, মাথায় মুকুট, কপালে লাল চুনিপাথর চকচক করছে? ওটাই ওদের রাজা।'

'বটে।'

ওরা অনেকদিন তেমন অপেক্ষা করে রইল।

তারপর আবার জিজ্ঞেস করল ওয়াহ্‌রিজ, 'এখন কি চড়ছে সে?'

ওরা বলল, 'এখন সে একটা ঘোড়ায় চড়ে আছে।'

আবার চলল অপেক্ষা।

আবার ওয়াহ্‌রিজ সেই একই প্রশ্ন করল। ওরা বলল, 'রাজাটা এখন একটা খচ্চরের উপর বসে আছে।'

ওয়াহ্‌রিজ বলল, 'গাধার বাচ্চা, এঁ্যাহ্। দুর্বল জীব বটে। জীব যখন দুর্বল, রাজ্যও দুর্বল হতে বাধ্য। আমি ওকে শরবিদ্ধ করব। তীর নিক্ষেপ

করার পর যদি দেখো ওর লোকজন নড়াচড়া করছে না, তাহলে যে যেখানে আছো দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি না বললে সামনে যাবে না। কারণ লোক-জন না নড়লে বুঝতে হবে, লক্ষ্য ব্যর্থ হয়েছে আমার। আর যদি দেখো লোকজন সবাই তাকে ঘিরে ধরছে, জানবে আমার নিক্ষিপ্ত তীর তাকে বিদ্ধ করেছে। তখন গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপর।'

তারপর তীর যোজনা করল ওয়াহ্রিজ তার ধনুকে। তার ধনুক নাকি এতো শক্ত ছিল যে, সে ছাড়া অন্য কেউ তা বাঁকাতে পারতো না। ধনু যোজনা করতে পারতো না। তীর যোজনা করে হুকুম দিল, তার চোখের ভুরু উপর দিকে উঠিয়ে রাখার জন্য।[১] তারপর তীর ছুড়ল ওয়াহ্রিজ মাসরুকের দিকে। ছিটকে পড়ল মাসরুকের কপালের লাল চুনি। তীর মাথা দিয়ে ঢুকে ঘাড় দিয়ে বের হয়ে গেল। খচ্চর থেকে পড়ে গেল মাস-রুক। সব হাবসী জড়ো হলো তার চারদিকে।

তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পারসিকরা। ওরা পালিয়ে গেল। পালানোর সময় চতুর্দিকে যত্রতত্র তীরবিদ্ধ হয়ে মারা গেল। সানা-র ভিতরে প্রবেশ করার জন্য যাত্রা করল ওয়াহ্রিজ। যখন নগরদ্বারে এসে পেঁছিল সে বলল তার পতাকা নিচু করতে পারবে না কেউ। হুকুম দিল ফটক ভাঙ্গার জন্য, যাতে পতাকা নিচু করতে না হয়। তারপর সে ঢুকল সমুন্নত পতাকা উড়িয়ে। সায়েফ ইবনে জুইয়াজান আল-হিমায়রি বলেন ঃ

লোকে ভেবেছিল সন্ধি করেছে দুই সম্রাট
এবং যারা তাদের আপোসের সংবাদ শুনল,
তারা জানল ব্যাপার বড় গুরুতর।
রাজপুত্র মাসরুককে আমরা হত্যা করেছি, বালু রাঙ্গিয়েছি রক্তে।
নতুন রাজপুত্র, জনগণের রাজকুমার
ওয়াহ্রিজ প্রতিজ্ঞা করল
সব বন্দী আর সব মালামাল দখল না করা পর্যন্ত
মদ স্পর্শ করবেন না তিনি।

১. বয়সের দরুন তার চোখ আধাবোজা হয়ে থাকতো।

আবু আস-সালত ইবনে আবু রাবিয়া আস-সাকাফি বলেন ঃ

ইবনে জুইয়াজানের মতো যারা, তারা প্রতিশোধ নিন
শত্রুর তাড়নায় যারা ইয়াজানের মতো বহুদিন কাটিয়েছে সমুদ্রে,
তার যখন যাবার সময় হলো তখন সে গেল সিজারের কাছে,
কিন্তু যা সে চেয়েছিল তা পায়নিকো।
বছর দশেক পরে সে গেল কোসরোসের কাছে
জীবন কিংবা সম্পদ সব তাচ্ছিল্য করল,
তারপর সে নিয়ে এল পারসিকদের তার সঙ্গে।
আমার প্রাণের শপথ নিয়ে বলছি, তোমরা বড় দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছো,
কী সুন্দর মহৎ একদল মানুষ বেরিয়ে এল ঃ
এমন মানুষ আর হয় না !
আমীর ওমরাহ, বীরপুরুষ, ধনুর্ধর,
যেমন জঙ্গলে সিংহ শেখায় কৌশল তার শাবককে !
বাঁকা ধনু থেকে তীর হানল
হাওদার দণ্ডের মতোই সুকঠিন
সে তীরে যে জন বিদ্ধ মৃত্যু তার তাৎক্ষণিক।
কালো কুত্তার পেছনে তোমরা সিংহ পাঠিয়েছো
পৃথিবীর সবখানে ছড়ানো তাদের পলাতকবৃন্দ।
কাজেই আকণ্ঠ পান করো, তুমি, মুকুট ধারণ করো শিরে
গুমদানের চূড়ায় আপন ঘরে অলস ক্ষণে।
প্রাণভরে পান করো ওরা মরে গেছে
রাজ পোশাক দুলিয়ে তুমি হাটো গর্বভরে।
এমন মহৎ সেইসব কর্ম ! দুই বালতি পানি মেশানো দুধ নয় সে,
যা পরে প্রস্রাবে পরিণত হতে পারে।

বানু তামিমের আদি ইবনে জায়দ আল-হিরি বলেন ঃ

যে সানায় এক সাম্রাজ্যের সম্রাট বাস করতেন, দুইহাতে বিলাতেন উপহার
তার অবসান কি আর থাকবে ওখানে ?

এর স্থপতিরা একে আকাশচুম্বী করেছিল।
সুউচ্চ প্রকোষ্ঠে দিয়েছিল মিশিয়ে কস্তুরী-মৃগ।
শত্রুর ছোবল থেকে সুরক্ষিত পাহাড় দিয়ে
সুউচ্চ প্রাচীর এর অলংঘনীয়।
রাতের পেচার ডাক সুমধুর ছিল
সে ডাকে জবাব দিত বাঁশির বাদক।
নিয়তি সেখানে নিয়ে এল পারস্যের সৈন্যদল
সঙ্গে বীরযোদ্ধা যত তাদের।
খচ্চরে এসেছে তারা মৃত্যুকে সঙ্গী করে
সঙ্গে ছুটছিল গাধার শাবক
তারপর দুর্গচুড়ো থেকে তাদের দেখল রাজপুত্রবৃন্দ
বাহিনীতে ইস্পাতের বিদ্যুৎ-চমক দেখল তারা
সেইদিন তারা বর্বরদের আর আল-ইয়াকসুমকে বলেছিল
'যে পালিয়ে যায় সে মানুষ না!'
সে দিনের কাহিনী এখনো জীবিত আছে,
সুপ্রাচীন মর্যাদার এক জাতির অস্তিত্ব লোপ পেল সেই দিন।
ওখানে যাদের জন্ম তাদের স্থান দখল করল পারসিকরা
অন্ধকার, রহস্যময় এবং সেই দিন।
তুব্বার মহান সন্তানের পর
পারস্যের সেনাপতিগণ কায়েম করল মজবুত আসন।

(তাবারির মতে ইয়ামন জয় করে ওখান থেকে হাবসীদের বিতাড়িত করে ওয়াহরিজ কোসরোসকে বিস্তারিত সংবাদ লিখে জানালো এবং সংগৃহীত সম্পদ পাঠাল। জবাবে সম্রাট ওখানে সায়েফকে রাজা বানিয়ে দিতে বলে দিলেন। সায়েফকে তিনি নির্দেশ দিলেন প্রতি বছর খাজনা আদায় করে তাঁর কাছে পাঠাতে হবে। ওয়াহরিজকে তিনি নিজের কাছে নিয়ে এলেন। সায়েফ রাজা হলেন। ইয়ামনের রাজবংশ জুইয়াজানের সন্তান সায়েফ। এই কথা আমাকে বলেছেন ইবনে হুমায়দ। ইবনে হুমায়দ

জেনেছেন সালামার কাছ থেকে। সালামা এ তথ্য পেয়েছে ইবনে ইসহাকের কাছ থেকে।)

(ওয়াহ্‌রিজ চলে গেল কোসরোসের কাছে। রাজা হলেন সায়েফ ইয়ামনের। রাজা হয়েই সায়েফ করল কি হাবসীদের উপর নির্যাতন শুরু করল। যেখানে তাদের পেল সেখানেই তাদের হত্যা করতে লাগল, সন্তানবতী রমণীকেও বাদ দিল না। এমনি করে প্রায় সবাইকে নির্মূল করে ফেলল। রইল কেবল কতিপয় মেরুদণ্ডহীন হাবসী। তাদের সে ক্রীতদাস বানাল, তীর-বর্শা বহন করা কাজে ব্যবহার করতে লাগল। বেশিদিন গেল না। একদিন অতর্কিত ওইসব সশস্ত্র ক্রীতদাসেরা তাকে ঘেরাও করে তাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করল। ওদের একজনকে তারা দলপতি বানাল। ইয়ামনে তারা ধ্বংসলীলা চালাল-হত্যা আর লুণ্ঠনে দেশ ছারখার করা শুরু করল। এই সংবাদ গেল পারস্যের সম্রাটের কানে। সম্রাট ওয়াহ্‌রিজকে পাঠালেন চার হাজার পার্সি'র সৈন্য সমেত। হুকুম দিলেন ছেলেবুড়ো সব হাবসীদের হত্যা করবে, ছোট বড় সমস্ত আরব রমণীদের হত্যা করবে, ছোট কোঁকড়া-চুল কোন মানুষকে জীবিত রাখবে না। ওয়াহ্‌রিজ এল। অক্ষরে অক্ষরে সম্রাটের আদেশ পালন করে পত্র লিখল, যা বলেছিলেন রাজা সব সে তামিল করেছে। সম্রাট তাকে শাসনকর্তার সনদ দিল, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানে সে রাজ্য শাসন করল।)

ইয়ামনে পারসীয় প্রভুত্বের অবসান

ওয়াহ্‌রিজ এবং অন্যান্য পারসীয়রা ইয়ামনে অনেকদিন রাজত্ব করল। ইয়ামনে এখন যে আবনা-রা আছে তারা পারসীয় সেনাবাহিনীরই চিহ্ন বহন করছে। আরিয়াতের অভ্যুত্থান থেকে শুরু করে পারসীয়দের হাতে মাসরুক ইবনে আবরাহার মৃত্যু ও সমস্ত হাবসীদের বিতাড়নের মধ্যবর্তী হাবসী অধিকারের সময়ের পরিধি বাহাত্তর বছর। পরপর চারজন রাজপুত্র এই সময়ে রাজত্ব করে। তারা হলো আরিয়াত, আবরাহা, ইয়াকসুম এবং মাসরুক।

কথিত আছে ইয়ামনের একটি প্রান্তরে প্রাচীন দিনের একটি লিপি পাওয়া গিয়েছিল। তাতে লিখা ছিল ঃ

ধিমার সাম্রাজ্যের মালিক কে ?
ন্যায়বান হিমায়র।
ধিমার সাম্রাজ্যের মালিক কে ?
নষ্টমতি হাবসীরা।
ধিমার সাম্রাজ্যের মালিক কে ?
মুক্ত স্বাধীন পারসীয়রা।
ধিমার সাম্রাজ্যের মালিক কে ?
বনিক কুরায়শরা।

ধিমার মানে ইয়ামন বা সান্'আ।

আল-আ'শা ইবনে কায়েস ইবনে থালাবা সাতিহ এবং তার সঙ্গীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ার পরে বলেছিলেন ঃ

'আল-ধিবির ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা সেই রমণী যেমন প্রত্যক্ষ করেছিলেন অন্য কোন রমণী তা করতে পারে নি।'[১] আরবরা তাকে ধিবি বলে অভিহিত করতো, কারণ তিনি ছিলেন রবি'আ ইবনে মাসুদ ইবনে মাজিন ইবনে ধিবের পুত্র।

নিজার ইবনে মা'দের বংশধর

নিজার ইবনে মা'দের তিন পুত্র ছিল ঃ মুদার, রবি'আ এবং আনমার।

আনমার খাতাম এবং বাজিলার পিতা। জারির ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-বাজালি ছিল বাজিলাদের নেতা। জারির সঙ্গে জনৈক লোকের উক্তি ঃ 'জারির না থাকলে বাজিলা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। গোত্র ছোট কিন্তু মানুষ বিরাট বড়।' আল-ফুরাফিসা আল-কালবির বিরুদ্ধে আল-আকরা ইবনে হাবিস আত-তামিমি ইবনে ইকাল ইবনে মুজাশি ইবনে দারিম ইবনে মালিক

১. কিংবদন্তী অনুযায়ী এই রমণী তিন দিনের ভ্রমণের দূরত্ব পর্যন্ত একজন লোককে দেখতে পারতেন।

ইবনে হানযালা ইবনে মালিক ইবনে যায়দ মানাতের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার সময় জারির বলেছিলেন :

শোন হে আকরা ইবনে হাবিস, শোন আকরা,
তোমার ভাই যদি না থাকে, তুমিও কিন্তু থাকবে না।

আরো বলেছেন :

তোমরা নিজারের দুই পুত্র, তোমাদের ভাইকে সাহায্য করো
আমার যে পিতা আমি জানি তিনি তোমারও পিতা।
যে ভাই আজকে মিত্র তোমার, পরাজিত হবে না সে।
ওরা ইয়ামনে গিয়ে ওখানে বসবাস করতে শুরু করল।

মুদার ইবনে নিজারের ছিল দুই পুত্র : ইলিয়াস ও আইলান। ইলিয়াসের ছিল তিন পুত্র : মুদরিকা, তাবিখা এবং কামা। তাদের মাতা খিনদিফ ছিল ইয়ামনি। মুদরিকার নাম ছিল আমির আর তাবিখার নাম ছিল আমর। এদের সম্বন্ধে একটা গল্প প্রচলিত আছে। দুই ভাই উট চরাতে চরাতে কিছু পাখি শিকার করে যখন রান্না করতে বসল, তখন কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাদের উটের উপর চড়াও হলো। আমির তখন আমরকে জিজ্ঞেস করল : 'কোন্‌টা করবে তুমি ? উটের পেছনে যাবে, নাকি রান্না করবে ?'

আমর জবাব দিল, সে রান্না করবে।

আমির কাজে কাজেই উটের পেছনে গেল। কিছুক্ষণ পর সে উট উদ্ধার করে নিয়ে এল।

ঘরে ফিরে পিতাকে ওরা সব কথা খুলে বলল। ওদের পিতা তখন আমিরকে বলল : 'তুমি হলে মুদরিকা।' মুদরিকার মানে হলো সেই লোক, যে কাউকে ধরে পরাভূত করতে পারে।'

আর আমরকে পিতা বলল : 'আর তুমি হচ্ছো গিয়ে তাবিখা।' মানে পাচক।

সংবাদ শুনে যখন ওদের আম্মা ছুটে এল দ্রুতপায়ে তার তাঁবু থেকে, তখন তাকে সে বলল : 'আর তুমি তো দেখি চলছো দুলকি চালে।' তখন ওদের আম্মার নাম হলো খিনদিফ। খান্দাফা মানে ঘোড়ার দুলকি চালে চলা। সেই থেকে তাঁকে বলা হয় খিনদিফ।

কামা সম্বন্ধে মুদারের বংশবেত্তারা জোর দিয়ে বলে যে, খুজা ছিল আমর ইবনে লুহাই ইবনে কামা ইবনে ইলিয়াস।

আমর ইবনে লুহাই-র কাহিনী এবং আরবদের দেবমূর্তির বিবরণ

আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে মুহম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাজম তার পিতার নাম ধরে আমাকে যা বলেছেন তা হলো এই রকম : আমাকে বলা হয়েছে যে আল্লাহ্‌র রসূল বলেছেন : 'আমি দোযখে আমর ইবনে লুহাইকে দেখলাম সে তার নাড়ি-ভুঁড়ি নিয়ে টানাটানি করছে। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, ওর কাল আর আমার কালের মধ্যবর্তী সময়ে কারা বাস করতো। সে বলল, ওরা সব ধ্বংস হয়ে গেছে।'

মুহম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আল-হারিস আত্-তামিমি আমাকে বলেছেন যে আবু সালিহ আস-সাম্মান তাকে বলেছেন যে, তিনি আবু হুরায়রাকে বলতে শুনেছেন : আমি আল্লাহ্‌র রসূলকে আখযাম ইবনে আল-জাউন আল খুজাই-কে বলতে শুনেছি 'জান আখযাম, আমি আমর ইবনে লুহাই- ইবনে কামা বিনতে খিনদিফকে দেখলাম নরকে সে নিজের নাড়িভুঁড়ি টানাটানি করছে। তোমার আর ওর চেহারার মধ্যে এতো মিল। দুজন মানুষের মধ্যে এতো মিল আমি আর কোথাও দেখিনি।

চেহারার এই সাদৃশ্য কোন ক্ষতি করবে আমায় ? আখযাম প্রশ্ন করল।

রসূলুল্লাহ বললেন, 'না। কারণ তুমি মুমিন। আর সে হলো কাফির। সে-ই প্রথম ইসমাঈলের ধর্ম পরিবর্তন করে। সে-ই

সর্বপ্রথম দেবতার মূর্তি স্থাপন করে। তারপর বহিরা, সাইবা, ওয়াসিলা, এবং হামি-কে প্রচলন করে।

লোকে বলে ইসমাঈলের (আ) সন্তানেরা যখন দেখল মক্কা তাদের জন্য খুব ছোট জায়গা হয়ে গেছে, দেশের ভেতরে তাদের আরো জায়গার দরকার, তখন তারা প্রস্তর পূজা শুরু করল। যারাই শহর থেকে অন্যত্র যেতো, হাতে করে পবিত্র স্থান থেকে একটা পাথর বহন করে নিয়ে যেতো পূজা করার জন্য। যেখানেই বসত করতে যেতো তারা, সেখানে পবিত্র ভূমির সেই পাথরকে প্রতিষ্ঠা করতো, কাবায় যেমন তওয়াফ করতো তেমনি সেই পাথরের চারধারেও তওয়াফ করতো। এমনি করতে করতে অবস্থা এমন হলো যে পরে তারা ইচ্ছামতো পাথরের পূজা শুরু করল। কোন পাথর দেখে ভাল লাগল তো আর কথা নেই—অমনি শুরু হয়ে যেতো তার পূজা।

এমনি করে পূজা করতে করতে কয়েক পুরুষ পর তারা তাদের আদি ধর্ম ভুলেই গেল একেবারে। ইবরাহীম (আ) আর ইসমাঈল (আ)-এর ধর্মের বদলে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধর্ম তারা অনুসরণ করতে লাগল। তারা মূর্তিপূজা শুরু করল। তাদের আগে মানুষ যে ভুল করতো, তারা সেই একই ভুল করতে লাগল এবং এতদ্‌সত্ত্বেও ইবরাহীম (আ)-এর সময়কার কিছু কিছু ধর্মীয় আচার অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে পালন করে যেতে থাকল। ওই সব প্রাচীন আচারাদির মধ্যে ছিল উপাসনা-গৃহকে সম্মান করা ও তার চারপাশে তওয়াফ করা, ছোট হজ্ব, বড় হজ্ব, আরাফা এবং মুযদালিফায় অবস্থান, কুরবানী, ছোট হজ্ব আর বড় হজ্বে উচ্চস্বরে হজ্বের দোয়া পড়া। সঙ্গে সঙ্গে আবার এমন আচারেরও প্রচলন ঘটাল যার সঙ্গে ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।

কিনানা আর কুরায়শদের হজ্বের দোয়া ছিল এমনি: 'তোমার সকাশে, ইয়া আল্লাহ্! তোমারই সকাশে। তোমার সকাশে, তুমি শরীকবিহীন, সকল ক্ষমতা আর প্রাধান্য একমাত্র তোমারই। তোমার কোন শরীক নেই।' চীৎকারে তার একত্ব স্বীকার করা হতো, আবার আল্লাহ্‌র সাথে তাদের

মূর্তি'কে মিশিয়ে দিত, মিশিয়ে সব কিছুর জন্য দায়ী করত আবার আল্লাহ্‌কেই. আল্লাহ্ মুহাম্মদ (সা)-কে[১] বলেন তার সঙ্গে অন্য কিছুর শরীক না করে এদের অধিকাংশ আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ তারা আমার যথার্থ অস্তিত্বের জ্ঞান নিয়ে আমার এককত্ব স্বীকার করে না, আমার সঙ্গে আমার সৃষ্ট কোন প্রাণীকে অংশীদার করে দেয়।

নূহ (আ)-এর লোকজন যা বিশ্বাস করত, তার একটা ভাবমূর্তি তারা তৈরী করে নিয়েছিল। আল্লাহ্ তার রসূলকে তাদের সঙ্গে বলেছেন এবং তারা বলেছে : তোমাদের দেবদেবীদের তোমরা পরিত্যাগ করো না, উদ, সুওবা, ইয়াগুস আর নসরকে তোমরা ত্যাগ করো না এবং তারা অনেককে বিপথগামী করেছে।[২]

যারা এইসব দেবদেবী বরণ করে নেয় এবং ইসমাঈল (আ)-এর ধর্ম-জীবন করার সময় নতুনে-পুরাতন মিলিয়ে তাদের দেবতাদের নামকরণ করে তাদের মধ্যে ইসমাঈল (আ) ও আরো অনেকের অনুসারী ছিল। হুদায়ল ইবনে মুদরিকা ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুদার তাদের অন্যতম ছিল। তারা সুওবাকে গ্রহণ করে রুহাতে[৩] তাকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। কুদা-র কালব ইবনে ওয়াবরা গ্রহণ করছিল উদকে, তাকে তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল দুমাতুল জন্দলে।

কাব ইবনে মালিক আল আনসারি বলেন :

আমরা বর্জন করেছি আল-লাত আর আল-উজ্জা আর উদকে ওদের গলার হার এবং কানের দুল খুলে নিয়েছি।

তাইয়ির আনুম এবং মাধিজ-এর জুরাশের লোকেরা ইয়াগুসকে প্রতিষ্ঠা করেছিল জুরাশে।[৪]

---

১. কুরআন ১২ : ১০৬।
২. কুরআন ৭১ : ২৩।
৩. ইয়ানবুর কাছে একটি স্থান।
৪. জুরাশ ইয়ামনের একটি প্রদেশ।

হামদানের এক গোত্র খায়ওয়ান। তারা গ্রহণ করল ইয়ায়ূফ-কে ইয়ামনের হামদানে।

হিমায়রের জুল-কালা নসরকে প্রতিষ্ঠা করল হিমায়র দেশে।

খাউলান দেশে খাউলানদের এক দেবতা ছিল আম্মানাস নামে। তাদের নিজদের বর্ণনা অনুযায়ী তারা তাদের সমস্ত ফসল আর উট-দুম্বা আল্লাহ্ এবং আম্মানাসের মধ্যে ভাগ করে দিত। যদি কখনো আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা কোন অংশ আম্মানাসের ভাগে চলে আসত, তাহলে তারা তা ওখানেই (অর্থাৎ আম্মানাসের কাছেই) রেখে দিত। কিন্তু যদি আম্মানাসের কোন অংশ আল্লাহ্‌র ভাগে চলে আসত, তাহলে তা আম্মানাসের ভাগে ফিরিয়ে নেওয়া হতো। খাউলানে এই গোত্রকে বলা হতো আল-আদিম। কেউ কেউ বলে থাকেন এঁদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন আল্লাহর সৃষ্ট ফসল আর গবাদি পশুর একটা অংশ আল্লাহ্‌কেই তারা দিয়ে দেয়। এবং বলে, এইটা আল্লাহ্‌র—বলে তাদের বিশ্বাস মতে—বলে আর এইটা হলো আমাদের শরীকদের। এমনি করে যা রাখা হয় তাদের শরীকদের জন্য তা আসে না আল্লাহ্‌র ভাগে। কিন্তু যা রাখা হয় আল্লাহ্‌র ভাগে তা চলে যায় তাদের অংশীদারের ভাগে—কী জঘন্য তাদের বিচার।[১]

বনি মিলকান ইবনে কিনানা ইবনে খুজায়মা ইবনে মুদরিকা ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুদার-এর এক দেবমূর্তি ছিল। নাম ছিল তার সাদ। তাদের দেশের মরুভূমির মাঝখানে [২] এক অত্যুচ্চ পাহাড়ের পাথর ছিল সে। সেই পাথর নিয়ে তাদের মধ্যে এক কাহিনী প্রচলিত আছে। জনৈক লোক তার ঘরে উট নিয়ে রাখল পাথরের কাছে। তার ধারণা কিছুক্ষণ পাথরের কাছে দাঁড় করিয়ে রাখলে উট পাথরের বরকত পাবে। উটগুলো ছিল সাধারণ চরে-বেড়ানো উট। পাথর দেখল, পাথরে পেল রক্ত গন্ধ, রক্ত

১. কুরআন ৬ঃ১৩৬।

২. জিদ্দার কাছে।

ওখানে লেগেছিল (ওখানে রক্তপাত হয়েছিল)। ওরা ওখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল, পালিয়ে গেল যেদিকে পারে। চতুর্দিকে। বানু মিলকানের সে লোক এতে এতো ক্রুদ্ধ হলো যে সে একটা পাথর ছুঁড়ে মারল সেই পাথর-দেবতার উপর, বলল, আল্লাহ্‌র লানত পড়ুক তোর গায়ে। আমার উট তুই তাড়িয়ে দিয়েছিস !

সে তখন ছুটল উট খুঁজতে। খুঁজে খুঁজে উট পেয়ে সেই উট নিয়ে সে আবার এল ওখানে। বলল ঃ

সা'দের কাছে আমরা এসেছিলাম ভাগ্য ফেরাতে
সাদ তাদের তাড়িয়ে দিল। সাদের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই আমাদের।
সাদ একটা পাথর কেবল, সামান্য উ'চুতে
সে ভালো করতে পারে না কারো, পারে না কারো মন্দ করতে।

দাউসে এক পুতুল ছিল, তার মালিক ছিল আমর ইবনে হুমামা আল-দাউসি।

কাবার মাঝখানে এক কুয়ার পাশে হুবাল নামে এক পুতুল ছিল কুরায়শদের। তারা ইসাফ (বা আসাফ) এবং নাইলাকে প্রতিষ্ঠিত করল যমযমের পাশে। ওখানে কুরবানী দিত তারা। ওরা ছিল জুরহুমের পুরুষ ও নারী। একজন ইসাফ ইবনে বাগি। অন্যজন নায়লা বিনতে দিক। কাবা ঘরে যৌন কর্ম করেছিল তারা। আল্লাহ্ দুজনকে দুটো পাথর বানিয়ে রেখে দিয়েছেন সেই অপরাধে।

আমর বিনতে আবদুর রহমান ইবনে সা'দ ইবনে জুরারার বরাত দিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে মুহম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাজম বলেছেন যে, আম্‌রা বলেছেন ঃ 'আয়েশা (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি, "সব সময় আমরা শুনে আসছি ইসাফ আর নায়লা জুরহুমের পুরুষ ও রমণী ছিল। তারা কাবাঘরে সহবাস করে বলে আল্লাহ্ তাদের পাথর বানিয়ে ফেলেছেন।" এর সত্যমিথ্যা সব আল্লাহ্ জানেন।'

আবু তালিব বলেন ঃ

ওখানে হাজীরা তাদের উটকে নতজানু করায়
ওখানে ইসাফ আর নায়লা থেকে পানি বহে।

ঘরে ঘরে মূর্তি ছিল। সেই মূর্তি পূজা করত সবাই। কোথাও যাত্রা করার সময় ঘোড়ায় চড়বার আগে মূর্তিকে আদর করত, স্পর্শ করত। যাত্রার পূর্বে মূর্তির সঙ্গে দেহ মিলাতই তারা। আবার কোনখান থেকে ঘরে প্রত্যাবর্তনের পর সবার আগে সেই মূর্তির সঙ্গেই কোলাকুলি করতো। আল্লাহ্ যখন এক-আল্লাহ্‌র বাণী দিয়ে তার রসূল (সা)-কে পাঠালেন, তখন কুরায়শরা বলেছিল ঃ 'তিনি কি সব দেবতাকে এক আল্লাহ্‌তে পরিবর্তিত করবেন? সে তো তাহলে এক সাংঘাতিক কর্ম হবে!'

কা'বার পাশাপাশি ছিল কিন্তু 'তাওয়াগিত'।[১] দেবমূর্তিতে ভরা অনেকগুলো উপাসনা-গৃহের সমাহার। কা'বাকে যেমন আরবরা সম্মান করত, ঠিক তেমনি তাওয়াগিতকেও সম্মান করত তারা। তাদের ছিল অনেক খেদমতগার আর পরিচারক। কা'বাঘরে যেমন তারা উপাচার ইত্যাদি প্রদান করত, তেমনি করত সেখানে। একই পদ্ধতিতে তাওয়াফ করত, কুরবানী দিত। তবু কা'বাকেই তারা সবচেয়ে বড় মানত কারণ কা'বাঘর ছিল উপাসনা-গৃহ, ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ)-এর মসজিদ।

কুরায়শ আর বনি কিনানার ছিল নাখলা-য় আল-উজ্জা। তার খেদমতগার আর পরিচারক ছিল বনি হিশামের মিত্র দল সুলায়মের বনি শায়বান।

একজন আরব কবি বলেন ঃ

আসমাকে যৌতুক দেওয়া হলো ছোট্ট লাল এক গাভীর মস্তক,
বানু খানামের কোন একজন সে গাভী কুরবানী দিয়েছিল।
সে যখন তাকে নিয়ে এল আল-উজ্জার কশাই খানায়, গাভীর চোখে

১. 'তাগুত' শব্দের বহুবচন, অর্থাৎ দেবমূর্তি।

সে দেখতে পেয়েছিল একটা কলঙ্ক,

তারপর তাকে ভাল করে টুকরো করে দেওয়া হলো।

প্রথা ছিল কুরবানীর বস্তুকে উপস্থিত পূজারীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার। কশাইখানার নাম ছিল ঘাবঘাব। ওখানেই নিক্ষেপ হতো রক্ত।

[আজরামির মতে আমর ইবনে লুআই আল-উজজাকে নাখলা-য় প্রতিষ্ঠা করে। তারা হজ্ব সমাপন করে কা'বাঘর প্রদক্ষিণ করে এসেও ই'হরাম বাঁধা অবস্থায় ছিল। তারপর তারা আল-উজ্জায় এসে তাকে প্রদক্ষিণ করল। ওখানে এসে তারা হজ্বের ই'হরাম খুলল এবং তার পাশে একদিন কাটাল। এর মালিক ছিল আল-খুজা'। খুজাদের এবং মুদার-দের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কুরায়শ ও বানু কিনানার লোকজন একে সম্মান করত। বনু হাশিমের মিত্র বনু সুলায়মের বনু শায়বান ছিল এর খেদমতগার ও পাহারাদার।)

আল-লাত ছিল তাইফবাসী 'সাকিফের। তার খেদমতগার ও পরিচারক ছিল সাকিফের বনু মুত্তালিব।

মানাতকে পূজা করতো আল-আউস আর আল-খাযরাজ এবং ইয়াস্রিবের আরো অনেকে, যারা তাদের ধর্মকে সমুদ্র-তীর ধরে কুদায়দে[১] আল-মুশাল্লালের দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

[আল-আজরাকির ভাষ্য: আমর ইবনে লুআই মানাতকে কুদায়দের কাছে সমুদ্রতীরে প্রতিষ্ঠা করে। আজ্দ আর গাস্সান তার ওখানে তীর্থযাত্রায় যায় এবং পূজা করে। কা'বার কম্পাস তৈরী করে তারা আরাফাত থেকে শীগগির কাজ সেরে মিনার আচার-অনুষ্ঠান পালন করল, কিন্তু মস্তক মানাত না যাওয়া পর্যন্ত মুণ্ডন করল না। কারণ 'লাব্বায়েক' ডাক তারা তুলে রেখেছিল মানাতের জন্য। এরা আবার সাফা-মারওয়ার মাঝখানে নাহিক মুজাবিদ আলরিহ এবং মুতিম আত্-

১. মদীনা থেকে হজ্বপথে মক্কা যেতে ইয়ানবু আর রাবিগের মাঝখানে রেড-সীর পারে কুদায়েদ। তার পাশে মুশাল্লাল পর্বত।

তায়ের নামক মূর্তি দুটোর কাছে যেতো না। আনসারদের এই গোত্র মানাতের আবাহন উৎসব পালন শুরু করেছিল আবার। ছোট হজ্ব কিংবা বড় হজ্বে গেলে ওরা কোন বাড়ির ছাদ তৈরী শেষ না হলে কোন বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতো না। হজ্বের ই'হরাম বাঁধা অবস্থায় কেউ নিজের ঘরে ঢুকতো না। ঘর থেকে কোন কিছু আনবার প্রয়োজন হলে বাড়ির পেছনের দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকতো, যাতে করে দরজার ভেতর দিয়ে মাথা গলাতে না হয়। আল্লাহ্ যখন ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন করলেন, পৌত্তলিকতার সব চিহ্ন মুছে দিলেন, তখন এই প্রসঙ্গে তিনি বললেন: 'ধার্মিকতা কেবল বাড়ির পেছন দিয়ে ঢুকলেই হয় না, হয় আল্লাহ্কে ভয় করলে।[১] মানাতের মালিক ছিল আল-আউস এবং আল-আজদ গোত্রের আল-খাযরাজ এবং গাসসানরা এবং ইয়াসরিব ও সিরিয়ার আরো অনেকেই যারা নিজেদের ধর্ম পালন করত। মানাত কুদায়দে আল-মুশাল্লাল এর কাছে সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল।

যুল-খালাসার মালিক ছিল দাউস খাসাম, বাজিলা এবং তাবালা অঞ্চলের আরবরা।[২] (আল-আজরাকির ভাষ্য: আমর ইবনে লুআই আল-খালাসাকে প্রতিষ্ঠিত করেন মক্কার দক্ষিণ দিকে। এর গলায় তারা নেকলেস দিয়ে সাজাতো। বার্লি ও গম নৈবেদ্য হিসেবে দিত তাকে। একে দুধ দিয়ে তারা গোসল করাত। এর কাছে কুরবানী দিত। তার সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখতো উটপাখীর ডিম। আমর-এর একটি অনুকৃতি আস-সাফার উপরে স্থাপন করেছিল। তার নাম দিয়েছিল নাহিক মুজাহিদ আল-রিহ। আরেকটি স্থাপন করেছিল আল মারওয়ায়। তার নাম মুতিম আত্-তায়ের।

ফাল্স-এর মালিক ছিল তাইয়ি এবং সালমা ও আযা নামে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকার অধিবাসীরা।

---

১. কুরআন ২ : ১৮৯।

২. মক্কা থেকে সাত রাতের পথ।

হিমইয়ারী এবং ইয়ামনিদের এক নজীর ছিল সানা-তে। নাম রিয়াম। রুদা ছিল বনি রাবিআ ইবনে কাব ইবনে সাদ ইবনে জায়দ মানাত ইবনে তামিমের মন্দির। ইসলামের আবির্ভাবের পর এই মন্দির ধ্বংস করেন আল-মুনাতাউগির ইবনে সাদ। ধ্বংস করার সময় আল-মুসতাউগির বলেছিলেন :

রুদাকে এমন ভেঙ্গে চুরমার করে দিলাম আমি
একটা গর্তের ভেতর একটা কালো স্তূপ ছাড়া
আর কিছুই ছিল না ওখানে।

যুল-কাবাতে ছিল সিনদাদের[১] আইয়াজ এবং ওয়াইলের দুই পুত্র—বাকার আর তাগলিব। এর সম্বন্ধে বানু কায়স ইবনে সালাবার আশা বলেন :

আল খাওয়ারনাক এবং আস-সাদির এবং বারিক
এবং সিনদারের যুল-কাবাত মন্দিরের মাঝখানে।

বাহিরা, সাইবা, ওয়াসিলা এবং হামি

বাহিরা হলো সাইবার মাদী বাচ্চা। সাইবা মাদী-উট। সে পরপর দশটা মাদী-বাচ্চার জন্ম দেয়—মাঝখানে কোন মরদ বাচ্চা হয়নি। তাকে স্বাধীনভাবে চড়তে দেওয়া হয়। তার চুল ছোট করা হয় না। কেবল মেহমান ছাড়া অন্য কেউ তার দুধ খেতে পারে না। তার উপর কেউ কোনদিন চড়ে না। ওর মাদী বাচ্চা হলে তার কান দুভাগ করে কেটে দেওয়া হয়, তার মার সঙ্গে সবখানে যেতে দেওয়া হয়, তার উপরে কেউ চড়ে না, কেউ কাটে না তার চুল, মার মতো তার দুধও কেবল মেহমান খেতে পারে। এই হলো বাহিরা, সাইবার কন্যা-উট।

ওয়াসিলা হলো এক ভেড়ী। পরপর সে দশটা মাদী-বাচ্চার জন্ম দেয়। এর মধ্যে একটাও মরদা হয় না। মাদী বাচ্চাকেও ওয়াসিলা বানানো

১. নজরানের উত্তরে কূফার একটি জিলা।

হয়। ওয়াসিলা থেকে ওরা 'ওয়াসালাত' শব্দ ব্যবহার করে। যতো ভেড়ির সে জন্ম দিক না কেন, সবগুলোর মালিক হবে পুরুষ মানুষ। যদি কোনটা মরে যায়, পুরুষ-রমণী সবাই মিলে তার গোশ্ত খায়।

হামি হলো খোজা করা হয়নি এমন ঘোড়া। কোন পুরুষ জন্ম না দিয়ে পরপর যার ঔরসে দশটি মাদী ঘোড়া জন্ম নেয়, সেই হলো হামি। তার পিঠ নিষিদ্ধ। ওখানে আরোহণ নিষেধ। তার চুল কেটে ছোট করা হয় না। তাকে উটের দলের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়, যাতে যাকে খুশি তার উপর সে চড়তে পারে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রেরণ করার পর আল্লাহ্ তাঁর কাছে নাযিল করেন: "আল্লাহ্ বাহিরা অথবা সাইবা অথবা ওয়াসিলা অথবা হামি কাউকেই সৃষ্টি করেন নি। যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস আনে নি তারাই তার বিরুদ্ধে মিথ্যা গল্প তৈরী করে থাকে, যদিও কি তারা করছে তা তারা নিজেরাই জানে না।'[১]

অন্য স্থানে আবার বলেছেন: 'তারা বলে, এই সব ভেড়ার পেটে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য, আমাদের স্ত্রীদের জন্য তা নিষিদ্ধ। তবে বাচ্চা যদি মরা জন্মে তাহলে তার গোশ্তের ভাগ ওরাও পায়। এরকম বিভেদ সৃষ্টিরে প্রতিশোধ তিনি নেবেন তাদের উপর। নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, তিনি সর্বজ্ঞ।[২]

আবার অন্যত্র: আপনি বলুন হে মুহম্মদ! আল্লাহ্ তোমাদের যে রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন তার কিছু তোমরা নিষিদ্ধ করেছ, কিছু দিয়েছ খেতে? আপনি বলুন 'আল্লাহ্ কি তা করার জন্য তোমাদের অনুমতি দিয়েছে, নাকি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে তোমরা মিথ্যা আরোপ করো?'[৩]

---

১. কুরআন ৫ : ১০৩।

২. কুরআন ৬ : ১৩৯।

৩. কুরআন ১০ : ৫৯।

আবার উট থেকে দুটো এবং গরু থেকে দুটো। বলুন তিনি (আল্লাহ্) কি মর্দা দুটো বা মাদী দুটো অথবা মাদী দুটোর গর্ভে যা আছে তা খেতে নিষেধ করে দিয়েছেন? যদি সত্য কথা বল, তাহলে জ্ঞান দ্বারা তা প্রমাণ কর। এবার দুটো উট আর অন্যান্য গবাদি পশুর মধ্যে দুটোর কথায় আসা যাক। আপনি বলুন, তিনি কি দুটো মরদা এবং দুটো মাদী এবং দুটো মাদীর গর্ভে যা আছে তা খেতে তোমাদের নিষেধ করেছেন? নাকি আল্লাহ যখন এই নিষেধ আরোপ করেন তখন তোমরা তার সাক্ষী দিলে? মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য জ্ঞানবুদ্ধি ছাড়া যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা ছড়ায় তার চেয়ে বড় পাপী আর কে আছে? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীদের সৎ পথে পরিচালিত করেন না।[১]

বংশ-বিবরণীর বাকী অংশ

খুজাআ বলেন: আমরা ইয়ামনের আমর ইবনে আমিরের বংশধর।

মুদরিকা ইবনে আল-ইয়াসের দুই ছেলে ছিল—খুজায়মা এবং হুদায়ল। তাদের আম্মা ছিলেন কুদাবাসী। খুজায়মার ছিল চার পুত্র—কিনানা, আসাদ, আসাদা এবং আল-হুন। কিনানার মা ছিল ইউয়ানা ইবনে সাদ ইবন কায়েস ইবনে আয়লান ইবনে মুদার।

কিনানার ছিল চার পুত্র—আন-নাদর, মালিক, আবদ্ মানাত এবং মিলকান। নাদরের আম্মা ছিলেন াররা বিনতে মুর ইবনে উদ ইবনে তাবিখা ইবনে আল-ইয়াস ইবনে মুদার। অন্য এক রমণীর গর্ভে তার আরো পুত্র ছিল।

বলা হয়ে থাকে কুরায়শ বংশের নামটি এসেছে একবার আলাদা হয়ে যাওয়ার পর আবার পুনর্মিলনী থেকে। 'তাকাররুশ' শব্দ দিয়ে পুনর্মিলনী বুঝানো যায়।

আন-নাদর ইবনে কিনানার দুই পুত্র ছিল—মালিক ও ইয়াখলুদ। মালিকের আম্মা ছিল আতিকা বিনতে আদওয়ান ইবনে আমর ইবনে

১. কুরআন ৬ : ১৪৪।

কায়েস ইবনে আয়লান। এই মহিলা ইয়াখদেরও মা ছিলেন কিনা আমি জানি না।

মালিক ইবনে আন-নাদরের ঔরসে জন্ম নেয় ফিহ্‌র ইবনে মালিক। এর আম্মার নাম ছিল জানদালা বিনতে আল-হারিস ইবনে মুদাদ আল-জুরহুমি। (তাবারির ভাষ্য ঃ ফিহ্‌র এবং হাসান ইবনে আবদু কালাল ইবনে মাসুব যু-হুরাস আল-হিময়ারির মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। হাসান ইয়ামন থেকে এসেছিল অনেক লোকজন নিয়ে কা'বাঘর থেকে পাথর ইয়ামনে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যাতে মক্কার হজ্ব ইয়ামনে নিয়ে যাওয়া যায়। নাখলা পর্যন্ত এসে সে উট দুম্বার উপর চড়াও হয় এবং রাস্তা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু মক্কায় প্রবেশ করার সময় ভয় পেয়ে গেল। কুরায়শ কিনানা, খুজায়মা, আসাদ, জুধাম এবং মুদারের অন্যান্য অজ্ঞাত গোত্রের লোকজন তার মতলবের কথা যখন টের পেল, তারা ফিহ্‌র ইবনে মালিকের নেতৃত্বে তাকে বাধা দিতে গেল। প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো দুই দলের মধ্যে। যুদ্ধে হিমায়ররা পরাজিত হয়, ফিহ্‌রের পুত্র আল-হারিসের হাতে হাসান বন্দী হয়। যুদ্ধে অন্যান্যদের মধ্যে তার নাতি কায়েস ইবনে গালিব ইবনে ফিহ্‌রও ছিল। দুই বৎসর কাল হাসান বন্দী ছিল। তারপর বন্দীপণ দিয়ে মুক্ত হয়। কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পর ইয়ামন যাওয়ার পথে মৃত্যুবরণ করে।)

ফিহ্‌রের চার পুত্র ছিল—গালিব, মুহারিব, আল-হারিস এবং আসাদ। তাদের আম্মার নাম নায়লা বিনতে সা'দ ইবনে হুদায়ল ইবনে মুদরিকা।

গালিব ইবনে ফিহ্‌রের ছিল দুই পুত্র—লুআই এবং তায়েম। তাদের আম্মার নাম সালমা বিনতে আমর আল-খুজাই। তায়মদের বানুল আদরাম বলা হতো।

লুআই ইবনে গালিবের চার পুত্র ছিল—কা'ব, আমির, সামা এবং আউফ। প্রথম তিনজনের আম্মার নাম মাবিয়া বিনতে কা'ব ইবনে আলকায়ন ইবনে জাসর। ইনি কুদায়-এর বাসিন্দা ছিলেন।

সামার কাহিনী

সামা ইবনে লুআই ওমানে চলে গিয়েছিল। ওখানেই সে থেকে যায়। বলা হয়ে থাকে, আমির ইবনে লুআই-র সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছিল। সামা আমিরের একটা চক্ষু উপড়ে নেয়। তখন আমির তাকে তাড়িয়ে দেয়। আমিরের ভয়ে সে ওমান চলে যায়। সামাকে নিয়ে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা হলো, সামা একটা মাদী-উটে চড়ে যাচ্ছিল, তখন উট ঘাস খাওয়ার জন্য মুখ নিচু করেছিল। অমনি একটা সাপ তার ঠোঁটে দংশন করে। দংশনের যন্ত্রণায় উট মাটিতে পড়ে যায়। তখন সামা পড়ে গেলে সামাকেও দংশন করে সেই সাপ। সামাও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এরূপ আরো একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে, সামা যখ। দেখল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে তখন সে বলেছিল ঃ

চক্ষু, সামা ইবনে লুআইর জন্য তুমি কাঁদো।
সামার পায়ে বেড়ি দিয়েছে সাপ।
উটের সওয়ারির এমন দুর্দশা আমি আর কোনদিন দেখিনি,
এই সামা ইবনে লুআইর উপর যেমন এসেছিল।
আমির আর কা'বকে সংবাদ দাও
আমার আত্মা তাদের জন্য কাঁদে।

আমার দেশ ওমানে
কিন্তু আমি গালিবি একজন, অভাবের তাড়নায় আমি
এখানে আসি নি।
অনেক পিরিচ তুমি ভেঙ্গেছো হে লুসাই পুত্র,
কিন্তু মরণকে ফাঁকি দেওয়ার সাধ্য নেই কারো
রাতের সফরে অনেক উট তুমি ফেলে রেখে গেছো,
শায়িত, অবসন্ন,
ক্লান্ত অনেক পরিশ্রমের পর।

আউফ ইবনে লুআই-র দেশত্যাগ

বলা হয়ে থাকে, আউফ ইবনে লুআই নাকি কুরায়শদের এক কাফেলার সাথে গাতফান ইবনে সা'দ ইবনে কায়স ইবনে আয়লানের জিলা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। ওখানে যাওয়ার পর তার দলের লোক তাকে ফেলে চলে যায়। তখন সালাবা ইবনে সা'দ তার কাছে এল, তাকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করল, তাকে একটা স্ত্রী দিল এবং নিজের গোত্রের মধ্যে আপন-ভাই বলে গ্রহণ করল। সালাবা, বানু যুবিয়ানের সূক্ষ্ম বংশ গণনা অনুযায়ী আউফের ভাই হতো সম্পর্কে। যেমন একদিকে সালাবা ইবনে সাদ ইবনে যুবিয়ান ইবনে বাগিদ ইবনে রায়ত ইবনে গাতফান, অন্যদিকে আউফ ইবনে সাদ ইবনে যুবিয়ান ইবনে বাগিদ ইবনে রায়ত ইবনে গাতফান। তারপর থেকে বানু যুবিয়ানে তাদের আত্মীয়তার কথা ছড়িয়ে পড়ল। আউফ যখন অনেক পেছনে পড়ে গিয়েছিল গোত্রের মধ্যে, যখন সবাই তাকে ত্যাগ করেছিল তখন নাকি এই সালাবাই আউফকে বলেছিল ঃ

আমার কাছে থেকে তুমি উট চড়াও হে ইবনে লুআই,
তোমার মানুষ তোমাকে ত্যাগ করে, তোমার কোন ঘরবাড়ি নেই।

মুহম্মদ ইবনে জাফর ইবনে আল জুবায়র অথবা মুহম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে হুসায়নও হতে পারে, আমাকে বলেছে যে, উমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন ঃ 'আরবের কোন গোত্রের সঙ্গে আমার যদি থাকার প্রশ্ন উঠতো, অথবা কোন গোত্রকে যদি আমার দলে নেওয়ার কথা হতো, তাহলে আমি বনু মুররা ইবনে আউফকে বেছে নিতাম। আমরা জানি, ওখানে আমাদের মতো লোক আছে। এবং আমরা সে-ই লোক কোথায় গেছে এ-ও জানি।' সেই লোক বলতে আউফ বিন লুআইকে বুঝানো হয়েছে। গাত্ফানের বংশবৃত্তান্তে আছে, তিনি হলেন মুররা ইবনে আউফ ইবনে সাদ ইবনে যুবিয়ান ইবনে বাগিদ ইবনে রায়ত ইবনে গাতফান। এই বংশবৃত্তান্তের কথা তাদের কাছে বলা হলে তারা বলে, আমরা এটা অস্বীকার করি না কিংবা এ নিয়ে তর্ক করি না। এই বংশ বৃত্তান্ত নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি।'

আল-হারিস ইবনে জালিম ইবনে জাদিমা ইবনে ইয়ারবু ছিলেন বনু মুররা ইবনে আউফের লোক। তিনি যখন আন-নুমান ইবনে আল-মুন-যির গোত্র ত্যাগ করে কুরায়শ গোত্র যোগে দেন তখন বলেছিলেন:

আমার গোত্র সালাবা ইবনে সাদ নয়
লম্বা চুল ফাজারাও নয়
একান্তই যদি জানতে চাও তাহলে জেনো আমার
গোত্র বনু লুআই।
মক্কায় তারা মুদারদের যুদ্ধ শিখিয়েছিল।
আমরা বনু বাগিদকে অনুসরণ করেছি।
নিজের মানুষকে ত্যাগ করে আহাম্মকি করেছি।
এ যেন সেই তৃষ্ণার্ত পানির অন্বেষায় দিশেহারা,
ফেলে দিয়ে পানি ছুটে মরীচিকার পেছনে।
আল্লাহ্‌র কসম, আমি হলে, আমি তাদের সঙ্গেই থাকতাম
দেশ-দেশান্তর যেতাম না ঘাসের সন্ধানে।
কুরায়শ বংশে রাওয়াহা তার উটের উপর আমাকে চড়তে দিল,
কোন মূল্য চায়নি তার জন্য।

আল-হুসায়ন ইবনে আল-হুমাম আল মারি ছিল বনু সাহম ইবনে মুরারার লোক। আল-হারিস ইবনে যালিমের কথা প্রতিবাদ করতে গিয়ে এবং গাতফানের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে তিনি বলেন:

দেখো তুমি আমাদের নও, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।
লুআই বিন গালিবের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা আমরা অস্বীকার করি।
আল-হিজাজের মহান উঁচু জায়গায় আমাদের বাস, আর তোমরা
থাকো দুই পাহাড়ের মাঝখানে সবুজ শ্যামলে।

'তোমরা' মানে কুরায়শরা। পরে অবশ্য আল-হুসায়ন বুঝতে পেরেছি-লেন, কথাগুলো বলা উচিত হয় নি। বুঝতে পেরেছিলেন আল-হারিস বিন যালিমের কথাই ঠিক। তিনি দাবী করেন তিনি কুরায়শ বংশের

লোক—মিথ্যা বলেছেন বলে নিজেকে নিজে দোষারোপ করেন, অতএব বলেন :

যে কথা বলেছিলাম, অনুতপ্ত আমি তার জন্য :
এখন বুঝেছি যে ইহা ছিল মিথ্যুকের এক উক্তি
আমার জিহ্বায় যদি দুটো ভাগ থাকত,
অর্ধেকটা থাকত বোবা আর অর্ধেকটা থাকত মুখর তোমার প্রশংসায়।

আমাদের পিতা কিনানী, মক্কায় তার কবর,
পাহাড়ের মাঝখানে আল-বাসার সরক শ্যামল প্রান্তরে।
উপাসনা গৃহের এক-চতুর্থাংশ আমরা পেয়েছি ওয়ারিশ হিসাবে,
আর পেয়েছি ইবনে হাতিবের বাড়ির পাশের
এক-চতুর্থাংশ প্রান্তর।

এর অর্থ হলো বনু লুআই ছিল চারজন : কাব, আমির, সামা এবং আউফ।

একজন লোক আমাকে বলেছিল, উমর বিন খাত্তাব বনু মুররার লোকজনকে বলেছেন : তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরে যেতে চাইলে ফিরে যাও।' লোকটার কথায় সন্দেহ করার আমার কোন কারণ নেই।

গাত্ফানদের মধ্যে এই গোত্র খুব অভিজাত ছিল। এদের দলপতি এবং নেতা ছিল হারিস ইবনে সিনান ইবনে আবু হারিসা ইবনে মুররা ইবনে নুশবা, খারিজা ইবনে আবু হারিসা, আল-হারিস ইবনে আউফ, আল-হুসায়ন ইবনে আল-হুমাম এবং হাশিম ইবনে হারমালা এই গোত্রের কয়েকজন। এদের সম্বন্ধে কে একজন বলেছে :

হাশিম ইবনে হারমালা তার আব্বাকে পুনরুজ্জীবিত[১] করেছে
আল-হাবাত আর আল-ইয়ামালার দিনে

১. পিতৃহন্তাকে হত্যা করাকে পুনরুজ্জীবনের সামিল ধরা হয়েছে।

তার পাশে ছিল নিহত রাজারা,
যেমন সে হত্যা করেছিল দোষী নির্দোষ নির্বিশেষে।[১]

গাতফান আর কায়সদের মধ্যে এদের খুব সুনাম ছিল। গোত্র দুটির মধ্যে খুব সুন্দর সম্পর্ক ছিল। তাদের মধ্যে বাসুল প্রথা প্রচলিত ছিল।

বাসুল হলো আরবদের পক্ষে পবিত্র আটটি মাস। এই আট মাস তারা নির্ভয়ে যে কোন স্থানে যেতে পারত। বনু মুররা সম্পর্কে জুহায়র ইবনে আবু সালমা বলেছেন :

জানো। আল-মাওরাতে নিজের ঘরে ওরা না থাকলে
নাখলে-তে তাদের পাবেই
নাখলে[২]-তে ওদের যথেষ্ট বন্ধুত্ব আমি পেয়েছি।
দুই জায়গার কোথাও তাদের যদি না পাও তাহলে
জানবে তারা বাসলে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অর্থাৎ পবিত্র সময়টাতে খুব করে বেড়াচ্ছে।

বনু কায়স ইবনে সালাবার আল-আশা বলেছেন :
তোমাদের মহিলা অতিথি কি আমাদের জন্য নিষিদ্ধ,
আমাদের মহিলা অতিথি এবং তাদের স্বামীরা
তোমাদের কাছে প্রাপ্তব্য যেখানে ?

কা'ব ইবনে লুআই-য়ের ছিল তিন পুত্র—মুররা, আদি ও হুসায়স। তাদের আম্মা ছিলেন ওয়াশিয়া বিনতে শায়বান ইবনে মুহারিব ইবনে ফিহ্র ইবনে মালিক ইবনে নাদর।

মুররা ইবনে কা'বের তিন ছেলে—কিলাব, তায়েম এবং ইয়াকাজা। কিলাবের আম্মা ছিলেন হিন্দ বিনতে সুরায়র ইবনে সালাবা ইবনে আল-হারিস ইবনে ফিহ্র ইবনে মালিক ইবনে আন-নাদর ইবনে কিনানা

---

১. অর্থাৎ রক্তপাতকে সে ভয় পায়নি।

২. হয় নেজদে, নয় মদীনার কাছে একটা জায়গা।

ইবনে খুজায়মা। ইয়াকাজার আম্মা ছিলেন আল-বারিকিয়া ইয়ামনের আসাদ বংশের বারিকের মেয়ে। কেউ কেউ বলে—তিনিই তায়েমের আম্মা ছিলেন। আবার কেউ বলে তায়েমের আম্মা আর কিলাবের আম্মা হিন্দ বিনতে সুরায়র।

কিলাব ইবনে মুররার ছিল দুই ছেলে—কুসাই আল-জুহরা। এদের আম্মা ছিলেন ফাতিমা বিনতে সাদ ইবনে সায়াল। ইনি ছিলেন ইয়ামনের আল-আজদের যু-সুমার বনু জাদারার মানুষ। বনু জাদারা ছিল আবার বনু দিল্ ইবনে বকর ইবনে আবদ মানাত ইবনে কিনানার মিত্র।

সাদ ইবনে সায়েল সম্পর্কে কবি বলেন:

মানুষের মধ্যে সাদ বিন সায়ালের মতো
এমন মানুষ আর দেখি না।
দুই হাতে অস্ত্র ধরে ঘোড়ায় চড়ে যেতো সে
তেমনি অস্ত্র হাতে নামতো, যুদ্ধ করতো নিচের লোকের সঙ্গে।
অস্ত্রাঘাতে সে বিপক্ষের অশ্বারোহীকে উড়িয়ে নিয়ে যেতো
যেমন করে শ্যেন ছোঁ মেরে থাবায় করে নিয়ে যায় পাখি।

কুসাই ইবনে কিলাবের ছিল চার ছেলে আর দুই মেয়ে: আবদ মানাফ, আবদুদ দার, আবদুল উজ্জা এবং আবদ কুসাই। আর টাখমুর ও বাররা। এদের মা ছিলেন হুব্বা বিনতে হুলায়ল ইবনে হাবশিয়া ইবনে সালুল ইবনে কা'ব ইবনে আমর আল-খুজাই।

আবদ মানাফের অপর নাম ছিল আল-মুগীরা ইবনে কুসাই। তার ছিল চার ছেলে—হাশিম, আবদ শামস ও আল-মুত্তালিব। এদের আম্মা ছিলেন আতিকা বিনতে মুররা ইবনে হিলাল ইবনে ফালিব ইবনে যাকওয়ান ইবনে সালাবা ইবনে বুহ্তা ইবনে সুলায়ম ইবনে মানসুর ইবনে ইকরিমা। চতুর্থ পুত্রের নাম ছিল নওফেল। তার মা ছিলেন ওয়াকিদা বিনতে আমর আল-মাজিনিয়া অর্থাৎ মাজিন ইবনে মানসুর ইবনে ইকরিমা।

যমযম খনন

একদিন আবদুল মুত্তালিব পবিত্র কাবার প্রাঙ্গনে ঘুমোচ্ছিলেন। তখন তিনি দৈবাদেশ পেলেন কুরায়শদের দুই দেবমূর্তি ইসাফ আর নায়লার মধ্যবর্তী নিম্ন জায়গায়, কুরায়শদের কুরবানীর স্থানে যমযম কুয়া খনন করতে হবে। মক্কা ত্যাগ করার সময় জুরহুম এই জায়গাটি ভরাট করে দিয়ে গিয়েছিল। এইখানে ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র ইসমাঈল (আ) এর কুয়া ছিল। ছোট্ট শিশু ইসমাঈলের (আ) তৃষ্ণা এই কুয়ার পানি দিয়ে নিবারণ করিয়েছিলেন আল্লাহ্। তৃষ্ণায় কাতর ইসমাঈল (আ)-এর জন্য পানি খুঁজতে বেরিয়েছিলেন তাঁর আম্মা। কোথাও পানি পাননি। তখন তিনি সাফার উপরে উঠলেন, আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা জানালেন ইসমাঈলকে সাহায্য করার জন্য। তারপর গেলেন মারওয়ায়। ওখানে গিয়েও আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটি করলেন। আল্লাহ্ জিবরাঈলকে পাঠালেন। জিবরাঈল মাটিতে একটি জায়গায় পায়ের গোড়ালি দিয়ে গর্ত করলেন। গর্তে পানি বেরিয়ে এল। তাঁর আম্মা তখন হিংস্র জানোয়ারের গর্জন শুনলেন পাহাড়ের উপর থেকে। তিনি ইসমাঈলের বিপদ হয়েছে মনে করে ভয় পেয়ে গেলেন। দৌড়ে এলেন তিনি সন্তানের কাছে। দেখলেন, শিশু ইসমাঈলের (আ) গালের নিচে পানি, হাত দিয়ে পানি নাড়ছে আর পান করছে। তখন আম্মা ছোট্ট একটা গর্ত করে দিলেন তার জন্য।[১]

জুরহুম এবং যমযম কুয়া ভরাটকরণ

জুরহুমের কাহিনী, তার যমযম ভরাট করা, মক্কা ত্যাগ এবং আবদুল মুত্তালিব কর্তৃক যমযম কুয়া খননের সময় পর্যন্ত যারা মক্কা শাসন করে তাদের বিবরণ আমি জিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-বাক্কাই-র মুখে শুনেছি। জিয়াদ বলেছেন মুহম্মদ ইবনে ইসহাক আল-মুত্তালিবের বরাত দিয়ে। ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর মৃত্যুর পর তদীয়

১. বর্ণনা গ্রন্থের অন্যত্র আরো আছে।

পুত্র নাবিত কা'বাঘরের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, যতদিন আল্লাহ্ তাঁকে সেই দায়িত্বে রেখেছিলেন। তার পরে সে দায়িত্ব পড়ল গিয়ে মুদাদ ইবনে আমর আল-জুরহুমির উপর। ইসমাঈল (আ)-এর পুত্ররা এবং নাবিতের পুত্রগণ তাদের পিতামহ মুদাদ ইবনে আমর ও জুরহুমের মামাদের সঙ্গে থাকতেন। জুরহুম ও কাতুরা চাচাতো ভাই ছিলেন। তাঁরা তখন মক্কায় বাস করতেন। তাঁরা এসেছিলেন ইয়ামন থেকে একসঙ্গে ভ্রমণ করে। মুদাদ ছিলেন জুরহুমের উপরে আর তাদের অন্য একজন লোক সামায়দা ছিলেন কাতুরার উপরে।

ইয়ামন ত্যাগ করার সময় প্রথমে তারা যেতে অস্বীকৃতি জানায়। সঙ্গে হুকুম দেওয়ার জন্য কোন রাজা না থাকলে তাঁরা যাবেন না। মক্কা এসে তাঁরা দেখলেন, শহরে প্রচুর পানি, গাছপালা। খুব খুশী হলেন তাঁরা এবং সেখানে থেকে গেলেন। জুরহুমের লোকের সঙ্গে মুদাদ মক্কার উত্তরে কুয়ায়কিয়ানে বসবাস শুরু করলেন। অন্য কোথাও আর গেলেন না। সামায়দা কাতুরার সঙ্গে বসতি স্থাপন করলেন মক্কার দক্ষিণে আইয়াদে। তিনিও অন্য কোন জায়গায় যাওয়ার কথা আর চিন্তা করলেন না। উত্তর দিক থেকে যারা মক্কা নগরীতে প্রবেশ করত, তাদের কাছ থেকে উপার্জনের এক দশমাংশ কর হিসেবে আদায় করতেন। আবার এদিকে দক্ষিণ দিক থেকে যারা এসে শহরে ঢুকত, তাদের কাছ থেকে একই হারে কর আদায় করতেন সামায়দা। যে যার এলাকায় থাকতেন, কেউ কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করত না।

তারপর মক্কার উপর আধিপত্য নিয়ে কোন্দল শুরু হলো জুরহুম আর কাতুরার মধ্যে। মুদাদের সঙ্গে সঙ্গে তখন ইসমাঈল (আ) আর নাবিতের পুত্রগণ ছিলেন। সামায়দার তুলনায় কা'বাঘরের ব্যাপারে কিছু ভুলত্রুটি তার ছিল। ওরা যুদ্ধে নামলেন। কুয়ায়কিয়ান থেকে মুদাদ তার অশ্বারোহী যোদ্ধা নিয়ে গেলেন বর্শা, চামড়ার বর্ম, তরবারী, তূণীরে সজ্জিত সামায়দার মুকাবিলা করতে। ঝনঝন করে উঠল তরবারী। এই যুদ্ধের জন্যই নাকি কুয়ায়কিয়ানের এবম্বিধ নামকরণ—এই রকম একটা জনশ্রুতি আছে।

আইয়াদ থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন সামায়দা, সঙ্গে পদাতিক আর অশ্বারোহী। সামায়দার অশ্বারোহী বাহিনীতে ছিল অনেক তেজী ঘোড়া। তা থেকেই নাকি আইয়াদের নামকরণ। জিয়াদ মানে তেজী ঘোড়া। দুপক্ষের মুকাবিলা হলো ফাদিহ্-তে। প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে নিহত হলো সামায়দা, নাস্তনাবুদ হলো কাতুরা। ফাদিহ্ নামকরণ নাকি সেই যুদ্ধ থেকেই। তখন দুপক্ষের লোকজন শান্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। এই অবস্থার ভেতর দিয়ে মক্কার উপর দিকে আল-মাতাবিখ নামে এক গিরি সংকটে এসে উপস্থিত হলো। ওখানে শান্তি স্থাপিত হলো। সবাই মুদাদের কাছে আত্মসমর্পণ করল। মুদাদ যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন তিনি পশু যবাই করে লোকজনকে খেতে দিতেন। লোকজন উট-দুম্বার গোশত ওখানে রান্না করে খেতো বলে ওই জায়গার নাম হয়েছে মাতাবিখ। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, তুব্বা ওখানে উট-দুম্বা যবাই করে লোকজনকে খাদ্য বিতরণ করত এবং ওখানে তার ঘাঁটি ছিল বলে এই নামকরণ। মুদাদ আর সামায়দার ঝগড়াই ছিল মক্কায় সংঘটিত প্রকাশ্য বিবাদ। অন্ততঃ অনেকে তাই মনে করেন।

তারপর আল্লাহ্ মক্কায় ইসমাঈল (আ)-এর বংশবৃদ্ধি করলেন। জুরহুম থেকে আগত তাঁদের মামারা অনেক কাল কা'বাঘরের প্রশাসক ও মক্কার বিচারক ছিলেন। ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর তাদের কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তুলত না। কারণ একে আত্মীয়তার বন্ধন, অন্যদিকে ছিল পবিত্র ঘরের প্রতি শ্রদ্ধাভাব। ভয় ছিল, বিবাদ-বিসম্বাদ হলে আবার কা'বা ঘরের ভেতরেই যুদ্ধ না বেঁধে বসে। তারপর একদিন যখন মক্কায় ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদের জন্য আর স্থান সংকুলান হলো না, তখন তাঁরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লেন। যখনই তাঁদের কোন যুদ্ধ করতে হয়েছে, ধর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁদের জন্য জয় তুলে রাখতেন এবং সবাই তাদের অধীনে বাস করত।

কিনানা ও খুজায়া গোত্রের কা'বাঘরের অধিকার অর্জন এবং জুরহুমদের বিতাড়ন

পরে জুরহুমরা মক্কায় উন্নাসিক ব্যবহার শুরু করে। যা নিষিদ্ধ তা-ও প্রচলন করে তারা। শহরে কোন অনাত্মীয় লোক প্রবেশ করলে তাদের প্রতি

দুর্ব্যবহার করত তারা। কা'বাঘরে কোন উপহার প্রেরণ করলে তারা তা আত্মসাৎ করত। ফলে তাদের কর্তৃত্ব দুর্বল হতে লাগল। এইসব ব্যাপার যখন বনু বকর ইবনে আবদু মানাত ইবনে কিনানা এবং খুজাআর গুবশানরা বুঝতে পারল, তখন তারা তাদের মক্কা থেকে বহিষ্কার করার জন্য জোট বাঁধল। যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো। ফলাফল বানু বকর ও গুবশানের অনুকূলে এল। তারা তাদের মক্কা থেকে বিতাড়িত করল। তখনকার পৌত্তলিকতার যুগেও মক্কা তার এলাকার ভেতরে অন্যায় ও অবিচার সহ্য করত না। কেউ ওখানে কোন অন্যায় করলে তাকে বের করে দেওয়া হতো। এইজন্য একে বলা হতো আন-নাসা বা দগ্ধকারী। কোন রাজা এর পবিত্রতাকে অপবিত্র করতে এলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হতো। বলা হয়ে থাকে, একে 'বাক্কা' বলা হতো, কারণ ওখানে অত্যাচারী কোন অনিষ্ট করতে এলেই তার ঘাড় ভেঙ্গে দেওয়া হতো।

আমর ইবনে আল-হারিস ইবনে মুদাদ আল-জুরহুমি কা'বার দুটো হরিণ মূর্তি এবং কোণের পাথর বের করে আনে এবং তাদের যমযমের ভেতরে সমাহিত করে। তারপর তারা জুরহুমের লোকের সঙ্গে ইয়ামনে চলে যায়। মক্কার রাজত্ব হারানোর জন্য তাদের ভীষণ ক্ষোভ হয়। উক্ত আমর বলেন ঃ

কত রমণী যে তীব্র চীৎকারে কেঁদে উঠেছে,
কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়েছে, বলেছে
হাজুন[১] আর সাফার মাসখানে কোন দোস্ত নেই,
মক্কায় দুঃসহ রাত্রির সুদীর্ঘ প্রহর ভোলাতে পারে
এমন কেউ নেই।
আমার বুকের ভেতর কাঁপছে হৃদয়
পাঁজরের ভেতরে ছটফট করছে যেন এক পাখী,
তবু সে রমণীকে আমি বললাম,
এক অঙ্গীকারে আমরা এর অধিবাসী ছিলাম,

১. মক্কার কাছে পাহাড়।

মারাত্মক মন্দভাগ্য আমাদের নিঃশেষে শেষ করে দিয়েছে।
নাবিতের পর আমরাই ছিলাম ওই ঘরের প্রভু
ওই ঘর আমরা তওয়াফ করেছি,
আমরা ঐশ্বর্যে পুষ্ট ছিলাম।
নাবিতের গৌরবময় দিনের পর আমরাই কা'বাঘরের
দায়িত্বে ছিলাম,
বিত্তবানের কোন তোয়াক্কা করিনি আমরা।
আমরা শাসন করেছি ক্ষমতায় থেকে, আমাদের শাসন
কতো সে ছিল মহান!
আমাদের মতে এমন গর্ব অন্য কোন গোত্র করতে পারবে না
আপনি কি আপনার মেয়েকে সর্বোত্তম লোকের সঙ্গে[১]
বিয়ে দেন নি?
তার পুত্র আমাদের পুত্র, বিবাহ-সূত্রে আমরা ভাই-ভাই।
পৃথিবী যদি আমাদের বৈরী হয়
তাহলে পৃথিবী দুঃখময় পরিবর্তন আনবে আমাদের জন্য।
আল্লাহ্ জোর করে আমাদের বিতাড়িত করেছিলেন।
এমনি করে হে মানুষ, নিয়তি আপন কাজ করে লয়।
নিশ্চিন্তে মানুষ যখন ঘুমায় আমি তখন ঘুমাই না,
আমি তখন বলি, 'হে সিংহাসনের মালিক, সুহায়ল আর
আমির যেন ধ্বংস না হয়!
যে মুখ আমি পছন্দ করি না, সে মুখের দিকে তাকাতে
আমাকে বাধ্য করা হয়েছে!
তারা হলো হিমায়র আর ইউহাবির।
আমাদের সমৃদ্ধি কিংবদন্তী হয়েছিল
আর কাল আমাদের কি হাল করেছে এখান

১. ইসমাঈল (আ)-এর কথা বলা হয়েছে।

অশ্রু ঝরে এক শহরের জন্য কান্নায়,
যে শহরে আছে পবিত্র ঘর এক, আছে বহু পবিত্র স্থান,
এক প্রার্থনা-গৃহের জন্য কান্না, তার বনকপোত অক্ষত,
নিরাপদে বাস করে, সঙ্গে অগণিত চড়ুই পাখি।
বুনো জানোয়ার এখানে এসে পোষ মানে, কেউ তার কোন ক্ষতি করে না,
কিন্তু এই পবিত্র স্থান ছেড়ে গেলেই সে সহজে যে কারো শিকার হতে
পারে।

বকর আর গুবশানের কথা মনে করে মক্কায় যেসব শহরবাসীকে পেছনে ফেলে রেখে এসেছিল, তাদের কথা মনে করে আমর ইবনে হারিস বলেছেন ঃ

সামনে চলো হে মানুষ, সময় আসবে
একদিন তোমরা আর যেতে পারবে না।
জানোয়ারদের তাড়া দাও, বল্গা ঢিলে করে দাও,
মৃত্যু আসার আগে, যা করবার করে নাও।
আমরা তোমাদের মত মানুষ ছিলাম, ভাগ্য আমাদের বদলে দিয়েছে
একদা আমরা যা ছিলাম, তোমরাও তাই হবে।

কা'বাঘরের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় খুজাআর স্বেচ্ছাচার

তারপর খুজাআ-র গুবশান বানু, বকর ইবনে আবদে মানাতের স্থলে কা'বাঘরের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হাতে নিয়েছিল। গুবশানের আমর ইবনে আল-হারিস আল-গুবশানি এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। কুরায়শরা সে সময় এদিকে সেদিকে ছড়ানো ছিল, তাঁদের তাঁবু ও ঘর বাড়ি বানু কিনানার লোকজনের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছিল। সুতরাং খুজাআ কা'বাঘরের অধিকারে এল এবং তারা তা নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল বংশানুক্রমে। সর্বশেষ খুজাআ ছিল হুলায়ল ইবনে হাবাশিয়া ইবনে সালুল ইবনে কাব ইবনে আমর আল খুজাই।

কুসাই ইবনে কিলাবের সঙ্গে হুলায়লের কন্যা হুব্বার বিবাহ

কুসাই ইবনে কিলাব হুলায়ল ইবনে হাবশিয়ার কাছে তার কন্যা হুব্বার পাণি প্রার্থনা করলেন। হুলায়ল সম্মতি দিলেন। বিয়ে হলো।

হুব্বা তাঁকে দিলেন চার পুত্র—আব্দ আদ্দার, আবদ মনাফ, আবদুল উজ্জা এবং আব্দ। কুসাই-এর ছেলে মেয়েরা ছড়িয়ে পড়ল দেশ-বিদেশে, অনেক সম্পত্তি হলো তাদের, অনেক সুনাম। এইসব দেখার পর ইন্তেকাল করল হুলায়ল। তখন কুসাই মনে করলেন, এখন কা'বাঘর নিয়ন্ত্রণের জন্য খুজাআ এবং বানু বকরের চেয়ে তার দাবির জোর বেশী। আর কুরায়শরা হলো ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (আ)-এর সবচেয়ে অভিজাত সন্তান এবং তাঁদের সন্তানদের বিশুদ্ধতম বংশধর। কুসাই কুরায়শ আর বানু কিনানার লোকজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। খুজাআ আর বানু বকরকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করার জন্য তাদের পরামর্শ দিলেন। তারা রাযী হলেন।

কিলাবের মৃত্যুর পর উদরা ইবনে সাদ ইবনে জায়দ বংশের রাবিআ ইবনে হারাম মক্কায় এলেন। তিনি বিয়ে করলেন ফাতিমা বিনতে সাদ ইবনে সায়ালকে। (জহুরা তখন বড়ো হয়ে গেছে। সে পেছনেই থেকে গেল। তখন কুসাই কিন্তু মাত্র মায়ের দুধ ছেড়েছে।) ফাতিমাকে রাবিআ আপন দেশে নিয়ে গেল। ফাতিমা কুসাইকে নিয়ে গেল সঙ্গে করে। ফাতিমার গর্ভে পরে রিজাহ্ জন্ম গ্রহণ করে। কুসাই বড়ো হলে পরে ফিরে এলেন মক্কায় এবং ওখানেই বসবাস করতে লাগলেন।

কাজেই তার গোত্রের লোকজন যখন তাঁকে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করার জন্য বলল তখন কুসাই চিঠি লিখলেন ভাই রিজাহর কাছে। রিজাহ এবং কুসাই-র এক মা। ভাই রিজাহ-কে পত্র লিখে মক্কায় এসে তাকে সাহায্য করার জন্য ডাক দিলেন। তখন রিজাহ রওয়ানা হয়ে গেলেন। সঙ্গে অর্ধ-ভ্রাতা হুন, মাহমুদ এবং জুলহুমা। এরা সবাই রাবিআ-র পুত্র কিন্তু ফাতিমার গর্ভের নয়। সঙ্গে আরো এল কিছু আরব হাজী খুজাআ বংশের। এরা সবাই সমর্থন করতে রাযী হলো।

খুজাআ বলেন, হুলায়ল ইবনে হাবশিয়া যখন দেখল কুসাই-র কন্যার সন্তান-সন্ততি দ্রুত বাড়ছে তখন কুসাইকে বলল কা'বাঘর নিয়ন্ত্রণ করার আর মক্কা শাসন করার খুজাআর চেয়ে তোমার হক বেশী। আর এইজন্যই

নাকি কুসাই এবম্বিধ আচরণ করেছিলেন। এই কাহিনী অবশ্য অন্য কোন সূত্র থেকে আমরা শুনিনি। এর সত্য মিথ্যা একমাত্র আল্লাহ্ জানেন। (তাবারির ভাষ্য ঃ যখন মক্কার সমস্ত লোক জমায়েত হলো এবং হজ্ব সমাধা করল এবং মিনা থেকে ফিরে এল তখন কুসাই কুরায়শদের মধ্যে তার নিজস্ব বংশ বানু কিনানার এবং কুদায়ার সব অনুসারী আর তার মালপত্র নিয়ে এক স্থানে জড়ো হলো এবং বাকি সবাইকে বিদায় করে দিল।

হজ্বযাত্রীদের উপর আল-গাউসের কর্তৃত্ব

আল-গাউস ইবনে মার ইবনে উদ ইবনে আল-ইয়াস ইবনে মুদার হজ্বযাত্রীদের আরাফা ত্যাগের অনুমতি প্রদান করতেন। এই কাজ তাঁর সন্তান-সন্ততির উপর বর্তিয়েছিল। তিনি এবং তাঁর সন্তানদের সুফা বলা হতো। আল-গাউস কাজটি করতেন কারণ তার আম্মা জুরহুম বংশ-সঞ্জাত ছিলেন। তিনি বন্ধ্যা ছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে মানত করেছিলেন, আল্লাহ তাঁকে একটি পুত্র সন্তান দিলে তিনি তাকে কা'বাঘরের খেদমতগার হিসেবে দান করবেন, যাতে সে কা'বাঘরের দেখাশুনা করতে পারে। কালে তিনি আল-গাউসের জন্ম দিলেন। আল-গাউস ছেলেবেলায় তার মাতুলদের সঙ্গে কা'বাঘরের দেখাশুনা করতো এবং কা'বাঘরে তার দায়িত্বগুণে আরাফা ত্যাগের জন্য হজ্ব যাত্রীদের হুকুম দিত। তার পুত্রগণও সেই দায়িত্ব তাদের নিষ্কৃতির পূর্ব পর্যন্ত পালন করতো।

মাতার মানত পূরণ উপলক্ষে মার ইবনে উদ বলেছেন ঃ
ইয়া আল্লা, আমার এক পুত্রকে আমি
মহান মক্কার এক খাদেম বানিয়েছি।
আমার মানত পূর্ণ হলো, আমাকে দোয়া করো,
তাকে সব মানুষের সেরা করে তার পুণ্য আমাকে দাও।

লোকজনদের বিদায় করে পরে আল-গাউস নাকি বলতেন ঃ

ইয়া আল্লা, আমি কেবল অন্যের আদর্শ অনুসরণ করছি।
যদি ভুল হয় সে ভুল কুদায়ার।

ইয়াহিয়া ইবনে আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আল-জুবায়র তাঁর আব্বা আব্বাদের বরাত দিয়ে বলেছেন: সুফা হজ্ব যাত্রীদের আরাফা থেকে বিদায় করত এবং মিনা ত্যাগের সময় তাদের অনুমতি প্রদান করত। বিদায়ের দিন এলে তারা আসত পাথর নিক্ষেপ করতে। তখন সুফার একজন লোক তাদের পাথর নিক্ষেপ করত। সে পাথর নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত অন্য কেউ তা করত না। যাদের খুব তাড়া থাকত, তারা তার কাছে এসে বলত: উঠো, পাথর নিক্ষেপ করো। তুমি পাথর মারলে তোমার সঙ্গে আমরাও মারব। তখন সে বলত, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সূর্য না ডোবা পর্যন্ত তা আমি করতে পারব না।' যারা তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাইত, তারা তখন তার দিকেই পাথর মারত। তাড়াতাড়ি করার জন্য বলত, 'আরে, উঠো না, পাথর মারো।' কিন্তু সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত সে কিছুই করত না। সূর্য অস্ত গেলে সে উঠত, পাথর নিক্ষেপ করত এবং তার সঙ্গে অন্যরাও পাথর নিক্ষেপ করত।

সবার পাথর নিক্ষেপ সারা হলে যখন তারা মিনা ত্যাগ করতে চাইত তখন সুফা পাহাড়ের দুই দিক ঘিরে রাখত আর সবাইকে আটকিয়ে রাখত। সবাই বলত: 'বিদায়ের হুকুম দিন সুফা।' তারা না যাওয়া পর্যন্ত কেউ যেতো না। সুফা চলে গেলে পরে সবাই নিজেদের পথে যেতে পারত। সুফাদের শেষ দিন পর্যন্ত এই রীতি চালু ছিল। তাদের পরে পরবর্তী আত্মীয়ের উপর সে দায়িত্ব পড়ত। তারা সাফওয়ান ইবনে আল-হারিস ইবনে সিজনার পরিবারের বানু সাদের লোক ছিলেন। সাফওয়ানই হজ্ব যাত্রীদের আরাফা ত্যাগের অনুমতি দিতেন। ইসলামের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত এই অধিকার প্রচলিত ছিল। এই ধারার শেষ ব্যক্তি ছিলেন কারিব ইবনে সাফওয়ান।

আউস ইবনে তামিম ইবনে মাগরা আস-সাদি বলেন:

হাজীরা আরাফা ত্যাগ করত না,
যতক্ষণ না বলত, 'অনুমতি দিন হে সাফওয়ান।'

আদওয়ান এবং মুযদালিফায় বিদায় অনুষ্ঠান

হুরসান ইবনে আমর আদওয়ানি ছিলেন। তাঁকে যু-ইসবাও বলা হতো, কারণ তার একটা আঙ্গুল ছিল না। তিনি বলেন ঃ

আদওয়ান বংশের জন্য একটা বাহানা দাও।
কারণ তারা পৃথিবীর সর্প ছিল।[১]
একজন অন্যজনের প্রতি অন্যায় আচরণ করত এরা,
কেউ কাউকে ছাড়ত না।
কেউ আবার ছিল যুবরাজের মতো,
ওয়াদা রক্ষা করত বিশ্বস্ততার সাথে।
কেউ হজ্বযাত্রীদের বিদায়ের অনুমতি দিত
প্রথা আর ঐশ্বরিক আদেশে।
এদের মধ্যে এক বিচারক রায় দিতেন
তার রায় কোনদিন রদ হতো না।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে জিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাক্কাই আমাকে বলেছেন ঃ মুযদালিফা ত্যাগের অনুমতি প্রদানের মালিক ছিলেন আদওয়ান। কাজেই সেখানেও এই অধিকার বংশ পরম্পরা ছিল ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত। এই সিড়ির শেষ লোক ছিলেন আবু সাইয়ারা উমায়লা ইবনে আল-আজাল। তাঁর সম্বন্ধে কোন এক কবি বলেন ঃ

আমরা আবু সাইয়ারাকে রক্ষা করেছি
রক্ষা করেছি তার মক্কেল বানু ফাজারাকে
তারপর তার গাধা নিরাপদে নিয়ে গেল
এবং মক্কার দিকে মুখ করে প্রতিপালকের কাছে সে
প্রার্থনা করল।

১. যুদ্ধে তাদের ব্যবহার করা হতো। খুব ধূর্ত আর অবিশ্বাসী ছিল এরা।

আবূ সাইয়ারা একটা মাদী-গাধার পিঠে বসে হাজীদের বিদায় করতেন। এইজন্য বলা—তার গাধা নিরাপদে নিয়ে গেল।

আমির ইবনে জাকির ইবনে আমর ইবনে আইয়ায ইবনে ইয়াশকুর ইবনে আদওয়ান

'এক বিচারক রায় দিতেন' বলতে একেই বুঝানো হয়েছে। আরবরা সমস্ত কঠিন ও জটিল মামলা নিষ্পত্তির জন্য তাঁর কাছে আসত। ইনি যে রায় দিতেন সবাই তা মেনে নিত। একবার এক উভলিঙ্গ ব্যক্তি সম্বন্ধে একটি মামলা তাঁর কাছে এল। তাদের প্রশ্ন—আমরা এই লোক-টাকে কি বলব? পুরুষ না মেয়ে? এমন কঠিন মামলার সামনে ইতি-পূর্বে তিনি আর পড়েন নি। তিনি বললেন, একটু সময় দিন আমাকে। একটু অপেক্ষা করুন, আমি বিষয়টা ভেবেচিন্তে দেখি। কারণ আল্লাহ্র কসম! এর আগে এই রকম কোন প্রশ্ন আপনারা আমার কাছে আনেন নি।

ওরা সবাই অপেক্ষা করতে রাযী হলেন।

সারারাত বিনিদ্র কাটালেন বিচারক। উল্টে পাল্টে বিষয়টা বারবার চিন্তা করলেন। এর সবদিক ভেবে দেখলেন। কিন্তু কোন ফল হলো না, কোন সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হতে পারলেন না।

তাঁর এক ক্রীতদাসী ছিল। নাম সুখায়লা। তাঁর মেষ-দুম্বা চড়াতো সে। রোজ ভোরে সে যখন মেষ-দুম্বা নিয়ে বের হতো, তখন তিনি তাকে বিদ্রূপ করে বলতেন, 'আজ দেখি খুব সকাল-সকাল সুখায়লা।'

বিকেলে যখন সে ফিরত তখনও একই রকম বিদ্রূপ করে বলতেন, 'আজকে অনেক দেরী করে ফিরলে কিন্তু সুখায়লা।'

কারণ ভোরে রওয়ানা হতো সে দেরী করে। আবার ফিরতো সন্ধ্যার অনেক পরে, সবার শেষে।

সুখায়লা দেখল মনিব সারারাত ঘুমোন নি। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করেছেন। তখন সে জিজ্ঞেস করল, বিষয়টা কি।

রেগে গেলেন আমির, 'আপন কাজে যাও, বিরক্ত করো না। বিষয়টা কি তা শুনে তোমার কাজ নেই।'

কিন্তু মেয়েটা জিদ ধরল। বারবার বিরক্ত করতে লাগল। তখন বিচারক আমির মনে মনে ভাবলেন, বলেই দেখি না। বলা তো যায় না, হয়তো ও-ই কোন সমাধান বের করে দিতে পারে।

তিনি বললেন, 'ব্যাপারটা তোমাকে তাহলে বলি। এক উভলিঙ্গ লোক। তার ওয়ারিশ কে হবে, তার উপর আমার রায় দিতে হবে। ওকে আমি কি হিসেবে নেবো? পুরুষ না মেয়ে?[১] এখন আমি কি করব বুঝতে পারছি না। কোন পথ খুঁজে পাচ্ছি না।'

সুখায়লা বলল, 'এ আর কি এমন কঠিন কাজ। কোন্ দিক দিয়ে সে প্রস্রাব করে, তা দিয়ে ঠিক হবে সে পুরুষ না মেয়ে; ব্যস। বিচারক লাফিয়ে উঠলেন, 'এখন থেকে তুমি যত খুশি দেরী করো, তুমি আমায় বাঁচিয়েছ।

ভোর হলো। তিনি অপেক্ষমান লোকজনের কাছে এলেন এবং সুখায়লার কথামতো সিদ্ধান্ত দিলেন।

মক্কায় কুসাই ইবনে কিলাবের ক্ষমতা দখলের কাহিনীঃ কেমন করে কুরায়শদের তিনি ঐক্যবদ্ধ করলেন, এবং কুদাআ তাঁকে কি রকম সাহায্য করলেন তার বিবরণ

সে বছরও সূফা তাদের স্বভাবসুলভ আচরণ করল।

আরবরা নীরবে তা সহ্য করল। জুরহুম আর খুজাআদের হাতে ক্ষমতা ছিল। যখন তখন সহ্য করাই ছিল তাদের কর্তব্য। কুসাই তাদের কাছে এলেন। সঙ্গে কুরায়শ, কিনানা আর আল-আকাবার কুদাআ গোত্রের

১. সিদ্ধান্ত প্রয়োজন, কারণ পুরুষ হলে মেয়েলোকের দ্বিগুণ অংশ পাবে।

লোকজন। এসে বললেন, 'এই ক্ষমতার হক তোমাদের চেয়ে আমাদের বেশী' (তাবারির মতে, তারা এসে ঝগড়া করেছিল এবং তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল।) ভীষণ যুদ্ধ হলো দুই দলের মধ্যে অতঃপর। যুদ্ধে সুফা পরাজিত হলো। ক্ষমতা দখল করল কুসাই।

তখন খুজাআ আর বানু বকর তাদের দল ত্যাগ করল, কারণ তারা জানত, তিনিও ঠিক সুফার মতোই একই রকম বিধি-নিষেধ তাদের উপর আরোপ করবে। কা'বাঘর এবং মক্কার শাসনের ব্যাপারে সে তাদের মাঝখানে আসবেই। তারা দল ত্যাগ করল যখন তখন কুসাইও তাদের প্রতি বৈরীভাব প্রদর্শন করলেন এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য শক্তি সংগ্রহ করতে তৎপর হলেন। (তাবারির মতে, তার ভাই রিজাহ্ ইবনে রাবিআ কুদাআ থেকে সংগৃহীত সমস্ত লোকজন সহ তার পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন।) খুজাআ আর বানু বকর তাদের রুখে দাঁড়াল। ভীষণ যুদ্ধ হলো মক্কার এক উপত্যকায়। প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হলো দুই পক্ষের। উভয়পক্ষ তখন সন্ধি করতে সম্মত হলো। ঠিক হলো একজন আরব মধ্যস্থতা করবে। ইয়ামার ইবনে আউফ ইবনে কা'ব ইবনে আমির ইবনে লায়ত ইবনে বাক্‌র ইবনে আবদু মানাত ইবনে কিনানাকে ঠিক করল মধ্যস্থতার জন্য। ইয়ামার রায় দিলেন, কা'বাঘরের উপর কর্তৃত্বের ও মক্কা শাসনের দাবি খুজাআর চেয়ে কুসাইর বেশী। কাজেই যত রক্তপাত কুসাই ঘটিয়েছেন সব কাটা যাবে, তার জন্য কোন রক্তপণ কেউ দাবি করতে পারবে না। কুরায়শ, কিনানা এবং কুদাআর যত লোক খুজাআ হত্যা করেছে সবার জন্য খুজাআ এবং বানু বকরকে রক্তপণ দিতে হবে। এবং কা'বাঘর এবং মক্কা শাসনের ব্যাপারে কুসাইকে সমস্ত ক্ষমতা দিতে হবে। এরপর থেকে ইয়ামার ইবনে আউফের নাম হয়ে গেল আল-শাদ্দাখ। কারণ তিনি সমস্ত রক্তপণের দাবি নাকচ করে দিয়েছিলেন।

এমনি করে কুসাই মক্কার উপরে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর সমস্ত লোকজনকে নিজেদের এলাকা থেকে মক্কা নিয়ে এলেন। গোত্রের উপর এবং মক্কার লোকজনের প্রতি তিনি রাজার মতো ব্যবহার শুরু-

করলেন। সুতরাং সকলেই তাকে রাজা বলে মেনে নিল। তবে তিনি সমস্ত আরবদের তাদের প্রচলিত অধিকারের নিশ্চয়তা দিলেন, কারণ তিনি মনে করতেন এটা তাঁর কর্তব্য। এই কর্তব্যে রদবদল করার তাঁর কোন অধিকার নেই। সুতরাং সাফওয়ান আর আদনানের বংশের, গণকদের এবং মুররা ইবনে আউফকে তাদের প্রচলিত অধিকার ভোগ করতে দিলেন। ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত তারা সেসব অধিকার ভোগ করে আসছিল। ইসলাম আসার পর আল্লাহ্ তাদের সব অধিকারে ছেদ টেনে দিলেন।

বানু কা'ব ইবনে লুআই বংশের মধ্যে কুসাই সর্বপ্রথম রাজা হলেন। সবাই তাকে রাজা বলে মেনে নিয়েছিল এবং মান্য করত। তাঁর কাছে থাকত কা'বাঘরের চাবি, হাজীদের যমযম থেকে পানি প্রদানের অধিকার, হাজীদের খাওয়ানোর দায়িত্ব, দরবারে সভাপতিত্ব করার কাজ এবং যুদ্ধ পতাকা বিতরণের ক্ষমতা। তার হাতেই ছিল মক্কার সমস্ত সম্ভ্রম আর মর্যাদা। সমস্ত শহরকে কয়েকটি ভাগে তিনি বিভক্ত করে দিলেন নিজের লোকজনের মধ্যে এবং সমস্ত কুরায়শদের তাদের স্ব স্ব বাড়ীতে বসতি করার অধিকার দিলেন।

লোকে খুব জোর দিয়ে বলে যে, পবিত্র ঘরের আশেপাশে কেউ নাকি নিজেদের বাসাবাড়ির ভেতরের গাছ কর্তন করত না। কিন্তু কুসাই সেসব গাছ নিজের হাতে অথবা কোন সহকারী দিয়ে কেটে দিয়েছিলেন। কুরায়শরা তাকে বলতো 'ঐক্যকারী', কারণ তিনি সবাইকে একতাবদ্ধ করেছিলেন এবং সবাই তার রাজ্য শাসনকে শুভ বলে ভাবত। আর কুরায়শদের ব্যাপারে সব কাজ হতো তার নিজের বাড়ির ভেতরে। কোন মেয়ের বা ছেলের বিয়ে, কোন প্রকাশ্য ঘটনা নিয়ে আলোচনা অথবা কোন যুদ্ধ পতাকা বিতরণ, যাই হোক না কেন। সেখানে তাদেরই কোন লোকের সামনে এই সব বিষয়ে সুরাহা হতো। কোন মেয়ে বিবাহযোগ্যা হলে, তাঁর বাড়িতে এসে তাকে বধূ বেশ (দির) পরতে হতো। তার বাড়িতেই বধূবেশ মাথার দিকে কাটা হতো, সেখানে তা মাথা গলিয়ে তা পরতো এবং পরে আপন জনের কাছে যেত। কুরায়শদের মধ্যে তাঁর কর্তৃত্ব তাঁর

জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পরে ছিল এক ধর্মীয় আইনের মতো। কোনমতেই তা লঙ্ঘন করা হতো না। কোথায় কোন সভা হবে তার স্থান তিনি নিজেই ঠিক করতেন, ওখান থেকে কা'বাঘরে যাওয়ার জন্য একটা দরজা করে রাখতেন। ওইখানে বসে কুরায়শরা সকল বিষয়ে মীমাংসা করত।

আবদুল মালেক ইবনে রশিদ আমাকে বলেছে যে, তার আব্বা বলেছেন যে, তিনি আল-মাকসুরার প্রণেতা আস-সাইব ইবনে খাব্বাবকে বলতে শুনেছেন যে, তিনি খলীফা থাকাকালে উমর বিন খাত্তাবের কাছে একটা লোককে কুসাইর কাহিনী বলতে শুনেছেন। কেমন করে কুসাই কুরায়শদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, মক্কা থেকে বহিষ্কৃত করেছিলেন খুজাআ আর বানু বকরকে, কেমন করে কা'বাঘর আর মক্কার কর্তৃত্ব তিনি অর্জন করেছিলেন, সেইসব বৃত্তান্ত। উমর প্রতিবাদ করার বা তাঁকে বাধা দেবার কোন চেষ্টা করেন নি। (তাবারি ঃ মক্কায় কুসাইর বিপুল সম্মান ছিল। তাঁর ক্ষমতা সম্বন্ধে কেউ কোনদিন প্রশ্ন করে নি। সমস্ত হজ্ব-প্রথা তিনি অপরিবর্তিত রেখেছিলেন। কারণ তিনি একে এক ধর্মীয় বিষয়ের মত মানতেন। সুফাদের খবরদারি চলতে দেওয়া হয়েছিল। তারপর ওয়ারিশ সূত্রে তাদের কর্তৃত্ব সাফওয়ান ইবনে আল-হারিস ইবনে সিজনার পরিবারের সময় ছিন্ন হয়ে যায়। ইসলামের আবির্ভাবের পর আল্লাহ্ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান রদ করে দেন—কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত আদওয়ান বানু মালিক ইবনে কিনানা এবং মুররা ইবনে আউফ এই কাজ করে যাচ্ছিলেন।)

কুসাইর যুদ্ধ-কর্ম শেষ হয়ে গেলে পরে তার ভাই রিজাহ্ তাঁর দেশীয় সব লোকজন নিয়ে আপন দেশে চলে যান। কুসাইর ডাকে তাঁর সাড়া দেওয়া সম্বন্ধে তিনি নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন।

কুসাইর কাছ থেকে দূত এল
বলল, 'বন্ধুর ডাকে সাড়া দাও,'
অমনি ঘোড়া নিয়ে রওয়ানা হলাম
আলসেমি আর ভাঙ্গামন ঝেড়ে ফেলে দিলাম।

সারারাত চললাম, সকাল তক,
দিনে লুকিয়ে থেকেছি আক্রমণের ভয়ে।
আমাদের তেজী ঘোড়া পানিতে ছোঁ মারা পাখির মতো বেগবান
দ্রুত কুসাইর ডাকে আমরা জবাব দিয়েছি
সির আর দুই আসমাদ[১] থেকে লোক সংগ্রহ করেছি আমরা
সব গোত্র থেকে একটি একটি করে দল।
কি সুন্দর অশ্বারোহী বাহিনী ছিল তারা সে রাতে,
সহস্রাধিক, দ্রুত, সমতালী!
যখন তারা আল আসজাদের পাশ কেটে গেল
মুসতানাখ থেকে সোজা পথ ধরল
ওয়ারীকানের কোণ বেয়ে গেল
আল-আরজের পাশ দিয়ে যেতে ওখানে একদল তাঁবু গাড়ল,
কাঁটাঝোপের পাশ দিয়ে গেল তাদের সাফ করল না,
ছুটল দীর্ঘ রাত্রি ধরে মার থেকে।
অশ্ব শাবককে তাদের মায়ের কাছে এনে দিয়েছি
যাতে হ্রেষা তীক্ষ্ন না হয়,
মক্কায় এসে গোত্রের পর গোত্র
আমরা দমন করেছি।
তরবারি দিয়ে ওদের আমরা আঘাত করেছি,
প্রতি আঘাতে ওদের বেহুঁশ করেছি।
আমাদের অশ্ব-খুরের নিচে ওদের পিষে দলেছি,
সবল যেমন পিষে মারে দুর্বলেরে, অসহায়েরে।
খুজাআদের তাদের আপন ভূমে হত্যা করেছি,
বকরদের সবাইকে মেরেছি দলকে দল।
আল্লাহ্‌র ভূমি থেকে বিতাড়িত করেছি তাদের,
এমন সুফলা দেশ তাদের আমরা ভোগ করতে দেবো না।

১. পাহাড় না গোত্র সে বিষয়ে বিতর্ক আছে।

লোহার শিকলে বেঁধে রেখেছি তাদের,
সব গোত্রের উপর প্রতিহিংসা তৃষ্ণা মিটিয়েছি আমরা।

কুসাইর আমন্ত্রণ এবং তাদের সাড়া দেওয়া সম্বন্ধে সালাবা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবিয়ান ইবনে আল-হারিস ইবনে সাদ হুদায়ম আল-কুদাই বলেন ঃ

সুঠাম কালো দীর্ঘ অশ্বে চড়ে আমরা ছুটেছি
বালুর পাহাড় থেকে, আল-জিনাবের বালুর পাহাড় থেকে
তিহামার নিম্নভূমে, শত্রুকে পেয়েছি
মরুর বন্ধ্যা নিচু জমিতে।
আর মেয়ে মানুষ সুফা-রা
তলোয়ারের ভয়ে ঘর ছেড়ে ভেগে গেল।
আর আলির ছেলেরা আমাদের দেখে
ঝটিতে তলোয়ার খুলে দাঁড়াল, উট যেমন ঘরের পানে চলে দ্রুতগতি।

কুসাই ইবনে কিলাব বলেছেন ঃ

ত্রাণকর্তা বানু লুআইর পুত্র আমি
মক্কাতেই ঘর, মক্কাতেই মানুষ হয়েছি।
আমার সমভূমিকে মাআজ চিনে
মারওয়াতেই আমার আনন্দ।
সে দেশ কখনো আমি জয় করতাম না
যদি না নাবিত আর কায়দরের সন্তানেরা ওখানে বাস করতো।
রিজাহ্ আমার সহায়ক, তাকে দিয়ে আমি বড়,
যতদিন বেঁচে আছি, কোন অন্যায়কে ভয় পাই না আমি।

আপন দেশে রিজাহ্ প্রতিষ্ঠিত হলে পরে আল্লাহ্ তার আর হুনদের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি করল। (এরাই এখনকার উদরার দুইটি জাতি)। নিজ দেশে তিনি যখন এলেন তখন রিজাহ্ আর নাহ্দ ইবনে জায়দ ও

হাউতাকা ইবনে আসলুমের মধ্যে খুব ঝগড়া চলছিল। এরা কুদাআর দুটা জাতি ছিল। তিনি তাদের ভেতরে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন, যাতে তারা ইয়ামনে থাকে, যাতে কুদাআ-দের দেশ ত্যাগ করে আসে। তাই তারা এখনো ওখানে আছে। এদিকে কুদাআর সঙ্গে কুসাইর সদভাব ছিল। তিনি চাইতেন তাদের বংশবৃদ্ধি হোক: নিজের দেশে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাস করুক। কারণ রিজাহ্-র সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল, তার সাহায্যের ডাকে তিনি সাড়া দিয়েছিলেন বলে তাঁর প্রতি তাঁর শুভেচ্ছা ছিল। রিজাহ্ তাদের প্রতি যে ব্যবহার করেছিল তা কুসাই পছন্দ করেন নি। তাই তিনি বলেছেন:

রিজাহ্কে কেউ গিয়ে বলুক
দুটো কারণে তার দোষ দিই আমি,
আমি তোমাকে দোষ দিই বানু নাহদা বিন জায়দের জন্য-
কারণ তুমি তাদের আর আমার মধ্যে বাধা এনেছো,
আর দোষ দিই হাউতাকা বিন আসলুমের জন্য. একথা সত্য
তাদের প্রতি যে খারাপ ব্যবহার করে, সে আমার প্রতিও খারাপ ব্যবহার করে।

বুড়ো ও দুর্বল হয়ে গেলে পরে কুসাই আবদুদ- দারের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তিনি তাঁর প্রথম সন্তান ছিলেন। (তাবারির মতে: আবদুদ দার দুর্বল ছিলেন)। কিন্তু পিতার জীবদ্দশাতেই আবদু মানাফ বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন এবং আবদুল উজ্জা ও আব্দের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যা করবার তা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ্র কসম, তুমি আমার পুত্র, আমি তোমাকে অন্য সকলের সমকক্ষ করে দেবো। যদিও তোমার চেয়ে তাদের খ্যাতি অনেক বেশি। তুমি কা'বাঘর খুলে না দিলে কেউ ওখানে ঢুকতে পারবে না। তুমি ছাড়া আর কেউ কুরায়শদের হাতে যুদ্ধ-পতাকা তুলে দিতে পারবে না। তুমি অনুমতি না দিলে মক্কায় কেউ পানি পান করতে পারবে না। তুমি খাবার না দিলে মক্কায় কোন হাজী খেতে পারবে না। আর তোমার ঘর ছাড়া অন্য কোথাও বসে কুরায়শরা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না।'

তিনি তাঁকে নিজের বাড়ি দিয়ে গেলেন। এখানে বসেই কুরায়শরা তাদের বিষয়-আশয় নিষ্পত্তি করতে পারত। আর দিলেন উপরোক্ত অধিকার-সমূহ।

কুরায়শরা কুসাইকে সমস্ত উৎসব-পর্বে তাদের সম্পত্তি থেকে একটা কর দিত। তার নাম ছিল রিফাদা। এই অর্থ দিয়ে তিনি যে সব হাজীরা নিজেদের খাবার যোগাড় করতে পারতেন না, তাদের খাবারের বন্দোবস্ত করতেন। কুসাই কুরায়শদের প্রতি এটাকে একটা কর্তব্য বলে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন: 'তোমরা হলে আল্লাহ্‌র ঘরের প্রতিবেশী, তাঁর ইবাদত-গৃহের মানুষ, তাঁর পবিত্র ঘরের লোক। হাজীরা হলেন আল্লাহ্‌র মেহমান এবং তাঁর ইবাদত-গৃহের দর্শনার্থী। কাজেই তাঁরা তোমাদের ঔদার্যের সর্বোচ্চ দাবিদার। কাজেই তাঁদের হজের সময় তাঁদের খাবার দেবে, পানি দেবে, তোমার এলাকা ত্যাগ না করা পর্যন্ত।'

কাজেই সবাই তাদের উট-দুম্বার জন্য তাঁকে প্রতি বছর একটা কর দিত। ওখান থেকে তিনি হাজীদের মিনাতে অবস্থানের সময় আহার যোগাতেন। আইয়ামে জাহিলিয়াতের সময় থেকে ইসলামের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত সবাই তার এই হুকুম মেনে চলত।

আমার আব্বা ইসহাক ইবনে ইয়াসার আল-হাসান ইবনে মুহম্মদ ইবনে আলী ইবনে আবু তালিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত আবদুদ্-দারের প্রতি কুসাইর বাণীর কথা শুনেছেন। আব্বা সে কথা আমাকে বলেছেন। আব্বা বলেছেন, 'আমি তাঁকে কথাগুলো নুবাই ইবনে ওয়াহাব, ইবনে আমির, ইবনে ইকরিমা, ইবনে আমির, ইবনে হাশিম, ইবনে আবদু মানাফ, ইবনে আবু যার, ইবনে কুসাই নামে বানু আবু জারের একজন লোকের কাছে বলতে শুনেছি। আল-হাসান বলেছেন: 'তাঁর লোকজনের উপর তাঁর যত অধিকার ছিল সব কুসাই তাঁকে দান করে গিয়েছিলেন। কুসাইর কোন কথায় বা কাজে কেউ প্রতিবাদ করত না, তাঁকে রাজ্যচ্যুত করার কথাও কেউ ভাবে নি।'

কুসাইর পরে কুরায়শদের মধ্যে অন্তর্বিবাদ এবং সুবাসিতদের জোট

কুসাইর মৃত্যুর পর মক্কার জনগণের উপর তার ছেলেরা কর্তৃত্ব অর্জন করে। তাঁরা নিজের গোত্রের জন্য জায়গা রেখে সমস্ত মক্কাকে অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত করে দেন। এইসব ভাগ তাঁরা নিজেদের লোকজনের নামে বরাদ্দ করেন, অন্যান্য মিত্রদের নামেও বরাদ্দ করে বিক্রি করেন। কুরায়শরা কোন বাদ-বিসম্বাদ না করে তাঁদের এই ভাগ-বিতরণে অংশ গ্রহণ করলেন। তারপর আবদ্ মানাফের পুত্ররা, আবদ্ শামস, হাশিম, আল-মুত্তালিব ও নওফেল—কুসাই আবদুদ দারকে যে সব ক্ষমতা দিয়েছিলেন, যে ক্ষমতা আবদুদ্ দারের সন্তানেরা ভোগ করছিলেন, তা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য তৈরী হলো। এই ক্ষমতার তালিকা পূর্বে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা ভাবলেন, এসব ক্ষমতায় ও'দের চেয়ে তাঁদের অধিকার বেশি, কারণ তাঁরা তাঁদের চেয়ে সব দিক দিয়ে উন্নত, লোকজনের কাছে তাঁদের সম্মানও বেশি। এই বিবাদের ফলে কুরায়শদের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দিল। একদল যোগ দিল আবদ্ মানাফের দলে. অন্য দল বানূ আবদুদ্ দারের দলে। প্রথমোক্ত দল মনে করতেন, নতুন দাবিদারদের দাবির জোর ও যুক্তি বেশি। শেষোক্ত দলের যুক্তি ছিল, কুসাই তাদের যে ক্ষমতা বিশেষ একটি শাখা-কে দিয়ে গেছেন, তা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া উচিত নয়।

বানূ আবদ্ মানাফের নেতা ছিলেন আবদ্ শামস, কারণ তিনিই ছিলেন পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। বানূ আবদুদ্ দারের নেতা ছিলেন আমির ইবনে হাশিম, ইবনে আবদ্ মানাফ ইবনে আবদুদ্ দার। বানূ আবদ্ মানাফের সঙ্গে ছিল বানূ আসাদ ইবনে আবদুল উজ্জা ইবনে কুসাই, বানূ জুহরা ইবনে কিলাব, বানূ তায়ম ইবনে মুররা ইবনে কা'ব এবং বানূ আল-হারিস ইবনে ফিহ্র ইবনে মালিক ইবনে আন-নাদর। আর বানূ আবদুদ্ দারের সঙ্গে ছিল বানূ মাখজুম ইবনে ইয়াকাজা ইবনে মুররা, বানূ সাহ্ম ইবনে আমর ইবনে হুসায়স ইবনে কা'ব, বানূ

জুমাহ ইবনে আমর ইবনে হুসায়স ইবনে কা'ব এবং বানু আদি ইবনে কা'ব। নিরপেক্ষ ছিলেন আমির ইবনে লুসাই এবং মুহারিব ইবনে ফিহ্র।

তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হলো, যতদিন সমুদ্র গুল্মলতা ভিজিয়ে রাখবে ততদিন কেউ কাউকে ত্যাগ করবে না, কেউ কারো সঙ্গে বেঈমানি করবে না। বানু আবদু মানাফ একটা গামলায় ভর্তি করে নিয়ে এল আতর (ওরা বলে গোত্রের মেয়েরা নাকি তা নিয়ে এসেছিল) এবং তা রাখল কা'বাঘরের পাশে মসজিদে তাদের মিত্রদের জন্য। তারপর তারা সবাই তাতে হাত ডুবাল, তারা এবং তাদের মিত্ররা এবং পবিত্র শপথ উচ্চারণ করল। এরপর তারা কা'বাঘরে ঘষে ঘষে হাত মুছল প্রতিজ্ঞার গাম্ভীর্যকে আরো শক্তি করার জন্য। এইজন্যই তাদের 'সুবাসিত দল' বলা হয়।

অন্য পক্ষও কা'বাঘরে অনুরূপ শপথ গ্রহণ করে। তাদের বলা হয় মিত্রদল। গোত্রগুলো অতঃপর কয়েকটি দলে বিভক্ত হলো, বিভিন্ন দলের মধ্যে আবার সম্পর্ক স্থাপিত হলো। বানু আবদু মানাফকে যোগ করা হলো বানু সাহ্মের সাথে। বানু আসাদকে বানু আবদুদ দারের সাথে। জুহরাকে লাগানো হলো বানু জুমাহ্-র সাথে। বানু তায়েম যোগ দিল বানু মাখজুমের সাথে আর বানু আল-হারিস আদি ইবনে কাবের সঙ্গে। তারা আদেশ দিল, যে দলকে বিরোধী যে দলের সাথে লাগানো হয়েছে তারা তাদের নিশ্চিহ্ন করবে।

এমনি করে সবাই যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো, তখন হঠাৎ সবাই কি মনে করে যেন শান্তি স্থাপনের দাবি করে বসল। শর্ত ছিল আবদু মানাফের কাছে থাকবে হাজীদের পানি দেওয়া আর তার জন্য কর আদায়ের ক্ষমতা এবং কা'বাঘরে প্রবেশ, যুদ্ধের পতাকা দান এবং দরবার কক্ষ আগের মতো সবই আবদুদ্ দারের কাছে। এই বন্দোবস্ত দুই পক্ষেরই মনোপূত হলো। দুপক্ষই তা মেনে নিল। অতএব যুদ্ধ আর হলো না। আল্লাহ্ কর্তৃক ইসলাম আনয়নের পূর্ব পর্যন্ত এই বন্দোবস্ত বলবৎ ছিল।

তারপর রসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ আইয়্যামে জাহিলিয়াতে যে মৈত্রী ছিল, ইসলাম তা পোক্ত করল।

ফুদুলদের[১] মৈত্রী

জিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাক্কাই আমাকে বলেছেন, তিনি নিম্নোক্ত বিবরণ ইবনে ইসহাকের কাছ থেকে পেয়েছেনঃ কুরাইশ বংশের সমস্ত দল স্থির করল তারা একটা চুক্তি সম্পাদন করবে। এই উদ্দেশ্যে তারা মিলিত হলো আবদুল্লাহ ইবনে জুদান ইবনে আমর ইবনে কা'ব ইবনে সা'দ ইবনে তায়ম ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লুআই-এর ঘরে। ওখানে মিলিত হওয়ার কারণ আবদুল্লাহ বয়সে সকলের বড় ছিলেন এবং সমাজে তাঁর প্রচুর সুনাম ছিল। তাঁর সঙ্গে যারা ঐকমত্যে পেঁৗছেছিলেন তাঁরা হলেন বানু হাশিম বানু আল-মুত্তালিব, আসাদ ইবনে আবদুল উজ্জা, জুহরা ইবনে কিলাব এবং তায়ম ইবনে মুররা। এই পবিত্র অঙ্গীকারে তারা চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন যে তাঁরা যদি দেখেন যে, মক্কার আদিবাসী অথবা বাইরের কেউ কারো কাছ থেকে অন্যায়ভাবে কিছু নিয়ে গেছে তাহলে তাঁরা অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে তার পক্ষ অবলম্বন করবে এবং চোরাই বস্তু তাকে উদ্ধার করে দেবে। কুরায়শরা এই মৈত্রী চুক্তির নাম দিয়েছিলেন 'ফুদুলদের মৈত্রী'।

মুহম্মদ ইবনে জায়দ ইবনে আল মুহাজির ইবনে কুনফুদ আত-তায়মি আমাকে বলেছেন যে, তিনি তাল্হা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আউফ আল-জুহ্রিকে বলতে শুনেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে জুদানের বাড়িতে আমি এক চুক্তির জন্ম প্রত্যক্ষ করেছি, অংসখ্য উটের বিনিময়েও আমি তা বদল করতে পারব না, ইসলামের সময়ে এই চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করতে আমন্ত্রিত হলে আমি তা করব।

১. ফুদুল মানে কেউ কেউ বলেন অন্যায়কারীকে চোরাই মাল রাখতে না দেওয়া। কেউ বলেন, আবর্জনার উচ্ছিষ্ট।

ইয়াজিদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উসামা ইবনে আল-হাদি আল-লায়তি আমাকে বলেছেন যে মুহম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আল-হারিস আত-তায়মি তাঁকে বলেছেন, যুল মারওয়াতে কিছু সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ ছিল আল হুসায়ন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব এবং আল ওয়ালিদ ইবনে উতবা ইবনে আবু সুফিয়ানের মধ্যে। তখন আল-ওয়ালিদ ছিলেন মদীনার শাসনকর্তা। তাঁর চাচা মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান তাঁকে সে পদে নিয়োগ করেছিলেন। আল-ওয়ালিদ কৌশলে আল হুসায়নকে তাঁর কিছু অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। কারণ শাসনকর্তা হিসাবে সে ক্ষমতা তাঁর ছিল। হুসায়ন তাঁকে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আমার প্রতি আপনার সুবিচার করতেই হবে। যদি না করেন, তাহলে আমি তলোয়ার নিয়ে রসূলুল্লাহর মসজিদে যাবো, ফুদুল মৈত্রীকে এর বিহিত করতে বলব।

তখন আবদুল্লাহ ইবনে আল-জুবায়র ছিলেন আল-ওয়ালিদের কাছে। তিনি বললেন, 'আমিও আল্লাহ্‌র নামে কসম খাচ্ছি, যদি সে ফুদুল মৈত্রীর কাছে সাহায্যের জন্য যায়, তাহলে আমিও তলোয়ার ধরব, ওর পাশে দাঁড়াব, ওর প্রতি সুবিচার না করা পর্যন্ত ওকে সাহায্য করব অথবা মরতে হয় দুজনেই একসঙ্গে মরব।

এই সংবাদ গেল আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ইবনে নওফেল আল-জুহ্‌রি এবং আবদুর রহমান ইবনে উসমান ইবনে উবায়দুল্লাহ আত্-তায়মির কাছে। তাঁরাও একই কথা বললেন। সুবিচার করা না হলে তাঁরাও তলোয়ার হাতে নেবেন। আল-ওয়ালিদ তখন বুঝতে পারলেন, সত্যিই অন্যায় হয়ে গেছে। তিনি আল-হুসায়নকে খুশি করে দিলেন, মিটমাট করে দিলেন।

একই ইয়াজিদ একই সূত্রের বরাতে আমাকে বলেছেন যে, কুরায়শদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী লোক ছিলেন মুহম্মদ ইবনে জুবায়র ইবনে মুতিম ইবনে আদিই ইবনে নওফেল ইবনে আবদু মানাফ। ইনি আবদুল

মালিক ইবনে মারওয়ান ইবনে আল-হাকামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আবদুল মালিক তখন সবেমাত্র ইবনুল জুবায়রকে হত্যা করেছেন এবং সব লোক তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

আবদুল মালিক তাঁকে বললেন, 'আপনি আবু সাঈদ, আপনারা আর আমরা একই ফুদুল মৈত্রীর লোক নই? আমি আবদু শামস ইবনে আবদু মানাফ নই? আর আপনি বানু নওফেল ইবনে আবদু মানাফের লোক নন?'

তিনি বললেন, 'সে তো আপনিই ভাল জানেন।'

আবদুল মালিক বললেন, 'না, আপনি বলেন আবু সাঈদ। যা সত্য তা বলেন।'

তিনি বললেন, 'না, আল্লাহ্র কসম, একথা সত্য নয়। আপনারা আর আমরা মৈত্রী থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম।'

'সত্য, আপনি সত্য বলছেন।' আবদুল মালিক বললেন।

হাশিম ইবনে আবদু মানাফ হাজীদের খাবার ও পানি সরবরাহ তদারক করতেন। কারণ আবদু শামস বাইরে বাইরে খুব ঘুরে বেড়াতেন। মক্কায় তাঁকে একদম পাওয়াই যেতো না। তাছাড়া মানুষ ছিলেন গরীব, অথচ পরিবার ছিল বিরাট বড়। আর হাশিমের অবস্থা ভাল ছিল। বলা হয়ে থাকে, হাজীরা এলে তিনি উঠে কুরায়শদের বলতেন :

'আপনারা হলেন আল্লাহ্র প্রতিবেশী, তাঁর ইবাদত-ঘরের মানুষ। এই মহোৎসবে আল্লাহ্র ঘরের দর্শনার্থী আসেন আপনাদের কাছে, আর হাজী আসেন কা'বাঘরে। তাঁরা আল্লাহ্র মেহমান, তাঁর মেহমান বলেই তাঁদের আপনার দরাজ-দিলের উপর দাবি সবচেয়ে বেশি। কাজেই ও'রা এখানে থাকলে যা যা খাবার লাগবে সব একসাথে দিয়ে দিন। আমার যদি সামর্থ্য থাকত, আমি আপনার উপর চাপ দিতাম না।'

তখন তারা নিজেরাই সব মানুষের উপর কর ধার্য করত, প্রত্যেকের ক্ষমতা অনুযায়ী। মক্কা ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত সেই অর্থ দিয়ে সকলের খাবারের যোগান দিত।

বলা হয়, শীতে ও গ্রীষ্মে দুটো কাফেলার ভ্রমণ সর্বপ্রথম হাশিম চালু করেন। মক্কায় তিনিই প্রথম সারিদ (টুকরো রুটির ঘন খাবার) দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। আসলে তাঁর নাম ছিল আমর। তাঁকে হাশিম ডাকা হতো কারণ মক্কায় তিনি লোকজনের জন্য রুটি টুকরো করে খাবার তৈরী করতেন। একজন কুরায়শ কবি, অথবা যে কোন আরবও হতে পারে তিনি, এই কবিতা রচনা করেছিলেন :

আমর সবার জন্য রুটি আর হালুয়া বানাতেন
মক্কায় যাঁদের দিন ভাল যেতো না, তাদের খাওয়াতেন।
দুটো যাত্রা তিনিই শুরু করেছিলেন
শীতের কাফেলা, গ্রীষ্মের বাহন।

ব্যবসার পণ্য নিয়ে যাচ্ছিলেন হাশিম ইবনে আবদু মানাফ। সেই অবস্থায় মারা গেলেন সিরিয়ার গাজা নামক স্থানে। তখন আল মুত্তালিব ইবনে আবদু মানাফ হাজীদের খাবার ও পানি সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি আবদু শামস ও হাশিমের চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন। সবাই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত। তাঁর উন্নত চরিত্র আর ঔদার্যের জন্য তাঁকে সবাই আল-ফায়দ বলে ডাকত।

হাশিম চলে গিয়েছিলেন মদীনায়। ওখানে বানু আদিই ইবনে আল-নাজ্জার বংশের সালমা বিনতে আমরকে বিয়ে করেন। সালমার এর আগে একবার বিয়ে হয়েছিল উহাইয়া ইবনে আল-জুলাহ ইবনে আল-হারিশ ইবনে জাহজাবা ইবনে কুলফা ইবনে আউফ ইবনে আমর ইবনে আউফ ইবনে মালিক ইবনে আল-আউসের সঙ্গে। তাঁর ঔরসে তাঁর এক পুত্র সন্তান ছিল। নাম আমর। সমাজে সালমার আসন খুব উঁচু ছিল। এইজন্য তিনি যখনই বিয়ে করতেন, শর্ত থাকত, তিনি নিজের

বিষয়-আশয় নিজেই দেখা-শোনা করবেন। কাউকে পছন্দ না হলে তিনি তাঁকে ত্যাগ করতেন।

হাশিমের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন আবদুল মুত্তালিব। তাঁর অন্য নাম ছিল শায়বা। শায়বাকে বাল্যাবস্থায় হাশিম সলমার কাছে রেখে এসেছিলেন। তারপর চাচা আল-মুত্তালিব এসেছিলেন শায়বাকে নিয়ে যেতে, নিয়ে আপন শহরে নিজের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে রেখে মানুষ করতে। সালমা তাকে যেতে দেন নি। চাচা তর্ক করেছিলেন। যুক্তি দেখিয়েছিলেন, ছেলে একটু বড় হয়েছে, হেঁটে যেতে পারবে। এখন সে আছে নির্বাসনে। আপন-জনের কাছ থেকে অনেক দূরে। তার আত্মীয়-স্বজনের কতো নাম ডাক, কতো ইজ্জত। তাঁরা কা'বাঘরের মানুষ, সরকারের অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব তাঁদেরই হাতে। নিজের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে থেকে মানুষ হলে ছেলের ভাল হবে। অতএব, তিনি তাকে না নিয়ে যাবেন না। অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস, মায়ের অনুমতি ছাড়া শায়বা যেতে রাযী হয় নি। শেষ পর্যন্ত মা সম্মতি দিয়েছিলেন। চাচা তাকে মক্কা নিয়ে এলেন উটের পিঠে তাঁর পেছনে বসিয়ে। এই দৃশ্য দেখে লোকজন চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'আল-মুত্তালিব ক্রীতদাস নিয়ে এসেছে।' এই থেকে তার নাম হয়েছিল আবদুল মুত্তালিব।

চাচা এতে ক্ষেপে গিয়ে চিৎকার করে জবাব দিয়েছিল: 'কি জঘন্য! দাস নয়, আমার ভাতিজা। মদীনা থেকে আমি নিয়ে এসেছি।'

রমযান মাসে আল-মুত্তালিব ইন্তেকাল করেন ইয়ামনে। একজন আরব তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছিলেন:

আল-মুত্তালিব নেই, হাজীরা তৃষ্ণার্ত এখন।
গামলা ভরে খাবার আসে না আর
তিনি চলে গেছেন, কী বেদনা কুরায়শদের।

আল-মুত্তালিব এবং আবদু মানাফের সমস্ত ছেলেদের উপর মাতরূদ ইবনে কা'ব আল-খুজাই এক শোকগাথা রচনা করেন তাঁদের শেষ বংশধর নওফেলের মৃত্যু সংবাদ শোনার পর:

হে রাত্রি ! দুঃসহতম রাত্রি এই
অন্য সব রাত্রিকে বিপর্যস্ত করেছে।
আমার অসহ্য মনো কষ্টে,
বেদনা আর নিয়তির পীড়নে।
ভাই নওফেলের কথা মনে এলে
অতীত দিনের স্মৃতি ভেসে আসে,
মনে পড়ে যায় লাল কোমর-বন্দ,
নতুন সুন্দর হলুদ পিরান।
তারা চারজন ছিল যুবরাজ,
ছেলে এবং নাতি যুবরাজদের,
একজন মরেছিল রাদমানে, একজন সালমানে
তৃতীয় জন শায়িত গাজার সন্নিকটে,
কা'বাঘরের নিকটে চতুর্থজন আছেন কবরে
পবিত্র ঘরের পূর্ব দিকে।
আবদু মানাফ বড় যত্ন করে এদের লালন করেছিলেন,
সব মানুষের বদনজর থেকে বাঁচিয়ে,
মুগিরার সন্তানের মতো এমন আর হয় না
জীবিত বা মৃতের মধ্যে।

আবদু মানাফের অন্য নাম ছিল আল-মুগিরা। প্রথমে মৃত্যুবরণ করেন হাশিম, সিরিয়ার গাজায়। তারপর আবদু শাম্স মক্কায়। তারপর আল মুত্তালিব ইয়ামনের রাদমানে। সবশেষে নওফেল ইরাকের সালমানে।

তাঁরা বেশ জোরের সঙ্গে বলে থাকেন মাতরূদকে কে যেন বলেছিল, 'আপনার পংক্তিমালা খুব সুন্দর। কিন্তু বিষয়বস্তুর প্রতি আরো একটু সুবিচার করলে আরো ভালো হত।'

'আমাকে আরো দুটো রাত সময় দিন'—মাতরূদ বলেছিলেন। তারপর মাতরূদ লিখেছিলেন :

কাঁদো, হে চোখ কাঁদো যতো পারো, অঝোরে ঝরাও অশ্রু
কাঁদো মুগিরার পুত্রদের জন্য, ছিলেন কা'বের মহৎ গর্ভজাত তাঁরা,
হে চোখ, তোমার অশ্রু ধরে রেখো না;
জীবনের দুর্ভোগে আমার মর্মবেদনা বিলাপ করে শোনাও।
ওই বিশাল-হৃদয় বিশ্বস্ত মানুষের জন্যে কাঁদো
দানে ধ্যানে মহৎ সুজন,
দিলে খাস, উদ্দেশ্যে উন্নত,
গম্ভীর কঠিন, অটল বিশ্বাসী গুরুতর কাজে,
সঙ্গীন বিষয়ে নিঃশঙ্ক, ছোটলোক নয়, নয় অপরে নির্ভর,
সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষিপ্র, দানে উদার।
কা'বের চেহারা চরিত্রে আছে বাজপাখীর বৈশিষ্ট্য
সে-ই ছিল তাদের হৃদয়ের আর গৌরবের চিহ্ন,
ঔদার্যের জন্য কাঁদো, উদার ছিল মুত্তালিব, তার জন্য
অশ্রুর ঝর্ণার বাঁধ খুলে দাও,
আমাদের কাছ থেকে চলে গেল রাদমানে, বিদেশীর মতো,
তিনি মরে গেছেন, হৃদয় আমার স্তব্ধ, শোকাহত।
হতভাগা, কাঁদো, যদি কাঁদতে পারো,
কা'বার পূবে আছে আবদু শামস, তার জন্য কাঁদো,
মরুর বুকে কবর হাশিমের
তাঁর হাড়ের উপর দিয়ে বয় গাযার বাতাস।
সবার উপরে আছে বন্ধু আমার নওফেল
সালমানের মরুতে তার কবর।
আরব আজম কোথাও দেখি নি এমন মানুষ আর,
সাদা উটে এমন মনোহর।
তাদের শিবির আর চেনে না তাদের,
অথচ তারাই ছিল আমাদের বাহিনীর প্রাণ।
সময় তাদের শেষ করে দিয়েছে কি? নাকি ভোঁতা হয়ে
গেল তলোয়ার তাদের?

নাকি সমস্ত জীবন্ত বস্তু খাদ্য নিয়তির?
ওদের মৃত্যুর পর আমি খুশি থাকি,
অল্প হাসি আর শুষ্ক কুশল বিনিময়ে।
এলোচুল রমণীদের আব্বার জন্য কাঁদো,
তাঁর জন্য কাঁদে ঘোমটাবিহীন সেই রমণীরা, মানতের উটের মতো।[১]
তারা শোক করে মর্ত্যের মহত্তম মানুষের জন্য
অশ্রুর বন্যায় বিলাপ তাদের।
উদার মহৎ একজন মানুষের জন্য তারা শোক করে
সেই তিনি অবিচার উচ্ছেদ করেছেন, ফায়সালা করেছেন,
কঠিনতম বিবাদ।
আমর আল উল্লার সময় হলো, তার জন্য তারা কাঁদল,
কি সুন্দর চরিত্র তার, হাসতেন রাত্রে মেহমান এলেও,
দুঃখে অবনত তারা কাঁদে,
কত দীর্ঘ হবে এই শোক, এই দুঃখের পথ!
কাল তাঁকে নিয়ে গেল তাদের কাছ থেকে, তখন তাঁরা কাঁদল,
পরম পিপাসার্ত উটের মুখের মত হয়েছে মুখ তাদের।
কোমরে বন্ধনী আছে, ভাগ্যের হাতে খেয়েছে মার
সারারাত আমার কেটেছে তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে যন্ত্রণায়,
আমি কেঁদেছি, সঙ্গে কেঁদেছে আমার ছোট্ট মেয়েরা
আমার দুঃখের অংশীদার,
কোন যুবরাজ কোন খান্দান সমকক্ষ নয় তাদের
তাদের সন্তান যারা বেঁচে আছে তাদের মত আর কেউ নেই,
তাদের ছেলেরা সবচেয়ে সুবোধ ছেলে,
বিপর্যয়ে তারা সব মানুষের সেরা মানুষ।

১. মাদী উট রাখার নিয়ম ছিল মৃত মনিবের কবরের পাশে। ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় সে উট মারা যেতো। পৌত্তলিক আরবদের বিশ্বাস ছিল, মনিব পরকালে সেই উটে চড়বে।

কতো যে সুন্দর তেজী ঘোড়া তারা দিয়েছে,
কতো যে ঘরের ঘোটকী তারা দিয়ে দিয়েছে,
কতো যে সুন্দর ধারালো ভারতীয় তলোয়ার,
কুয়োর দড়ির মতো দীর্ঘ কতো যে বর্শা,
এবং ক্রীতদাস, চাইতেই দিয়ে দিয়েছে তারা।
দরাজ হাতে দান করেছে চতুর্দিকে।
আমি পারব না, কেউ পারবে না,
তাদের সৎকাজের হিসেব বলে শেষ করতে।
বিশুদ্ধ বংশ-গর্বে তারা সর্বোচ্চে,
তাদের পূর্বপুরুষ সমস্ত লোকের গর্ব,
বাড়িতে সমস্ত অলংকার তারা রেখে গেছে,
তারা এখন অলংকারবিহীন, নির্জন, পরিত্যক্ত।
চোখের পানি আমার বন্ধ হয় না, অশ্রু নিয়েই আমি বলি,
হতভাগ্য পরিবারটিকে আল্লাহ্ শান্তি দিন।

'এলোচুল রমণীদের আব্বা' বলতে কবি হাশিম ইবনে আবদু মানাফকে বুঝিয়েছেন।

চাচা আল-মুত্তালিবের পর আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম হাজীদের খানাপিনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি পূর্বপুরুষের দেওয়া জনসেবার প্রথা অনুযায়ী কাজ করে যান। ভীষণ সুখ্যাতি হয়েছিল তাঁর, তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ এতো সুখ্যাতি অর্জন করতে পারেন নি। তাঁর লোকজন তাঁকে ভালবাসত, তাদের মধ্যে তাঁর সুনাম ছিল বিপুল।

যমযম খনন

হুজরায়[১] ঘুমোচ্ছিলেন আবদুল মুত্তালিব। তখনই দৈবাদেশ পেলেন যমযম খনন করার। যমযমের কাহিনী পাওয়া গেছে আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর কাছ থেকে। আবদুল্লাহ ইবনে যুরায়র আল-গাফাকি থেকে

১. কক্ষ।

মার্তাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ইয়াজানি এবং মার্তাদ থেকে ইয়াজিদ ইবনে আবু হাবিব আল-মিসরী আমাকে বলেছেন, তিনি আলী ইবনে আবু তালিবকে এই কাহিনী বলতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন যে, আবদুল মুত্তালিব বলেছেন: একদিন হুজরায় আমি ঘুমোচ্ছিলাম, তখন একজন অলৌকিক মেহমান এসে আমাকে বললেন, "তিবা খনন কর।"

আমি বললাম, "তিবা কি জিনিস?"
তিনি চলে গেলেন।
পরদিনও আমি ওখানে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলাম।
তিনি আবার এলেন, বললেন: "বার্‌রা খনন কর।"
আমি জিজ্ঞেস করলাম "বাররা কি।"
তিনি চলে গেলেন।
তার পরদিন তিনি এলেন, বললেন, 'মাদনূনা খনন কর।"
আমি প্রশ্ন করলাম, 'মাদনূনা কি?' তিনি এবারও চলে গেলেন।

পরদিন আমি যখন ঘুমোচ্ছিলাম, তিনি আবার এলেন। বললেন, "যমযম খনন কর।"

আমি বললাম, "যমযম কি?"
তিনি বললেন:
'সে কোনদিন ব্যর্থকাম হবে না অথবা শুকোবে না কোনদিন
সে পানি দেবে সমস্ত হাজীদের
সে আছে গোবর আর রক্তাক্ত মাংসের মাঝখানে[১]
যে বাসায় উড়ে আসে শ্বেত-পক্ষ দাঁড়কাক, তার পাশে,
যে বাসায় যাতায়াত পিঁপড়ের তার পাশে।'

১. 'গোবর আর রক্তাক্ত মাংসের মাঝখানে' কথাগুলোর কোন পরিষ্কার অর্থ পাওয়া যায় নি। সম্ভবতঃ কুরবানীর পশুকে যবাইর আগে যেখানে রাখা হত, সেখানে গোবর থাকার কথা আর যেখানে যবাই হত, সেখানে রক্তাক্ত মাংস থাকার কথা ছিল।

যখন ঠিক জায়গার সন্ধান তাঁকে দেওয়া হলো, তিনি বুঝলেন, বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর মিল আছে। আল-হারিস তখন ছিলেন তাঁর একমাত্র পুত্র। তিনি তাঁকে নিয়ে গেলেন সেই নির্দেশ-করা জায়গায় খন্তা নিয়ে। তারপর খুঁড়তে শুরু করলেন।

কুয়োর মুখ যেই বেরিয়ে পড়ল, অমনি উনি চীৎকার করে উঠলেন 'আল্লাহু আকবার!'

কুরায়শরা বুঝতে পারল যা তিনি খুঁজছিলেন, তা তিনি পেয়ে গেছেন। সবাই ছুটে এল তাঁর কাছে, বলল, 'এই কুয়ো আমাদের পিতা ইসমাঈলের। এতে আমাদের সকলের অধিকার আছে। কাজেই আমাদের এর অংশ দিন।'

তিনি জবাব দিলেন, 'না, দেবো না। এর কথা বিশেষ করে আমার কাছে বলা হয়েছে, আপনাদের কাছে বলা হয়নি। আর এটা দেওয়া হয়েছে আমাকে।'

সকলে বলল, 'আমাদের প্রতি সুবিচার করুন। এই বিষয়ে বিচার করে রায় না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে আমরা ছাড়ব না।'

তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, আপনাদের যাকে খুশি বানান বিচারক।' সিরিয়ার কাছে এক পাহাড়ী অঞ্চলে থাকতেন বনু সাদ হুদায়মের এক মহিলা ভবিষ্যদ্বক্তা। তাঁকে বিচারক মানতে রাযী হলেন তিনি।

কতিপয় আত্মীয় এবং কুরায়শদের সব বংশের একজন একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে আবদুল মুত্তালিব ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন সেই ভবিষ্যদ্বক্তার অন্বেষণে। সিরিয়া আর হিজাযের মাঝখানে জনহীন প্রান্তরের ভেতর দিয়ে তাঁরা যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে এক সময় আবদুল মুত্তালিবের দলের পানি ফুরিয়ে গেল। অবস্থা এমন, ওদের ভয় হলো, ওরা বুঝি তৃষ্ণায় মারা যাবে।

কুরায়শদের বিভিন্ন বংশের যাদের নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের কাছে তিনি পানি চাইলেন। কিন্তু তারা পানি দিল না। তারা বলল

তাদের পানি দিয়ে দিলে তারাও তো তৃষ্ণায় মরবে। আবদুল মুত্তালিব তখন মরিয়া হয়ে উঠেছেন। কি করা যায় সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাঁরা কেউ কোন পরামর্শ দিতে পারলেন না। বললেন তারা অতশত বুঝে না। আবদুল মুত্তালিব যা বলবেন তাই হবে।

আবদুল মুত্তালিব বললেন, আমার মনে হয় দেহে জোর থাকতে থাকতে প্রত্যেকের একটা করে গর্ত খুঁড়ে রাখা উচিত। কেউ মারা গেলে তার সঙ্গীরা তাকে কবর দেবে। এমন করে শেষ ব্যক্তি ছাড়া সবার কবর দেওয়া হয়ে যাবে। মরার পরে সবার কবর না হওয়ার চেয়ে একজনের কবর না হওয়া অনেক ভাল হবে।

সবাই তার প্রস্তাব গ্রহণ করল। সবাই নিজেদের জন্য একটা একটা করে গর্ত খুঁড়ে রাখল। তারপর তারা বসে রইল, তৃষ্ণায় মরার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর আবদুল মুত্তালিব আবার বললেনঃ আল্লাহ্‌র দোহাই আর এমনি করে মৃত্যুর কাছে নিজেদের সঁপে দেওয়া, পানির জন্য আশেপাশে তালাশ না করে, এটা নিছক পাগলামো। এতে প্রমাণিত হয় আমরা একেবারে অপদার্থ। চলো, খুঁজে দেখি আল্লাহ্ কোথাও আমাদের হয়তো পানি দেবেন। সবাই উঠে ঘোড়ায়।

সবাই রওয়ানা হওয়ার জন্য ঘোড়া প্রস্তুত করতে লেগে গেল। কুরায়শরা তাদের চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। আবদুল মুত্তালিব গেলেন নিজের ঘোড়ার কাছে। তার পিঠে চড়ে বসলেন। ভাঙ্গা হাটু সোজা করে উঠে দাঁড়াতেই তাঁর পায়ের নিচ থেকে ছলাৎ করে উঠল পানি। আবদুল মুত্তালিব এবং তাঁর সঙ্গীরা 'আল্লাহু আকবর' বলে চিৎকার করে উঠলেন। ঘোড়া থেকে নামলেন, আকণ্ঠ পানি পান করলেন এবং সকলের ভিস্তি ভরে পানি নিলেন।

তাঁরা কুরায়শদের ডাকলেন। তারা এসে যত খুশি পানি পান করতে পারে। এই পানি তাঁদের দিয়েছেন আল্লাহ্! তাঁরা সবাই এসে

তৃষ্ণা নিবারণ করলেন, ভিস্তি (পানি রাখার জন্য চামড়ার থলে) ভরলেন। তারপর বললেন : আল্লাহ্‌র দোহাই, রায় আপনার পক্ষে হয়ে গেছে আবদুল মুত্তালিব। যমযমে আপনার মালিকানা নিয়ে আমরা আর কোনদিন প্রশ্ন করব না। এই দিকচিহ্নহীন প্রান্তরে যিনি আপনাকে পানি দিলেন তিনিই আপনাকে যমযম দিয়েছেন। হাজীদের পানি দেওয়ার জন্য আপনার পদে আপনি ফিরে যান, শান্তিমতে কাজ করুন।'

ওরা সবাই ফিরে গেলেন। ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে আর যাওয়ার দরকার রইল না।

এই হলো যমযমের কাহিনী। এই কাহিনী আমি শুনেছি আলী ইবনে আবু তালিবের কাছে। আবদুল মুত্তালিবের বরাত দিয়ে বলা আরেকটা বিবরণ আমি শুনেছি। সেটি হলো, যমযম খনন করার জন্য তাঁকে যখন হুকুম দেওয়া হলো, তখন তাঁকে বলা হয়েছিল :

তারপর স্ফটিক স্বচ্ছ পানির জন্য তুমি প্রার্থনা করো
তাদের শ্রদ্ধার স্থানে আসা আল্লাহ্‌র হাজীদের পানি দেওয়ার জন্য
যতদিন যমযম আছে ততদিন তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই।

একথা শুনে আবদুল মুত্তালিব গেলেন কুরায়শদের কাছে। বললেন, 'আপনারা জেনে রাখুন, যমযম খনন করার জন্য আমাকে আদেশ করা হয়েছে।' তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু কোথায় যমযম আছে, তা কি আপনাকে বলা হয়েছে ?'

তিনি জবাব দিলেন, তা অবশ্য তাকে বলা হয়নি। তাঁরা তাঁকে পরামর্শ দিলেন, যেখানে ঘুমানোর সময় তিনি এই আদেশ পেয়েছেন সেখানে গিয়ে তিনি আবার শুয়ে থাকবেন। এই আদেশ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসে থাকলে বিষয়টা আবার পরিষ্কার করা হবে। আর যদি এই আদেশ শয়তানের কাছ থেকে এসে থাকে, তাহলে সে আর ফিরে আসবে না।

আবদুল মুত্তালিব নিজের বিছানায় ফিরে গেলেন। ঘুমোলেন, এবং নিম্নোক্ত বার্তা পেলেন :

যমযম খনন করো, এ তোমার আশাকে মিথ্যে করবে না।
এটা তোমাকে তোমার পিতা দিলেন চিরকালের জন্য।
এ কোনদিন ব্যর্থকাম হবে না অথবা শুকোবে না কোনদিন,
হাজীদের সে পানি দেবে
অস্‌ট্রিক পাখি যেমন আপন দলকে দেখে,
তাদের কণ্ঠ আল্লাহ্ শোনেন সাগ্রহে,
সুদূর অতীত থেকে চুক্তি আছে এক নিশ্চিত,
অদৃশ্য, তাকে কোনদিন দেখতে পাবে না তুমি;
এ আছে গোবর আর রক্তাক্ত মাংসের মাঝখানে।

বলা হয়ে থাকে যে, এই আদেশ যখন তাঁকে দেওয়া হলো, তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—যমযম কোথায় আছে? তাঁকে বলা হয়েছিল, যমযম আছে পিঁপড়ের বাসার পাশে, যেখানে আগামীকাল বাজপাখি ঠোকড়াবে। একথা কতটুকু সত্য তা একমাত্র আল্লাহ্ জানেন। পরদিন আবদুল মুত্তালিব তাঁর একমাত্র পুত্র আল-হারিসকে নিয়ে ওখানে যান। তখন তাঁর একটিই পুত্র ছিল। গিয়ে ঠিক পিঁপড়ের বাসার পাশে দুই দেবমূর্তি—ইসাফ আর নাখলার মাঝখানে—যেখানে কুরায়শরা গবাদি পশু কুরবানী দিতেন, ওখানে একটি জায়গায় একটা বাজপাখি ঠিকই ঠোকড়াচ্ছে। তিনি একটা খন্তা নিয়ে এসে সেই জায়গায় খুঁড়তে শুরু করলেন। কুরায়শরা তা দেখল। কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে বাধা দিল। দুই দেবমূর্তির মাঝখানে ওরা কুরবানী দেয়। ওখানে গর্ত করতে তারা তাঁকে দেবে না। আবদুল মুত্তালিব তখন তাঁর ছেলেকে ওখানে দাঁড়িয়ে কিছু হলে তাকে রক্ষা করতে বললেন এবং নিজে মাটিতে গর্ত করে যেতে থাকলেন। কারণ যে আদেশ তিনি পেয়েছেন তা পালন করতে তিনি বদ্ধপরিকর। তারা দেখল তাঁকে নিরস্ত করা যাবে না। তারা চলে গেল। বেশীদূর গর্ত করতে হলো না। ভেসে উঠল কুয়ার পাথরের মুখ। আল্লাহ্‌র প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। সঠিক তথ্যই তাঁকে দেওয়া হয়েছে। আরো কিছুদূর গর্ত করার পর তিনি পেলেন দুটো সোনার গাজলা হরিণ।

মক্কা ত্যাগের আগে জুরহুম ওগুলো সেখানে পুঁতে রেখে গিয়েছিলেন। আরো পেলেন কয়েকটা তরবারি, কালা-র কয়েকটা বর্ম-কোট।[১]

কুরায়শরা দাবি করে বসল, এসব জিনিসে তাদের হক আছে। আবদুল মুত্তালিব মানলেন না। তবে পবিত্র নাম লটারি দিয়ে যা স্থির হয় তা তিনি মেনে নেবেন। বললেন, তিনি দুটো তীর বানাবেন কা'বা-র নামে। দুটো তাদের নামে আর দুটো নিজের নামে। তূণীর থেকে যে দুটো তীর বেরিয়ে আসবে প্রথম তাদেরই হবে এই সম্পদ। সবাই এতে রাযী হলো। তিনি দুটো হলুদ রঙের তীর বানালেন কা'বাঘরের নামে, দুটো কালো বানালেন নিজের নামে আর দুটো সাদা বানালেন কুরায়শদের নামে। কিছু পবিত্র ঐশী তীর নিক্ষেপ করা হয় হুবালে। সেই তীরের দায়িত্বে থাকেন যে পুরোহিত, তার কাছে দিলেন তীরগুলো। (হুবাল কা'বার মধ্যখানে অবস্থিত একটি প্রতিমা, বস্তুত এটিই ছিল সর্ববৃহৎ প্রতিমা। ওহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ান ইবনে হার্ব চীৎকার করে উঠেছিলেন, 'আরিসে হুবাল' অর্থাৎ তোমার ধর্মকে জয়ী করো। এটা সেই হুবাল।)

আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন পুরোহিত তীর নিক্ষেপ করলেন। গাজলা হরিণের জন্য দুটো হলুদ তীর পড়ল এসে কা'বার নামে। কালো দুটো তীর তরবারি আর বর্ম-কোট এনে দিল আবদুল মুত্তালিবকে। কুরায়শদের তীর দুটো পেছনে পড়ে রইল। আবদুল মুত্তালিব তরবারিগুলো কা'বাঘরের একটি দরজার ভেতর দিকে লাগিয়ে রাখলেন, আর দরজার উপরে লাগিয়ে রাখলেন সোনার হরিণ দুটো। কা'বাঘরের এ-ই ছিল প্রথম স্বর্ণালঙ্কার। অন্তত সবাই তাই বলে থাকে।

আবদুল মুত্তালিব অতঃপর হাজীদের যমযমের পানি সরবরাহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

---

১. সিরিয়ায় এক পর্বতের নাম।

মক্কায় কুরায়শদের বিভিন্ন গোত্রের মালিকানাধীন অন্যান্য কুয়া

যমযম খনন করার আগেও কুরায়শরা মক্কায় আরো কুয়া খনন করেছিলেন। একথা আমাকে বলেছেন যিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-মক্কাই। যিয়াদ এই তথ্য পেয়েছেন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের কাছে। তিনি বলেছেন, আবদু শামস ইবনে আবদু মানাফ আল-তাওয়ি নামে একটা কুয়া খনন করেছিলেন মক্কার উত্তর দিকে আল-জায়দার কাছে, মুহম্মদ ইবনে ইউসুফ আস-সাকাফির বাড়ির কাছে।

হাশিম ইবনে আবদু মানাফ বাদ্ধার নামে একটা কূপ খনন করেছিলেন আবু তালিবের গিরিপথের মুখের কাছে আল-খানসামা পর্বতের একটি ঢিবির পাশে। লোকে বলে কূপ খনন করার সময় তিনি বলেছিলেনঃ 'আমি এটাকে লোকজনের জীবিকার একটা উপায়ে পরিণত করবো।'

তিনি[১] সাজিলা খনন করেছিলেন। এই কূপের মালিক আল-মুতিম ইবনে আদিই ইবনে নওফেল ইবনে আবদু মানাফ। এই কূপ এখনো ব্যবহার করা হচ্ছে। বনু নওফেলের মতে এটি আল-মুতিম কিনে নিয়েছিলেন আসাফ ইবনে হাশিমের কাছ থেকে। আর বনু হাশিম বলেন, এটা তিনি তাঁকে দিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ যমযম বের হওয়ার পর অন্যান্য কূপের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল।

উমাইয়া ইবনে আবদু শামস নিজে খনন করেছিলেন 'আল-হাফর'। বনু আসাদ ইবনে আবদুল উজ্জা খনন করেছিলেন সুকাইয়া[২] কূপ। এটি এখনো তাদের কাছেই আছে। বনু আবদুদ্ দার খনন করেছিলেন

১. এটা সম্পাদকের ভুল হতে পারে। অন্যত্র পাওয়া যায় 'সাজলা খনন করেছি আমি কুসাই'।

২. ভিন্নমনে সুফাইয়া।

উম্ আহরাফ। বনু জুমাহ্ খনন করেছিলেন আস-সুনবুলা। এটির মালিক খালাফ ইবনে ওয়াহাব। বনু সাহ্ম আল গাম্র নামে কূপ খনন করেন। এটির মালিক তাঁরাই।

মক্কার বাইরে কিছু কুয়া আছে মুররা ইবনে কা'ব এবং কিলাব ইবনে মুররার সময় থেকে। ওইসব কুয়া থেকে পানি আনতেন কুরায়শদের প্রথম দিককার যুবরাজগণ। রুম এবং খুম এই দুটো কূপের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। রুম খনন করেছিলেন মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লুআই আর খুম খনন করেছিলেন বনু কিলাব ইবনে মুররা। আল-হাফ্র[২]ও বনু কিলাব খনন করেছিলেন। বনু আদিই ইবনে কা'ব ইবনে লুআই-এর ভাই হুযায়ফা ইবনে গানিমের একটি প্রাচীন কবিতা নিম্নরূপ ঃ

সুন্দর প্রাচীন সেই কালে বহুদিন আমরা খুশি ছিলাম
খুম কিংবা আল-হাফর থেকে পানি এনে।

যমযম অন্য সব কুয়াকে ম্লান করে দিয়েছিল। ওই সব কুয়া থেকে আগে হাজীরা পানি পেতেন। যমযমের প্রাধান্যের কারণ, ওখানে হাজীরা যেতেন ওটা পবিত্র অঞ্চলের ভেতরে আর এর পানি অন্য সবগুলোর চেয়ে ভাল বলে। তাছাড়া এটি ইসমাঈল (আ) ইবনে ইবরাহীম (আ)-এর কূপ। এর জন্য কুরায়শ আর অন্য সব আরবদের সঙ্গে খুব গর্ব করে বেড়াতেন।

হাজীদের খাবার ও পানি দেবার অধিকার কুরায়শদের ছিল না, ছিল তাদের, তারাই যমযম আবিষ্কার করেছে এবং বনু আবদু মানাফের পরিবারের গৌরবে সবাই ধন্য হয়েছিল। এই নিয়ে লিখেছিলেন মুসাফির ইবনে আবু আমর ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদু শামস ইবনে আবদু মানাফ। তার রচনায় সেই গর্বের প্রকাশ ঃ

২. এটি সম্ভবত জাফ্র।

আমাদের মহিমা এসেছে আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে।
সে মহিমা আমরা উন্নত করেছি আরও।
আমরা পানি দিই না হাজীদের,
দিই না পুষ্ট দুগ্ধবতী উট কুরবানী?
মৃত্যু কাছে চলে এলেও আমরা
সাহসী এবং উদার থাকি।
আমরাও শেষ হই (কারণ মানুষ অমর হয় না)
আমাদের কাউকে শাসন করবে না কোন অচেনা মানুষ।
যমযম আমাদের
যে আমাদের ঈর্ষার চোখে দেখবে, তার চোখ উপড়ে নেবো আমরা।

এই হুযায়ফা ইবনে গানিম আরো বলেছেন:

(তার জন্য কাঁদো) যে হাজীদের পানি দিয়েছে, ছেলে যার রুটি ভেঙ্গেছে, ফিহ্রি প্রভু আবদু মানাফের জন্য এবং।

মাকামের পাশে তিনি যমযম উন্মুক্ত করেছেন,
তার পানি নিয়ন্ত্রণ অন্য যে কারো গর্বের চেয়ে বৃহত্তর গর্ব।

আবদুল মুত্তালিব নিজের পুত্রকে কুরবানী করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন

জনশ্রুতি আছে, যমযম খনন করার সময় আবদুল মুত্তালিব যখন কুরায়শদের বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন তখন তিনি কসম খেয়েছিলেন, তাঁকে রক্ষা করার জন্য তাঁর দশটা পুত্র হলে, একজনকে তিনি কাবাঘরে আল্লাহ্র নামে কুরবানী করবেন। এর সত্য-মিথ্যা আল্লাহ্ জানেন। পরে তাঁর দশটা পুত্র হলো। তিনি তাদের সবাইকে একত্রে ডাকলেন। তার প্রতিজ্ঞার কথা তাদের বললেন। বললেন—আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস সমুন্নত রাখা তাদের উচিত। তারা বলল, তিনি যা বলবেন তাই হবে। কি করতে হবে তাদের, জানতে চাইল। তিনি

বললেন, তাদের প্রত্যেকে একটা করে তীর নেবে, তাতে তার নাম লিখে তাঁর কাছে আনবে। তারা সবাই নাম-লেখা তীর নিয়ে তাঁর কাছে এল। তীর নিয়ে তিনি গেলেন কা'বার মধ্যখানে হুবালের কাছে। পবিত্র কূপের পাশে প্রতিমা হুবাল স্থাপিত। কা'বাঘরে প্রদত্ত সমস্ত দান ওই কূপে জমা রাখা হত।

হুবালের পাশে সাতটা তীর ছিল। সবকটাতে কিছু না কিছু লেখা ছিল। একটায় লেখা ছিল রক্তপণ'। যখন প্রশ্ন উঠত রক্তপণ কে দেবে, তখন সাতটা তীরের মধ্যে লটারী হতো। যার ভাগ্যে পড়ত 'রক্তপণ' লেখা তীর, তাকেই দিতে হত টাকা। একটা 'হাঁ' চিহ্ন দেওয়া ছিল, আরেকটায় না'। যার প্রতি দৈবাদেশ নির্দেশ করা হতো এমনি করে, সে-ই মেনে নিত আদেশ। একটায় লেখা ছিল, 'তোমাকে' আরেকটায় গোত্রের নয় (মুসলাক)' আরেকটায় 'তোমাদের নয়' আর সব শেষেরটায় 'পানি'। কেউ যদি পানির জন্য গর্ত করতে চাইত এই তীর সে নিক্ষেপ করত। যেখানে পড়ত গিয়ে তীর সেখানেই খনন করতে লেগে যেত সে।

কখনো কোন ছেলের খৎনা করার দরকার হলে অথবা বিয়ে দিতে চাইলে, কারো কবর দিতে হলে, কারো বংশ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন দেখা দিলে, তারা তাকে হুবালের কাছে নিয়ে যেতো একশ দিরহামের বিনিময়ে। যে তীর ছুড়তো তাকে এই একশ দিরহাম আর কুরবানীর জন্য একটা উট দেওয়া হতো। সেই লোককে তারপর কাছে নিয়ে আসা হতো। তারা বলত, 'হে প্রভু! এই হলো! অমুকের পুত্র অমুক। এর সঙ্গে আমরা অমুক কাজ করতে চাই। কোনটা ঠিক হবে আপনি বলে দিন।'

তীরন্দাজ লোককে বলা হতো, 'তীর নিক্ষেপ করুন।'

যদি 'তোমাদের' উঠত, তাহলে ধরে নেওয়া হতো সে লোক তাদের গোত্রের খাঁটি সদস্য। যদি উঠত 'তোমাদের নয়' তাহলে বোঝা হতো সে তাদের মিত্র। যদি মুসলাক বের হতো তাহলে সবাই জানত, তাদের গোত্রের সঙ্গে ওই লোকের কোন রক্ত-সম্পর্ক নেই এবং সে তাদের মিত্র

নয়। 'হাঁ' বেরুলে সে অনুযায়ী কাজ করত, 'না' বেরুলে প্রস্তাবিত কাজ এক বছরের জন্য স্থগিত রাখা হত। তারপর আবার সেটা আনা হত। তীরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এমনি করে তারা তাদের কাজকর্ম করতো।

আবদুল মুত্তালিব তীর-ওয়ালাকে বললেন, 'এই তীরগুলো ছুঁড়ে আপনি আপনার ছেলেদের ভাগ্য স্থির করে দিন।'

তিনি তাকে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা বললেন।
সবাই তাদের নাম লেখা তীর দিয়ে দিলেন।

আবদুল্লাহ্ ছিলেন তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। তিনি, আল-জুবায়র এবং আবু তালিব ছিলেন ফাতিমা বিনতে আমর ইবনে আইধ ইবনে আরদ্ ইবনে ইমরান ইবনে মাখজুম ইবনে ইয়াকাজা ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লুআই ইবনে গালিব ইবনে ফিহর-এর গর্ভজাত। অনেকে বলেন, আবদুল্লাহ ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের সবচেয়ে প্রিয় পুত্র। তাঁর পিতা মনে মনে চাচ্ছিলেন আবদুল্লাহ্‌র তীর না বেরুলে তিনি বেঁচে যাবেন। [ইনিই রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিতাজী]।

তীর-ওয়ালা তীর নিক্ষেপ করতে প্রস্তুত হলেন। আবদুল মুত্তালিব গিয়ে দাঁড়ালেন হুবালের পাশে। মনে মনে আল্লাহ্‌কে ডাকতে লাগলেন।

তীর ছুঁড়লেন তীর-ওয়ালা। বেরিয়ে এলো আবদুল্লাহ্‌র তীর। পিতা তাঁর হাত ধরলেন, বের করলেন বিরাট এক ছোরা। আবদুল্লাহ্ নিয়ে এলেন ইসাফ আর নায়লার কাছে। (তাবারির ভাষ্য ঃ এই দুই প্রতিমার কাছে কুরবানী দেওয়া হতো।) ছেলেকে কুরবানী দেবেন।

তখন চতুর্দিক থেকে দলে দলে কুরায়শরা ছুটে এল। জিজ্ঞেস করল কি করতে চান তিনি। তিনি বললেন, ছেলেকে তিনি কুরবানী দেবেন। তারা এবং তাঁর অন্যান্য পুত্র তখন বলল, 'ইয়া আল্লাহ্! তাঁর জন্য সর্ব-বৃহৎ প্রায়শ্চিত্ত-কুরবানী না দিয়ে কিছুতেই আপনি তাঁকে কুরবানী দিতে পারবেন না। আপনি যদি এই কাজ করেন সবাই দলে দলে

তাদের ছেলেদের কুরবানী দিতে আসবে। তাদেব থামাতে পারবেন না। তাহলে মানুষের কি হবে ?'

তখন আবদুল্লাহ্‌র মায়ের গোত্রের আল-মুগিরা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে মাখজুম ইবনে ইয়াকাজা বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! তার জন্য সর্ববৃহৎ দক্ষিণা কুরবানী না দিয়ে কিছুতেই তাকে আপনি কুরবানী দিতে পারবেন না। তাঁর মুক্তিপণের জন্য যদি আমাদের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করতে হয় তবু তাকে আমরা মুক্ত করবো।'

কুরায়শ এবং তাঁর পুত্ররা বলল, তিনি একাজ কিছুতেই করতে পারবেন না। বরং তাকে হিযাজে [১] নিয়ে যাওয়া অনেক ভাল। ওখানে একজন মেয়ে-যাদুকর আছে। তার কাছে জিন আছে, তারা তার হুকুম মানে। তার পরামর্শ তাকে নিতেই হবে। ওর সঙ্গে কথা বলার পর তিনি যা খুশি করবেন। যাদুকর যদি তাঁকে কুরবানী দিতে বলে, তাহলে এখানকার চেয়ে খারাপ তো কিছু আর হবে না। আর সে যদি অন্য কোন অনুকূল উপদেশ দেয়, তাহলে তো কথাই নেই।

তারা সবাই মদীনায় গেলেন। জানলেন, যাদুকর আছে খয়বরে। অন্তত লোকজন তাই বলল। ওরা আবার রওয়ানা হলো ঘোড়ায় চড়ে। অবশেষে তাকে পাওয়া গেল। আবদুল মুত্তালিব সব বৃত্তান্ত খুলে বললেন তাকে। যাদুকর তাদের চলে যেতে বলল, কারণ তার জিন তখন ওখানে ছিল না। বলল, পরে চেনা জিন তার কাছে এলে আবার তাদের আসতে হবে। ইতিমধ্যে জিন এলে জিনের কাছে জিজ্ঞেস করে রাখবে।

তার কাছে আসার সময়ও আল্লাহ্‌কে স্মরণ করলেন আবদুল মুত্তালিব। প্রার্থনা করলেন তার কাছে। পরদিন আবার গেলেন তার কাছে।

যাদুকর বলল, 'আমার কাছে বাণী এসে গেছে। আপনাদের রক্তপণ কতো করে ?'

---

১. হিযাজের কেন্দ্রস্থল ছিল মদীনা।

তারা তাকে বললেন, দশ উট। তখন রক্তপণের পরিমাণ তাই ছিল।

যাদুকর তাদের দেশে ফিরে যেতে বলল। দেশে ফিরে গিয়ে নওজোয়ানকে আর দশটা উটকে নিয়ে আবার লটারি দিতে হবে। লটারি যদি আপনার লোকের বিপক্ষে যায় তাহলে আরো দশটা উট যোগ করে আবার লটারি দিতে হবে। আবার যদি ভাগ্য আপনার লোকের বিরুদ্ধে যায় আরো উট যোগ করতে হবে, আপনার প্রভু সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এমনি করে উটের সংখ্যা দশ দশ করে বাড়াতে হবে এবং লটারি দিতে হবে আপনার লোকের আর উটের ভাগ্যের মধ্যে। এমনি করে যখন লটারি উটের বিরুদ্ধে যাবে, তখন আপনার লোকের বদলে সবগুলো উটকে কুরবানী দিতে হবে। তখন বুঝতে হবে, আপনার প্রভু সন্তুষ্ট হয়েছেন। এমনি করে আপনার মক্কেল মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারবে।

তারা মক্কায় ফিরে এলেন। তারা সবাই যখন নির্দেশ কার্যে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিলেন তখনও আবদুল মুত্তালিব আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছিলেন। সবাই আবদুল্লাহ্ এবং দশটা উটকে কাছে নিয়ে এল। হুবালের পাশে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছেন আবদুল মুত্তালিব। তীরের লটারি হলো। ফল গেল আবদুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে। আরো দশটা উট আনা হলো। আবার লটারি হলো। আবার তা গেল আবদুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে। প্রতিবার লটারি হয়, যায় আবদুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে। এমনি করতে করতে উটের সংখ্যা হলো একশত। একশত উট একদিকে, অন্যদিকে আবদুল্লাহ্। এবার জয় হলো আবদুল্লাহ্‌র, লটারি উঠল উটের বিরুদ্ধে।

কুরায়শ এবং আর যারা হাযির ছিলেন, সবাই বললেন, 'অবশেষে আপনার প্রভু খুশি হলেন, আবদুল মুত্তালিব।'

আবদুল মুত্তালিব জবাব দিলেন, (অন্ততঃ তাই লোকে বলে), 'না, আল্লাহ্‌র কসম, তিনবার তার ভাগ্যে না পড়লে আমি মানব না।'

তিনবারই লটারি দেওয়া হলো।

তিনবারই তীর গেল উটের বিরুদ্ধে।

উট যবাই করা হলো, ওখানেই রাখা হলো। কাউকে ওখান থেকে না খেয়ে যেতে দেওয়া হয়নি, খেতে কাউকে বাধা দেওয়া হয়নি।

এক রমণী আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন

কথিত আছে, আবদুল্লাহ্‌র হাত ধরে যখন আবদুল মুত্তালিব ওখান থেকে চলে আসছিলেন, তখন পথে দেখা হয়েছিল বানু আসাফ ইবনে আবদুল উজ্জা ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে লুআই ইবনে গালিব ইবনে ফিহ্‌র বংশের এক রমণীর সঙ্গে। কা'বাঘরে কাজ করতেন ওয়ারাকা ইবনে নওফেল ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উজ্জা, ইনি তাঁর বোন।

আবদুল্লাহ্‌র চোখে চোখ রেখে রমণী বললেন, 'কোথায় যাচ্ছো আবদুল্লাহ্ ?'

আবদুল্লাহ্ জবাব দিলেন, 'আব্বার সঙ্গে।'

রমণী বললেন, 'তুমি যদি আমাকে গ্রহণ করো, তাহলে যতগুলো উট তোমার বদলে কুরবানী দিতে হয়েছে, ঠিক ততগুলো উট তুমি পাবে।'

তিনি বললেন, 'আমি আব্বার সঙ্গে আছি। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ আমি করতে পারব না। তাঁকে আমি ত্যাগও করতে পারব না।'

আবদুল মুত্তালিব তাঁকে নিয়ে এলেন, ওয়াহাব ইবনে আবদুল মানাফ ইবনে জুহ্‌রা ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লুআই ইবনে গালিব ইবনে ফিহ্‌র-এর কাছে। ইনি জন্মসূত্রে এবং স্বভাবগুণে খুব মানী লোক ছিলেন। তাঁর মেয়ে আমিনাকে বিয়ে করলেন আবদুল্লাহ্। আমিনা জন্মসূত্রে এবং অবস্থাগুণে কুরায়শদের মধ্যে তখনকার দিনে রূপে-গুণে অতুলনীয়া ছিলেন। তাঁর মাতা ছিলেন বাররা বিনতে আবদুল উজ্জা ইবনে উসমান ইবনে আবদুদ্-দার ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লুআই ইবনে গালিব ইবনে ফিহ্‌র।

বার্রার আম্মা ছিলেন উম্মে হাবিব বিনতে আসাদ ইবনে আবদুল উজ্জা ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লুআই ইবনে গালিব ইবনে ফিহ্র। উম্মে হাবিবের মাতা ছিলেন বাররা বিনতে আউফ ইবনে উবায়দ ইবনে উআইজ ইবনে আদিই ইবনে কা'ব লুআই ইবনে গালিব ইবনে ফিহ্র।

কথিত আছে, আবদুল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর কাছে গিয়েছিলেন এবং বিয়ে সম্পূর্ণ করেছিলেন। এবং তাঁর স্ত্রী রসূলুল্লাহ্কে গর্ভে ধারণ করলেন। তিনি তখন স্ত্রীর সান্নিধ্য থেকে চলে গেলেন। সেই যে রমণী, বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, দেখা হয়ে গেল তাঁর সঙ্গে আবদুল্লাহ্র। আবদুল্লাহ্ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, গতকাল যে প্রস্তাব তিনি করেছিলেন, তা এখন করছেন না কেন।

রমণী জবাব দিলেন, গতকাল আবদুল্লাহ্র মধ্যে এক জ্যোতি ছিল। সে জ্যোতি এখন আর নেই তাঁর মধ্যে। কাজেই তাঁকে তার আর প্রয়োজন নেই। রমণীর ভাই ছিলেন ওয়ারাকা ইবনে নওফেল। ওয়ারাকা খৃস্টান ছিলেন, ধর্মশাস্ত্র পড়াশুনা করতেন। ভাই ওয়ারাকার কাছে রমণী শুনেছিলেন, এই বংশের মধ্যে একজন নবীর আবির্ভাব হবে।

আমার পিতা ইসহাক ইবনে ইয়াসার আমাকে বলেছেন যে, কে একজন তাঁকে বলেছিল, আবদুল্লাহ্র এক রমণীর সঙ্গে পরিচয় ছিল। আবদুল্লাহ যখন কাদামাটি নিয়ে কাজ করছিলেন, তখন তিনি সেই রমণীর কাছে গিয়েছিলেন। সে রমণী আমিনা বিনতে ওয়াহাব নন। কাদামাটি নিয়ে কাজ করার ফলে তাঁর সর্ব অঙ্গে দাগ ছিল কাদার। তিনি মহিলার কাছে একটু প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু রমণী তাঁকে পাত্তা দিলেন না, গায়েমুখে তাঁর কাদা লেগেছিল বলে।

তিনি চলে এলেন, গোসল করলেন। পরিষ্কার হলেন। পরিচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি যাচ্ছিলেন আমিনার কাছে, তখন আবার দেখা হলো সেই রমণীর সঙ্গে।

রমণী তাঁকে আহ্বান করলেন, তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য।

এবার আবদুল্লাহ্‌র প্রত্যাখ্যানের পালা। তাঁর কাছে তিনি গেলেন না। গেলেন আমিনার কাছে। আমিনার গর্ভে মুহম্মদ (সা) এলেন।

আবার আবদুল্লাহ্‌র পথে পড়লেন সেই রমণী।

আবদুল্লাহ্ জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর কোন দরকার আছে কিনা, তিনি কিছু চান কিনা।

রমণী জবাব দিলেন, 'না! তখন যখন এদিক দিয়ে তুমি যাচ্ছিলে, তোমার দুই চোখের মাঝখানে আমি একটা শুভ্র আভা দেখেছিলাম। সেই দেখে তোমাকে আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তুমি প্রত্যাখ্যান করলে। তুমি চলে গেলে আমিনার ঘরে। সেই আভা এখন দেখছি, আমিনা নিয়ে গেছে।'

কথিত আছে, আবদুল্লাহ্ তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেই রমণী বলতেন, আবদুল্লাহ্‌র দুই চোখের মাঝখানে একটা আভা আছে, অশ্বের আকৃতির মতো। রমণী বলেছিলেন: 'আমি তাঁকে ডেকেছিলাম, আশা করেছিলাম তিনি আমাকে আদর করবেন। তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। গেলেন আমিনার কাছে। আমিনার গর্ভে এলেন আল্লাহ্‌র রসূল (সা)।'

সুতরাং আল্লাহ্‌র রসূল জন্মসূত্রে ছিলেন তাঁর এলাকায় মহত্তম মানুষ, আর ইয্যতের দিক থেকে ছিলেন সর্বোত্তম। পিতা-মাতা—উভয়ের দিক থেকে। আল্লাহ্ তাঁর মঙ্গল করুন, তাঁকে রক্ষা করুন!

রসূলকে (সা) গর্ভে ধারণ করার সময় আমিনাকে যা বলা হয়েছিল

কিংবদন্তী আছে (সত্য-মিথ্যা আল্লাহ্ জানেন), রসূলুল্লাহ্‌র (সা) মাতা আমিনা বিনতে ওয়াহাব প্রায়ই বলতেন, রসূলুল্লাহ্‌কে গর্ভে ধারণ করা অবস্থায় একটি কণ্ঠ তাঁকে বলত, 'আপনি এই জাতির প্রভুকে

গর্ভে ধারণ করে আছেন। তাঁর জন্মের পর আপনি বলবেন, "সমস্ত হিংসুকের বদনজর থেকে তাকে আমি একজনের হেফাজতের সোপর্দ করলাম। তাঁর নাম রাখবেন মুহাম্মদ।" (একজন বলতে আল্লাহ্‌কে বোঝানো হয়েছে)।

যখন তিনি তাঁকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন তার দেহ থেকে একটা আলো বেরুত। সেই আলোতে তিনি সিরিয়ার বোসরা-র-প্রাসাদ দেখতে পেতেন।

কিছুদিন পরে রসূলুল্লাহ্‌র (সা) পিতা আবদুল্লাহ্ ইন্তেকাল ফরমাইলেন।

রসূলুল্লাহ্‌র (সা) জন্ম, তাঁর স্তন্য-পোষ্য শৈশব

হাতীর বছরে ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার রসূল (সা) জন্মগ্রহণ করেন। আল-মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ্ তাঁর দাদু কায়স ইবনে মাখ-রামার রবাত দিয়ে বলেছেন, 'হাতীর বছরে আমি আর রসূল (সা) একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। (তাবারির মতেঃ বলা হয়, ইবনে ইউসুফের বাড়ি নামে পরিচিত একটি বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। আরো বলা হয়, রসূল (সা) এই বাড়ি আকিল ইবনে আবু তালিবকে দিয়ে দিয়েছিলেন। আকিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই বাড়িতে ছিলেন। তাঁর পুত্র আল-হাজ্জাজের ভাই মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফের কাছে বাড়িটি বিক্রি করে দেন। মুহাম্মদ পরে বাড়ি তৈরী করার সময় মূল বাড়িটা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। পরে খায়জুরান এই বাড়ি পৃথক করে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।)[১]

সালিহ্ ইবনে ইবরাহিম ইবনে আবদুল রহমান ইবনে আউফ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে সা'দ ইবনে জুরারা আল-আনসারি বলেছেন যে, তাঁর গোত্রের লোক বলেছে যে, হাসান ইবনে সাবিত বলেছেনঃ 'আমি তখন সাত-আট বছরের বালক,

১. খায়জুরান, খলীফা আল-মাহদীর স্ত্রী।

বয়সের তুলনায় বেশ একটু বড়ো-বড়ো। যা কানে আসত তাঁর সবই আমি বুঝতে পারতাম। একদিন শুনলাম, ইয়াস্রিবের এক দুর্গের চূড়ো থেকে প্রাণপণে গলার সমস্ত জোর দিয়ে চীৎকার করছিলেন এক য়াহুদী, "এই য়াহুদীর দল।"

সব লোক ছুটে এল। তারাও চীৎকার করে বলল, "কী হচ্ছে এসব এ্যাঁ? কী হয়েছে?"

সেই য়াহুদী জবাব দিলেন: "আজকে রাতে এক তারকার উদয় হয়েছে, সেই তারকার নিচে জন্মগ্রহণ করবে আহমদ।"

আমি সা'দ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হাসান ইবনে সাবিতকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রসূল (সা) যখন মদীনায় আসেন তখন কতো ছিল হাসানের বয়স। তিনি বললেন, হাসানের তখন ষাট বছর, আর তাঁর নিজের তিপ্পান্ন। কাজেই হাসান এই বিবরণ সাত বছর বয়সে শুনেছিলেন।

ছেলের জন্মের পর তাঁর আম্মা লোক পাঠালেন দাদু আবদুল মুত্তালিবকে সংবাদ দিতে। পুত্রসন্তান হয়েছে তাঁর। তিনি যেন দেখতে আসেন। আবদুল মুত্তালিব এলে মা আমিনা তাঁকে সব কথা খুলে বললেন। গর্ভবতী অবস্থায় নিজের দেহের আলোয় বোসরার প্রাসাদ দেখার কথা। একটি কণ্ঠ যে কথা তাঁকে বলে গেছে, তাঁর নামকরণ সম্বন্ধে তাঁকে যে হুকুম দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ। সব তিনি আবদুল মুত্তালিবকে খুলে বললেন।

কথিত আছে, আবদুল মুত্তালিব তখন রসূলকে (সা) নিয়ে গেলেন, (তাবারির মতে: হুবালের কাছে) কা'বাঘরে (তাবারির মতে: কা'বার মাঝ-খানে)। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি আল্লাহ্র কাছে শোকর গুযারী করলেন এই অপূর্ব উপহারের জন্য। তারপর বাইরে এসে তাঁকে তাঁর মার কোলে তুলে দিলেন। তিনি তক্ষুণি একজন ধাত্রী-জননীর অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে গেলেন।

বনু সা'দ ইবনে বকরের হালিমা বিনতে আবু যু-আয়বকে বলা হলো তাকে স্তন্যদানের জন্য। আবু যু আয়ব ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে আল-হারিস ইবনে শিজন ইবনে জাবির ইবনে রিজাম ইবনে নাসিরা ইবনে কুসাইয়া ইবনে নসর ইবনে সা'দ ইবনে বকর ইবনে হাওয়াযিন ইবনে মানসুর ইবনে ইকরিমা ইবনে খাসাফা ইবনে কায়েস ইবনে আয়লান।

রসূলের (সা) দুগ্ধ-পিতা ছিলেন আল-হারিস ইবনে আবদুল উজ্জা ইবনে রিফাআ ইবনে মাল্লান ইবনে নাসিরা ইবনে কুসাইয়া ইবনে নসর ইবনে সা'দ ইবনে বকর ইবনে হাওয়াযিন।

তাঁর দুগ্ধ-ভাই ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে আল-হারিস। উনায়সা এবং হুযায়ফা ছিলেন তাঁর দুধ-বোন। হুযায়ফাকে আশ-শায়মা নামে ডাকা হতো। তার নিজের লোকেরা তার ভাল নাম ব্যবহার করত না। এ'রা ছিলেন হালিমা বিনতে আবদুল্লাহ্ ইবনে আল-হারিসের সন্তান। মাতাকে সাহায্য করার জন্য আশ-শায়মা নবী (সা)-কে কোলে রাখতেন বলে জানা যায়।

আল-হারিস ইবনে হাতিব আল-জুমাহির মক্কেল জাহম ইবনে আবু জাহম আমাকে বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর ইবনে আবু তালিব অথবা অন্য একজন বক্তার বরাত দিয়ে যে, নবী (সা)-এর ধাত্রী-জননী হালিমা বলতেন, তিনি স্বামী এবং ছোট বাচ্চা নিয়ে নিজের দেশ থেকে তাঁর গোত্রের অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে লালন করার মতো বাচ্চার অনুসন্ধানে বেরিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য বাচ্চা পেলে তিনি তার ধাত্রী-মা হবেন। দুর্ভিক্ষের বছর ছিল সেটা। তাদের সহায়-সম্বল কিছু ছিল না। কালচে রঙের তার নিজের একটা গাধায় চড়ে তিনি যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিল একটা বুড়ো মাদী-উট। এক ফোঁটা দুধ ছিল না স্তনে তার। ক্ষুধার্ত শিশুর কান্নায় সারারাত কারো ঘুম হয় নি। তাঁর নিজের বুকে দুধ ছিল না, সকালে এক চুমুক দুধও দিতে পারে নি উট।

আমরা আশা করছিলাম বৃষ্টি হবে, ঠাণ্ডা হবে প্রকৃতি। আমি একটা গাধার পিঠে চড়ে যাচ্ছিলাম। এই গাধাটি খুব দুর্বল আর হাড়-জিরজিরে ছিল। ফলে সবকটার পেছনে পড়ে গেছিল। বাকী সবকটার সঙ্গে সমান তালে চলতে পারছিল না বলে অন্যগুলোর অসুবিধা হচ্ছিল। আমরা মক্কায় পে'ীছেই দুগ্ধ-পুত্রের সন্ধানে তৎপর হলাম। রসূলুল্লাহ্‌কে (সা) গ্রহণ করার জন্য সবাইকে অনুরোধ করা হলো। কিন্তু যেই সবাই শুনল, তিনি ইয়াতীম, কেউ তাঁকে নিতে রাযী হলো না। কারণ সবাই শিশুর মা-বাবার কাছ থেকে অর্থ প্রাপ্তির আশায় ছিল।'

আমরা বললাম, 'ইয়াতীম! তাহলে তার মা আর দাদু কি করবে?'

তাকে এইজন্য আমরা কেউ নিতে আগ্রহী হলাম না। আমার সাথে যত মেয়েলোক এসেছিল সবাই একটা করে বাচ্চা পেয়ে গেল। পেলাম না শুধু আমি। অতএব আমরা যাওয়ার জন্য তৈরী হলাম। আমার স্বামীকে আমি তখন বললাম, "আল্লাহ্‌র কসম! সব বন্ধুর সঙ্গে আমিও ফিরে যাবো. সবার বাচ্চা থাকবে, আমার থাকবে না, তা হয় না। আমার ভাল লাগছে না। আমি বরং সেই ইয়াতীম বাচ্চাকেই নেবো।"

তিনি বললেন, "তাই করো তবে। হয়তো তার খাতিরেই আল্লাহ্ আমাদের বরকত দেবেন।"

আমি গিয়ে তাঁকে নিয়ে এলাম। তাঁকে নিলাম আর কাউকে পাই নি বলে। যেখানে মালপত্র রেখেছিলাম ওখানে তাঁকে নিয়ে এলাম। তারপর যেই তাকে কোলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলাম, সমস্ত বুক ভরে গেল দুধ এসে। বুক থেকে দুধ উপছে পড়ছিল আমার। পরম পরিতৃপ্তি ভরে তিনি সে দুধ পান করলেন, ঠাণ্ডা হলেন। কেবল তিনি নয়, তাঁর দুধ-ভাইও দুধ খেয়ে পেট ভরল। তারপর দুজনেই ঘুমালো। অথচ এর আগে আমার বাচ্চা একদম ঘুমোত না। আমার স্বামী উঠে উটের কাছে গেলেন। অবাক কাণ্ড! তার বাঁট ভর্তি দুধ। দুধ দোহন করলেন স্বামী। আমরা দুজনে পেট ভরে তার দুধ খেয়ে সম্পূর্ণ তৃপ্ত হলাম। রাত্রে খুব ঘুম হলো আমাদের।

সকালে স্বামী বললেন, "তুমি জানো হালিমা, তুমি এক প্রিয় বন্ধু গ্রহণ করেছ ?"

আমি বললাম, "আলহামদু লিল্লাহ ! আমার তাই মনে হচ্ছে।"

আমরা রওয়ানা হলাম। আমি আমার গাধার উপর তাঁকে নিয়ে চড়ে বসলাম। এতো বেগে দৌড়াছিল সে, অন্য গাধারা কিছুতেই তার সঙ্গে তাল দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছিল না। তখন আমার সঙ্গীরা বলল, "আরে, কি ব্যাপার ! থামো, আমাদের নিয়ে যাও ! যে গাধা নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলে তুমি, এটা সেই গাধাটা নয় ?"

আমি জবাব দিলাম, "সেটাই তো।"

তারা বলল, "ইয়া আল্লাহ্ এ কি তাজ্জব ব্যাপার। নিশ্চয়ই আচানক কিছু একটা ঘটেছে।"

বনু সা'দের দেশে আমাদের বাড়িতে এলাম আমরা। এত রুক্ষ উষর অনুর্বর দেশ আমি আর কোথাও দেখি নি।

তিনি যতদিন ছিলেন আমাদের সঙ্গে, আমাদের উটগুলো প্রচুর দুধ দিত। সেই দুধ দোহন করে আমরা পেট ভরে খেতাম। অথচ অন্যদের উট একফোঁটা দুধ দিত না। তাদের উটের বাঁটে তাঁরা কিছুই খুঁজে পেতো না। আমাদের লোকজন তখন তাদের রাখালকে বলতো, "কি মুশকিল ! তোমরা আবু যুআয়বের মেয়ের রাখাল যেখানে যায় সেখানে যাও না কেন ?"

তা-ও তারা গিয়ে দেখেছেন। তাদের উটের পাল ফিরে এসেছে পেটের ক্ষুধা পেটে নিয়ে। এক ফোঁটা দুধও তারা দিতে পারত না। অথচ আমার উটগুলোর দুধ ধরে রাখতে পারে না। দুই বছর যে এই দুধ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রেরিত হয়েছিল, সেকথা কোনদিন আমরা ভুলে থাকতাম না। দুই বছর পর তাঁকে স্তন্যদান বন্ধ করলাম।

তিনি বড় হচ্ছিলেন অন্য দশটা ছেলোর মতো নয়। একটু বিশেষ ধরনের। দুই বছর বয়সে বেশ সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন তিনি।

তাঁর দেহ গঠন সুন্দর ছিল। তাঁকে আমরা নিয়ে এলাম তাঁর মার কাছে। অথচ তাঁকে আমরা আমাদের কাছেই রাখতে চেয়েছিলাম। কারণ তিনি আমাদের জন্য বরকত এনেছিলেন।

আমি তাঁর মাকে বললাম, "আমি চাই ছেলে বড় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুক। মক্কায় তো অসুখ বিসুখের মহামারী লেগেই আছে। ওকে এখানে রাখতে আমার ভয় লাগে। ওকে আপনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে দিন।"

আমরা জিদ ধরলাম। জিদ দেখে তিনি রাযী হলেন। তাঁকে আমাদের সঙ্গে ফেরত যেতে দিলেন।

আমরা দেশে ফিরে আসার কয়েকমাস পর। একদিন তিনি আর তাঁর ভাই তাঁবুর পেছন দিকে মেষ চড়াচ্ছিলেন। তাঁর ভাই দৌড়ে এল আমাদের কাছে। বলল, "দুজন লোক, সাদা কাপড় পরা আমার কুরায়শী ভাইকে ধরেছে, ধরে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। মাটিতে ফেলে তার পেট-খুলে ফেলেছে এখন ওরা তার পেটের ভেতর কি যেন নাড়াচাড়া করছে।"

আমরা ছুটে গেলাম সেখানে। দেখলাম, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। চেহারা নীল হয়ে আছে। তাঁকে কাছে টেনে নিলাম, কি হয়েছে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, "সাদা পোশাক পরা দুজন লোক আমাকে মাটিতে ফেলে আমার পেট খুলে ওখানে কি জানি খুঁজেছে। তাঁকে আমরা তাঁবুতে নিয়ে এলাম।

তাঁর আব্বা আমাকে বললেন, "আমার কেমন জানি ভয় হচ্ছে, ছেলে বোধ হয় কোন আঘাত পেয়েছে। কোন কিছু হবার আগেই ওকে নিয়ে যাও, ওর পরিবারের কাছে দিয়ে এসো।

ওকে নিয়ে আমরা ওর মার কাছে চলে গেলাম। তাঁর আম্মা জিজ্ঞেস করলেন, তাঁকে রাখার জন্য এতো শখ ছিল আমাদের, তাঁর ভাল-মন্দের

জন্য এতো উদ্বিগ্ন ছিলাম আমরা, সেই জন্যই তো তখন নিয়ে গেলাম। তাহলে এখন কেন ফিরিয়ে আনলাম।

আমি তাঁকে বললাম, "আল্লাহ্ আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমি আমার কর্তব্য করেছি। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে তাঁর অসুখ হতে পারে। কাজেই আপনার ইচ্ছামতো তাঁকে আপনার কাছেই নিয়ে এলাম।"

তিনি বারবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে জেরা করতে লাগলেন কি হয়েছিল। কিছুতেই আমাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁকে সব বলে ফেললাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁকে কোন জিনে আছর করেছে বলে আমার মনে হয় কিনা। আমি বললাম, হয়। তিনি বললেন, কোন জিনের তার ছেলের কিছু করার ক্ষমতা নেই। কারণ তাঁর সামনে আছে এক বিপুল সম্ভাবনা। তখন তিনি বললেন, পেটে থাকার সময় কেমন করে তাঁর শরীর থেকে একটা আলো নির্গত হতো, সেই আলোতে তিনি বিভাসিত বোসরার প্রাসাদ দেখতে পেতেন। বললেন, তাঁর জন্মের সময় তার কোন কষ্ট হয়নি। এরকম সচরাচর হয় না। জন্মের সময় ছেলে নিচে মাটিতে দুই হাত রেখে উপরে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল।

তিনি বললেন, "ঠিক আছে, তাহলে রেখেই যান ওকে। আপনি শান্তিতে থাকুন।"

সাউর ইবন ইয়াজিদ আমার কাছে আর এক বিবরণ দিয়েছেন। তিনি এটা পেয়েছেন এক জ্ঞানী লোকের কাছ থেকে। সে জ্ঞানী লোক সম্ভবত খালিদ ইবন মা'দান আল-কালাই। তিনি বলেছেন, নবী (সা)-এর সঙ্গীরা তাঁকে ধরেছিলেন নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে। তিনি তখন বলেছিলেন: 'আমার পিতা ইবরাহীম যে জিনিসের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন (তাবারির মতে: আমার ভাই), যীশু যে সুসংবাদের কথা বলেছিলেন, আমি সে-ই। আমি যখন আম্মার পেটে তখন আম্মার শরীর

থেকে এক আলো বেরোত। সেই আলোতে তিনি সিরিয়ার প্রাসাদ দেখতে পেতেন। বনু সা'দ ইবনে বাকর-এর লোকজনের সঙ্গে আমি স্তন্যপান করে বড় হই। একদিন আমার দুধ-ভাইয়ের সঙ্গে আমি তাঁবুর পেছনে মেষ চড়াচ্ছিলাম। তখন সাদা পোশাক-পরা দুজন লোক আমার কাছে এলেন। তাদের সঙ্গে ছিল এক তুষারভর্তি সোনার পাত্র। তারা আমাকে ধরে আমার পেট খুলে ফেললেন। পেট থেকে হৃৎপিণ্ড বের করে তা ভেঙ্গে ফেললেন। ভাঙ্গা কলিজা থেকে কালো একটি বিন্দু বের করে তা ফেলে দিলেন। তারপর তারা সেই তুষার দিয়ে আমার হৃৎপিণ্ড আর পেট ধুয়ে দিলেন। ধুয়ে পরিষ্কার করলেন। তারপর তাদের একজন বললেন, একে এদের আরো দশজনের বিপরীতে ওজন কর। ওরা ওজন করল। দেখা গল আমার ওজন বেশী। এরপর তারা আমাকে অন্য একশজনের বিপরীতে ওজন করলেন, তারপর এক হাজার জনের বিপরীতে ওজন করলেন। এক হাজার জনের চেয়েও আমার ওজন বেশী হল। তিনি বললেন, "ওকে একা থাকতে দিন। আল্লাহ্‌র নামে বলছি, তাকে তার সমস্ত লোকজনের বিপরীতে ওজন করলেও তার ওজন বেশী হবে।"

আল্লাহ্‌র রসূল প্রায়ই বলতেন, এমন কোন নবী নেই, যিনি মেষ চরান নি। সকলে প্রশ্ন করত, 'তাহলে আপনিও কি আল্লাহ্‌র নবী ?'

তিনি বলতেন, 'জি হ্যা।'

আল্লাহ্‌র নবী (সা) তাঁর সঙ্গীদের বলতেন, 'তোমাদের মধ্যে আমি সবচেয়ে ভাল আরব। আমি কুরায়শ বংশের মানুষ। আমি স্তন্যপান করেছি বনু সা'দ ইবনে বাকরদের সঙ্গে।'

কেউ কেউ অন্য একটা কথা বলেন। এর সত্যমিথ্যা আল্লাহ্ জানেন। বলেন, তাঁর ধাত্রীমাতা যখন তাঁকে মক্কায় তাঁর নিজের লোকের কাছে নিয়ে এলেন তখন তিনি ভীড়ের মধ্যে তার কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন হালিমা, কিন্তু কোথাও তাঁকে পেলেন না। তখন তিনি গেলেন আবদুল মুত্তালিবের কাছে।

বললেন, 'আজকে রাতে আমি মুহাম্মদকে নিয়ে এসেছিলাম। মক্কার উত্তরদিকে আমি ছিলাম। তখন কোথায় যে সে চলে গেল, তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি না।'

আবদুল মুত্তালিব গেলেন কা'বাঘরে। প্রার্থনা করলেন তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য।

তারা জোর দিয়ে বলেন, ওয়ারাকা ইবন নওফেল ইবন আসাদ এবং অন্য একজন কুরায়শ তাঁকে পেয়ে আবদুল মুত্তালিবের কাছে নিয়ে এলেন। বললেন, 'আমরা আপনার এই ছেলেকে মক্কার উত্তর দিকে পেয়েছি।'

আবদুল মুত্তালিব তাকে কাঁধে নিলেন. সেই অবস্থায় তাওয়াফ করলেন কা'বাঘর, আল্লাহ্‌র হেফাজতে তাঁকে দেওয়ার কথা বললেন, আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর জন্য প্রার্থনা করলেন। তারপর পাঠিয়ে দিলেন মা আমিনার কাছে।

একজন জ্ঞানী লোক আমাকে বলেছেন, তাঁকে তাঁর আম্মার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার যে কারণ ধাত্রী-মা তাঁর আম্মাকে বলেছিলেন, সেটা ছাড়া তাঁকে ফেরত দেওয়ার আরো কারণ ছিল। কিছুসংখ্যক আবিসিনীয় খৃস্টান তাঁকে স্তন্যত্যাগ করার পর মক্কা থেকে ফিরিয়ে আনার পর তাঁকে দেখেন। তাঁরা তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। তাঁকে খুব গভীর মনোনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করলেন। তারপর ধাত্রী মাকে বললেন, 'এই ছেলেকে আমাদের দেশে আমাদের রাজার কাছে নিয়ে যেতে দিন। এ'র এক মহান ভবিষ্যৎ আছে। এর সম্বন্ধে আমরা সব জানি।

যিনি আমাকে এসব কথা বলেছেন, তিনি আরো বলেছেন, ধাত্রীমা কিছুতেই তাঁকে তাঁদের কাছ থেকে সরিয়ে আনতে পারছিলেন না।

আমিনা মারা গেলেন, রসূল (সা) দাদুর সঙ্গে বাস করতে লাগলেন

রসূল (সা) মা আমিনা বিনতে ওয়াহাব ও দাদু আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে আবদুল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধানে বড় হতে লাগলেন। সুন্দর স্বাস্থ্যবান

চারাগাছের মতো আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁকে সম্মান দেখানোর ইচ্ছার সহযোগে। তিনি যখন ছয় বছরের তখন ইন্তেকাল করলেন আম্মা আমিনা।

আবদুল্লাহ্ ইবন আবু বকর ইবন মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন হাজম আমাকে বলেছেন যে, রসূলের (সা) যখন ছয় বছর বয়স তখন তাঁর আম্মা তাঁকে সঙ্গে করে তাঁর মাতুল বানু আদি ইবন আন-নাজরের বাড়ি থেকে মক্কা ফিরছিলেন। পথে মক্কা এবং মদীনার মাঝখানে আবওয়া-তে আম্মা আমিনা দেহত্যাগ করেন। এখন নবী (সা) রইলেন দাদুর কাছে। সবাই মিলে দাদুর জন্য কা'বার ছায়াতলে তাঁর জন্য একটা বিছানার বন্দোবস্ত করে দিলেন। তাঁর ছেলেরা সেই বিছানার চারধারে বসতেন। শ্রদ্ধা প্রদর্শনের খাতিরে কেউ সে বিছানায় বসতেন না। বালক রসূল (সা) আসতেন। এসে সেই বিছানায় বসতেন। তাঁর চাচারা তাঁকে নিষেধ করতেন এবং তাড়িয়ে দিতেন ওখান থেকে। আবদুল মুত্তালিব এটা লক্ষ্য করলেন। তিনি বললেন, 'আমার ছেলের পেছনে তোমরা লাগবে না। আল্লাহ্র দিব্যি ! তার ভবিষ্যৎ বিরাট।'

তিনি রসূলকে (সা) নিজে নিয়ে বিছানায় বসাতেন, তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতেন। দাদুর এই আদর খুব পছন্দ ছিল তাঁর।

আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যু, তাঁর উপর শোকগাথা

রসূল (সা)-এর বয়স তখন আট বছর। 'হাতীর বছরের' আট বছর পর। তাঁর দাদু সংসারের মায়া কাটালেন। এই তারিখ আমাকে দিয়েছেন আল-আব্বাস ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মা'বাদ ইবনে আল-আব্বাস। আল- আব্বাস এটা জেনেছিলেন তাঁর পরিবারের একজনের কাছ থেকে।

মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবনে আল-মুসাইয়্যির আমাকে বলেছেন যে, আবদুল মুত্তালিব যখন বুঝতে পারলেন মৃত্যু সন্নিকটে, তখন তিনি তাঁর ছয় কন্যাকে ডেকে পাঠালেন। ছয় কন্যা হলেন সাফিয়া, বাররা,

আতিকা, উম্মে হাকিম আল-বায়দা, উমায়মা এবং আরওয়া। তাঁদের তিনি বললেন, 'আমাকে নিয়ে তোমরা শোকগাথা রচনা করো। আমার মৃত্যুর পর তোমরা কে কি বলবে, আমি তা শুনে যেতে চাই।'

পিতার মৃত্যুতে শোক করে সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব বললেন :

মেয়েদের কান্নার শব্দে আমি ঘুমাতে পারি নি,
জীবনের পথের শেষ প্রান্তে যেজন তারি শোকে বিলাপ তাদের,
অশ্রু ঝরছে
আমার গাল বেয়ে মুক্তোর মতো
এক মহৎ লোকের জন্য, কোন অসহায় দুর্বলের জন্য নয়
তাঁর পুণ্য প্রকাশিত সকলের কাছে।
মুক্ত হস্ত শায়বা, মেধাবী তুমি,
ভাল মানুষ তোমার পিতা, অধিকারী সব গুণের,
ঘরেতে বিশ্বস্ত, নন হীনবল,
দাঁড়িয়েছেন ঋজু আত্ম-নির্ভর।
শক্তিমান, ত্রাস-সঞ্চারী, বিশাল,
সবাই মানে তাকে, সব মুখে প্রশংসা তার
বড় বংশের মানুষ তিনি, হাসিমুখ, পুণ্যবান
উটের যখন দুধ থাকে না তখন তিনি ছিলেন বৃষ্টির মতো করুণাময়
বড় মহৎ ছিলেন দাদু তার, কলঙ্কের কোন চিহ্নবিহীন,
দাস কিংবা মুক্ত সকলের উপরে ছিল তার স্থান,
বড় নম্র, মহৎ বংশের সন্তান তিনি,
সে বংশের সবাই ছিলেন উদার-মন, সিংহের মতো বলবান
প্রাচীন গৌরব দিয়ে মানুষ অমর হতে পারতো যদি,
(হায়, অমরত্ব প্রাপ্তব্য নয়।)
তাহলে তিনি তাঁর শেষ রাত্রি অনন্তকাল ধরে রাখতেন
তাঁর অনন্য অতীত গৌরব আর প্রাচীন আভিজাত্যের বদৌলতে।

তাঁর কন্যা বাররা বলেন :

হে চক্ষু দরাজ হও, ধারণ কর মুক্তোর মতো অশ্রু
সেই দরাজ মানুষের জন্য, কোনদিন কোন ভিখারী নিরাশ হয়নি
যার কাছে।
এক মহান জাতির মানুষ তিনি, যে জাতি কর্মে সফল,
অনিন্দিত চেহারার জন তিনি, অতিশয় অভিজাত।
শায়বা, প্রশংসার্হ, মহৎ
গৌরবমণ্ডিত- বলবান, খ্যাতিমান
নম্রকোমল, শতদুঃখে সিদ্ধান্তে অটল
বিশাল উদার মুক্তহস্ত দানে
কীর্তিতে সব মানুষের সেরা মানুষ,
আপন মহিমা নিয়ে ভাস্বর এক চাঁদ যেন।
মৃত্যু তাকে টেনে নিল, ছাড়ল না
পরিবর্তন, সৌভাগ্য এবং নিয়তি তাকে নিয়ে গেল।

তাঁর কন্যা আতিকা বলেন :

অবারিত হও হে নয়ন, কৃপণ হয়ো না
তোমার অশ্রু নিয়ে, অন্যসব ঘুমায় যখন
কাঁদো যত পারো, হে চক্ষু, তোমার অশ্রু দিয়ে,
কাঁদো আর মুখে আঘাত করো।
কাঁদো হে নয়ন দীর্ঘ সময়, অবাধে এবং
তার জন্য যে ছিল না কোন বিশরগ্রস্ত বলহীন,
যে ছিল কঠিন বলবান, প্রয়োজনে উদার-হৃদয়,
উদ্দেশ্যে মহৎ, বিশ্বস্ত ওয়াদায়।
প্রশংসনীয় শায়বা, সফল সমস্ত কাজে
নির্ভরযোগ্য এবং অবিচলিত,
যুদ্ধে সে তীক্ষ্ন তলোয়ার,
যুদ্ধে সে নিপাত করে দুশমন,
সহজ স্বভাব, মুক্তহস্তে,

রাজভক্ত, সন্দেহী, বিশুদ্ধ, ভাল।
তার ঘর উচ্চ সম্মানে সগর্বে স্থাপিত,
সে মহিমা স্পর্শ করে এমন আর কারো সাধ্য নেই।

কন্যা উম্মে হাকিম আল-বায়দা বলেন :

অশ্রু লুকিয়ো না হে নয়ন, কাঁদো অঝোরে,
কাঁদো উদার বিশালের জন্য,
মিনতি করি তোমাকে চক্ষু, অশ্রুর
অনিবার ধারায় সহায় হও আমার।
কাঁদো সর্বোত্তম মানুষের জন্য, চিরকাল
যে পশুর পিঠে চড়েছে
তোমার প্রিয় পিতা, মিষ্টি পানির উৎস যিনি।
পুণ্যবান বিশাল-হৃদয় শায়বা,
মুক্ত মন প্রকৃতি তার, প্রশংসিত দানের জন্য
পুত্র-কন্যার প্রতি অবারিত স্নেহ, সুদর্শন,
খরার বছরে বৃষ্টির মতো বাঞ্ছিত।
বর্শা-নিক্ষেপে সিংহ তিনি
তার সব রমণীকুল গর্বভরে দেখে তাকে।
কিনানার সর্দার তিনি, সকলের আশার স্থল
দুর্দিন যখন বিপদ নিয়ে আসে
যুদ্ধে তিনি পরম আশ্রয়
পরম সহায় বিপদে আর বিপর্যয়ে।
তার জন্য কাঁদো, শোক থামাবে না,
যতদিন দেহে প্রাণ থাকে, ততদিন তোমার রমণীদের
তার জন্য কাঁদতে বলো।

তাঁর কন্যা উমায়মা বলেন :

হায়, চলে গেল তার মানুষের রাখাল, বিরাট-হৃদয়,
হাজীদের যিনি পানি দিয়েছেন, আমাদের সুনামের রক্ষক,

তাঁবুতে তার ডেকে এনেছেন তাবৎ মুসাফির
আকাশ যখন মিতালী করেনি বৃষ্টির সঙ্গে।
কোন মানুষের যত মহত্তম দেল হতে পারে, সব
ছিল তোমার
তোমার যশের খ্যাতি বৃদ্ধি থামেনি কো কোনদিন, হে শায়বা!
দানবীর আবুল হারিস ঘর ছেড়ে চলে গেছেন,
দূরে যেয়ো না, কারণ সমস্ত জীবন্ত বস্তু দূরেই যাবে চলে।
আমি তাঁর জন্য কাঁদব, যতদিন বাঁচি তার বেদনা বহন করব।
তার স্মৃতি আমার বেদনার যোগ্য।
সমস্ত মানুষের প্রভু তোমার কবরে বৃষ্টি ঝরাক,
এই আমার প্রার্থনা!
তিনি কবরের ভেতর শায়িত থাকবেন, তবু আমি
কাঁদব তার জন্য।
তিনি ছিলেন তার সব মানুষের গর্ব,
প্রশংসার কাজের জন্য তিনি প্রশংসা পেয়েছেন।

তাঁর কন্যা আরওয়া বলেন:

কেঁদেছে আমার চোখ, ভাল করে কেঁদেছে সে
আমার সুন্দর স্নেহশীল পিতার জন্য,
মক্কার মধুর স্বভাব মানুষটির জন্য,
মননে মহৎ, লক্ষ্যে উন্নত,
পুণ্যে পূর্ব দানবীর শায়বা;
তোমার পিতার কোন সমকক্ষ নেই,
দীর্ঘ হাত, সুন্দর দীর্ঘকায় দেহ
তার কপালে বিচ্ছুরিত আভা,
সরু কোমর সুদর্শন, পুণ্য প্রাণ
তার ছিল গৌরব, মর্যাদা আর মান,
অন্যায়ে প্রতিবাদমুখর, হাসিমুখ, সক্ষম,

লুকানো যেতো না তার পূর্বপুরুষের নাম,
'মালিকদের আশ্রয় স্থান, ফিহ্‌রের ঝর্ণা,
বিচারের বেলা তার কথা রায় হতো।
তিনি ছিলেন বীর, উদার বিশাল,
রক্তদানের সময় দারুণ সাহসী তিনি,
সশস্ত্র মানুষ মৃত্যুকে করতো ভয়,
প্রায় সব মানুষের প্রাণ কাঁপতো বাতাসে.
উজ্জ্বল ঝকঝকে তরবারি হাতে তিনি এগিয়ে যেতেন,
ধ্রুবতারা তিনি সমস্ত চোখের।

মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ ইবনে আল-মুসাইয়িব আমাকে বলেছেন যে, আবদুল মুত্তালিব ইঙ্গিত দ্বারা প্রকাশ করেছিলেন, তিনি খুশী হয়েছেন। কারণ তিনি তখন কথা বলতে পারতেন না।

বনু আদিই ইবনে কা'ব ইবনে লুআই-র ভাই হুযায়ফা ইবনে গানিম এবং কুসাই ও তার পুত্রদের স্থান কুরায়শদের অনেক উপরে ছিল বলে উল্লেখ করেছিলেন। কারণ, মক্কায় তাঁকে একবার ৪০০০ দির-হামের দেনার দায়ে আটকে রাখা হয়েছিল। আবু লাহাব আবদুল উজ্জা ইবনে আবদুল মুত্তালিব ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সব টাকা প্রদান করে তাঁকে (হুযায়ফাকে) মুক্ত করে এনেছিলেন। হুযায়ফা বলেন:

হে চোখ, অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরতে দাও বুকের উপর দিয়ে
ক্লান্ত হয়ো না, তুমি ধুয়ে যাবে বৃষ্টিধারায়,
অকৃপণ ঢালো অশ্রু তোমার প্রতি ভোরে,
নিয়তি নিষ্কৃতি দেয়নি যাকে, তার জন্য কাঁদো।
যতদিন প্রাণ আছে দেহে অশ্রুর বন্যা বইয়ে দাও
তার উপর কুরায়শদের যে বিনম্র বীর গোপন করে রাখতো
　　　　সব তার মহৎ কাজ
আপন মর্যাদার তিনি দিলেন শক্তিমান ঈর্ষাময় রক্ষক।

সুদর্শন ঠুনকো নয়, নয় অসাড় দম্ভের মানুষ
ছিলেন প্রখ্যাত যুবরাজ তিনি স্নেহশীল উদার হৃদয়
খরায় আর দুর্ভিক্ষে লুআইর বসন্তের বৃষ্টির মতো
মা'দের সুন্দরতম পুত্র
কর্মে, প্রকৃতিতে আর জাতিতে মহৎ
মূলে, শাখায় আর প্রাচীনত্বে সর্বোত্তম।
সুনাম আর সুবংশে সবচেয়ে খ্যাতিমান
গৌরব দয়াধর্ম আর দূরদর্শিতায় প্রথম সারির মানুষ
এবং পুণ্যে যখন দুর্ভিক্ষের দিন করাল ছায়া ছড়ায়।
প্রশংসার মানুষ শায়বার জন্য কাঁদো, তার মুখ
আলোকিত করত কৃষ্ণতম রাত্রি, পূর্ণ চাঁদের মতো,
হাজীদের তিনি পানি খাওয়াতেন, পুত্র তাঁর রুটি বানাতেন
আর ফিহ্‌রি প্রভু আবদু মানাফ
উন্মোচিত করেছিল পবিত্র ঘরের পাশে যমযম
তার হাতে পানি নিয়ন্ত্রণ, সে ছিল যে কোন মানুষের
মহত্তর গর্ব

দুঃখের শিকলে বন্দী সব মানুষকে কাঁদতে দাও তার জন্য
তার জন্য আর কুসাই-র পরিবারের ধনী দরিদ্র সবার জন্য।
ছেলেবুড়ো সব পুত্র তার মহাশয় বটে
শ্যেনের ডিম থেকে ফোটা যেন
কুসাই প্রতিহত করেছিল সব কিনানদের
সম্পদে বিবাদে পাহারা দিয়েছেন কা'বার মন্দির।
নিয়তি তাকে কেড়ে নিয়ে গেছে যদিও
তাঁর ছিল সফল কর্মে সমৃদ্ধ জীবন,
তিনি পেছনে গেছেন রেখে সুসজ্জিত লোক
আক্রমণে দুঃসাহসী অবিকল বর্শারই মতো।
আবু উৎবা আমাকে দান করেছেন
শুভ্রতম সাদা শ্বেত-রক্ত উট।

হাশিমরা ছিলেন আলো দিতে উন্মুখ বিকশিত পূর্ণচাঁদ
পূত পবিত্র, বেঈমানি থেকে মুক্ত।
আর আবদু মানাফ গরিয়ান, আপন ইয্যত রক্ষায় পারঙ্গম
স্বজনের প্রতি দয়ালু, ভদ্র আত্মীয়ের প্রতি।
তারা সব মানুষের সেরা মানুষ
তাদের বাচ্চারা রাজপুত্রের মতো অক্ষয়, অমর।
তাদের বংশের কারো সঙ্গে দেখা হলে
দেখবেন, তারা তদের পূর্বপুরুষেরই অনুগামী।
সব দেশ তারা পূর্ণ করেছেন খ্যাতি দিয়ে, মহিমা দিয়ে
যখন চতুর্দিকে ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর মহৎ কর্ম।
তাদের আছে খ্যাতিমান নির্মাতা, প্রাসাদ
তাদের দাদু আবদু মানাফ ছিলেন তাদের সৌভাগ্যের সংস্কারক,
নিজের মেয়েকে বিয়ে দিলে আউফের সঙ্গে, আমাদের
শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, যখন ফিহ্র
আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল
তার আশ্রয়ে আমরা পথ পার হয়েছি উঁচু নিচু
এমনি করে আমাদের উট সমুদ্র স্পর্শ করেছে।
কিছু ছিল তাদের শহুরে, কিছু বা যাযাবর
বানু আমরের শেখ[১] ছাড়া আর কেউ ছিল না তখন,
অনেক বাড়ি নির্মাণ করেছে তারা, খনন করেছে অনেক কূপ
সে কূপ সমুদ্রের মতো পানি দিতো সদাই
সে পানি ছিল হাজীদের জন্য, সবার জন্য
কুরবানীর পরদিন তারা ছুটে গেছে ওখানে,
তিনদিন ওখানে থাকতো তাদের উট,
হিজরা আর পর্বতের মাঝখানে।
পুরনো দিনে প্রাচুর্য ছিল আমাদের,

১. হাশিমের পুত্রদের কথা বলা হয়েছে এখানে।

খুম অথবা আল-হাফর থেকে পানি পেতাম আমরা।
যে অন্যায়ের শোধ নেওয়া হয়ে গেছে তাকে
ভুলে যেতো তারা।
বাজে অপবাদ নিয়ে মাথা ঘামাতো না তারা,
সমস্ত মিত্রকে জড়ো করত তারা
বানু বকরের অত্যাচার থেকে রক্ষা করত।
হে খারিজা[১], আমি মরে গেলেও, তাদের প্রতি শোকরিয়া জানাবে
কৃতজ্ঞ থাকবে কবরে প্রবেশের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত,
আর ইবনে লুবনার দয়ার কথা ভুলবে না,
সে দয়া তোমার কৃতজ্ঞতার যোগ্য।
তুমি ইবনে লুবনা, তুমি তো কুসাই-রই বংশধর,
হিসেব করলেই তা জানবে,
কুসাই, যেখানে মানুষের সর্বোচ্চ আশা পরিপূর্ণ হয়েছিল,
নিজে তুমি গৌরবের উচ্চতম শিখায় উত্তীর্ণ বলে
তার সঙ্গে নিজকে যুক্ত করেছে শৌর্যের শিকড়ে।
দানে তোমার সমস্ত লোককে অতিক্রম করে, বালক হিসেবে
তুমি সব হৃদয়বান নেতাকে হার মানিয়েছিলে।
তোমার মা নিশ্চয়ই খুজাআ-র খাঁটি মুক্তো হবেন
যদি কোনদিন অভিজ্ঞ বংশবেত্তা বংশ তালিকা তৈরী করেন।
তারা দেখবেন, শেবার বীর পরিবারে তার জন্ম, আসলেও তাই।
ঔজ্জ্বল্যের চূড়ান্তে ছিল তার মহান বংশ!
আবু শামির ছিলেন সেই বংশের, ছিলেন আমর বিন মালিক,
ছিলেন যু জাদান আর আবুল জাবর এবং
আসাদ, যিনি সবাইকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিশ বছর,
নিয়ে এসেছিলেন অনেক বিজয়ের মাল্য।

আবদুল মুত্তালিব ও আবদু মানাফের পুত্রদের জন্য শোক করতে গিয়ে খুজায়ি মাতরুদ ইবনে কা'ব বলেছেন ঃ

১. খারিজা ইবনে হুযায়ফা।

নিয়ত পথ বদল-করা হে পথিক,
তুমি আবদ্ মানাফের বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করোনি কেন কাউকে ?
হায় আল্লাহ্, তাদের বাড়িতে যদি তুমি থাকতে
আপদ অথবা বাজে বিবাহের হাত থেকে তারাই তোমাকে বাঁচাতো।
তাঁদের ঐশ্বর্য মিশে থাকে দরিদ্রের মধ্যে,
সুতরাং তাদের দরিদ্র থাকে তাদের বিত্তবান হয়ে।
দুর্দিনেও দানশীল ছিল তাঁরা,
তারা কুরায়শদের কারাভাঁর সাথে চলে,
ঝড়ের দিনে মানুষকে আহার দেয় তারা
সমুদ্রে সূর্য ডুবে যাওয়া ইস্তক।
তুমি যখন বিলীন হয়ে গেছো হে মহান কর্মের মানুষ,
কোনদিন কোন রমণী তোমার মতন অমন গলার হার পরেনি আর[১]
সেই সহৃদয়ে তোমার পিতা ছাড়া,
তার মেহমানদের পিতা আবদুল মুত্তালিব ছাড়া।

আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আল-আব্বাস যমযম এবং হাজীদের পানি সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইসলাম প্রবর্তনের সময়েও এই দায়িত্ব তাঁর হাতেই ছিল। রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর এই অধিকার কায়েম করে দেন। এই কর্তব্য এখন পর্যন্ত আল-আব্বাসের বংশধরদের হাতেই রয়েছে।

আবু তালিব নবী (সা)-এর অভিভাবক হলেন

আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর রসূল (সা) চাচা আবু তালিবের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। কারণ (তাঁরা দাবি করেন), আবদুল মুত্তালিব নাকি তাকেই তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন রসূল (সা) এর পিতা আবদুল্লাহ্ এবং আবু তালিব একই মায়ের গর্ভজাত ভাই

১. অর্থাৎ অমন সন্তান কোন রমণী জন্ম দেয় নি আর।

ছিলেন বলে। তাঁদের আম্মা ছিলেন ফাতিমা বিনতে আমর ইবনে আবদ্ ইবনে ইমরান ইবনে মাখজুম। দাদুর মৃত্যুর পর আবু তালিব তাঁর দেখাশোনা করতেন। তিনি তাঁর পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিলেন।

ইয়াহিয়া ইবনে আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আল-জুবায়র আমাকে বলেছেন যে, তাঁর আব্বা তাঁকে বলেছিলেন যে, লিহ্ব নামে তখন একজন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ছিলেন। যখনই তিনি মক্কায় আসতেন কুরায়শরা তাঁদের ছোট ছেলেদের নিয়ে তাঁর কাছে যেতো তাদের ভাগ্য গণনা করে দেওয়ার জন্য। বালক রসূল (সা)-কে আবু তালিব অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে তাঁর মাকে নিয়ে এসেছিলেন। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা তাঁকে দেখলেন বালকের মধ্যে কি যেন একটা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি অন্য-মনস্ক হয়ে গেলেন। একটু সামলে নিয়ে তিনি চীৎকার করে উঠলেন, 'ওই ছেলেকে আমার কাছে নিয়ে আসুন।'

ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার মধ্যে আগ্রহের আধিক্য দেখে বিচলিত হলেন আবু তালিব। তিনি তাঁকে আড়াল করে রাখলেন। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা বলতে লাগলেন, 'এটা কী রকম ব্যবহার। বলছি, ওই যে ছেলেটাকে এক্ষুনি আমি দেখলাম, ওকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসুন। আমি ওর মধ্যে এক বিরাট ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি।'

কিন্তু আবু তালিব ওখান থেকে চলে গেলেন।

বাহিরার গল্প

আবু তালিব স্থির করলেন, বাণিজ্যের কাফেলা নিয়ে তিনি সিরিয়া যাবেন। সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হলো। তখন বালক রসূল (সা) তাঁকে আঁকড়ে ধরে রইলেন, কিছুতেই তাঁকে ছাড়বেন না। বায়না ধরলেন, তিনিও যাবেন তাঁর সঙ্গে। আবু তালিবের তখন মায়া লাগল। বললেন, ঠিক আছে, তাঁকে তিনি সঙ্গে নেবেন। কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যেন কিছুতেই দুজনের ছাড়াছাড়ি না হয় কখনো।

কারাভাঁ পেঁৗছল সিরিয়ার বোসরা-তে। বোসরায় একটি নিভৃত ঘরে থাকতেন বাহিরা নামে এক সাধু। খৃস্টানদের সম্বন্ধে অনেক জানাশুনা ছিল তাঁর। ওই নিভৃত কক্ষে সব সময় কোন-না-কোন একজন সাধু থাকতেন। ওই ঘরে ছিল একটি গ্রন্থ। তাঁরা দাবি করেন, তিনি সেই গ্রন্থ পাঠ করে করে অনেক জ্ঞান আয়ত্ত করতেন। বংশানুক্রমে এই গ্রন্থ সাধু থেকে সাধুর হাতে যেতো। অতীতে আবু তালিবদের কাফেলা বহুবার যাতায়াত করেছে এই পথে। কিন্তু কোনদিন সাধু তাদের সাথে কোন কথা বলেন নি। কথা বলা দূরের কথা, মুখ তুলে তাদের তাকিয়ে পর্যন্ত দেখেন নি। কিন্তু এবার তাঁরা যখন থামলেন ওখানে, সাধু বিরাট এক ভোজের আয়োজন করলেন। এর কারণ হিসেবে দাবি করা হয় যে, নিভৃত কক্ষে বসে সাধু কিছু একটা দেখছিলেন। তাঁরা দাবি করেন, কারাভাঁ যখন এগিয়ে আসছিল, তখন ঘরে বসেই সাধু রসূল (সা)-কে দেখতে পেয়েছিলেন। দেখতে পেয়েছিলেন সমস্ত লোকের মধ্যে সেই তাঁর উপরে একটি মেঘ তাঁকে ছায়া দিয়ে দিয়ে আসছে। কারাভাঁ এসে থামল সাধুর কাছাকাছি একটা গাছের নিচে।

সাধু দেখলেন গাছের উপরে ছায়া ধরে আছে সে মেঘ। নুয়ে পড়েছে গাছের শাখা-প্রশাখা। রসূল (সা) ছায়ার ভেতরে প্রবেশ করার আগে অবনত হয়েছিল ডালপালা। বাহিরা সেটা লক্ষ্য করলেন। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, তাদের[১] বলে পাঠালেন, 'হে কুরায়শগণ, আমি আপনাদের সবার জন্য খাবার তৈরী করেছি। ছোট-বড়, মুক্ত কি দাস-আপনারা সবাই আসুন।'

তাদের একজন বলল, 'আল্লাহ্‌র কসম বাহিরা, আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। আজকে নিশ্চয়ই অসাধারণ কিছু একটা ঘটেছে। এদিক দিয়ে আপনার পাশ দিয়ে কতোবার আমরা যাওয়া-আসা করেছি, কিন্তু কোন দিন তো এমন খাতির করেন নি আমাদের। কি হয়েছে আজকে?'

১. তাবারির মতে, তাদের সবাইকে দাওয়াত দিয়ে পাঠালেন।

বাহিরা বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনারা আমার মেহমান। আপনাদের আমি খেদমত করতে চাই। আপনাদের কিছু খাওয়ার আয়োজন করেছি আমি।'

সবাই তাঁর কাছে গিয়ে জড়ো হলেন। গাছের নিচে মালপত্রের কাছে রইলেন রসূল (সা)। তিনি ছোট মানুষ, তাই।

বাহিরা সবাইকে দেখলেন। কিন্তু যে চিহ্ন তিনি চিনতেন, গ্রন্থে পড়েছেন, সে চিহ্ন তাদের কারো মধ্যে দেখতে পেলেন না। তখন তিনি বললেন, 'কাউকে ফেলে আসবেন না, কেউ যেন আমার ভোজ থেকে বাদ না পড়ে।'

তারা বলল, যাদের আসবার সবাই এসেছে, কাউকে ফেলে আসা হয় নি। তবে একটা ছেলেকে তাদের মালপত্রের কাছে রেখে এসেছেন। সে অল্প বয়সী, বয়সে এখানে সবার চেয়ে ছোট। সাধু বললেন, তাকেও ডেকে আনা হোক। একসঙ্গে বসে সে-ও খাবে। কুরায়শদের একজন বলল, 'আল-লাত ও আল-উজ্জার দোহাই লাগে, আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের ছেলেকে আমরাই রেখে এসেছি। আমাদেরই দোষ।

বাহিরা তাঁকে দেখলেন। তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে অপলকে। তাঁকে দেখছেন তন্ন তন্ন করে। তাঁর দেহে খৃস্টান গ্রন্থে যে বর্ণনা তিনি পড়েছেন, তার চিহ্ন খুঁজছেন।

খাওয়া সারা হলে সবাই চলে গেল। বাহিরা উঠে দাঁড়ালেন, রসূলকে-(সা) বললেন, 'বৎস, আল-লাত আর আল-উজ্জার নামে তোমাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব, তুমি তার জবাব দেবে।'

বাহিরা এই দুটি দেবতার নাম নিয়ে কথাটি বলেছিলেন, কারণ তিনি এদের নামে কসম খেতে তাদের শুনেছিলেন। লোকে বলে, রসূল (সা) নাকি তাঁকে বলেছিলেন, 'আল-লাত আর আল-উজ্জার নামে দিব্যি নিয়ে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আল্লাহ্‌র কসম, এই দুটির মতো এমন ঘৃণ্য আর কিছু নেই।'

বাহিরা বললেন, 'বেশ, তাহলে আল্লাহ্‌র কসম, যা জিজ্ঞেস করি তার জবাব দাও।'

রসূল (সা) বললেন, 'আপনার যা খুশি আমাকে জিজ্ঞেস করুন।'

বাহিরা তখন রসূল (সা)-কে নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। জাগরণে কি হয় তাঁর, কি হয় নিদ্রায়, তাঁর অভ্যাস, তাঁর সাধারণ কার্যাবলী, চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন। যে উত্তর বাহিরা তাঁর কাছ থেকে পেলেন, তার সঙ্গে গ্রন্থে প্রাপ্ত বর্ণনা মিলে গেল। বাহিরা অতঃপর রসূল (সা)-এর পেছন দিকে তাকালেন। দেখলেন, গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী দুই কাঁধের মাঝখানে নবুয়তের চিহ্ন আছে ঠিক।

বাহিরা গেলেন আবু তালিবের কাছে। জিজ্ঞেস করলেন, এই বালক তার কি হয়। আবু তালিব বললেন, সে তাঁর পুত্র। বাহিরা বললেন, তা তো হতে পারে না। এর পিতা এখন জীবিত থাকার কথা নয়। আবু তালিব বললেন, 'সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র।'

বাহিরা এর পিতার কথা জিজ্ঞেস করলেন। আবু তালিব জানালেন, ওর জন্ম হওয়ার আগেই তিনি মারা গেছেন। বাহিরা বললেন, 'সত্য, আপনি সত্য কথা বলেছেন। আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিয়ে দেশে ফিরে যান। তাকে য়াহুদীদের নজর থেকে সাবধানে রাখবেন। কারণ আল্লাহ্‌র কসম। একে যদি তারা দেখে, আর এর সম্বন্ধে আমি যা জানি তা জানে তাহলে ওরা এর ক্ষতি করবে। এক মহান ভবিষ্যৎ আছে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের সামনে। শীঘ্র ওকে দেশে নিয়ে যান।'

সিরিয়ায় বাণিজ্যকর্ম শেষ করে চাচা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে চলে এলেন মক্কায়। লোকে বলে, সেই সফরেই আহলে কিতাব জুরায়র, তামাম এবং দারিস রসূল (সা)-এর মধ্যে বাহিরা যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁরা তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাহিরা তাদের প্রতিহত করেছিলেন। তাদের ঈশ্বরের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তাঁর বর্ণনা আছে সব পবিত্র ধর্মগ্রন্থে।

তাঁরা তাকে ধরে নিতে চাইলেও তা তারা পারবে না। সহজে বাহিরা তাদের ছাড়লেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাঁর কথার সত্যতা অনুধাবন করতে পারলেন। তখন তাঁরা চলে গেলেন।

রসূল (সা) বড় হতে লাগলেন। আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করলেন। নাস্তিক-দের সমস্ত বদনজর এবং অশুভ ইচ্ছার হাত থেকে তিনি তাঁকে বাঁচিয়ে রাখলেন। কারণ নবুয়তের সম্মান প্রদান করতে হলে তাঁকে তাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবেই। তারপর যথাসময়ে রসূল (সা) তাঁর লোক-জনের মধ্যে পরিণত হলেন সবচেয়ে পৌরুষমণ্ডিত, সবচেয়ে সচ্চরিত্র, সবচেয়ে সদ্বংশ সজ্জাত, সর্বোত্তম প্রতিবেশী, সর্বাধিক দয়ালু, সত্যবাদী, নির্ভরযোগ্য এক মানুষে। সর্বপ্রকার আবিলতা এবং দুষ্ট নৈতিকতা থেকে তিনি অনেক দূরে অবস্থান করতেন। তাঁর উন্নত চরিত্র আর বংশের আভিজাত্যের ফলে এতগুলো গুণের তিনি অধিকারী হয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে এইসব গুণে গুণান্বিত করেছিলেন বলে, সবাই তার নাম দিয়ে-ছিল, 'আল-আমীন'—বিশ্বাসী। সেই নাস্তিকতার দিনগুলোয় তাঁর শৈশবে আল্লাহ্ কেমন করে তাঁকে রক্ষা করতেন, তা রসূল (সা) বলতেন বলে আমাকে বলা হয়েছে। তিনি বলতেন, 'কুরায়শ ছেলেরা পাথর নিয়ে খেলত। সাধারণত সব ছেলেরা এ খেলা খেলে। আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম। আমরা সবাই পরনের পিরহান খুলে গলায় ঝুলিয়ে পাথর বহন করতে লাগলাম। ওদের মতো আমিও দৌড়াদৌড়ি কর-ছিলাম এদিক-ওদিক একদিন: আমি তাকে দেখতে পাই নি, কে একজন অদৃশ্য আমার গালে জোরে চড় মারল এবং বলল, "কাপড় পরো।" গালে আমি ব্যথা পেলাম। আমি কাপড় পরে ফেললাম। তারপর ঘাড়ে পাথর বহন করে বেড়াতে লাগলাম অন্যদের মত। ওখানে কেবল আমার পরনেই পিরহান ছিল, অন্য কোন সঙ্গীর ছিল না।

ফুজ্জার বা অন্যায় যুদ্ধ

নবী করীম (সা)-এর কুড়ি বছর বয়সের সময় এই যুদ্ধ হয়। এবম্বিধ নামকরণের কারণ হলো, দুটি গোত্র—কিনানা আর কায়েস আয়লান

পবিত্র মাসে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল। কুরায়শ ও কিনানা গোত্রের নেতা ছিলেন হারব ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদু শাম্‌স। প্রথম দিকে যুদ্ধ কায়েসের অনুকূলে যাচ্ছিল। কিন্তু দুপুরে যুদ্ধ শেষ হলো, জয়লাভ করল কিনানা।

রসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজাকে বিয়ে করলেন

খাদীজা ছিলেন এক ধনবতী ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্না ব্যবসায়ী মহিলা। খাদীজা লোক নিয়োগ করতেন দেশের বাইরে মালামাল নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেই লোককে দেওয়া হতো লাভের একটা অংশ। রসূল (সা) এর সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা এবং তাঁর আত্মমর্যাদা সম্পন্ন চরিত্রের কথা তাঁর কানে এলো। তিনি তাঁকে ডেকে আনলেন, প্রস্তাব দিলেন, তিনি যদি তাঁর মাল নিয়ে সিরিয়া যান, বাণিজ্য করে আসেন তাহলে অন্যদের যা দিয়ে থাকেন তার চেয়ে বেশী অংশ তাঁকে দেবেন। তাঁর সঙ্গে যাবে মায়সারা নামে তাঁর এক দাস ছোকরা। রসূল করীম (সা) সেই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তাঁরা রওয়ানা হলেন এবং এক সময় সিরিয়া এলেন।

এক সাধুর কুটিরের কাছাকাছি একটি গাছের ছায়ায় রসূল করীম (সা) থামলেন বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সাধু। মায়সারাকে জিজ্ঞেস করলেন—গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছে লোকটা কে। মায়সারা জবাব দিল, ইনি কুরায়শ বংশের লোক। কুরায়শদের হাতে কা'বাঘরের দেখাশোনার দায়িত্ব।

সাধু খুব অবাক হলেন, বললেন এই গাছের নিচে নবী ছাড়া অন্য কেউ কোনদিন বসে নি।

যা কিছু নিয়ে এসেছিলেন সব বিক্রি করলেন নবী (সা)। যা কিছু কিনবার কথা ছিল সব কিনলেন। তারপর শুরু হলো মক্কায় প্রত্যা-গমন। কথিত আছে, ভরদুপুরের প্রখর তাপে রসূল (সা) যখন জন্তুর পিঠে চড়ে যাচ্ছিলেন, তখন মায়সারা দেখল, দুজন ফিরিশতা সূর্য তাপ থেকে রসূল (সা)-কে ছায়া দিয়ে যাচ্ছে। খাদীজার জন্য যে তেজারতির

মালামাল তিনি নিয়ে এসেছিলেন, তা বিক্রি করার ফলে দ্বিগুণের মতো লাভ হলো। মায়সারা খাদীজাকে রসূল (সা)-কে দুই ফিরিশতার ছায়াদান এবং সাধুর উক্তির কথা বলল। এই খাদীজা ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা, সম্ভ্রান্ত এবং তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্না। তার সঙ্গে আল্লাহ্ তাঁকে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক করে তাঁকে সম্মানিত করে রেখেছিলেন। মায়সারার কাছে এইসব বৃত্তান্ত শুনে তিনি রসূল (সা)-কে ডেকে আনলেন। তারপর তিনি—তাকে নাকি—বললেন: আপনি সম্পর্কে আমার ভাই হন। আমাদের সম্পর্ক আর সমাজে আপনার বিপুল সুনাম, আপনার বিশ্বস্ততা, সুন্দর চরিত্র এবং সত্যবাদিতার জন্য আপনাকে আমার ভালো লাগে।'

তারপর খাদীজা বিয়ের প্রস্তাব দিলেন।

খাদীজা তখন ছিলেন কুরায়শদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজাত, সবচেয়ে মর্যাদাবান এবং সবচেয়ে বিত্তশালী মহিলা। তাঁর সম্পদে লোভ সবার ছিল তখন। কোনমতে তাঁর সম্পদ হস্তগত করার দিকে সবার ঝোঁক ছিল।

খাদীজার পিতা ছিলেন খুয়ায়লিদ ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উজ্জা ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লুআই ইবনে গালিব ইবনে ফিহ্র। তাঁর আম্মা ছিলেন ফাতিমা বিনতে জায়দা ইবনে আল-আসাম্ ইবনে রাওয়াহা ইবনে হাযার ইবনে আবদ ইবনে মাইস ইবনে আমির ইবনে লুআই ইবনে গালিব ইবনে ফিহ্র। তার আম্মার আম্মা ছিলেন হালা বিনতে আবদু মানাফ ইবনে আল-হারিস ইবনে আমর ইবনে মুনকিয ইবনে আমর ইবনে মাইস ইবনে আমির ইবনে লুআই ইবনে গালিব ইবনে ফিহ্র। হালার মা ছিলেন কিলাবা বিনতে সুয়ায়দ ইবনে সা'দ ইবনে সাহ্ম ইবনে আমর ইবনে হুসায়স ইবনে কা'ব ইবনে লুআই ইবনে গালিব ইবনে ফিহ্র।

খাদীজার প্রস্তাবের কথা রসূল করীম (সা) তাঁর চাচাদের গোচরে আনলেন। চাচা হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব খুয়ায়লিদ ইবনে আসাদের কাছে গিয়ে রসূল (সা)-এর জন্য খাদীজার পাণি প্রার্থনা করলেন। তাঁদের বিয়ে হয়ে গেল।

ইবরাহীম ছাড়া রসূল করীম (সা)-এর অন্য সমস্ত সন্তানের মাতা ছিলেন খাদীজা। তাঁরা হলেন আল-কাসিম (এজন্য তিনি আবুল কাসিম নামেও পরিচিত হতেন), আত্-তাহির, আত্-তাইয়িব, যয়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম এবং ফাতিমা।

আল-কাসিম, আত্-তাইয়িব এবং আত্-তাহির প্রাক-ইসলাম সময়ে ইন্তেকাল করেন। অন্যদের সবাই ইসলামের সময় পর্যন্ত বেঁচেছিলেন, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং পিতার সঙ্গে মদীনায় হিজরত করেছিলেন।

ওয়ারাকা ইবনে নওফেল ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উজ্জা ছিলেন খাদীজার চাচাতো ভাই। ইনি খৃস্টান ছিলেন। ইনি ধর্মগ্রন্থ বাইবেল পাঠ করতেন এবং খুব পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। দাস মায়সারা সিরিয়া থেকে এসে রসূল সম্পর্কে সাধুর উক্তির কথা, ফিরিশতার রোদে ছায়া দেওয়ার কথা ইত্যাদি যা তাকে বলেছিল, খাদীজা ওয়ারাকাকে তা সবিস্তারে বললেন।

ওয়ারাকা বললেন, 'যা বললে তা যদি সত্য হয়, তাহলে জানবে মুহাম্মদ নিশ্চয়ই এই জাতির পয়গাম্বর। আমি জানতাম এই জাতির মধ্যে একজন নবী আসার কথা আছে। তার আসার সময় হয়েছে। অথবা এই ধরনের কিছু। তার জন্য অপেক্ষা করতে করতে আসলে ওয়ারাকা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি প্রায়ই প্রশ্ন করতেন, 'আর কতো দিন?' এই বিষয়ে তাঁর কিছু রচনা নিম্নরূপ ঃ

একটি উৎকণ্ঠা আমার মধ্যে ছিলই, ছিল এবং বারবার
তার কথা মনে পড়তো, মনে পড়ে মাঝে মাঝে কান্না আসতো। এবং
তার সমর্থনে সাক্ষ্য আসছে খাদীজার কাছ থেকে।
অনেক প্রতীক্ষা করতে হয়েছে আমার, খাদিজা,
মক্কার উপত্যকায়. আশায় আশায়,
আশা, একদিন দেখব তোমার কথা সত্য হয়েছে।
যে সাধুর কথা তুমি বলেছিলে, তার বাক্য

মিথ্যে হলে আমি সইতে পারবো না, তার বাক্যঃ

মুহম্মদ আসবেন আমাদের রাজা হয়ে,
যারা তাকে বাধা দেবে, সবাইকে তিনি পরাজিত করবেন।
এই দেশে আলো আসবে এক অপূর্ব মহান
মানুষকে উদ্ধার করবে বিশৃংখলা থেকে।
তাঁর শত্রুরা বিপর্যস্ত হবে,
মিত্ররা বিজয়ী।
তা দেখার জন্য আমি যেন বেঁচে থাকি,
কেননা আমিই হবো তাঁর প্রথম সমর্থক,
তা-ই করবো যা ঘৃণা করে কুরায়শরা,
তা সে তাদের মক্কায় যতই চীৎকার করুক না তারা।
তাঁকে তারা ভালবাসবে না, আমি তাঁকে ধরে উঠব
সিংহাসনের প্রভুর কাছে, তারা নিচেই থাকবে পড়ে, থাকুক না।
যিনি তাঁকে নির্বাচন করলেন, যিনি তারকালোকের উচ্চতায় উত্থিত,
তাকে বিশ্বাস না করা কি নির্বোধের কাজ ?
তারা এবং আমি যদি বেঁচে থাকি, কিছু কাজ করা হবে,
অবিশ্বাসীরা পতিত হবে প্রচণ্ড সংকটে।
আর যদি মরে যাই, কি আর হবে,
মানুষের নিয়তিই হলো
মৃত্যু আর বিচ্ছেদ বরণ করা।

রসূল করীম (স)-এর মধ্যস্থতায় কা'বাঘর পুনর্নির্মাণ

রসূল করীম (সা)-এর বয়স পঁয়ত্রিশ।

কুরায়শরা ঠিক করলেন তাঁরা পুনর্নির্মাণ করবেন কা'বঘর (তাবারি বলেছেন, ফুজ্জোর যুদ্ধের পনেরো বছর পর)। ঘরের ছাদ নির্মাণ করার পরিকল্পনা করছিল তারা, অথচ ভয় পাচ্ছিল, তা করতে গেলে সমস্ত ঘর আবার ভেঙ্গে না পড়ে। এক মানুষের চেয়ে উচু শিথিল গাঁথুনির

পাথরে প্রস্তুত দেয়াল। তাদের ইচ্ছা, উঁচু করবে ঘর এবং তাতে ছাদ বসাবে। এর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, কারণ কা'বাঘরের মাঝখানে একটি গর্তের ভেতরে কা'বাঘরের ধনরত্ন থাকত। তার কিছু কিছু এর মধ্যে চুরি হয়ে গিয়েছিল। চুরি-হওয়া ধনরত্ন পাওয়া গিয়েছিল খুজাআ-র বানু মুলাই ইবনে আমরের এক মুক্ত দাস দুওয়ায়েকের কাছে। কুরায়শরা তার হাত কেটে দিয়েছিল। তারা বলে, যারা প্রকৃতপক্ষে চুরি করে নিয়েছিল ধনরত্ন, তারা দুওয়ায়েকের কাছে তা গচ্ছিত রেখেছিল।

(তাবারি বলেন, এই চুরির জন্য সন্দেহ করা হয়েছিল আল-হারিস ইবনে আমির ইবনে নওফেল, আবু ইহাব ইবনে আজিজ ইবনে কায়েস ইবনে সুওয়ায়েদ আত্-তামিমি এবং আবু লাহাব ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে। প্রথম দুজনের মা এক ছিল। কুরায়শরা অভিযোগ করেন, কা'বার ধনরত্ন এরাই সরিয়ে নেয় এবং বানু মুলাইয়ের মুক্ত দাস দুওয়ায়েকের কাছে গচ্ছিত রাখে। কুরায়শরা যখন তাদের সন্দেহ করল, তারা দুওয়ায়েকের নাম বলে দিল। কাজেই হাত কাটা গেল দুওয়ায়েকের। একথা তখন বলা হতো যে, তারা তার কাছেই রেখেছিল রত্নরাজি। লোকে বলে, তারপর কুরায়শরা যখন নিশ্চয় করে জানল ধনরত্ন আছে আল-হারিসের কাছেই, তখন আল-হারিসকে তারা নিয়ে গেল এক আরব মেয়ে যাদুকরের কাছে। মন্ত্র পড়ে সে যাদুকর রায় দিল, দশ বছর এই লোক মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না, কারণ সে কাবাঘরের পবিত্রতাকে অবমাননা করেছে। তারা দাবি করে, তাকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল—মক্কার বাইরে কোথাও সে দশ বছর যাপন করে।

এক গ্রীক বণিকের একটি জাহাজ জেদ্দায় চড়া আটকে যায় এবং সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ওরা এর কাঠ সংগ্রহ করে নিল কা'বার ছাদ দেওয়ার জন্য। দৈবক্রমে তখন মক্কায় একজন মিসরীয় খৃস্টান সূত্রধর ছিলেন। কাজেই আয়োজন সব হাতের কাছে তৈরী ছিল। এদিকে যে গর্তের ভেতর পবিত্র মানত ও নৈবেদ্য নিক্ষেপ করা হতো, তার ভেতরে বাস করত এক সাপ। প্রতিদিন সে গর্ত থেকে এসে কা'বাঘরের দেয়ালের সঙ্গে বসে

রোদ পোহাতো। সে এক ভীষণ বিভীষিকার বস্তু ছিল। কেউ তার কাছে এলেই সে ফণা তুলে একটা মচমচে আওয়াজ তুলত এবং মুখ হা করে থাকত। ওরা সব ভয়ে পালাতো। একদিন এমনি করে রোদ পোহাচ্ছিল সেই সাপ। তখন আল্লাহ্ একটা পাখি পাঠালেন। পাখি ছোঁ মেরে সাপটাকে তুলে নিয়ে চলে গেল। তখন কুরায়শরা বলল, 'এখন আমরা বলতে পারি আমরা যা করতে চাচ্ছি তাতে আল্লাহ্ রাযী আছেন। আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের দোস্ত মিস্ত্রী সাহেব, কাঠ পেয়ে গেছি, সাপও নিয়ে গেছে আল্লাহ্।'

ওরা স্থির করল পুনর্নির্মাণ-ই করবে কা'বাঘর। আগেরটা ভেঙ্গে ফেলবে। আবু ওহাব ইবনে আমর ইবনে আইয ইবনে আব্দ ইবনে ইমরান ইবনে মাখযুম উঠে গিয়ে কা'বা থেকে একটা পাথর তুলে আনল। তুলে আনতেই পাথরটা হাত থেকে আপনাআপনি ফসকে গিয়ে আপন জায়গায় ফিরে গেল। তিনি তখন বললেন, 'কুরায়শগণ, এই ঘরের ভেতর তোমরা অন্যায়ভাবে অর্জিত অর্থ, বেশ্যার উপার্জন, সুদের টাকা, অন্যায়ভাবে বা ছিনিয়ে নেওয়া কোন কিছু আনতে পারবে না।' লোকে বলে, এই কথা নাকি বলেছিলেন আল-ওয়ালিদ ইবনে আলমুগিরা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর ইবনে মাখযুম।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু নাজিহ্ আল মাক্কি আমাকে বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া ইবনে খালাফ ইবনে ওয়াহাব ইবনে হুযায়ফা ইবনে জুমাহ্ ইবনে আমর ইবনে হুসায়স ইবনে কা'ব ইবনে লুআই-র বরাত দিয়ে তাকে বলা হয়েছে যে, তিনি জা'দা ইবনে হুবায়রা ইবনে আবু ওয়াহাব ইবনে আমরের একটা ছেলেকে দেখলেন কা'বাঘর তওয়াফ করতে। ছেলেটা কে জিজ্ঞেস করলে—তাঁকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করা হলে—তার পরিচয় দেওয়া হলো। আবদুল্লাহ্ ইবনে সাফওয়ান বললেন, 'কুরায়শরা যখন কা'বাঘর ভেঙ্গে আবার নির্মাণ করতে গেলেন তখন এরই (আবু ওয়াহাব-এর) দাদু কা'বা থেকে একটা পাথর উঠিয়ে নিয়েছিলেন, সে পাথর তার হাত থেকে ছিটকে গিয়ে

চলে গিয়েছিল তার আপন জায়গায়। এই একটু আগে যে কথাগুলো উদ্ধৃত করা হলো, এগুলো তাঁরই কথা।'

আবু ওয়াহাব ছিলেন রসূলে করীম (সা)-এর পিতার মামা। তিনি একজন অভিজাত লোক ছিলেন। এক কবি তার সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ

আবু ওয়াহাবের দরজায় আমার উটকে যদি হাঁটু ভেঙ্গে বসাই,
তার জিনের থলে কানায় কানায় পূর্ণ করে সে কালকের যাত্রা
আজকেই শুরু করে দেবে।
লুআই ইবনে গালিব বংশের দুই শাখায় সবচে'
শরীফ ছিলেন তিনি,
এটা হলো শরাফতির কথা
অন্যায় সহ্য করতেন না কখ্খনো, দানে পেতেন আনন্দ তার পূর্বপুরুষ,
সবচেয়ে শরীফ বংশের মানুষ ছিলেন তাঁরা।
তার চুলার নিচে ছাইয়ের বিরাট স্তূপ,
রুটির থালার উপরে সাজিয়ে দিতেন সুস্বাদু মাংস।
কুরায়শরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল কাজ।

দরজার কাছাকাছি অংশের কাজ দেওয়া হলো বানু আবদু মানাফ আর জুহ্রাকে। কৃষ্ণ প্রস্তর এবং দক্ষিণ কোণের মধ্যবর্তী স্থান দেওয়া হলো বানু মাখজুম আর তাদের সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য কুরায়শ গোত্রদের। কা'বার পেছন দিক পড়ল আমর ইবনে হুসায়স ইবনে কা'ব ইবনে লুআই এর দুই পুত্র বানু জুমাহ্ এবং সাহ্মের ভাগে। হিজরার পার্শ্ব গেল বানু আবদুদ্ দার ইবনে কুসাই এবং বানু আসাদ ইবনে আল-উজ্জা ইবনে কুসাই এবং বানু আদিই ইবনে কা'ব ইবনে লুআই যার অন্য নাম ছিল হাতিম, তাদের ভাগে।

কা'বাঘর ভাঙ্গতে গিয়ে সবাই ঘাবড়ে গেল। অজানা ভয়ে সব লোক ওখান থেকে চলে গেল। আল ওয়ালিদ ইবনে আল-মুগিরা বললেন, 'ঠিক আছে, আমি ভাঙ্গা শুরু করব।'

তিনি একটা শাবল নিয়ে কা'বাঘরের কাছে যেতে যেতে বললেন, 'হে কা'বা, ভয় নেই। হে আল্লাহ্, আমরা যা সবচেয়ে ভাল, তাই করতে চাচ্ছি।'

তারপর তিনি দুই কোণের মাঝখানে একটু অংশ ভাঙলেন।

সমস্ত লোক সারারাত উচ্চকিত রইল, কি হয় তার অপেক্ষায় বসে রইল। বলতে লাগল, 'আমরা দেখব। ও'র যদি কোন ক্ষতি হয় তাহলে আমরা আর ভাঙব না, যা ভাঙ্গা হয়েছে, সব ভাল ক'রে আগের মতো করে দেবো। আর ও'র কিছু যদি না হয় তাহলে বুঝব আমরা যা করছি তাতে আল্লাহ্ খুশি আছেন। তখন আমরা কা'বাঘর ভাঙব।'

সকাল বেলা আল-ওয়ালিদ ভাঙ্গার কাজে এলেন। সব লোক তার সঙ্গে কাজে যোগ দিল। ভাঙতে ভাঙতে তারা ইবরাহীম (আ)-এর ভিত্তি প্রস্তরের কাছে চলে এল। তারপর দেখল উটের কুঁজের আকৃতির সবুজ পাথর একটার সঙ্গে আরেকটা লাগানো রয়েছে।

একজন হাদীসবেত্তা আমাকে বলেছেন যে কুরায়শদের একজন লোক এরূপ দুটো পাথরের মাঝখানে একটা শাবল ঢুকিয়ে দিয়েছিল একটা পাথর বের করে আনার জন্য। পাথরটাকে বের করার জন্য চাপ দিতেই সমস্ত মক্কা কেঁপে উঠেছিল। কাজেই ভিত্তি-প্রস্তর নিয়ে তারা আর ঘাটা-ঘাটি করল না।

আমাকে একজন বলেছে, যে কোণে কুরায়শরা সিরীয় ভাষায় কিছু লিপি পেয়েছিলে, সে লেখা তারা পড়তে পারেনি। পেরেছিল একজন য়াহূদী। য়াহূদী ভদ্রলোক লেখাটা তাদের পড়ে শুনিয়েছিলেন ঃ আমি আল্লাহ্, বাক্কার প্রভু, যেদিন আমি আকাশ সৃষ্টি করলাম, পৃথিবী সৃষ্টি করলাম, সূর্য আর চাঁদকে বানালাম তাদের ঘিরে দিলাম সাতটি পুণ্যবান ফিরিশতা দিয়ে সেদিনই আমি এটা সৃষ্টি করেছিলাম। এর দুইটি পর্বত দণ্ডায়মান থাকবে, এটাও দণ্ডায়মান থাকবে দুধ আর পানিসহ। এ থাকবে মানুষের কাছে নিয়ামত হয়ে। আমাকে একজন বলেছে—তারা মাকামে আরেকটা

লেখা পেয়েছিল এবং তা ছিল, মক্কা আল্লাহ্র পবিত্র ঘর, এর খাদ্য আসে তিন দিক থেকে, এর লোকজন যেন প্রথমে এর অবমাননা না করে।

লায়ছ ইবনে আবু সুলায়ম দাবি করেছেন যে, রসূলে করীম (সা) এর নবুয়তের চল্লিশ বছর আগে তারা কা'বায় একটা পাথর পেয়েছিল। তাদের কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে তাদের মতে সেই পাথরে উৎকীর্ণ লিপির পাঠ ছিলঃ যে ভাল বপন করবে সে আনন্দদায়ক ফসল পাবে, যে মন্দ বপন করবে সে মন্দ ফসল পাবে। তুমি কি মন্দ করে তার পুরস্কার ভাল পেতে পারো? না, যেমন কাঁটা থেকে আঙুর ফল সংগ্রহ করা যায় না।

কুরায়শদের সব গোত্র পাথর জড়ো করল। প্রতিটি গোত্র পাথর সংগ্রহ করে নিজেরাই দালানের কাজ করল। কৃষ্ণ প্রস্তর পর্যন্ত নির্মাণ কার্য শেষ হলো। কৃষ্ণ প্রস্তর পর্যন্ত গিয়ে পড়ে বিতর্ক দেখা দিল। সব গোত্র চাইল, তারা এই পাথর আপন জায়গায় নিয়ে বসাবে। তর্ক থেকে ঝগড়া বিবাদ। ভিন্ন ভিন্ন দল হয়ে গেল। কয়েকটি দল মিলে আবার জোট হলো। ওরা যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে গেল। বানু আবদুদ দার একটি গামলা ভর্তি করে রক্ত নিয়ে এল। তারা আর বানু আদিহ ইবনে লুআই প্রতিজ্ঞা করল—তারা আমরণ লড়বে। প্রতিজ্ঞা পাকা করল রক্তের গামলায় হাত চুবিয়ে। এর জন্য এদের বলা হয় 'রক্ত চোষা'। চার রাত, পাঁচ রাত এমনি করে চলল। তারপর কুরায়শরা মসজিদে এসে বসে পরামর্শ করল। কোন ফল হলো না—তাদের মধ্যে ভিন্ন জনের ভিন্নমত।

একজন হাদীসবেত্তা বলেন যে তখনকার দিনে আবু উমাইয়া ইবনে আল-মুগিরা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে মাখযুম ছিলেন কুরায়শদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ লোক। তিনি তাদের বললেন, যে লোক মসজিদে সবার আগে প্রবেশ করবে (আগামীকাল), এই ঝগড়ার নিষ্পত্তির জন্য তাকে বিচারক মান তাহলেই তো সব চুকে যায়। তাই করল তারা।

সবার আগে মসজিদে ঢুকলেন রসূলুল্লাহ (সা)। তাঁকে দেখেই তারা বলে উঠল, 'এই তো বিশ্বস্ত মানুষ। আমরা খুশি আছি, রাযী আছি। ইনি মুহাম্মদ।

তিনি তাদের কাছে এলেন। তারা তাঁকে সমস্তটা বিষয় খুলে বলল। তিনি বললেন, 'আমাকে একটা চাদর এনে দিন।'

চাদর আনা হলো। তিনি কৃষ্ণপ্রস্তর আনলেন, রাখলেন চাদরের মাঝখানে। বললেন, প্রতি গোত্র চাদরের কোণ ধরবে, ধরে সবাই একসঙ্গে তুলবে। তাই তারা করল এবং তেমনি করে হজরে আসওয়াদ (কৃষ্ণপ্রস্তর) যথাস্থানে নিয়ে এল। যথাস্থানে বসানোর পর তিনি আপন হাতে তাকে ঠিক মতো বসিয়ে দিলেন। তারপর চলল নির্মাণের কাজ।

ওহি আসার পূর্বে কুরায়শরা নবী (সা)-কে বিশ্বাসী (আল-আমিন) বলে ডাকত। নির্মাণের কাজ শেষ হলে সকলের ইচ্ছা অনুসারে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আল-জুবায়র যে সাপের ভয়ে কুরায়শরা কা'বা পুনর্নির্মাণ করতে পারছিল না তার সম্বন্ধে বললেন :

এমন অবাক লাগল, ঈগলটা সোজা গিয়ে
ক্রুদ্ধ সাপটাকে তুলে নিল।
এমন ভীষণ মর্মর ধ্বনি তুলতো,
তেড়ে আসতো কখনো বা।
কাবাঘর পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা নিলাম তখন আমরা
তার জন্য আমরা আতঙ্কিত হলাম, আতঙ্কের বস্তুই সে ছিল বটে।
আমরা তার আক্রমণের ভয়ে যখন তটস্থ ছিলাম, নেমে এলো ঈগল
সোজা এক ছোঁ ধরে এল
তুলে নিয়ে গেল তাকে, আমরা এখন ইচ্ছা করলেই
কাজে যেত পারি, আর কোন বাধা নেই।
আমরা সবাই একসঙ্গে কা'বাঘর ভাঙতে লেগে গেলাম।
তার ভিত্তিপ্রস্তর ছিল আমাদের হাতে, ছিল মাটি।

পরদিন আমরা ভিত্তি স্থাপন করলাম
আমাদের কোন কর্মীর পিরহান ছিল না গায়ে।
এর মারফত আল্লাহ্ লুআইর পুত্রদের ইয্যত দিলেন,
এর ভিত্তির সঙ্গে তাদের নাম যুক্ত হয়ে রইল,
ওখানে ছিল বানু আদিই আর মুররা,
তার আগে ছিল কিলাব।
এর জন্য রাজা আমাদের ওখানে প্রতিষ্ঠিত করলেন ক্ষমতায়,
পুরস্কার দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ্‌র।

হুম

হুমের ধারণা আবিষ্কার ও প্রচলন হাতীর বছরের আগে কি পরে, তা আমি জানি না। তারা বলল, 'আমরা ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র, পবিত্র রাজ্যের বাসিন্দা, মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক এবং মক্কার নাগরিক; আমাদের যে অধিকার ও অবস্থান তা অন্য কোন আরবের নেই। আরবরা আমাদের যেরকম স্বীকৃতি দেয়, অন্য কাউকে সে রকম স্বীকৃতি দেয় না। কাজেই পবিত্র এলাকার যে গুরুত্ব তা বাইরের কোন দেশকে দিতে যেয়ো না। দিলে, আরবরা তোমাদের হারামকে ঘৃণা করবে এবং বলবে, "তারা পবিত্র রাজ্য আর বাইরের এলাকাকে একই রকম গুরুত্ব দিয়েছে।" সুতরাং তারা আরাফায় বিরতি এবং ওখান থেকে যাত্রা করা বাদ দিল। তবে তারা এটা মেনে নিল যে, এ কাজ দুটি হজ্জের এবং ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মের একটা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপার। তারা তা বিবেচনা করে স্থির করল, অন্যান্য আরবরা ওখানে যাত্রা-বিরতি করবে এবং ওখান থেকেই আবার রওয়ানা হবে। তারা বলল, 'আমরা হলাম পবিত্র স্থানের মানুষ, কাজেই আমরা পবিত্র স্থান থেকে বাইরে যাব আমরা, হুমরা, এই স্থানকে যেমন সম্মান করি অন্যান্য স্থানকেও তেমনি সম্মান করব—এটা ভাল দেখায় না, কারণ হুমরা হলো পবিত্র স্থানের মানুষ।' তারা তখন পবিত্র এলাকার ভেতরে

এবং বাইরে যে সব আরব জন্মগ্রহণ করেছে সবাইকে সমভাবে গ্রহণ করতে শুরু করল।

হুম্‌স্‌রা এরপর নতুন নতুন প্রথা চালু করতে লাগল। এইসব প্রথা চালু করার তাদের কথা ছিল না। তারা মনে করল তাদের টক দইয়ে তৈরী পনির খাওয়া উচিত। ইহ্‌রামের সময় তাদের মাখন তোলা উচিত। তাদের উটের পশমে তৈরী তাঁবুতে প্রবেশ করা উচিত নয়। ইহ্‌রামে অবস্থানের সময় চামড়ার তাঁবু ছাড়া অন্য কোথাও রোদ থেকে বাঁচবার জন্য প্রবেশ করা উচিত নয়। কেবল তা করেই ক্ষান্ত হলো না তারা। হুকুম দিল, উমরা কিংবা বড় হজের হারাম-বহির্ভূত কাউকে কোন খাদ্য নিয়ে আসতে দেওয়া হবে না। হুম্‌সদের পোশাক ছাড়া অন্য কোন পোশাকে কাউকে কা'বা তওয়াফ করতে দেওয়া হবে না। কারো ওই রকম পোশাক না থাকলে ন্যাংটা হয়ে তওয়াফ করতে হবে। আর যদি কোন মেয়েলোক বা পুরুষ হুম্‌স্ পোশাক না থাকলে লজ্জা বোধ করে তাহলে তারা সাধারণ পোশাকে তওয়াফ করতে পারবে। তবে সাধারণ পোশাকে তওয়াফ করলে, তওয়াফের শেষে সে পোশাক ফেলে দিতে হবে, যাতে সে পোশাক তারা বা অন্য কেউ ব্যবহার করতে না পারে।

ওইসব পোশাককে আরবরা নাম দিয়েছিল 'পরিত্যক্ত'। যেসব আরব আরাফাতে যাত্রা-বিরতি করত, ওখান থেকে আবার রওয়ানা হতো এবং ন্যাংটা অবস্থায় কা'বা তওয়াফ করত। তারা তাদের জন্যও এই সব বিধি নিষেধ আরোপ করত। ফলে পুরুষরা উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করত। আর মেয়েরা সমস্ত কাপড় ছেড়ে কেবল একটা বস্ত্র পরিধান করত। সে বস্ত্রের হয় সামনের দিকে, নয় পেছনের দিকে আগাগোড়া কাটা থাকত। এমনি অবস্থায় এক আরব রমণী তওয়াফ করার সময় বলেছিল ঃ

আজকে কিছু অথবা সব দেখা যায়,
কিন্তু যা দেখা যায় তাকে আমি সাধারণের সম্পত্তি বানাই নি!

যারা সাধারণ কাপড় পরে বাইরে থেকে আসত, তারা তাওয়াফের পর তা ফেলে দিত। এই পোশাক তারা কিংবা অন্য কেউ ব্যবহার করত

না। একজন আরব এমনি করে তার পোশাক ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু যদিও পোশাকটা সে ভীষণ করে চাচ্ছিল, তা নিতে পারল না। তখন সে বলেছিল :

আমার দুঃখ, তার কাছেই আমার ফিরে যেতে হবে,
সে যেন হাজীদের সামনে নিষিদ্ধ পরিত্যক্ত বস্ত্র।

অর্থাৎ তাকে স্পর্শ করা যাবে না।

এই অবস্থা চলল আল্লাহ্ মুহাম্মদ (সা)-কে প্রেরণ করার পূর্ব পর্যন্ত। হযরত (সা)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর ধর্মের আইন প্রদান করলেন, হজের নিয়ম বেঁধে দিলেন : 'তারপর যেখান থেকে মানুষের সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার কথা, সেখান থেকে বিলম্ব না করে সামনের দিকে অগ্রসর হও, আল্লাহ্‌র কাছে মার্জনা চাও, কারণ আল্লাহ্ মার্জনাকারী, দয়ালু।'[১] এই বাণী কুরায়শদের উদ্দেশ্যে সম্বোধিত। 'মানুষ' বলতে আরবদের বোঝানো হয়েছে। কাজেই হজের বিধানে তিনি সবাইকে আরাফাতে যেতে বলেছেন, আরাফাতে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবস্থান করে আবার ওখান থেকে শীঘ্র যাত্রা করতে বলেছেন।

মসজিদে পবিত্র এলাকার বাইরে থেকে খাদ্য আনয়ন ও পোশাক সম্বন্ধে বিধি-নিষেধের ব্যাপারে তাঁর কাছে আল্লাহ্ ইরশাদ করলেন : 'হে আদমের সন্তানগণ, সব মসজিদে তোমরা পোশাক পর এবং খাও এবং পান কর এবং অমিতব্যয়ী হয়ো না। বলুন (হে মুহাম্মদ), আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে যে বস্ত্র প্রদান করেছেন এবং তিনি যে সমস্ত ভাল জিনিসের বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন, কে সেগুলো তাদের জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছে? বলুন, কিয়ামতের দিন কেবল পৃথিবীতে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল তাদের জন্যই এইসব জিনিস থাকবে। এমনি করে যাদের জ্ঞান আছে তাদের জন্য আমরা অনেক ইঙ্গিত রেখে দিয়েছি।'[২] এমনি করে কুরায়শদের যে

১. কুরআন ২ : ১৯৯।
২. কুরআন ২ : ৩১-৩২।

উদ্ভাবিত প্রথা এবং হুমদের বিধি-নিষেধ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল রসূল (সা) যখন প্রেরিত হন তখন আল্লাহ্ সব নাকচ করে দেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাজম যা জেনেছেন উসমান ইবনে আবু সুলায়মান ইবনে যুবায়র ইবনে মুতিমের কাছ থেকে, উসমান যা পেয়েছেন তার চাচা নফি ইবনে যুবায়রের কাছ থেকে তা হলো, নফির পিতা যুবায়র ইবনে মুতিম বলেছেনঃ 'ওহী আসার আগে আমি রসূল (সা)-কে তাঁর লোকজনের সঙ্গে আরাফাতে তার উটের পিঠে বসে থাকতে দেখেছি। পরে তিনি আর তা করেন না— আল্লাহ্ তাঁকে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন, সে কাজ তাঁকে আর করতে হয় নি।'

[এই হাদীস উসমান ইবনে সাজ পেয়েছেন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের কাছ থেকে, ইবনে ইসহাক পেয়েছেন আল-কালবির কাছ থেকে, আল-কালবি পেয়েছেন উম্মে হানির মুক্ত দাস আবু সালিহ্ এর কাছ থেকে এবং আবু সালিহ্ পেয়েছেন ইবনে আব্বাসের কাছ থেকেঃ যারা হুমস ছিলেন তাঁরা হলেন কুরায়শ, কিনানা, খুজাআ, আল-আউস ও আল-খাযরাজ, জুছাম, বানু রাবিয়া ইবনে আমির ইবনে সাসা, আজদ শানুয়া, জুযাম, জুবায়দ, বানু সালিমের বানু যাকওয়ান, আমর আল-লাত, সাকিফ, গাতফান, গউস, আদওয়ান, আল-লাফ এবং কুদায়া। কুরায়শরা যখন তাদের কোন মেয়েকে কোন আরবের সঙ্গে বিয়ে দিত, তখন শর্ত দেওয়া থাকত, দম্পতির যে সন্তানাদি হবে, তাদের ধর্মমতে তাদের আহমাসি হতে হবে। আল-আদরাম তায়ম ইবনে গালিব ইবনে ফিহ্র ইবনে মালিক ইবনে আন-নাদর ইবনে কিনানা তাদের পুত্র মাজদের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন তায়ম রাবিআ ইবনে আমির ইবনে সাসাআর মেয়ের সঙ্গে। কথা ছিল, মেয়ের সন্তানেরা কুরায়শদের রীতি-নীতি মেনে চলবে। লাবিদ ইবনে রাবিআ ইবনে জাফর আল-কিলাব সেই মেয়েকে স্নানে রেখেই বলেছিলেনঃ

মাজদের সন্তানদের পানি খাইয়েছে আমার বংশের লোক
আর আমি পানি দিই নুমায়র আর হিলাল বংশের লোকদের।

মানসুর ইবনে ইকরিমা ইবনে খাসাফা ইবনে কায়স ইবনে আয়লান বিয়ে করেছিলেন সালমা বিনতে দুবাইয়া ইবনে আলী ইবনে ইয়াসুর ইবনে সাদ ইবনে কায়স ইবনে আয়লানকে। তার গর্ভে হাওয়াযিনের জন্ম হয়। হাওয়াযিন একবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। সালমা তখন মানত করেন, পুত্র আরোগ্য লাভ করলে, তাকে তিনি হুমস বানাবেন। হাওয়াযিন সুস্থ হওয়ার পর সালমা কথা রক্ষা করেছিলেন। হুমরা পবিত্র মাসগুলোকে খুব মেনে চলত। সেই মাসগুলোয় তারা আশ্রিতের কোন ক্ষতি করত না। আশ্রিত কেন, সেই পবিত্র মাসে কারোই কোন ক্ষতি হতে দিত না তারা। কা'বার চতুর্দিকে কাপড় চোপড় পরে তারা তওয়াফ করত। ইসলাম প্রবর্তনের শুরুতে ও তার আগে কোন বাড়ির বাসিন্দা, অর্থাৎ বাড়িতে বা গ্রামে বসবাসকারী কেউ (তাঁবুর বাসিন্দা কিংবা যাযাবর নয় এমন) হারামে (বিধি-নিষেধের বিশেষ অবস্থান) থাকলে. সে বাড়ির পেছনদিকে একটা গর্ত করে নিত এবং সেই গর্তপথে যাওয়া-আসা করত। দরজা ব্যবহার করত না। হুমরা বলত, 'অপবিত্র বা নিষিদ্ধ কোন কিছুকে শ্রদ্ধা করবে না, হজ্বের সময় পবিত্র এলাকার বাইরে যাবে না।' সুতরাং হজ্বের আচার অনুষ্ঠান তারা কাটছাট করে নিয়েছিল। আরাফা যেহেতু নিষিদ্ধ এলাকা সেহেতু সেখানে তারা অবস্থান করা বন্ধ করে দিল। ওখানে তারা থামতও না, ওখান থেকে নতুন করে আবার যাত্রাও করত না। তারা তাদের বিশ্রামের জায়গা ঠিক করে নিয়েছিল, পবিত্র এলাকার শেষ প্রান্তে নামিরায়, আল-মা'জিমানের মুক্ত অঙ্গনে। ওখানেই তারা কাটাত আরাফার রাত্রি, দিনের বেলা কাটাত নামিরার গাছের ছায়ায় এবং ওখান-থেকেই রওয়ানা হতো মুযদালিফার উদ্দেশ্যে। পাহাড়ের চূড়ায় যখন রোদ পড়ত তখনই তারা রওয়ানা হয়ে যেতো। তাদের হুমস্ বলা হতো, কারণ তাদের ধর্ম বড় কড়া ছিল।...হুদাইবিয়ার বছরে

রসূল করীম (সা) নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল একজন আনসার। দরজায় একটু থামলেন রসূল (সা)। বুঝলেন যে, তিনি একজন আহমাসি। রসূল করীম (সা) বললেন, 'আমিও একজন আহমাসি। তোমার ধর্ম আর আমার ধর্ম এক।' কাজেই রসূল (সা) যে দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন, সেই একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন সঙ্গী আনসারও।

বহিরাগত স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই কা'বা তওয়াফ করত উলঙ্গ অবস্থায়। বানু আমির ইবনে সাসাআ এবং আক্ক এই দলে ছিল। কোন মহিলা উলঙ্গ অবস্থায় চতুর্দিকে ঘোরার সময় একটি হাত দিয়ে সম্মুখভাগ এবং অন্য হাত দিয়ে পশ্চাদ্ভাগ ঢেকে রাখত।[১]

আরব ভবিষ্যদ্বক্তা, য়াহূদী রাব্বি এবং খৃস্টান সাধুদের বিবরণ

নবুয়তের সময় ঘনিয়ে আসার কালে কিছু য়াহূদী রাব্বি, খৃস্টান সাধু এবং আরব ভবিষ্যদ্বক্তা রসূল করীম (সা)-এর নবুয়ত সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। রাব্বি এবং সাধুরা তাঁর এবং তাঁর সময়ের বর্ণনা দিয়েছেন তাঁদের ধর্মগ্রন্থ থেকে এবং তাঁদের রসূলেরা তাঁর সম্বন্ধে যে নির্দেশ রেখেছিলেন তা থেকে। আর আরব ভবিষ্যদ্বক্তাদের কাছে সংবাদ নিয়ে এসেছিল জিনের কাছ থেকে শয়তান। এই সংবাদ তারা আড়াল থেকে গোপনে শুনে ফেলেছিল। তারপর আকাশ থেকে তারকা দিয়ে তাদের উপর কারা যেন ঢিল মারল, তখন আর শুনতে পায় নি। পুরুষ ও মেয়ে ভবিষ্যদ্বক্তারা এই সব কথা ছড়াতে লাগল। আরবরা তাদের কথায় কান দিল না। তারপর আল্লাহ্ তাঁকে প্রেরণ করলেন। অন্যান্য সব ঘটনাও ঘটল। তখন আরবরা তাদের স্বীকৃতি দিল। রসূল করীম

১. সূত্র আজরাকী। ইবনে আব্বাসের নামের সঙ্গে এই বিবরণ সংযুক্ত। ইবনে ইসহাক এই বিবরণ দিয়েছেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, কারণ কিছু কিছু বর্ণনার এখানে পুনরাবৃত্তি আছে।

(সা)-এর কাছে যখন ওহী এল, তা শয়তানদের শুনতে দেওয়া হয় নি। যে সব আসনে তারা আগে বসত সে সব আসনে তারা বসতে পারে নি, এবং বসে ঐ সব ঐশী ব্যাপার-স্যাপার আড়ি পেতে জানতে পারে নি—কারণ তাদের উপর তারকার ঢিল নিক্ষেপ করা হয়েছিল। জিনেরা জানত সে কাণ্ড আল্লাহ্ ঘটিয়েছিলেন মানব জাতির স্বার্থে। মুহাম্মদ (সা) কে তাঁর রসূলরূপে প্রেরণ করার পর একদিন তিনি তাকে জিনদের বিষয়ে অবহিত করছিলেন। বলছিলেন, কেমন করে জিনদের সবকথা শোনা থেকে বিরত রেখেছিলেন। তিনি জানতেন যে, জিনরা জানে। জিনরা যা দেখেছিল বলে বলেছিল তা তিনি অস্বীকার করেন নি। আল্লাহ্ রসূল (সা)-কে বলছিলেন, 'বলুন হে মুহাম্মদ, আমার কাছে নাযিল হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক জিন শুনে ফেলেছিল। শুনে বলেছিল, "আমরা শুনেছি এক পরমাশ্চর্য কুরআন সকলকে সৎপথ প্রদর্শন করবে; আমরা এতে বিশ্বাস করি, আমরা আমাদের প্রভুর সঙ্গে কোন শরীক করব না, আর তিনি (আমাদের প্রভুর মহিমা সমুন্নত থাকুক) কোন স্ত্রী বা পুত্র মনোনীত করেন নি। আমাদের মধ্যে এক বোকা ছিল, সে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলত, আর আমরা জানতাম মানুষ ও জিন আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোন মিথ্যা কথা বলবে না, জানতাম মানুষ জিনের সঙ্গে আশ্রয় নিলে বিদ্রোহ করে তারা তাদের দল বৃদ্ধি করে দেয়।" এই ওহী এই ভাবে শেষ হয়েছিলঃ "ওখানে আমরা বিভিন্ন জায়গায় বসে শুনতাম: এখন যে শুনে তার জন্য একটা অগ্নিশিখা, অপেক্ষা করছে। আমরা জানি না পৃথিবীতে যারা আছে তাদের অমঙ্গল করা হবে কিনা, নাকি তাদের প্রভু তাদের সঠিক পথে নিয়ে যাবেন।"[১] জিনরা যখন কুর-আনের কথা শুনল তখন তারা বুঝল এর সম্বন্ধে তাদের আগে কিছুই শুনতে দেওয়া হয় নি। কাজেই কুরআন নাযিলের বিষয়টি অন্যান্য আসমানী খবরের মতো করে নেওয়া যাবে না।

১. কুরআন ৭২ঃ১।

তা করলে পরে যখন প্রমাণ আসবে, সমস্ত সংশয়ের নিরসন হবে, তখন অন্যান্য আসমানী খবরের সঙ্গে এর সংমিশ্রণে মানুষের ভেতরে বিভ্রান্তি আসবে। কাজেই সব কথা তারা বিশ্বাস করল; বিশ্বাস করল এবং সত্যকে স্বীকার করে নিল। তারপর "তারা তাদের লোকজনের কাছে প্রত্যাবর্তন করল। তাদের এই বলে সাবধান করল, 'হে আমাদের লোক, আমরা মূসা (আ)-এর পর অবতীর্ণ একটা গ্রন্থের কথা জেনেছি। এই গ্রন্থে পূর্ববর্তী সমস্ত কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, এই গ্রন্থ সত্য ও ন্যায় পথের প্রদর্শক।"[১]

'মানুষ জিনের সঙ্গে আশ্রয় নিলে বিদ্রোহ করে করে তারা তাদের দলবৃদ্ধি 'করে দেয়'—জিনদের সম্বন্ধে এই উক্তির প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আরবরা ও কুরায়শরা সফরের সময় মাঝে মাঝে সমতলের নীচু স্থানে রাত কাটাত। এমনি রাত কাটানোর সময় তারা বলত, 'আজ রাতে আমরা জিনদের এই সমতলের প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করলাম আমি। এখানকার সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে তার কাছে আশ্রয় নিলাম।'

ইয়াকুব ইবনে উতবা ইবনে আল-মুগিরা ইবনে আল-আখনাস আমাকে বলেছেন যে, তাঁকে বলা হয়েছে যে, তারকা দিয়ে তাদের উপর ঢিল নিক্ষেপ করলে উল্কাপাত হবে—এই ভয় সর্বপ্রথম আসে আরবদের সাকিফ গোত্রের মধ্যে। তারা এল তাদেরই গোত্রের লোক আমর ইবনে উমাইয়ার কাছে। বানু ইলাজের এই আমর অত্যন্ত বিচক্ষণ ও ধূর্ত লোক ছিলেন। তাঁর কাছে এসে সাকিফ গোত্রের লোকজন জিজ্ঞেস করল—তারকা দিয়ে ঢিল নিক্ষেপ করতে তিনি কখনো দেখেছেন কি না। আমর বললেন, 'হ্যাঁ দেখেছি। কিন্তু দাঁড়াও। কিছু কিছু অতি চেনা তারকা আছে, সমুদ্রে বা স্থলপথে তারা পথিকদের পথ চেনায়। ওই তারা ধরে মানুষ দৈনন্দিন জীবনে শীত-গ্রীষ্মের সংবাদ জানতে পারে। ওই তারকা দিয়ে যদি ঢিল দেওয়া হয় তাহলে একদম সর্বনাশ হয়ে যাবে! তাহলে

১. কুরআন ৪৬ : ৩০।

বুঝতে হবে কিয়ামত হয়ে গেছে, পৃথিবী শেষ, শেষ এর ভেতরকার সমস্ত কিছু। আর ওই অতি-চেনা তারাগুলো যদি ঠিক থাকে এবং অন্য তারা দিয়ে ঢিল মারা হয় তাহলে বুঝতে হবে এর মধ্যে মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র কোন উদ্দেশ্য নিহিত আছে।'

মুহম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব আল-জুহ্‌রি একটি তথ্য পেয়েছেন আলী ইবনে আল-হুসায়ন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিবের কাছ থেকে আর আলী পেয়েছেন কতিপয় আনসারের কাছ থেকে। সেই আনসারদের কাছে রসূলে করীম (সা) বলেছিলেন, 'এই উল্কাটি সম্বন্ধে কি যেন বলছিলেন আপনারা?'

তারা জবাব দিল, 'বলছিলাম, একজন রাজা মারা গেছে, একজন রাজা নিযুক্ত হয়েছে, জন্ম হয়েছে একটি বাচ্চার, মৃত্যু হয়েছে আরেকটি বাচ্চার।'

রসূল (সা) বললেন, 'তা নয়। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টি সম্বন্ধে যখন কোন আদেশ দেন, সর্বপ্রথম তা শোনেন ফিরিশতারা! শুনে ফিরিশতারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন, তাদেরও নিচে যারা তারাও আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন, তাদেরও নিচে যারা তারাও প্রশংসা করেন আল্লাহ্‌র। এমনি করে চলতে থাকে, প্রশংসা নেমে আসে সর্বনিম্ন আসমানে, সেখানেও আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা হয়। সর্বনিম্ন আসমানে তখন একে অপরকে প্রশ্ন করে, কেন, ব্যাপার কি, তখন উত্তর আসে তাদের উপরে যারা আছেন তারা প্রশংসা করছেন, তাই তারাও করছে। আবার প্রশ্ন হয়, "তোমাদের উপরে যারা আছেন তাদের কারণটা জিজ্ঞেস করো না কেন?" এমনি করে চলতে থাকে উপর থেকে উপরে, আরো উপরে প্রশ্ন পাঠানো। সে প্রশ্ন যায় আল্লাহ্‌র দরবারে। ফিরিশতারা প্রশ্ন শুনে বলে দেন, আল্লাহ্‌র এই হুকুম হয়েছে তার মাখলুকাত সম্বন্ধে। তখন সেই সংবাদ আবার অবতরণ করতে থাকে আসমান থেকে আসমানে। তারপর সংবাদ এসে পৌঁছে নিম্নতম আসমানে। ওখানে তারা সংবাদ নিয়ে কথা বলে, আলোচনা করে। শয়তানরা তখন সেটা আড়ি পেতে শোনে, সবটা ভাল করে শুনতে পায় না, কাজেই যা শোনে তার সঙ্গে নিজের অনুমান আর স্থূল বুদ্ধি

যোগ করে। যোগ করে যা হয় তা তারা বলে গণক কি ভবিষ্যদ্বক্তাদের কাছে। তাদের সংবাদ কখনো সত্য হয়, কখনো মিথ্যে হয়। এইজন্য গণকদের কথা কখনো সত্য হয়, কখনো মিথ্যে হয়। তারপর আল্লাহ্ এইসব তারা বর্ষণ করে শয়তানদের বন্ধ করে ফেললেন। এইজন্য এখন গণকরাও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এখন তাদের অস্তিত্বই নেই।'

ইবনে শিহাবের হাদীসের অনুরূপ একটা হাদীস আমাকে বলেছিলেন আমর ইবনে আবু জাফর। আমর সেটা পেয়েছিলেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু লাবিবার কাছে। মুহাম্মদ তা পেয়েছিলেন আলী ইবনে আল-হুসায়ন ইবনে আলীর কাছ থেকে।

একজন জ্ঞানী লোক আমাকে আরেক বিবরণ দিয়েছেন। আল গায়-তালা নামে বানু সাহ্মের এক রমণী আইয়ামে জাহিলিয়াতে গণক ছিলেন। একদিন রাতে তার পরিচিত ভূত তার কাছে এল। ভূত মেয়ে গণকের নিচে থেকে কিচির-মিচির করে বলে উঠল ঃ

আমি যা জানি তা আমি জানি,
যখম আর হত্যার দিন।

কুরায়শরা যখন শুনল, তারা জানতে চাইল এর মানে কি। ভূত তার কাছে আরেক রাতে এল। কিচির-মিচির করে বলল ঃ

'মৃত্যু, মৃত্যু কি ?
এর মধ্যে ইতি-উতি নিক্ষেপ করা হয়েছে অস্থি।'

এটা শুনেও কুরায়শরা বুঝতে পারল না। তারা অপেক্ষা করতে লাগল। পরে হয়তো ভূত এসে আরো কিছু বলবে, যাতে এর অর্থ পরিষ্কার হবে। তারপর বদর আর উহুদের যুদ্ধ হলো সঙ্কীর্ণ সমতলে। তখন তারা সেই বাণীর ভাষা বুঝতে পারল।

আলি ইবনে নাফি আল জুরাশির কাছ থেকে আমি একটি বিবরণ পেয়েছি। আলি আমাকে বলেছেন, ইয়ামনের জানব নামে এক গোত্রে

একজন গণক ছিল আইয়ামে জাহিলিয়াতের সময়। আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ রসূল করীম (সা)-এর আবির্ভাবের সংবাদ যখন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকের আরবদের মধ্যে, তখন ইয়ামনের লোকজন গেল সেই গণকের কাছে। বলল, 'এই লোকটার কি বিবরণ বৃত্তান্ত সব খোঁজ করে আমাদের জানাও।'

ওরা যে পাহাড়ে বাস করত গণক তার নিচে জমায়েত হলো সবাই। গণক তাদের কাছে এল ঠিক সূর্যোদয়ের সময়। ওখানে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তার তীরে হেলান দিয়ে। তার পর মাথা তুলল আকাশের দিকে, আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল অনেক ক্ষণ। তারপর হঠাৎ সে লাফাতে শুরু করল, লাফাতে লাফাতেই বলল :

হে মানুষ, আল্লাহ্ মুহাম্মদকে সম্মানিত করেছেন, মনোনীত করেছেন।
তিনি তার হৃদয় এবং পেট পবিত্র করেছেন।
তোমাদের সঙ্গে তাঁর অবস্থান, হে মানুষ, সংক্ষিপ্ত হবে।

বলেই সে ঘুরে দাঁড়াল। যে পাহাড়ের উপর থেকে এসেছিল, সেখানে উঠে গেল অতঃপর।

একজন লোক, সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিল তার বিশ্বাসযোগ্যতা। তিনি উসমান ইবনে আফফানের এক মুক্ত দাস আবদুল্লাহ্ ইবনে কাবের বরাত দিয়ে আমাকে বলেছেন যে, একজন তাঁকে বলেছেন যে, একদিন রসূল করীম (সা) মসজিদে উমর ইবনে আল-খাত্তাব লোকজনের সঙ্গে বসেছিলেন। তখন একজন আরব এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। উমর তাঁকে দেখেই বললেন, 'এই লোক এখানে বহু ঈশ্বরবাদী, তার পুরনো ধর্ম এখনো ছাড়ে নি (অথবা সে বলেছে) ও আইয়ামে জাহিলিয়াতে গণক ছিল।'

লোকটা উমরকে সালাম জানিয়ে পরে আসন গ্রহণ করল। উমর লোকটাকে তিনি মুসলমান কিনা জিজ্ঞেস করলেন। লোকটা বললেন, তিনি মুসলমান।

উমর বললেন, 'কিন্তু আইয়ামে জাহিলিয়াতে আপনি গণক ছিলেন না ?'

লোকটি বললেন, 'বড় আশ্চর্য লাগল, বিশ্বাসীদের অধিনায়ক। আপনি আমাকে মন্দ ভেবেছেন। আপনি আমাকে এমন ভাবে সম্ভাষণ করলেন, ক্ষমতায় আসার পর আপনি কোন প্রজার সঙ্গে এই রকম সম্ভাষণ আর করেছেন বলে আমি শুনি নি।'

উমর বললেন, 'আল্লাহ্ আমাকে মাফ করুন। আইয়ামে জাহিলিয়াতে এর চেয়েও কতো খারাপ কাজ করেছি আমরা। আমরা মূর্তিপূজা করেছি। প্রতিমা পূজা করেছি। তারপর আল্লাহ্ আমাদের সম্মানিত করলেন তাঁর রসূল দিয়ে * এবং ইসলাম দিয়ে।

লোকটা জবাব দিলেন, 'কি হুযুর, আল্লাহ্‌র নামে বলছি, আমি গণক ছিলাম।'

উমর বললেন, 'তাহলে আমাদের বলুন—আপনার পোষা ভূত কি সংবাদ আপনাকে দিয়েছিল।'

লোকটা বললেন, 'ইসলাম প্রবর্তনের মাসখানিক আগে আমার কাছে সে এসেছিল। বলেছিল ঃ

জিনদের কথা, তাদের সংশয়ের কথা ভেবে দেখেছ কি,
তাদের ধর্ম এক হতাশা, এক প্রবঞ্চনা,
তাদের উপরে জিন-কাপড় প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে তারা এখন ?

আবদুল্লাহ্ ইবনে কা'ব বলেছেন, তখন উমর বললেন, 'আইয়ামে জাহিলিয়াতে কতিপয় কুরায়শের সঙ্গে আমি একটি মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন একজন আরব একটা বাছুর কুরবানী দিল। আমরা ভেবেছিলাম কুরবানীর কিছু গোশত আমরা পাব। তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ঠিক তখন আমি শুনলাম তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠ বেরিয়ে আসছে বাছুরের পেটের ভেতর থেকে (ইসলাম প্রবর্তনের মাসখানিক আগে হবে এটা), বলছে ঃ

* উপরোক্ত নিম্নরেখ অংশটুকু তাবারিতে নেই, তাবারি ১১৪৫।

হে রক্ত লালটা
করা হয়ে গেছে কাজটা
এক লোক চীৎকার করবে,
আল্লাহ্‌র সঙ্গে কেউ নেই আর।

আরবদের মধ্যে গণক সম্বন্ধে আমার শোনা এই হলো বৃত্তান্ত।

আল্লাহ্‌র রসূল (সা) সম্বন্ধে য়াহুদীদের সতর্কবাণী

আসিম ইবনে উমর ইবনে কাতাদা আমাকে বলেছেন যে, তাঁর গোত্রের কয়েকজন বলেছেঃ আমাদের ইসলাম গ্রহণের পেছনে আল্লাহ্‌র করুণা ও নেক-নজর তো ছিলই। কিন্তু আমাদের ইসলাম গ্রহণের পেছনে বড় কারণ ছিল আমরা য়াহুদীদের কাছে যা শুনে আসছিলাম তা। আমরা ছিলাম বহু ঈশ্বরবাদী। মূর্তিপূজা করতাম। আর তারা ছিল বাইবেলের মানুষ। তাদের যে জ্ঞান-গরিমা তা আমাদের ছিল না। তাঁদের সঙ্গে আমাদের ছিল চিরদিনের শত্রুতা। কখনো তাদের যখন আমরা কোণঠাসা করে ফেলতাম, তখন আমাদের প্রতি তাঁদের ঘৃণা প্রবলতর হতো। তাঁরা বলতেন, "একজন রসূলের আসার সময় হয়ে গেছে। আদ আর ইরাম যেমন ধ্বংস হয়ে গেছে, তেমনি তোমাদেরও আমরা হত্যা করব তাঁর সাহায্যে।" ওরা প্রায়ই একথা বলত, আমরা শুনতাম। আল্লাহ্ যখন তাঁর রসূল (সা)-কে পাঠালেন, আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করে নিলাম। তিনি যখন আমাদের আল্লাহ্‌র পথে নিলেন, তখন আমরা বুঝলাম য়াহুদীদের হুঁশিয়ারির কি অর্থ ছিল। কাজেই তাঁদের আগেই আমরা তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে ফেললাম। আমরা তাঁকে বিশ্বাস করলাম। কিন্তু তাঁরা তাকে প্রত্যাখ্যান করল। তাদের আর আমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে আল্লাহ্ সূরা বাকারায় ইরশাদ করেছেনঃ "এবং যখন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে একটি কিতাব তাদের উপর নাযিল হলো, সেই কিতাবে তাদের যা ছিল তার সব কিছুর সমর্থন দিল (এবং তারা তার আগে অবিশ্বাসীদের উপর বিজয় কামনা করে আসছিল), যা

তারা আগে থেকে জানত তাই যখন এলো তাদের কাছে, তারা তা অবিশ্বাস করে বসল। অবিশ্বাসীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"[১]

সালিহ্ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ এই হাদীস জানতে পারেন বানু আবদুল আ'শালের ভাই মাহমুদ ইবনে লাবিদ এর কাছ থেকে, মাহমুদ জেনেছিলেন সালামা ইবনে সালামা ইবনে ওয়াক্‌স এর কাছ থেকে (সালামা বদর যুদ্ধে হাযির ছিলেন)। সালিহ্ বলেনঃ 'বানু আবদুল আশালের মধ্যে একজন য়াহুদী প্রতিবেশী ছিল আমাদের। তার বাড়ি থেকে তিনি একদিন আমাদের কাছে এলেন। (সে সময় আমি ছিলাম আমার পরিবারের সবচেয়ে ছোট্ট মানুষ. ছোট্ট একটা পিরহান পরে আঙ্গিনায় শুয়েছিলাম।) তিনি কিয়ামত, হাশর, মিজান, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদির কথা বললেন। তিনি এসবগুলো বললেন বহু ঈশ্বরবাদীর কাছে, যাদের ধারণা মৃত্যুর পরে কোন পুনরুত্থান নেই। তারা বলল, আরে মানুষ! মৃত্যুর পর মানুষকে নিয়ে যাওয়া হবে এমন এক জায়গায়, যেখানে বাগান আছে, আগুন আছে, ওখানে নিয়ে গিয়ে মানুষের কাজের খতিয়ান নেওয়া হবে, আপনার ধারণা, এসব জিনিস আছে?"

তিনি বললেন, "আছে। যাঁর নামে মানুষ কসম খায় (অর্থাৎ আল্লাহ্) তার কসম, যে আগুনের মধ্যে তাকে নেওয়া হবে, সেখানে গিয়ে তার ইচ্ছা হবে এর চেয়ে তার বাড়ির সবচেয়ে বড় উত্তপ্ত কড়াইটা অনেক ভাল ছিল। ওইখানে নিয়ে গিয়ে আগুনের তাপ দেওয়া হবে, সেই উত্তপ্ত আগুনে তাকে নিক্ষেপ করা হবে, তারপর ভাল করে পলেস্তারা করে আঁটকাট বেঁধে দেওয়া হবে যাতে পরদিন সেই আগুন থেকে সে বের হতে না পারে।"

তারা বলল, এই যে এত সব কথা লোকটা বলছে, সে এমন একটা চিহ্ন দেখাক—যাতে করে বোঝা যায়, এই সব সত্যিই ঘটবে। তখন তিনি

১. কুরআন ২ঃ৮৯।

মক্কা আর ইয়ামনের দিকে হাতের ইশারা করলেন। বললেন, "ওই-দিক থেকে একজন নবী প্রেরিত হবেন।"

তারা জিজ্ঞেস করল, কখন তিনি আসবেন। তিনি তখন আমার দিকে, পরিবারের সবচেয়ে ছোট জনের দিকে তাকালেন। বললেন ঃ

"এই বালক, যদি পূর্ণ জীবন বেঁচে থাকে, তাহলে সে তাঁকে দেখবে।" এবং আল্লাহ্‌র কি কুদরত! এরপর একটা রাত ও একটা দিনও পার হলো না, আল্লাহ্ তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সা)-কে পাঠিয়ে দিলেন এবং তিনি আমাদের মধ্যে আছেন। আমরা তাঁর কথা বিশ্বাস করলাম, কিন্তু তারা দুষ্টমতি এবং হিংসার কারণে তাঁকে অস্বীকার করে বসল।

আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "ওইসব কথা আপনিই কি বলেন নি তখন আমাদের কাছে?"

সেই লোক বললেন, "নিশ্চয়ই বলেছিলাম। কিন্তু এই লোক সেই লোক নন।"

বানু কুরায়জার এক শেখের উদ্ধৃতি দিয়ে আসিম ইবনে উমর ইবনে কাতাদা আমাকে বলেছেন, 'বানু কুরায়জার ভাই বানু হাদলের সালাবা ইবনে সায়া, আসিদ ইবনে সায়া এবং আসাদ ইবনে উবায়দ কেমন করে মুসলমান হয়েছিলেন, জানেন? জাহিলিয়াতের দিনে তারা তাদের সঙ্গে ছিলেন, তারপর তারা ইসলামে তাদের মনিব হয়ে গেলেন।' আমি বললাম, "সে কথা আমি জানি না।"

তিনি বললেন, ইবনুল হাইয়াবান নামে একজন সিরিয়ার য়াহুদী ইসলামের কয়েক বছর আগে এখানে আমাদের সঙ্গে বসবাস করেছিলেন। 'মুসলমান নয়, অথচ এত ভাল মানুষ আমি আর দেখি নি। তখন ভীষণ খরা চলছে। আমি তাকে বললাম, আমাদের সঙ্গে এসে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে। কিন্তু তাকে কিছু না দিলে কিছুতেই তা করতে তিনি রাযী হলেন না। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কত দিতে হবে।

তিনি বললেন, "এক ঝুড়ি খেজুর আর দুই ঝুড়ি বালি'।"

আমরা তাকে তা-ই দিলাম। তিনি আমাদের হুজরা (ঘর) থেকে বাইরে গিয়ে আমাদের হয়ে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলেন। আর সুবহানাল্লাহ, তিনি চলে যেতে না যেতেই কোত্থেকে এসে মেঘ জড়ো হলো এবং বৃষ্টি নামল সঙ্গে সঙ্গে। একবার দুবার নয়, অনেকবার তিনি আমাদের জন্য এই কাজটি করেছেন। যখন তিনি বুঝলেন, তাঁর মৃত্যু আসন্ন, তিনি বললেন, "হে য়াহূদীগণ, রুটি আর মদের দেশ ছেড়ে এই দুঃখ আর ক্ষুধার দেশে যেন আমি এসেছিলাম বলে তোমাদের ধারণা ?

আমরা বললাম, আমরা জানি না। তিনি বললেন, তিনি এদেশে এসেছিলেন একজন আসন্ন নবীর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করবেন বলে। এই সেই শহর, যেখানে তিনি হিজরত করবেন। তিনি আশায় আশায় ছিলেন, তাঁকে প্রেরণ করা হবে। তিনি এলে তাঁর অনুসারী হবেন তিনি। বললেন, "তার সময় হয়েছে আসার, তোমাদের আগে যেন তাঁর কাছে কেউ না যেতে পারে। হে য়াহূদীবৃন্দ। কারণ তাঁকে প্রেরণ করা হবে যারা তাঁকে বাঁধা দেবে তাদের রক্তপাত করার জন্য, তাদের ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীলোকদের বন্দী করার জন্য।"

নবীকে প্রেরণ করা হলো। তিনি বানু কুরায়শকে বশীভূত করলেন। সেই জোয়ান এবং কিশোররা তখন বলল, 'ইনিই সেই নবী, যার কথা ইবনুল হাইয়াবান আমাদের কাছে নিশ্চয় করে বলেছিলেন।' তারা বলল, না, ইনি তিনি নন। অন্যান্য সকলে জোর দিয়ে বলল, তার সঙ্গে বর্ণনা হুবহু মিলে যাচ্ছে, ইনিই তিনি সুতরাং তাঁর কাছে সবাই ইসলাম গ্রহণ করল, জান-মাল এবং পরিবারদের রক্ষা করল।

য়াহূদীদের বিবরণ সম্পর্কে আমি যা শুনেছি, তা বর্ণনা করলাম।

সালমান কেমন করে মুসলমান হল

আসিম ইবনে উমর ইবনে কাতাদা আল-আনসারি আমাকে বলেছেন মাহমুদ ইবনে লাবিদের বরাত দিয়ে, মাহমুদ আবার এই হাদীস পেয়েছেন

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের কাছ থেকেঃ সালমানের কথা আমি শুনে যাচ্ছিলামঃ 'আমি ইস্পাহানের জাঈ গ্রামের এক পার্সী। আমার বাবা গ্রামের সবচেয়ে বড় জমিদার। তাঁর কাছে সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে প্রিয় ছিলাম আমি। তিনি আমাকে এত ভালবাসতেন যে, একটা ঘরে আমাকে তিনি বন্ধ করে রাখতেন, যেন আমি তাঁর কোন ক্রীতদাসী। আমি এমন এক উৎসাহী পার্সী পুরোহিতে পরিণত হলাম যে, আমি পবিত্র আগুনের রক্ষক হয়ে গেলাম। সব সময় আগুন জ্বালিয়ে রাখতাম, এক মুহূর্তের জন্যও আগুন নিবতে দিতাম না। বিরাট খামার ছিল আমার আব্বার। একদিন সময় হলো, খামারে যাওয়া বন্ধ হলো তাঁর, তিনি অক্ষম হয়ে গেলেন। আমাকে তিনি খামারে যেতে বললেন এবং কিছু নির্দেশ দিলেন আমাকে। বললেন, খামারের কাজ আমাকে শিখতে হবে।

তিনি বললেন, "কোথাও দেরী করবে না কিন্তু। কারণ, খামার টামার কিছু নয়, তুমিই আমার সব। তোমার জন্য দুশ্চিন্তা থাকলে আমি আর কিছুই করতে পারব না।"

আমি খামারের দিকে রওয়ানা হলাম। গির্জার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, প্রার্থনার স্বর কানে এলো। ভেতরে কারা যেন প্রার্থনা করছে। ওদের সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। আব্বা তো সব সময় আমাকে ঘরেই বন্ধ করে রাখতেন। শব্দ শুনে আমার কৌতূহল হলো—কি করছে ওরা? ভেতরে গেলাম গির্জার। ওদের প্রার্থনার ধরনে আমি মুগ্ধ হলাম, ওদের ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হলাম। মনে হলো, ওদের ধর্ম আমাদের ধর্মের চেয়ে ভাল। স্থির করলাম, সূর্যাস্তের আগে আমি আর ফিরব না। আমি খামারে গেলাম না, ওখানে রইলাম পড়ে।

ওদের ধর্মের উৎস কোথায় আমি ওদের জিজ্ঞেস করলাম।

'সিরিয়া' ওরা বলল।

আমি আব্বার কাছে ফিরে গেলাম। আব্বা আমার জন্য চিন্তা করছিলেন। কোন কাজে মন দিতে পারছিলেন না। কাজেই আমাকে আনবার জন্য লোক পাঠালেন।

কোথায় ছিলাম তিনি জানতে চাইলেন। তাঁর উপদেশ না শোনার জন্য বকলেন। তাঁকে আমি বললাম—যাওয়ার সময় গির্জায় কিছু লোক প্রার্থনা করছিল, ওদের ধর্মের যেটুকু আমি দেখলাম, আমার খুব ভাল লাগল। আমি ওখানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ছিলাম।

তিনি বললেন, "বৎস, ওদের ধর্ম ভাল নয়। তোমার পিতা-পিতামহের ধর্ম ওটার চেয়ে অনেক ভাল।"

আমি বললাম, "না, ওদেরটা বেশী ভাল।"

আমার ভাব-সাব দেখে আব্বা ভয় পেয়ে গেলেন, কি জানি কি আমি করে বসি। তিনি আমাকে শিকলে বাঁধলেন, তাঁর ঘরে বন্দী করে রাখলেন আমাকে।

আমি কোনমতে খৃস্টানদের কাছে লোক পাঠালাম। সিরিয়া থেকে খৃস্টান বণিকদের কোন কাফেলা এলে আমাকে জানাতে বললাম। কাফেলা এলে ওরা আমাকে জানাল। আমি ওদের বললাম: "ওদের কাজ হয়ে গেলে ওরা যখন দেশে ফিরবেন, তখন আমাকে ওরা সঙ্গে নেবেন কিনা একটু জিজ্ঞেস করে আমাকে জানাবেন দয়া করে।"

ওরা আমাকে জানালো।

পায়ের শিকল আমি ভেঙে ফেললাম। চলে গেলাম ওদের সঙ্গে সিরিয়ায়। ওখানে গিয়ে আমি ওখানকার ওদের ধর্মের সবচেয়ে পণ্ডিত মানুষকে জিজ্ঞেস করলাম। ওরা আমাকে যেতে বলল বিশপের কাছে। তাঁর কাছে গেলাম আমি। বললাম—তাঁদের ধর্ম আমার ভাল লাগে। আমি তাঁর সঙ্গে থাকব। গির্জার সেবা করব। তাঁর কাছে ধর্ম শিখব, তাঁর জন্য প্রার্থনা করব। তিনি আমাকে ভেতরে যেতে বললেন। আমি ভেতরে গেলাম।

ওই লোক কিন্তু সুবিধের ছিল না। লোকদের ভিক্ষা দেওয়ার জন্য আদেশ দিতেন। ভিক্ষার জন্য চাপ প্রয়োগ করতেন। লোকজন টাকা পয়সা দিলে তা রাখতেন নিজের পেটিকায়। তা থেকে দরিদ্রদের কিছু দিতেন না। এমনি করে তিনি সাত কলসী সোনা রূপা সংগ্রহ করলেন। এই সব দেখে ওর প্রতি তীব্র ঘৃণার জন্ম হলো আমার মধ্যে। কিছু দিন পর বিশপ মারা গেলেন। সমস্ত খৃস্টানরা এল তাকে সমাহিত করবার জন্য। আমি তাদের বললাম, তিনি খুব খারাপ লোক ছিলেন। ভিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি সবাইকে প্ররোচিত করতেন। ভিক্ষা পেলে তা রাখতেন নিজের পেটিকায়। গরীব মানুষের কিছুই দিতেন না। তারা জিজ্ঞেস করল—সে কথা আমি কি করে জানলাম। আমি ওদের নিয়ে গেলাম যেখানে এসব ধন রাখা হয়েছিল সেখানে। ওরা সোনা রূপা ভর্তি সাতটি কলস বের করে আনল। ওগুলো দেখেই ওরা বলে উঠল, "ঈশ্বরের শপথ! এই লোককে আমরা সমাহিত করবো না।" ওরা ওকে ক্রুশবিদ্ধ করল, ওর শবদেহে পাথর মারল। অন্য একজন লোক নিয়োগ করল তার জায়গায়।

অমুসলিমদের মধ্যে নতুন বিশপের মতো এমন পুণ্যবান, এমন তপস্বী, পরকালের প্রতি এমন নিবেদিত প্রাণ, দিনরাত এমন নিষ্ঠাবান মানুষ আমি আর দেখিনি। তাঁকে আমি যত ভালবেসেছিলাম, এমন আর কাউকে কোনদিন ভালবাসি নি। অনেক দিন তাঁর সঙ্গে আমি কাটিয়েছি। তারপর তাঁর মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এল। আমি তাঁকে বললাম-- তাকে আমি কত ভালবাসি। বললাম—কার কাছে তিনি আমাকে সোপর্দ করে যাচ্ছেন, মৃত্যুর সময় কি অছিয়ত তিনি আমাকে দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বললেন, "বাছা আমার, আমার মত এমন আর কেউ আছে কিনা আমি জানি না। কিছু মানুষ মারা গেছে, কেউ তাদের সত্য ধর্ম পরিবর্তন করেছে, কেউ বা বর্জন করেছে। করেন নি শুধু একজন। তিনি মাউসিলে থাকেন। তিনি আমার ধর্মের মানুষ। তুমি তাঁর কাছে যাও।" তিনি ইন্তেকাল করলেন, সমাহিত করা হলো তাঁকে। আমি তখন মাউসিলের সেই বিশপের কাছে গেলাম। বললাম, মরবার

সময় অমুক আমাকে তাঁর কাজে এসে থাকতে বলে দিয়ে গেছেন। তিনি বলে গেছেন, তিনিও তাঁর পথেরই অনুসারী। তাঁর সঙ্গে আমি থেকে গেলাম। দেখলাম, তাঁর সম্বন্ধে যা যা বর্ণনা আমাকে দেওয়া হয়েছিল, তিনি তা-ই। কিন্তু অল্পদিন পরে তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। মৃত্যুর আগে আগের জনের মত তাঁকেও আমি জিজ্ঞেস করলাম—এরপর আমি কি করব। তিনি জবাব দিলেন, একটি মাত্র মানুষের খবর তিনি জানেন, তিনি থাকেন নাসিবিনে। তিনিই তাঁর মত একই মতাবলম্বী। আমাকে তিনি তাঁর কাছে যেতে বললেন।

নাসিবিনের এই ভাল মানুষের সঙ্গে কিছুদিন ছিলাম আমি। তিনিও মারা গেলেন এবং আমাকে বললেন—আমুরিয়া-য় তাঁর এক সহকর্মীর কাছে যেতে। তাঁর সঙ্গে থাকলাম কিছুকাল। খুব পরিশ্রম করে আমি কয়েকটা গাভী ও এক পাল ভেড়ার মালিক হলাম। তাঁর যখন মৃত্যুর সময় হলো, তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলাম—কার কাছে আমি যাবো এর পরে। তিনি বললেন, 'তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণ করেন এমন কাউকে তিনি চেনেন না। তবে অচিরেই আবির্ভাব ঘটবে একজন নবীর। তিনি অবতীর্ণ হবেন ইবরাহীমের ধর্ম নিয়ে। তিনি অবতীর্ণ হবেন আরবদেশে। পরে তিনি হিজরত করবেন দুই আগ্নেয়গিরির মধ্যবর্তী দেশে, যেখানে খেজুর গাছ আছে। নির্ভুল তাঁর চিহ্ন। তাঁকে কিছু দেওয়া হলে তিনি তা খাবেন। কিন্তু সদকা তিনি গ্রহণ করবেন না। তাঁর দু' কাঁধের মাঝখানে আছে নবুয়তের সীল। ওই দেশে তুমি যদি যেতে পারো, তাই যাও তবে।''

তিনিও মারা গেলেন, সমাধিস্থ করা হলো তাঁকে। যতদিন আল্লাহ্ ইচ্ছা করলেন, ততদিন আমি ছিলাম আমুরিয়ায়। কালবাইট বণিকদের একটি দল যাচ্ছিল ওপথে তখন। আমি তাঁদের আমাকে আরবদেশে নিয়ে যেতে অনুরোধ করলাম। বললাম, বিনিময়ে আমার সমস্ত গাধা ও ভেড়া তাদের দিয়ে দেব। তারা আমার প্রস্তাব গ্রহণ করল। তাদের সঙ্গে আমি রওয়ানা হলাম এবং ওয়াদিল-কুরা এসে উপস্থিত হলাম। ওখানে তারা আমাকে একজন য়াহুদীর কাছে বিক্রি করে দিল ক্রীতদাস হিসেবে। দেখলাম

ওখানে খেজুর গাছ আছে। মনে আশা হলো, এই বুঝি সেই শহর, যার কথা প্রভু আমাকে বলেছিলেন। কারণ আমি নিশ্চয় করে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আমার নতুন মনিবের এক চাচাতো ভাই, মদীনার বানু কুরায়জার এক ভদ্রলোক এলেন। তিনি আমাকে কিনে নিয়ে চললেন মদীনায়। আল্লাহ্‌র কসম! দেখেই আমি সে দেশ চিনতে পারলাম। এই শহরের কথা আমার মনিব আমাকে বলেছিলেন। এরই বর্ণনা তিনি আমার কাছে দিয়েছিলেন।

আমি ওখানেই বসবাস করতে লাগলাম। এর মধ্যে আল্লাহ্‌র নবী মক্কায় প্রেরিত হয়ে গেছেন। কেউ আমার কাছে তাঁর কথা বলে নি। কারণ ক্রীতদাস হিসাবে সর্বক্ষণ আমাকে কাজ করতে হতো। তারপর তিনি হিজরত করে এলেন মদীনায়। আমি তখন মনিবের এক খেজুর গাছের উপরে বসে কাজ করছিলাম। মনিব ছিলেন গাছের নিচে বসে। হঠাৎ তার এক চাচাতো ভাই দৌড়ে এল। বলল: "বানু কায়লার উপর আল্লাহ্‌র গজব নাযিল হোক! তারা কুবায় একটা লোককে ঘিরে জড়ো হয়েছে। লোকটা এসেছে মক্কা থেকে। বলছে সে নাকি নবী।"

কথাটা শুনেই আমার সর্বশরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। মনে হলো এক্ষুনি বুঝি মনিবের ঘাড়ের উপরই আমি পড়ে যাবো। আমি কোনমতে নেমে এলাম গাছ থেকে। মনিবের চাচাতো ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, "কি বললেন আপনি! কি বললেন?"

আমার মনিব ভীষণ রেগে গিয়ে আমাকে সজোরে একটা চড় মারল। বলল, "এ সবের মানে কি? যা কাজে যা।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে যাচ্ছি। আমি শুধু উনি যা বলছেন তা সত্য কিনা জানতে চাচ্ছিলাম।"

কিছু খাবার আমি সঞ্চয় করে রেখেছিলাম। সন্ধ্যায় তা-ই নিয়ে আমি কুবা-য় গেলাম নবীর কাছে। বললাম, "আমি শুনেছি আপনি খুব সৎ মানুষ। শুনেছি আপনার সঙ্গীরা এই ভিন দেশে খুব

অসুবিধায় আছে। এই নিন, আমার তরফ থেকে কিছু সদকা। কারণ আমি মনে করি অন্য যে কোন লোকের চেয়ে এর উপর আপনার হক বেশি।"

আমি খাবার রসূল (সা)-কে প্রদান করলাম। নবী (সা) তাঁর সঙ্গীদের বললেন, "খাও।"

কিন্তু তিনি নিজের হাত প্রসারিত করলেন না। খেলেনও না। মনে মনে আমি বললাম, "ইনিই তিনি।"

আমি চলে গেলাম। আরো কিছু খাবার সংগ্রহ করলাম। নবী (সা) চলে গেলেন মদীনা শহরে। সেই খাবার নিয়ে আমি গেলাম তাঁর কাছে। বললাম, "আমি দেখেছি, সদকার খাবার আপনি খান না। এই নিন, এটা আমার উপহার। আমি খাস দিলে আপনাকে দিচ্ছি।"

নবী (সা) তা খেলেন। কিছু দিলেন সঙ্গীদের। আমি বললাম, "এখন বাকি রইল দুই নম্বর।"

নবী (সা) তখন গেছেন বাকিউল গারকাদে ১ তাঁর এক সঙ্গীর শবানুগামী হয়ে। আমার কাছে তখন দুটো আলখেল্লা। তিনি বসেছিলেন সঙ্গীদের নিয়ে। আমি তাঁকে অভিবাদন জানালাম। তারপর ঘুরে পেছন দিকে গেলাম। মনিব যে নবুয়তের চিহ্নের কথা আমাকে বলেছিলেন তা আছে কিনা দেখার জন্য। নবী (সা) দেখলেন, তার পেছন দিকে আমি কি খুঁজে বেড়াচ্ছি। নবী (সা) তখন বুঝতে পারলেন, যে সত্যের খবর আমি জানি, সেই সত্য আমি তালাশ করছি। তিনি আলখেল্লা পেছন থেকে সরিয়ে দিলেন, তাঁর অনাবৃত পৃষ্ঠদেশে আমি নবুয়তের সীল দেখলাম। দেখেই চিনলাম। আমি তাঁর উপর অবনত হয়ে ওখানে চুমু খেতে লাগলাম এবং কাঁদতে লাগলাম। নবী (সা) বললেন, "এখানে এসো।"

১. মদীনা শহরের বাইরে গোরস্তান।

আমি তাঁর কাছে গেলাম। বসলাম তাঁর সামনে। এবং হে বানু আব্বাস, তাঁর কাছে আমার সব কাহিনী বর্ণনা করলাম। যে কাহিনী এতক্ষণ আপনাদের বললাম, সব। নবী (সা) তাঁর সঙ্গীদের আমার কাহিনী শ্রবণ করতে বললেন।'

ক্রীতদাস সালমান দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, রসূল (সা)-এর সঙ্গে যেতে পারেন নি বদর আর উহুদের যুদ্ধে।

সালমান আবার বলতে লাগলেন ঃ তারপর নবী (সা) আমাকে বললেন, "একটা চুক্তি লেখো।" আমি আমার মনিবকে সম্বোধন করে লিখলাম— তাঁর জন্য আমি তিনশ খেজুর গাছ লাগিয়ে দেব। গাছের গোড়ায় গর্ত করে আর তাঁকে চল্লিশ ওক স্বর্ণ দেব। রসূল (সা) তাঁর সঙ্গীদের আদেশ দিলেন আমাকে সাহায্য করার জন্য। তাঁরা সবাই নেমে গেলেন আমাকে সাহায্য করতে। একজন দিলেন ত্রিশটা খেজুর গাছের চারা, একজন দিলেন বিশটা, একজন পনেরোটা, আরেকজন দিলেন দশটা। প্রত্যেকে সাধ্যমতো চেষ্টা করতে লাগলেন। তারপর সম্পূর্ণ হলো তিনশ খেজুর গাছ সংগ্রহ। নবী করীম (সা) আমাকে বললেন, গর্তগুলো গিয়ে খনন করে ফেলতে। বললেন, গর্ত করা হয়ে গেলে তিনি নিজের হাতে গাছ লাগিয়ে দেবেন। আমার সঙ্গীদের সহায়তায় সবগুলো গর্ত করে ফেললাম। গর্ত করে তাঁকে এসে বললাম। তারপর সবাই একত্রে গেলাম গাছের জায়গায়। তাঁকে আমরা খেজুর গাছের চারাগুলো এনে দিলাম। নবী করীম (সা) নিজের হাতে চারা লাগালেন। আর কি আশ্চর্য! আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় একটা চারাও মরল না।

গাছ তো দেওয়া হলো। কিন্তু টাকা? টাকা দিতে হবে এবার। সোনার এক খনি[১] থেকে রসূল (সা)-কে এক টুকরা স্বর্ণ দেওয়া হয়েছিল। মুরগীর ডিমের মতো প্রকাণ্ড। তিনি আমাকে ডেকে তা দিয়ে দিলেন। ওই স্বর্ণ দিয়ে ঋণ শোধ করতে হুকুম দিলেন।

১. ওয়াঝ-ইয়ানবু এলাকায় একটা খনি পুনরুদ্ধার হয়েছিল সেই সময়ে।

আমি বললাম, "এই দিয়ে কতটুকু ঋণ পরিশোধ হবে আমার হে রসূলুল্লাহ্ ?"

তিনি বললেন, "এটা তুমি নাও। এই দিয়েই আল্লাহ্ তোমার ঋণ শোধ করবেন।"

আমি সে দান গ্রহণ করলাম। ওজন করে দেখি, ইয়া আল্লাহ্, ঠিক কাঁটায় কাঁটায় চল্লিশ ওক্ ওজন। তাই দিয়ে শোধ করলাম আমার ঋণ। সালমান মুক্ত হয়ে গেল দাসত্ব থেকে।

মুক্ত মানুষ হিসাবে আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে খন্দকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। তারপর সব যুদ্ধে আমি ছিলাম তাঁর পাশে।'

ইয়াজিদ ইবনে আবু হাবিব আমাকে বলেছেন যে, আবদুল কায়সের একজন লোক সালমানের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁকে বলেছে যে, সালমান তাঁকে বলেছিলেন: 'আমি যখন বললাম, "এই দিযে কতটুকু ঋণ আমার পরিশোধ হবে ?' তখন রসূল (সা) স্বর্ণখণ্ডটি নিয়ে তাঁর জিহ্বায় রেখেছিলেন। তারপর বের করে এনে বলেছিলেন, "এটা নাও, এই দিয়ে তোমার সাকুল্য ঋণ শোধ করো।" আমিও তা দিয়ে সাকুল্য ঋণ শোধ করলাম, সম্পূর্ণ চল্লিশ ওক্।[১]

উমর ইবনে আবদুল আযীয ইবনে মারওয়ানের এক বিশ্বস্ত তথ্যদাতার সূত্রে আসিম ইবনে উমর ইবনে কাতাদা বলেছেন যে, তাঁকে বলা হয়েছে যে, পার্সী সালমান রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেছিলেন যে, আম্মুরিয়াস্থ তাঁর মনিব সিরিয়ায় একটি জায়গায় তাঁকে যেতে বলেছিলেন। সেই জায়গায় দুই ঘন ঝোঁপের মাঝখানে এক লোক থাকেন। প্রতি বছর সেই লোক এক ঝোঁপ থেকে অন্য ঝোঁপের পথ দিয়ে যাওয়ার সময় রোগীরা তার পথ আগলে দাঁড়াত। তিনি দোয়া পড়তেন। রোগী সুস্থ হয়ে যেতো। সালমানের মনিব তাঁকে বলে দিয়েছিলেন, 'তুমি যে ধর্ম তালাশ করছ,

---

১. এক ওক এক আউন্সের সমান।

তার কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করো। তিনি তোমাকে বলে দেবেন।' আমি রওয়ানা হয়ে গেলাম। যেতে লাগলাম। যেতে যেতে সেইখানে এসে হাযির হলাম, যে জায়গার কথা আমাকে বলা হয়েছিল। দেখলাম রোগী নিয়ে জমা হয়ে আছে অনেক লোক। তারা অপেক্ষা করছে কখন তিনি বেরুবেন। তিনি বের হয়ে এলেন রাতের বেলায়। অন্য ঝোঁপে যাবেন। রোগী নিয়ে লোকজন তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের জন্য তিনি দোয়া করলেন। রোগী সুস্থ হয়ে গেল। আমি তাঁর কাছে যেতে পারলাম না। লোকজন আমাকে যেতে দিল না। যে ঝোঁপে তিনি যাবেন, তার ভেতর তিনি যখন ঢুকতে যাবেন, তখন আমি তাঁকে ধরলাম। আমি তাঁর কাঁধ চেপে ধরলাম। তিনি ফিরে দাঁড়ালেন, জিজ্ঞেস করলেন—আমি কে, কি চাই। আমি বললাম, "আপনার উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। আমাকে ইবরাহীমের ধর্ম হানিফিয়া সম্বন্ধে কিছু বলুন।"

তিনি জবাব দিলেন, 'এমন জিনিস আপনি জানতে চাচ্ছেন, কেউ তো আজকাল তা জানতে চায় না। সময় হয়েছে. সেই ধর্ম নিয়ে এক নবী অবতীর্ণ হবেন। হারামের লোকজনের ভেতর থেকে। তাঁর কাছে যান, তিনি আপনাকে তা (সেই ধর্ম) দেবেন।'

বলেই তিনি ঝোঁপের ভেতর প্রবেশ করলেন।

রসূল সালমানকে বলেছিলেন, 'তুমি যা বলছ, তা যদি সত্য হয়, তাহলে তোমার সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছিল মেরীর পুত্র যীশুর।'

চারজন লোক বহু ঈশ্বরবাদ ভেঙে দিলেন

একদিন এক ভোজে জমায়েত হয়েছিল কুরায়শরা। উপলক্ষ—যে প্রতিমার সামনে তারা কুরবানী দিচ্ছিল তাকে তওয়াফ করা ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। এই ভোজ প্রতি বছর হতো। খুব গোপনে চারজন লোক ওখান থেকে সরে গেলেন। গোপনে তাঁরা বন্ধুত্বের বন্ধনে থেকে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। লোকগুলো ছিলেন: (১) ওয়ারাকা ইবনে নওফেল ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উজ্জা ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে

কা'ব ইবনে লুআই, (২) উবায়দুল্লাহ্ ইবনে জাহ্শ ইবনে রিআব ইবনে ইয়ামার ইবনে সাবরা ইবনে মুররা ইবনে কবির ইবনে গানম্ ইবনে দুদান ইবনে আসাদ ইবনে খুযায়মা। এ'র আম্মা ছিলেন উমায়মা বিনতে আবদুল মুত্তালিব, (৩) উসমান ইবনে আল-হাওয়ারিস ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উজ্জা ইবনে কুসাই এবং (৪) যায়দ ইবনে আমর ইবনে নওফেল ইবনে আবদুল উজ্জা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে কার্ত ইবনে রিয়াহ্ ইবনে রাজাহ্ ইবনে আদিই ইবনে কা'ব ইবনে লুআই। তাঁদের মতে ওরা তাঁদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মকে কলুষিত করে ফেলেছে, যে পাথরের চারদিকে তারা তওয়াফ করছে, তার কোন মাহাত্ম্য নেই। এই পাথর কিছু শোনে না, দেখে না, আঘাত করতে পারে না, সাহায্য করতে পারে না। তারা বলে, 'যাও না, তোমরা নিজেদের ধর্ম বের করো না। ঈশ্বরের দিব্যি, তোমাদের কোন ধর্ম নেই।' কাজেই তারা ভিন্ন ভিন্ন পথে বের হয়ে পড়লেন দেশে দেশে, ইবরাহীমের (আ) ধর্ম হানিফিয়ার সন্ধানে।

খৃস্টধর্মের উপর বিশ্বাস ছিল ওয়ারাকার। এই ধর্মের শাস্ত্রাদি তিনি অধ্যয়ন করতেন। পড়তে পড়তে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন তিনি সে শাস্ত্রে। উবায়দুল্লাহ্ অন্বেষণ করেই চললেন, সেই অবস্থায় ইসলাম আবির্ভূত হলো। মুসলমানদের সঙ্গে তিনি চলে গেলেন আবিসিনিয়ায়। সঙ্গে গেলেন তাঁর মুসলমান স্ত্রী উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান। আবিসিনিয়ায় গিয়ে তিনি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন, খৃস্টান হিসাবেই ইহধাম ত্যাগ করেন।

মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর ইবনে আল-যুবায়র আমাকে বলেছেন যে, খৃস্টান হওয়ার পর উবায়দুল্লাহ্ রসূলে করীম (সা)-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় প্রায়ই বলতেন: 'আমরা পরিষ্কার দেখি, কিন্তু তোমাদের চোখ তো আধ-খোলা।' অর্থাৎ 'আমরা দেখতে পাচ্ছি, আর তোমরা দেখতে চেষ্টা করছো, এখন দেখতে পাচ্ছো না।' তিনি 'সা'সা' শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন। সা'সা অর্থাৎ কুকুরের বাচ্চা চোখ খুলে দেখতে চেষ্টা করলে কেবল অর্ধেকটা দেখতে পায়। অন্য যে শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন তা হল 'ফাক্কাহা'।

অর্থাৎ চোখ খোলা। তাঁর মৃত্যুর পর রসূল (সা) তাঁর বিধবা পত্নী উম্মে হাবিবাকে শাদী করেছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসায়েন আমাকে বলেছেন যে, রসূল (সা) তাঁর বিয়ের ব্যাপারে আমর ইবনে উমাইয়া আদ দামরিকে পাঠিয়েছিলেন নিগাসের কাছে এবং তিনিই (নিগাস) এ বিয়ে সমাধা করে দেন। নবী করীম (সা)-এর তরফ থেকে তিনি তাকে মোহর হিসাবে দিয়েছিলেন চারশত দিনার। মুহাম্মদ ইবনে আলী বলেছিলেন, 'আমাদের মনে হয় এটাকে নযীর ধরে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান মেয়েদের মোহরের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন চারশত দিনার। উম্মে হাবিবাকে রসূল করীম (সা)-এর হাতে এসে তুলে দিয়েছিলেন খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আ'স।

উসমান ইবনে আল-হাওয়ারিস চলে গিয়েছিলেন বাইজানটাইন সম্রাটের কাছে। ওখানে তিনি খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁকে উচ্চ পদের চাকুরী দেওয়া হয়েছিল সেখানে।

যায়দ ইবনে আমর যেখানে ছিলেন সেখানেই থেকে গেলেন ঃ তিনি য়াহুদী বা খৃস্টান—কোন ধর্মই গ্রহণ করলেন না। নিজের পিতা-পিতামহের ধর্ম পরিত্যাগ করে মূর্তি, মৃত প্রাণী ও রক্ত ভক্ষণ এবং প্রতিমাকে অর্ঘ্যদান ইত্যাদি বিষয় থেকে বিরত রইলেন। শিশুকন্যাদের হত্যা করতে তিনি সবাইকে বারণ করতেন। বলতেন—তিনি ইবরাহীমের উপাস্যকে পূজা করেন। নিজের লোকজনদের প্রকাশ্যে তিনি তাদের আচার-আচরণের জন্য নিন্দা করতেন।

হিশাম ইবনে 'উরওয়া তাঁর পিতার এবং তার পিতা তাঁর আম্মা আসমা বিনতে আবু বকরের উদ্ধৃতি দিযে বলেছেন যে, আসমা যায়দকে খুব বুড়ো অবস্থায় কা'বাঘরে পিঠ হেলান দিয়ে বলতে শুনেছেন, 'হে কুরায়শ, যার হাতে আমার প্রাণ তার নামে কসম খেয়ে আমি বলছি, তোমরা কেউ ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ করো না, কিন্তু কেবল আমি।' পরে তিনি আবার বলেছেন, 'হে আল্লাহ্, আমি যদি জানতাম কেমন

করে তুমি উপাসনা চাও, তাহলে আমি সেভাবেই উপাসনা করতাম। কিন্তু আমি তো তা জানি না।' তারপর তিনি দুই হাত সামনে রেখে সিজদা করলেন।

আমাকে বলা হয়েছে যে তাঁর পুত্র সাঈদ ইবনে যায়দ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র উমর বিন আল-খাত্তাব রসূল (সা)-কে বলেছেন, 'যায়দ ইবনে আমরের জন্য কি আমাদের আল্লাহ্‌র ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া উচিত ?' রসূল করীম (সা) বলেছেন, 'হ্যা, উচিত। কারণ তাহলে তাঁকে মৃত অবস্থা থেকে একেবারে তার সমস্ত জাতির প্রতিনিধি পর্যায়ে উন্নীত করা হবে।'

যায়দ ইবনে আমর ইবনে নওফেল তাঁর নিজের লোকজনদের ছেড়ে চলে যাওয়া এবং তাদের কাছে প্রাপ্ত আচরণ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কবিতা লিখে গেছেন ঃ

এক প্রভুকে আমি আরাধনা করব, নাকি হাজার প্রভুকে ?
যত তোমরা দাবি করো তত যদি থাকে ঈশ্বর
আমি আল-লাত আর আল-উজ্জা—উভয়কেই বর্জন করলাম,
যে কোন দৃঢ়চেতা মানুষ তাই করবে।
আল-উজ্জা আর তার দুই কন্যাকে আমি পুজা করব না,
বানু আমরের দুই প্রতিমার ধারে কাছে আমি যাব না।
আমি হুবালকে পূজা করব না. যদিও তিনিই প্রভু ছিলেন
আমার কোমলমতি সময়ের।
আমি ভাবতাম, বুঝতে পারতাম না (রাতে বহু জিনিসই বিচিত্র
লাগে, দিনে স্পষ্ট হয়ে যায় সব),
আল্লাহ্ এত মানুষ ধ্বংস করলেন
যাদের সমস্ত কর্ম ছিল শয়তানিতে পূর্ণ
এবং রক্ষা করলেন অন্যদের তাদের আপন মানুষের পুণ্যের ফলে
যাতে ছোট শিশু পূর্ণ মানুষে পরিণত হতে পারে।
কেউ কখনো নিস্তেজ থাকে, পরে আবার সতেজ হয়,
বৃষ্টির পর যেমন সতেজ হয় বৃক্ষ শাখা।

আমি আমার দয়াময় প্রভুর সেবা করি,
যাতে ক্ষমাশীল প্রভু আমার পাপ মার্জনা করেন,
সুতরাং তোমার প্রভু আল্লাহ্র প্রতি ভয় রাখে
যতদিন তা করবে ধ্বংস হবে না তুমি
দেখবে নেক বান্দা বাগানে বাস করছে,
অবিশ্বাসীদের জন্য জ্বলছে দোযখের আগুন।
জীবনে অসম্মানিত, মরণের পর
তাদের বুক বেদনায় কুঁকড়ে যাবে।

যায়দ আরো বলেছেন ঃ

আল্লাহ্র কাছে আমার যত প্রশংসা আর শোকরানা,
এটা নিশ্চিত, তা কোন দিন ব্যর্থ হবে না,
সেই বেহেশতের রাজার কাছে—তাঁর উর্ধ্বে কোন ঈশ্বর নেই,
কোন প্রভু তার কাছে যেতে পারে না।
মৃত্যুর পর যা ঘটবে, তার জন্য সাবধান হে মানুষ।
আল্লাহ্র কাছ থেকে কিছুই তুমি লুকাতে পারবে না।
সাবধান আল্লাহ্র পাশে কাউকে রাখবে না,
ন্যায় পথ এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে।
আমি দয়া চাই তোমার। অন্য লোক জিন্-এ বিশ্বাস করে করুক,
কিন্তু তুমি, তুমি আমার আল্লাহ্, আমাদের প্রভু, আমাদের আশা।
তোমার উপর আমি খুশি আছি, হে আল্লাহ্, প্রভু, হিসেবে,
তুমি ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বরকে পূজা আমি করব না।
তোমার করুণা আর মহত্ত্বে তুমি
মূসার কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন ঘোষণাকারী হিসাবে,
তুমি তাকে বলে দিয়েছিলে, যাও তুমি আর আ'রন
জালিম ফিরাউনকে আল্লাহ্র পথে ডাক,
এবং তাকে বলো, 'কোন খুঁটি ছাড়া একে (পৃথিবীকে) তুমি
কি প্রসারিত করেছিলে,
এমনি করে মজবুত হওয়ার আগে ?

তাকে বলো, 'তুমি কি একে (আকাশকে) শূন্যে তুলেছিলে
কোন সমর্থন ছাড়া ?
কি নিপুণ কারিগর তুমি ছিলে তাহলে।'
তাকে বলো, 'তুমি কি তার মাঝখানে চাঁদ বসিয়েছিলে,
রাতে পথ দেখার জন্য ?
তাকে বলো, ' কে পাঠিয়েছে সূর্য দিনের,
পৃথিবীর সব সুন্দর প্রকাশিত হওয়ার জন্য ?'
তাকে বলো, 'কে ফেলেছে বীজ মাটিতে,
জন্মেছে লতাপাতা মোম ?
আবার এনেছে বীজ গাছের শীর্ষে ?
এতে আছে ইশারা সব কিছু বুঝবার।
তোমার করুণায় তুমি ইউনুসকে পাঠিয়েছিলে,
তিনি সারারাত কাটিয়েছিলেন মাছের পেটে।
আমি সকল সময় যদিও তোমার মহিমা কীর্তন করি তবুও প্রায়ই বলি,
'প্রভু হে, ক্ষমা করে দাও সব পাপ আমার।'
হে সমস্ত সৃষ্টির কর্তা, তোমার রহমত ও করুণা
আমার উপর বর্ষণ করো,
আমার পুত্র পৌত্রাদি, আমার জানমাল আমানত করো।

যায়দ ইবনে আমর তাঁর স্ত্রী সাফিয়া বিনতে আল-হাদ্রামিকে তিরস্কার করতে গিয়ে বলেন ঃ[১]

ইবরাহীমের ধর্ম হানিফিয়ার অন্বেষায় যায়দ মক্কা ছেড়ে বাইরে, দেশ দেশান্তর যাবেনই যাবেন বলে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। সাফিয়া যখনই দেখতেন স্বামী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তখনই তিনি আল-খাত্তাব ইবনে নুফায়েলকে বলে দিতেন। আল-খাত্তাব তাঁর চাচা ছিলেন, আবার একই মায়ের গর্ভজাত ভাইও

১. কবিতার শান-ই-নযুল আগে আসছে, পরে আসছে কবিতা।

ছিলেন।[১] আল-খাত্তাব তাকে ভর্ৎসনা করতেন নিজের পিতা-পিতামহের ধর্ম বর্জন করার জন্য। সাফিয়াকে তিনি বলে দিয়েছিলেন, কোথাও যায়দ যাওয়ার জন্য তৈরী হলে তাঁকে যেন জানানো হয়। তখন যায়দ বলেছিলেন ঃ

এই অপমানের ভেতরে আমাকে আর ধরে রেখো না
হে সাফিয়া। এ আমার পথ নয়।
আমি যখন অপমানের আশঙ্কা করি
তখন সাহসী হই আমার অশ্ব হয় অনুগত।
যে মানুষ নিয়ত রাজদরবারে যায়,
উট তার পার হয় মরু,
যে অন্যের সঙ্গে ছিন্ন করে সম্পর্ক
বন্ধুর সাহায্য ছাড়া নিজের বিপদ নিজেই অতিক্রম করে (সেই আমি)।
গাধাই কেবল অপমান সহ্য করে
গায়ের চামড়া উঠে যায় তবু।
বলে, হাল ছাড়ব না আমি
বোঝার ভারে পেটের চামড়া ছড়ে গেছে, তাতে কি।'
আমার ভাই (আম্মার পুত্র, এবং পরে আমার চাচা)
যে ভাষা ব্যবহার করে (আমার প্রতি), তা আমার ভাল লাগে না।
আমাকে বকেন তিনি, আমি বলি,
'তার জন্য কোন জবাব আমার নেই।'
তবু ইচ্ছা করে যা বলতে চাই তা যদি বলতে পারতাম,
যে বস্তুর চাবি দরজা আমার কাছে, তার কথা
যদি বলতে পারতাম।

যায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফায়লের পরিবারের একজন আমাকে বলেছেন যে মসজিদের ভেতরে কা'বার দিকে মুখ করে যায়দ বলতেন, 'লাব্বায়কা, সত্যে, ধর্মে আর খেদমতে আমি হাযির তোমার কাছে ঃ

১. যায়দের মার প্রথম বিয়ে হয় নুফায়লের সঙ্গে। তার গর্ভে জন্ম হয় আল-খাত্তাবের। পরে তার বিয়ে হয় সৎ-পুত্র আমরের সঙ্গে. সেখানে জন্ম হয় যায়দের। দ্বৈত-সম্পর্ক এমনি করে হয়েছিল।

যা ছিল ইবরাহীমের আশ্রয় কিবলা সামনে রেখে যখন তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেইখানে আমি আশ্রয় নিলাম।

তারপর তিনি বললেন :

অধম বন্দী আমি হে আল্লাহ্, ধুলোয় লুণ্ঠিত আমার মুখ,
তোমার যা আদেশ সব আমার শিরোধার্য।
অহংকার নয়, আমি চাই ধার্মিকতার বর
দ্বিপ্রহরের মুসাফির তো সে নয়, সে যে নিদ্রা যায় দুপুরেই।

যায়দ আরো বলেছেন :

তাঁর কাছে আমি অবনত বিরাট
পর্বত ধারণ করা পৃথিবী যার প্রজা।
প্রথমে তিনি তা বিছিয়ে দিলেন, যখন দেখলেন তাতে স্থিতি এসেছে
সমুদ্রের উপর, পর্বত স্থাপন করে দিলেন তাতে।
আমি তাঁর কাছে অবনত সুমিষ্ট পানি-বহ
মেঘ যার প্রজা।
সেই মেঘ জমে যে যে দেশের উপর
আজ্ঞাবহের মতো সেখানে বৃষ্টি পরে অকৃপণ।

আল-খাত্তাব যায়দকে এত বেশী হেনস্তা করেছিলেন যে, যায়দ শেষ পর্যন্ত চলে গেলেন মক্কা ছেড়ে, উত্তর দিকে। হীরা পাহাড়ের কাছে শহরকে মুখ করে তিনি থামলেন। আল-খাত্তাব তাঁর অনুগত কিছু উচ্ছন্নে যাওয়া কুরায়শ যুবাদের বলে দিলেন, যায়দ যেন মক্কায় প্রবেশ করতে না পারে। যদি আসেও তাহলে কেবল গোপনে আসতে পারবে। তারা যখন জানতে পারল, যায়দ কোথায় আছে, তারা তা আল-খাত্তাবকে জানাল এসে। তারপর সকলে মিলে তারা যায়দকে ওখান থেকে তাড়িয়ে দিল, তার উপর অত্যাচার চালাল, কারণ তাদের ভয় ছিল, তিনি তাদের ধর্মকে আসল স্বরূপে উদঘাটিত করে দেবেন এবং তার ফলে অনেকে তাদের ধর্ম ছেড়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দেবে। যারা এই ঘটনাকে মামুলি

বলে গুরুত্ব দেয় নি তাদের উদ্দেশ্য করে তাঁর ধর্মের পবিত্রতার কথা৷ তিনি বলেছেন এমনি করে :

আমি পবিত্র এ নগরীর লোক হে আল্লাহ্! কোন বহিরাগত নই,
এর কেন্দ্রস্থলে আমার বাড়ি
আস-সাফার নিকটে।
এ কোন ভ্রান্তির ঘর নয়।

তারপর তিনি চলে গেলেন ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মের অন্বেষণে। সেখানে যত সাধু পেলেন, রাব্বি পেলেন, তাদের জিজ্ঞেস করলেন সে ধর্ম সম্বন্ধে। এমনি করে আস-মাওসিল আর সমস্ত মেসোপটেমিয়ার সর্বত্র সফর করা সারা হলো। তারপর তিনি সমস্ত সিরিয়া ঘুরলেন। ঘুরতে ঘুরতে এলেন বালকার[১] পার্বত্য অঞ্চলে। ওখানে দেখা হলো এক সাধুজনের সঙ্গে। কথিত আছে, ইনি খৃস্টধর্মে পণ্ডিত ছিলেন। যায়দ তাঁকে ইবরাহীম (আ)-এর ধর্ম হানিফিয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। সাধু জবাব দিলেন, 'এমন এক ধর্ম সম্বন্ধে আপনি জানতে চাইছেন, যার কোন তথ্য আজকে কেউ আপনাকে দিতে পারবে না। তবে একজন নবী আসার সময় হয়ে গেছে। যে দেশ আপনি ছেড়ে এসেছেন, সেই আপনার দেশেই তাঁর আবির্ভাব হবে। ইবরাহীমের ধর্ম হানিফিয়া দিয়ে তাঁকে প্রেরণ করা হবে। কাজেই আপনি নিষ্ঠা ধরে লেগে থাকুন। তাঁকে খুব শীঘ্র প্রেরণ করা হচ্ছে, এই তাঁর সময় এখন।'

যায়দ য়াহুদী ও খৃস্টধর্ম নেড়েচেড়ে দেখেছেন। ওর কোনটাই তাঁর পছন্দ নয়। সুতরাং সাধুর কথা শোনামাত্র তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন মক্কার উদ্দেশ্যে। কিন্তু লাখমের দেশে প্রবেশ করার পর তাঁকে আক্রমণ করা হয় ও হত্যা করা হয়।

১. এই জিলার রাজধানী আম্মান।

ওয়ারাকা ইবনে নওফেল ইবনে আসাদ তাঁর জন্য এই শোকগাঁথা লিখেছেন ঃ

সম্পূর্ণ সঠিক পথে তুমি ছিলে ইবনে আমর,
দোযখের জ্বলন্ত চুলা থেকে বেঁচে গেছো
এক এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র উপাসনা করে
অর্থহীন প্রতিমাকে পরিত্যাগ করে।
যে ধর্মের পেছনে তুমি ছুটেছিলে, তা তুমি পেয়েছিলে,
তোমার প্রভুর একত্ব সম্বন্ধে তুমি সচেতন ছিলে,
এবং তা করে তুমি এক মহান আশ্রয় লাভ করেছ
ওখানে তোমার উদার প্রাণ আনন্দ করবে।
ওখানে তোমার দেখা হবে খলিলুল্লাহ্‌র[১] সাথে,
কারণ তুমি অত্যাচারী ছিলে না, দোযখের ভোগ্য নও তাই,
আল্লাহ্‌র করুণা মানুষের উপর পড়বেই,
যারা মাটির সত্তুর তলা নিচে আছে তাদের উপরও।

বাইবেলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বোঝাতে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে

আমার কাছে আরো একটি তথ্য এসেছে। ঈসা ইবনে মরিয়ম আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তাঁর অনুসারীদের নিমিত্ত অবতীর্ণ বাইবেল গ্রন্থে কোন একটি শব্দ ব্যবহার করে রসূলে করীম (সা)-এর বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

মরিয়মের পুত্র ঈসার টেস্টামেন্ট থেকে জন দি এপস্টল তাদের জন্য যে বাইবেল লিখেন তা থেকে এই উদ্ধৃতি নেওয়া হলো ঃ 'যে আমাকে ঘৃণা করে সে প্রভুকে ঘৃণা করে। যে কাজ আমার আগে কেউ করে নি সে কাজ আমি তাদের মুকাবিলায় করেছি, যদি না করতাম, তাহলে তাদের কোন পাপ থাকত না। কিন্তু এখন থেকে তারা অহঙ্কারে

১. ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্।

স্ফীতকায় হয়ে আছে, তারা মনে করে তারা আমাকে অতিক্রম করবে, প্রভুকেও অতিক্রম করে যাবে। কিন্তু শাস্ত্রে যে কথা আছে তা পূর্ব হতেই, "তারা বিনা কারণে আমাকে ঘৃণা করেছে" (অর্থাৎ বিনা যুক্তিতে)। কিন্তু যখন আরামদায়ক আসবেন যাঁকে আল্লাহ্ প্রেরণ করবেন প্রভুর উপস্থিতি থেকে, তিনি আমার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবেন, তোমাদের সম্পর্কেও সাক্ষ্য দেবেন, কারণ তোমরা সূচনা থেকে আমার সঙ্গে আছ। এই কথা আমি তোমাদের বললাম, এর সম্বন্ধে কোন সন্দেহ তোমরা করবে না।"[১]

সিরীয় ভাষায় 'মুনাহ্‌হেমানা' (আল্লাহ্ তাকে আশীর্বাদ ও রক্ষা করুন) শব্দের অর্থ মুহাম্মদ। গ্রীক ভাষায় এর অর্থ পবিত্র স্বপক্ষীয় উকীল।

রসুলুল্লাহ্‌র মিশন

আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ (সা)-এর বয়স যখন চল্লিশ, তখন আল্লাহ্ সমস্ত মানবজাতির প্রতি রহমত হিসাবে তাঁকে 'সমস্ত মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা' রূপে প্রেরণ করেন। যত নবী আল্লাহ্ তাঁর আগে প্রেরণ করেছেন, সবার সঙ্গে তাঁর এমন একটা অঙ্গীকার ছিল যে, তিনি তাঁর প্রতি বিশ্বাস আনবেন, তাঁর সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবেন, তাঁর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্যে করবেন এবং তাঁর এই নির্দেশ, যারাই আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস আনবে, তাদের কাছে পেঁছিয়ে দেবেন। এবং তারা সবাই অনুরূপভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। আল্লাহ্ মুহাম্মদ (সা)-কে বললেন, 'যখন আল্লাহ্ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, তখন (তিনি বলেছিলেন) এই কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিলাম, তার শপথ, তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে একজন রসূল আসবে, তখন তোমরা তাকে বিশ্বাস করবে এবং সাহায্য করবে।'[২] তিনি বললেন, "তোমরা কি রাযী আছ? গ্রহণ করেছ আমার এই অঙ্গীকার?" তাঁরা বললেন, 'আমরা গ্রহণ করলাম।' তিনি বললেন, 'তবে তোমরা এর সাক্ষী থাক, এবং আমিও

১. বাইবেল জন ১৫ঃ২৩।

২. কুরআন ৩৪ঃ২৮।

তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী রইলাম।[১] এমনি করে আল্লাহ্ সমস্ত নবীদের অঙ্গীকার আদায় করেছিলেন যে, তাঁরা তাঁর সত্যকে সাক্ষী দেবে এবং তাঁর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্যে করবে। তাঁরা (নবীরা) সেই দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন, দুই একেশ্বরবাদী ধর্মে যারা তাঁদের প্রতি বিশ্বাস এনেছিল।

(তাবারির ভাষ্য : জনৈক লোক একটা হাদীস আমাকে বলেছিলেন সা'দ ইবনে আবু আরুবার বরাত দিয়ে। সা'দ সেটা পেয়েছিলেন আবুল জালদ বংশের কাতাদা ইবনে দিয়ামা আস-সাদুসীর কাছ থেকে। সেই লোককে আমি সন্দেহ করি না। তিনি বলেছিলেন : 'ফুরকান নাযিল হয় ১৪ই রমযান রাতে। অন্যান্যরা বলেন, 'না, তা নয়, নাযিল হয়েছিল ১৭ই রমযানে।' এর সমর্থনে তারা আল্লাহ্‌র কালামে সমর্থন খোঁজে, 'আমরা আমাদের সেবকের কাছে আল-ফুরকানের দিনে যা নাযিল করেছি সেই দিন দুই দলের দেখা হয়েছিল।'[২] কিন্তু সে তো রসূল এবং বহু ঈশ্বরবাদীদের বদরের সাক্ষাৎকার। তা সংঘটিত হয়েছিল ১৭ ই রমযান তারিখে।)

উরওয়া ইবনে যুবায়রের সূত্রে আল-জুহ্‌রী বলেছেন যে, আয়েশা (রা) তাঁকে বলেছেন যে, আল্লাহ্ যখন মুহাম্মদ (সা)-কে নবুয়তের সম্মানে ভূষিত করতে মনস্থ করলেন, তাঁর মাধ্যমে তাঁর সমস্ত বান্দাদের উপর করুণা বর্ষণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নবুয়তের যে প্রথম চিহ্ন রসূলের উপর তিনি আরোপ করেছিলেন, তা হলো সত্যিকারের দিব্যদৃষ্টি। তাঁর ঘুমের মধ্যে ভোরের আলোর মতো উজ্জ্বল আলো ফুটে উঠত তাঁর মধ্যে। আয়েশা বলেছিলেন, আল্লাহ্ তাঁকে নির্জনতা ভালবাসবার প্রবৃত্তি দিয়েছিলেন, নির্জনতার মতো এমন আর কিছুই তিনি ভালবাসতেন না।

সাকাফি বংশের আবদুল মালিক ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু সুফিয়ান ইবনে আল-আলা' ইবনে জারিয়ার ছিল অসাধারণ স্মরণশক্তি। তিনি কোন এক পণ্ডিতের কাছ থেকে শুনে আমাকে বলেছিলেন যে,

১. কুরআন ৩ : ৮১।

২. কুরআন ৫ : ৪২।

আল্লাহ্ যখন রসূল (সা)-এর উপর তাঁর নবুয়তের রহমত নাযিল করার নিয়ত করলেন, সেই সময় রসূল (সা) কার্য উপলক্ষে অনেক দূরে চলে যেতেন এবং দূরে সফর করতেন। চলে যেতেন সেই মক্কার সংকীর্ণ উপত্যকায়, উপত্যকার সুদূর অঞ্চলে, যেখানে দৃষ্টির সীমানায় কোন বাড়ি-ঘর ছিল না। যত পাথর তখন চোখে পড়ত তাঁর, যত গাছ চোখে পড়ত, সবাই বলত, 'সালাম আলায়কুম হে রসূলুল্লাহ্'। শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা) ডানে তাকাতেন, বাঁয়ে তাকাতেন, পেছনে তাকাতেন। কাউকে দেখতে পেতেন না। দেখতেন শুধু গাছ আর পাথর। এমনি করে দেখতেন আর শুনতেন। দেখতেন, শুনতেন এবং ওখানে থেকে যেতেন; আল্লাহ্‌র যতক্ষণ মর্জি হতো, ততক্ষণ তিনি থাকতেন। তারপর রমযান মাসে তিনি যখন হিরা পাহাড়ে ছিলেন, জিবরাঈল (আ) এলেন আল্লাহ্‌র রহমতের বাণীর উপহার নিয়ে।

আল-যুবায়রের পরিবারের একজন মক্কেল ওয়াহাব ইবনে কায়সান আমাকে বলেছেন—আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে আল-যুবায়রকে লেথাই বংশের উবায়দ ইবনে উমায়র ইবনে কাতাদাকে বলতে শুনেছি, 'উবায়দ, জিবরাঈল এসে কেমন করে রসূলকে প্রথম নবুয়ত প্রদান করলেন, তা আমাদের কাছে বলুন।' উবায়দ আমার সামনে সব ঘটনা আবদুল্লাহ্‌র কাছে বর্ণনা করলেন। সে বর্ণনা হলো ঃ প্রতি বছর হিরা পাহাড়ে রসূল (সা) নাস্তিকদের আচার-অনুষ্ঠান অনুযায়ী এক মাসের জন্য নির্জনে তাহান্নুছ করতে যেতেন। তাহান্নুছ হলো ধর্মীয় ইবাদত। আবু তালিব বলেন ঃ

সাউর এবং যিনি তার বুকে শক্ত করে সাবিরকে স্থাপন করেছেন, তার শপথ
এবং যারা হিরা পাহাড়ে আরোহণ করে অবরোহণ করেছেন তাদের শপথ।

ওয়াহাব ইবনে কায়সান আমাকে বলেছেন যে, উবায়দ তাঁকে বলেছেন ঃ প্রতি বছর রসূলুল্লাহ্ সেই মাসে নির্জন বাসে যেতেন, প্রার্থনা করতেন,

১. সাউর ও সাবির মক্কার নিকটে দুটো পর্বত।

যেসব দরিদ্র লোক তাঁর কাছে আসতেন তাঁদের তিনি খাবার দিতেন। নির্জন-বাসের একমাস পরে তিনি ফিরে আসতেন। কিন্তু প্রথমেই তিনি ঘরে প্রবেশ করতেন না যেতেন কা'বা ঘরে, সাতবার অথবা যতবার আল্লাহ্র ইচ্ছা হত ততবার প্রদক্ষিণ করতেন কা'বাঘর। তারপর যেতেন নিজের ঘরে। যে বছর আল্লাহ্ তাঁকে রসূল রূপে মনোনীত করলেন, সে বছর পর্যন্ত এই চলল। সে বছরে রমযান মাসে আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর উপর রহমত নাযিল করলেন, সে বছর ও তাঁর অন্যান্য বছরের অভ্যাস মত তিনি গিয়েছিলেন হিরা পর্বতে। তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর পরিবার। রাত হলো। এই সেই রাত, যে রাতে আল্লাহ্ তাঁকে সম্মানিত করলেন। তাঁকে নবুয়ত প্রদান করলেন, তাঁর এবং তাঁর মাধ্যমে তাঁর সমস্ত বান্দাদের রহমত করলেন। জিবরাঈল (আ) তাঁর কাছে নিয়ে এলেন আল্লাহ্র ফরমান।

রসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ 'তিনি আমার কাছে এলেন। তিনি এলেন একটি রেশমী কাপড়ের আচ্ছাদন নিয়ে। কি যেন কি লেখা ছিল সে আচ্ছাদনে। বললেন, "পড়ুন।"

আমি বললাম, "কি পড়ব ?"

তিনি সেই আচ্ছাদন দিয়ে এমন জোরে আমাকে চাপ দিলেন মনে হলো সেই বুঝি আমার মৃত্যু। তারপর ছেড়ে দিলেন। আবার বললেন, "পড়ুন !"

আমি বললাম "কি পড়ব ?"

তিমি আবার আমাকে জোরে উক্ত কাপড় দিয়ে চেপে ধরলেন। আবার আমার মনে হলো, এই আমার মৃত্যু। তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন। আবার বললেন, "পড়ুন !"

আমি বললাম, "কি আমি পড়ব ?"

তৃতীয়বারের মতো তিনি আমাকে সেই বস্তু দিয়ে চেপে ধরলেন. আমার মনে হলো, এই আমার মরণ। আবার বললেন, "পড়ুন।'

আমি বললাম, "আমি তাহলে কি পড়ব ?"—কথাটা এবার আমি

বললাম তাঁর কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য, যাতে আবার তিনি তেমনি চেপে না ধরেন। তিনি বললেন ঃ

পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন,
যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন রক্তপিণ্ড থেকে।
পড়ুন, আপনার প্রতিপালক মহামহিম
যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন
মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন তা. যা সে জানত না।

আমি পড়লাম। তিনি প্রস্থান করলেন। আমার মনে হলো কথাগুলো আমার হৃদয়ে গাঁথা হয়ে আছে। (তাবারির ভাষ্য ঃ ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত কবি এবং জিনে-ধরা মানুষকে আমি দু'চোখে দেখতে পারতাম না ঃ আমি তাদের মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারতাম না। মনে মনে বললাম, আমিও কবি বা জিনে-পাওয়া মানুষ হলাম, আমাকে ধিক ! —কুরায়শরা কোনদিন আমার সম্বন্ধে এমন কথা বলতে পারবে না ! আমি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ওখান থেকে ঝাঁপ দেব। আমি আত্মহত্যা করব, সেই হবে আমার শান্তি। যা আমি ভাবলাম, তাই আমি কার্যে পরিণত করতে গেলাম এবং তারপর) আমি যখন পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় এসেছি, তখন আসমানের দিক থেকে ভেসে আসা একটি স্বর শুনলাম, "হে মুহাম্মদ ! আপনি আল্লাহ্‌র রসূল। আমি জিবরাঈল বলছি।" মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকালাম, কে কথা বলছে দেখার জন্য, আর কী পরম বিস্ময়, মানুষের বেশে জিবরাঈল ওখানে, দুই দিগন্তে দুই পা, বলেছেন, "হে মুহাম্মদ ! আপনি আল্লাহ্‌র রসূল আর আমি জিবরাঈল।" স্থিরনেত্রে আমি তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে। (তাবারি এখানে বলেন ঃ আমি তখন আমার সিদ্ধান্তের কথা ভুলে গেলাম।) না যেতে পারলাম সামনে, না যেতে পারলাম পেছনে। তারপর আমি তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। কিন্তু আসমানের যেদিকে তাকাই, যেখানে তাকাই, সেখানেই দেখি তাঁর মুখ। ঠিক পূর্বের মতো। ওখানে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, সামনে গেলাম না, পেছনে গেলাম না। তারপর

এক সময় খাদীজা আমার তালাসে লোকজন পাঠালেন—মক্কার সমস্ত উঁচু এলাকায় খোঁজাখুঁজি করে তারা ফিরে গেল খাদীজার কাছে। আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি (জিবরাঈল) তারপর প্রস্থান করলেন আমার কাছ থেকে। আমি তাঁর কাছ থেকে। আমি ফিরে এলাম আমার পরিবারের কাছে।

আমি খাদীজার কাছে এলাম; তাঁর পাশ ঘেঁষে বসলাম। তাঁর আরো কাছে ঘন হয়ে এলাম।

খাদীজা বললেন, "আরে আবুল কাসিম[১] কোথায় ছিলেন আপনি? আল্লাহ্‌র কসম, আমি লোকজন পাঠিয়েছিলাম আপনাকে তালাশ করতে। মক্কার ওইদিকে উঁচু এলাকা তারা ঘুরে ফিরে এল।" (তাবারির বর্ণনা: আমি তাকে বললাম, সর্বনাশ আমার আমি কবি হয়ে গেছি অথবা জিনে ধরেছে আমাকে।" খাদীজা বললেন, "ওইসব জিনিসের হাত থেকে রক্ষার জন্য আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই হে আবুল কাসিম। আল্লাহ্ আপনাকে ওরকম করবেন না, আপনার সত্যবাদিতা, আপনার বিশ্বস্ততা, আপনার সুন্দর চরিত্র এবং আপনার দয়ালু স্বভাবের খাতিরে। ওটা কিছুতেই হয় না, প্রিয় আমার। বোধ হয় কিছু দেখেছেন-টেখেছেন আপনি।" আমি বললাম, "হ্যাঁ, দেখেছি।"

তারপর তাঁকে আমি যা দেখেছি তা বললাম।

খাদীজা তখন বললেন, "আনন্দ করুনা, হে আমার পিতৃব্য পুত্র, মন প্রফুল্ল করুন। যার হাতে খাদীজার প্রাণ তাঁর কসম, নিশ্চয়ই আমার আশা হচ্ছে, আপনি এই জাতির জন্য আল্লাহ্‌র নবী হবেন।"

তক্ষুনি তিনি উঠে পড়লেন। কাপড় চোপড় পড়ে রওয়ানা হলেন চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেল ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উজ্জা ইবনে কুসাইর উদ্দেশ্যে। ওয়ারাকা খৃস্টান হয়ে গিয়েছিলেন। বাইবেল ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৌরাত আর বাইবেল যারা অনুকরণ করে

১. মুহাম্মদ (সা)-এর কুনিয়া বা আদরের নাম।

তাদের কাছ থেকে অনেক বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন তিনি। তাঁর কাছে তিনি রসূল করীম (সা) যা দেখেছেন, যা শুনেছেন সব বর্ণনা করলেন। ওয়ারাকা শুনে চীৎকার করে উঠলেন, 'মারহাবা! মারহাবা! নিশ্চয়ই যাঁর হাতে ওয়ারাকার প্রাণ তাঁর কসম! আপনি যা বললেন তা যদি সত্য হয় হে খাদীজা, তাহলে তাঁর কাছে পরমত্মা নামুস (অর্থাৎ জিবরাঈল) এসেছিলেন, যে জিবরাঈল এর আগে এসেছিলেন মূসা (আ)-এর কাছে। আরে ইনিই এই মানুষের নবী। তাঁকে প্রফুল্ল থাকতে বলবেন।

খাদীজা ফিরে এলেন রসূল করীম (সা)-এর কাছে। ওয়ারাকা যা যা বলেছেন সব তাঁকে বললেন। (তাবারির বর্ণনা: তাতে তাঁর ভয় কিছুটা প্রশমিত হলো।) এবং নির্জনবাস সমাপ্ত হলে পরে রসূল করীম (সা) ফিরে এলেন মক্কায়। ফিরে এসে অভ্যাসমতো সর্বপ্রকার তওয়াফ করলেন কা'বাঘর। প্রদক্ষিণ করার সময় ওয়ারাকা এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, বললেন, 'ভ্রাতুষ্পুত্র, কি আপনি দেখেছেন এবং শুনেছেন আমাকে বলুন।' নবী করীম (সা) তাঁকে বললেন। সব শুনে ওয়ারাকা বললেন, 'নিশ্চয়ই যাঁর হাতে ওয়ারাকার প্রাণ তাঁর নামে শপথ, আপনি এই জাতির নবী। আপনার কাছে এসেছিলেন আল্লাহ্র দূত জিবরাঈল, যিনি মূসার কাছেও এসেছিলেন। ওরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলবে, আপনাকে ঘৃণার চোখে দেখবে, আপনাকে তাড়িয়ে দেবে, আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।' আমি যদি সেইদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তাহলে আমি আল্লাহ্কে সাহায্য করব, কেমন সাহায্য করব তা তিনি জানেন।'

ওয়ারাকা অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একেবারে কাছে এসে তাঁর কপালে চুম্বন করলেন। রসূল (সা) এরপর চলে গেলেন আপন ঘরে। (তাবারির বর্ণনা: ওয়ারাকার কথা শুনে তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়ল, তাঁর উদ্বিগ্নতা হালকা হলো।)

খাদীজা (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে আল-জুবায়র পরিবারের একজন মুক্ত দাস ইসমাঈল ইবনে আবু হাশিম আমাকে বলেছেন যে, খাদীজা

রসূলুল্লাহ্কে বলেছিলেন, 'হে আমার পিতৃব্য পুত্র, আপনার ঐশী দূত যখন আপনাকে দর্শন দিতে আসেন, তখন কি আপনি তাঁর আসা সম্পর্কে আমাকে জানাতে সক্ষম হবেন?' তিনি বললেন, সক্ষম হবেন। খাদীজা বললেন, এরপর তিনি এলে তাঁকে যেন রসূল (সা) জানান। সুতরাং জিবরাঈল যখন এলেন তাঁর কাছে, যেমন তিনি আসতেন প্রায়ই, রসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজা (রা)-কে বললেন, 'এইমাত্র যিনি আমার কাছে এলেন, তিনি জিবরাঈল।'

খাদীজা বললেন, 'উঠুন পিতৃব্য পুত্র, আসুন, আপনি আমার বাঁ উরুতে বসবেন।' রসূল (সা) তাই করলেন।

খাদীজা জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন আপনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন?' তিনি বললেন, 'পাচ্ছি।'

খাদীজা বললেন, 'তাহলে আসুন এবার আপনি আমার ডান উরুতে বসবেন।' নবী করীম (সা) তাই করলেন। খাদীজা (রা) বললেন, 'এখন আপনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন?'

তিনি যখন বললেন, তিনি এবারও দেখতে পাচ্ছেন, তখন খাদীজা রসূলে করীম (সা)-কে তাঁর কোলে উঠে বসতে বললেন। তাই করলেন রসূলুল্লাহ্ (সা)। আবার জিজেস করলেন রসূল (সা)-কে জিবরাঈলকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন কি না। রসূলে করীম (সা) বললেন, হ্যাঁ, তিনি দেখতে পাচ্ছেন। তখন খাদীজা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন, ঘোমটা সরিয়ে ফেললেন। তখনো রসূলে করীম (সা) তার কোলে বসে। তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এখন দেখতে পাচ্ছেন তাঁকে?'

রসূলে করীম (সা) বললেন, 'না।'

খাদীজা বললেন, পিতৃব্য পুত্র, আনন্দ করুন, প্রফুল্ল হোন। আল্লাহ্‌র কসম, তিনি একজন ফিরিশতা, শয়তান নন।'

আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে হাসানকে এই কাহিনী বলেছি। তিনি বললেন, আমার আম্মা এবং হুসায়নের কন্যা ফাতিমাকে এই হাদীসটি খাদীজার কাছ থেকে পাওয়ার কথা বলতে শুনেছি। আমি যেমনটি শুনেছি তাতে খাদীজা রসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর পরিচ্ছদের ভেতরে নিয়ে এসেছিলেন, আর তাতেই প্রস্থান করেছিলেন জিবরাঈল। এবং তখন তিনি রসূল (সা)-কে বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই ইনি ফিরিশ্তা, শয়তান নন্।"

দ্বিতীয় পর্ব

নবুয়ত এবং মক্কায় ধর্ম প্রচার

কুরআন অবতীর্ণ হলো

রমযান মাসে রসূল করীম (সা) ওহী পেতে শুরু করলেন। আল্লাহ্‌র ভাষায় 'মানুষের জন্য দিক নির্দেশ হিসেবে এবং চূড়ান্ত নীতি নিয়ামক হিসেবে রমযান মাসে কুরআন নাযিল হলো।'' [১] অন্যত্র বলেছেন, 'আমি একে অবতীর্ণ করেছি মহিমময় রজনীতে। তুমি কি জানো সে মহিমময় রজনী কি? মহিমামণ্ডিত সেই রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম। সেই রাতে প্রভুর অনুমতি নিয়ে ফিরিশ্‌তারা নেমে আসেন। প্রত্যুষ পর্যন্ত বিরাজিত থাকে সেই শান্তিময়তা।[২] আবার বলেছেন, 'হা-মীম। শপথ, সুস্পষ্ট গ্রন্থের। নিশ্চয়ই আমি এই গ্রন্থ প্রেরণ করেছি এক শুভ রজনীতে। আমি এক সতর্ককারী। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই রজনীতেই। আমার আদেশে আমি রসূল প্রেরণ করে থাকি।'[৩] অন্য এক স্থানে আবার বলেছেন, '...যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর যা আমি মীমাংসার দিন আমার দাসের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলাম যখন দুই দল পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল।'[৪] দুই দল মানে বদর যুদ্ধে রসূল করীম (সা) এবং পৌত্তলিকেরা। জাফর ইবনে আলী ইবনে হুসায়নের মতে রসূলুল্লাহ (সা)-এর পৌত্তলিকদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার দিনটি ছিল ১৭ই রমযান, শুক্রবার।

তারপর রসূল করীম (সা) যখন আল্লাহ্‌তে এবং তাঁর প্রেরিত ওহীতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করছিলেন, তখনই ওহী আসা শুরু হলো পুরোদমে। তিনি কায়মনোবাক্যে তা গ্রহণ করতে শুরু করলেন। তা সে মানুষের প্রতি শুভকামনাই হোক আর ভীতিপ্রদর্শনই হোক, ঐশী বাণী বড় কঠিন

১. কুরআন ২ : ১৮৫।
২. কুরআন ৯৬।
৩. কুরআন ৪৪ : ১-৪।
৪. কুরআন ৪১ : ৪২।

বন্ধু। আল্লাহ্‌র কৃপায় কেবলমাত্র শক্ত-সমর্থ ও দৃঢ়চেতা মাধ্যমই তা বহন করতে সক্ষম হয়। কারণ আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারে বিরোধিতা বড় প্রবল প্রকৃতির হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেছেন, বৈরিতা বা নির্যাতন কোন কিছুতে পশ্চাদপদ হন নি।

খুয়ায়লিদের কন্যা খাদীজার ইসলাম গ্রহণ

খাদীজা তাঁকে বিশ্বাস করলেন। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যা তিনি বহন করে আনলেন সব কিছু সত্য বলে গ্রহণ করলেন। তাঁকে তিনি সাহায্য করলেন। তিনিই প্রথম বিশ্বাস করলেন আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর রসূলের উপর বিশ্বাস করলেন আল্লাহ্‌র বাণীর সত্যতাকে। তাঁকে দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর বোঝা লাঘব করে দিতেন। বিরোধিতা কিংবা মিথ্যাচারের অভিযোগ তিনি শুনে যেতে লাগলেন। তাতে তিনি ব্যথিত হতেন, কিন্তু ঘরে প্রত্যাবর্তন করলেই তিনি শান্তি পেতেন, আল্লাহ্ খাদীজার মাধ্যমে তাঁকে আশ্বস্ত করতেন। তিনি তাঁকে সাহস যোগাতেন। তাঁর বোঝা লাঘব করতেন, তাঁর সত্যকে সমর্থন করতেন, বিরোধীদের সমস্ত নিন্দাকে তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিতেন। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, তাঁর মঙ্গল করুন।

রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'আল্লাহ্ আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেন খাদীজাকে জান্নাতের একটি সুরম্য গৃহের সন্ধান জানিয়ে দিই, যে গৃহে কোন অশান্তি নেই, কোন পরিশ্রম নেই।' একথা বলেছেন হিশাম ইবনে উরওয়া। তিনি সে কথা শুনেছেন তাঁর আব্বা উরওয়া ইবনে আল-যুবায়রের কাছ থেকে, উরওয়া পেয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবু তালিবের কাছ থেকে।

তারপর এক সময় ওহী নাযিল হঠাৎ কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। রসূল করীম (সা) তাতে খুব দমে গেলেন, দুঃখ পেলেন। তারপর জিবরাঈল তাঁর কাছে নিয়ে এলেন প্রভাতের সূরা। তাতে আল্লাহ্ জানালেন তিনি তাঁর সম্মানের পাত্র, শপথ করে বললেন, তাঁকে তিনি পরিত্যাগ করেন নি, তাঁকে তিনি অসম্মান করেন না। আল্লাহ্ বললেন,

'নিস্তব্ধ প্রভাত এবং রজনীর শপথ, তোমাকে তোমার প্রতিপালক পরিত্যাগ করেন নি, তোমার প্রতি বিরূপও হন নি তিনি।'[১] তার অর্থ তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি, সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি, এত ভালবাসার পর তোমার প্রতি বিরূপ হন নি। আরো বলেছেন, 'তোমার জন্য পরকাল ইহকালের চেয়ে শ্রেয়।'[২] তার অর্থ, এখন এই পৃথিবীতে তোমাকে যে সম্মান দিচ্ছি তার চেয়ে অনেক অনেক অধিক মর্যাদা তুমি পাবে যখন তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে। এবং তিনি তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন এবং তোমার সন্তুষ্টি বিধান করবেন'—অর্থাৎ ইহকালে দেবেন বিজয় আর পরকালে পুরস্কার। 'তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পান নি এবং তোমাকে আশ্রয় দান করেন নি ? এবং তোমাকে পথহারা পেয়ে পথনির্দেশ করেন নি ? এবং নিঃস্ব অবস্থায় পেয়ে অভাবমুক্ত করেন নি ?' এমনি করে আল্লাহ্ বলেছেন কেমন করে তিনি তাঁর উপর এই জগতে করুণা বর্ষণ করেছেন, এক ইয়াতীম ও পথহারা বালক হিসেবে তাঁর প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন, পরম মমতায় সমস্ত আপদ থেকে তাঁকে মুক্ত রেখেছেন।

'সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি নির্দয় হয়ো না। সাহায্য প্রার্থীকে কটু-কথা বলো না।' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দুর্বলতম বান্দাদের জন্য তুমি কঠোর হতে পারবে না, অহংকারী, রুক্ষ অথবা কুটিল হতে পারবে না।

'তুমি তোমার প্রভুর অনুগ্রহের কথা সকলকে জানিয়ে দাও।' এর অর্থ আল্লাহ্ পরম অনুগ্রহ করে তোমাকে নবুয়ত দিয়েছেন, একথা সবাইকে জানিয়ে দাও, তা প্রচার কর।

অতএব আল্লাহ্‌র এই করুণার কথা তিনি গোপনে বলতে লাগলেন, যাদের তিনি বিশ্বাসযোগ্য মনে করতেন, তাদের কাছে তাঁর নবুয়তের কথা প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন।

১. সূরা ৯৩।
২. সূরা ৯৩।

নামাযের ব্যবস্থা

রসূল করীম (সা)-কে নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া হল। তিনি নামায পড়া শুরু করলেন। আয়েশার বর্ণনাক্রমে উরওয়া ইবনে আল-যুবায়র এবং তাঁর বর্ণনাক্রমে সালিহ্ ইবনে কায়সান আমাকে বলেছেন, 'রসূলের উপর প্রথমে প্রতি ওয়াক্তের জন্য দুই রাকাত নামায পড়ার নির্দেশ ছিল। পরে আল্লাহ্ বাড়ির জন্য তা বাড়িয়ে চার রাকাত করলেন আর সফরের বেলায় পূর্ববর্তী দুই রাকাতের আদেশই বলবত রাখলেন।'

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে বলেছেন, নামায পড়ার যখন আদেশ আসে তখন জিবরাঈল এসেছিলেন রসূল (সা)-এর কাছে। রসূল (সা) তখন মক্কায় পাহাড়ে অবস্থান করছিলেন। জিবরাঈল তাঁর পায়ের গোড়ালি দিয়ে উপত্যকায় একটি গর্ত করেন এবং সেই গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে পানির ধারা। সেই পানিতে অযু করলেন জিবরাঈল আর তা পর্যবেক্ষণ করলেন রসূল করীম (সা)। নামাযের আগে কেমন করে নিজেকে পবিত্র করতে হয় তা দেখানোই ছিল এর উদ্দেশ্য। জিবরাঈলের অনুকরণে রসূল করীম (সা) অযু করলেন। জিবরাঈল রসূল (সা)-এর সঙ্গে প্রথমে নামায পড়লেন— রসূল (সা) পড়লেন তাঁর নিজের নামায। জিবরাঈল তারপর প্রস্থান করলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন করে রসূল করীম (সা) জিবরাঈলের অনুকরণে নামায পড়লেন খাদীজাকে দেখানোর জন্য। সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে খাদীজাও নামায আদায় করলেন। তারপর রসূল করীম (সা) আবার নামায পড়লেন খাদীজাকে সঙ্গে করে, খাদীজা নামাযে তাঁর অনুসরণ করলেন।

নাফি ইবনে যুবায়র ইবনে মুতিম হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত সিদ্ধকাম পুরুষ। ইবনে আব্বাসের সূত্রে এঁর বর্ণনাক্রমে বানু তায়মের মুক্ত দাস উতবা ইবনে মুসলিম আমাকে বলেছেন: 'রসূল করীম (সা)-এর উপর যখন নামাযের নির্দেশ আসে, তখন জিবরাঈল রসূল করীম (সা)-এর কাছে আসেন এবং সূর্য মধ্যগগন অতিক্রম করার পর তিনি জোহরের নামায পড়েন। তারপর তিনি আসরের নামায পড়েন, যখন তাঁর ছায়া তাঁর শরীরের দৈর্ঘ্যের

সমান হয়। সূর্য অস্ত গেল, তখন তিনি পড়লেন মাগরিবের নামায। দিগন্ত থেকে সন্ধ্যার সব চিহ্ন বিদূরিত হওয়ার পর তিনি পড়লেন এশার নামায। খুব ভোরে তিনি তাঁর সঙ্গে পড়লেন ফজরের নামায। তিনি আবার এলেন পরদিন দুপুরের সময়, যখন তাঁর ছায়া আপন দেহের দৈর্ঘ্যের সমান হলো, তাঁর সঙ্গে পড়লেন জোহরের নামায। তাঁর ছায়া যখন দুজনের ছায়ার সমান হলো তখন তিনি পড়লেন আসরের নামায। সূর্য অস্ত গেলে পরে তিনি মাগরিবের নামায পড়লেন যেমন পড়েছিলেন আগের দিন। রাতের তৃতীয় যাম অতিক্রান্ত হলে পরে তিনি তাঁর সঙ্গে পড়লেন তাহাজ্জুদের নামায। পরদিন ভোর হলো, সূর্য উঠতে অনেক বাকী, তিনি আদায় করলেন ফজরের নামায। তারপর তিনি বললেন, "হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি আজকে আর গতকাল যে নামায পড়লেন তাই হলো নামাযের সময়।"[১] ইউনুস ইবনে যুবায়র বলেছেন যে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক তাঁকে বলেছেন যে কুফার ইয়াহিয়া ইবনে আবুল আব্বাস আল-কিন্দি বলেছেন যে, ইসমাঈল ইবনে আইয়াস ইবনে আফিফের পিতা তদীয় পিতাকে বলতে শুনেছেন, 'আমি তখন ব্যবসা-বাণিজ্য করি। একবার, হজের সময় আল-আব্বাসের কাছে আমি এসেছিলাম। আমরা কয়েকজন একসঙ্গে বসেছিলাম। দেখলাম একজন লোক কা'বার দিকে মুখ করে প্রার্থনা করতে দাঁড়ালেন। একটু পর একজন মহিলা এলেন এবং তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে প্রার্থনায় যোগ দিলেন। তারপর এক যুবাপুরুষ এলেন, তিনিও তাঁদের সঙ্গে প্রার্থনায় দাঁড়ালেন। আমি আল-আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, "এদের ধর্ম কি? কিরকম নতুন নতুন লাগছে?"

তিনি বললেন, "ইনি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্। ইনি দাবী করছেন, আল্লাহ্ তাঁকে এই ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন। খোশরোস আর

---

১. সুহায়লি মনে করেন, একথা বলা ঠিক হয় নি। হাদীসকাররা পাঁচ বছর পর এই বলে সম্মত হন যে, এই কাহিনী রসূল করীম (সা)-এর মিরাজের পর দিনের ঘটনা। হিজরতের আঠারো মাস নাকি এক বৎসর পূর্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে তা ওহী নাযিল শুরু হওয়ার অনেক দিন পরের ঘটনা।

সিজারের সমস্ত ঐশ্বর্য নাকি তাঁর জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। মহিলাটি এ'র স্ত্রী খাদীজা। খাদীজা তাঁর ধর্ম বিশ্বাস করেন। যুবাপুরুষটি হলেন তাঁর চাচাতো ভাই আলী। তিনিও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।" আফিফ বললেন, "আহা, আমিও যদি সেদিনই তাঁর উপর বিশ্বাস করতাম তাহলে আমি হতাম তৃতীয় বিশ্বাসী জন।"[১]

(তাবারির মত : ইবনে হামিদ বলেছেন, সালামা ইবনে আল-ফজল এবং আলী ইবনে মুজাহিদ তাঁর কাছে এই বর্ণনা দিয়েছিলেন। সালামা বলেছেন, ইয়াহিয়া ইবনে আবুল আল-আসের বরাত দিয়ে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আমাকে বলেছেন তাবারি বলেন, 'আমার গ্রন্থের অন্যত্র আছে এই বর্ণনা ইয়াহিয়া ইবনে আল আশআস পেয়েছেন ইসমাঈল ইবনে আইয়াস ইবনে আফিফ আল-কিন্দির কাছ থেকে। আফিফ ছিলেন আল আশাআস্ ইবনে কায়স আল-কিন্দির সহোদর ভাই, কিন্তু পিতা ছিলেন আল-আশআসের চাচা—আল-আশআসের পিতা তাঁর পিতামহ আফিফ-এর কাছ থেকে শুনেছেন : 'আল আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন, আমার বন্ধু। ইনি প্রায়ই ইয়ামনে যেতেন সুগন্ধি দ্রব্যাদি কিনতে। এসব তিনি মেলায় বিক্রি করতেন। আমি তাঁর সঙ্গে তখন মিনায় অবস্থান করছিলাম। দেখলাম একজন পূর্ণবয়স্ক লোক সেখানে এলেন, গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অযু করলেন, তারপর দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। তারপর এলেন একজন মহিলা। তিনিও অযু করে দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। তারপর এলেন এক নবীন যুবাপুরুষ। তিনিও অযু করে নামাযের জন্য দাঁড়ালেন প্রথম যুবাপুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে। আমি আল-আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম—এসব কি হচ্ছে ? তিনি বললেন—ঐ যুবাপুরুষ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। তিনি দাবি করছেন, আল্লাহ্ নাকি তাঁকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। অন্য লোকটি হচ্ছে আমার আর এক ভ্রাতুষ্পুত্র আলী ইবনে আবু

১. এই হাদীসের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে বিতর্ক আছে। অনেকে মনে করেন ইবনে ইসহাক এটি আলিদদের সমর্থনে তৈরী করেছিলেন।

তালিব। সে তার ধর্ম গ্রহণ করেছে। তৃতীয় মানুষটি হলো তাঁর স্ত্রী খাদীজা বিনতে খুয়ায়লিদ। ইনিও মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেছেন।'

পরবর্তীকালে আফিফ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, ইসলাম বদ্ধমূল হয়েছিল তার মর্মমূলে। তখন তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "আহা, তখন আমি যদি চতুর্থ মুসলমান হতে পারতাম।"

আলী ইবনে আবু তালিব পুরুষদের মধ্যে প্রথম মুসলমান

পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম আলী রসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেন এবং তিনি যে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ওহী পেতেন তা বিশ্বাস করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র দশ বছর। অসীম ছিল তাঁর উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, কারণ ইসলাম শুরু হওয়ার আগে থেকে রসূলের হাতেই তিনি বড় হচ্ছিলেন।

মুজাহিদ ইবনে জাবির আবুল হাজাজের নাম ধরে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু নাজি আমাকে বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাঁর উপর করুণা এবং শুভেচ্ছা বর্ষণ করেছিলেন এমন এক সময় যখন কুরায়শরা ছিলেন এক প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত। আবু তালিবের পরিবার অনেক বড়। রসূল (সা)-এর চাচা আল-আব্বাস বানু হাশিমদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিত্তশালী লোক। তাঁর কাছে গেলেন রসূল (সা)। বললেন, আবু তালিবের পরিবারে এত মানুষ, তাদের কিছুর দায়িত্ব তিনি যদি নেন তাহলে ওরা বেঁচে যায়। আল আব্বাস রাযী হলেন। তারপর তিনি আবু তালিবের কাছে গিয়ে বললেন, তাঁর দুটি সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আল-আব্বাস নেবেন। তারপর দিন ফিরলে ছেলেদের তিনি আবার ফেরত নিয়ে আসতে পারবেন। আবু তালিব বললেন, "যা তোমাদের খুশী করো, কিন্তু আকিল আমার সঙ্গে থাকবে।" রসূল নিলেন আলীকে, তাঁকে রাখলেন নিজের সঙ্গে। আল-আব্বাস নিলেন জাফরকে।

আলী থেকে গেলেন রসূল (সা)-এর সঙ্গে নবুওয়ত প্রাপ্তির কাল পর্যন্ত। আলী তাঁকে অনুসরণ করলেন, তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করলেন, তাঁর সত্য প্রচার করায় ব্রতী হলেন। আর জাফর থেকে গেলেন আল-আব্বাসের সঙ্গে। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর কাছ থেকে চলে আসেন।

একজন হাদীস-বর্ণনাকারী বলেছেন, নামাযের সময় হলেই রসূল (সা) চলে যেতেন মক্কার উপত্যকায়। সঙ্গে যেতেন আলী। আলী যে যেতেন তা তাঁর আব্বা, চাচা কিংবা অন্য কোন আত্মীয়-স্বজন জানতেন না। সেখানে তাঁরা একসঙ্গে নামায পড়তেন, ফিরতেন রাতে। এমনি করে চলল আল্লাহ্‌রই হুকুমে। একদিন তাঁরা সেখানে নামায পড়ছিলেন, এমন সময় আবু তালিব এসে হাযির। তিনি রসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কি রকম ধর্মকর্ম করছ তোমরা বৎস ?'

রসূল (সা) উত্তর দিলেন, 'এটি আল্লাহ্‌র ধর্ম চাচা, আল্লাহ্‌র ধর্ম, তাঁর ফিরিশতার ধর্ম, তাঁর নবীদের ধর্ম, আমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্ম।'

ঠিক এমনি ভাষায় নয় হয়তো। হয়তো তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ্ আমাকে মানুষের নবী করে পাঠিয়েছেন। আপনি আমার চাচা, সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় জন, সবচেয়ে যোগ্য মানুষ। সত্যের পথে আনার জন্য, হিদায়ত করার জন্য আপনি সর্বোত্তম ব্যক্তি। আপনি ইচ্ছে করলেই আমার ডাকে সাড়া দিতে পারেন, আমাকে সাহায্য করতে পারেন।'

অথবা এমনি কিছু কথা।

তাঁর চাচা বললেন, 'আমি আমার পিতা-পিতামহের ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। কিন্তু আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন কেউ তোমার কোন অসুবিধা করতে পারবে না। প্রতিপালকের নামে শপথ করছি আমি।'

অনেকেই বলেন, তিনি নাকি আলীকে বলেছিলেন, 'বাছা ! এটা কি ধর্ম তোমার ?'

আলী বলেছিলেন, আমি আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি, রসূলে বিশ্বাস করি, আমি বিশ্বাস করি ইনি যা এনেছেন তা সত্য, আমি তাঁর সঙ্গে আল্লাহ্‌র কাছে নামায পড়ি, তাঁকে অনুসরণ করি।'

অনেকের মতে, জবাবে তিনি নাকি বলেছিলেন, 'ভাল ছাড়া অন্য কোন কিছুতেও তোমাকে জড়াবে না। সুতরাং ওর সঙ্গে লেগে থাকো।'

আলীর পর যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি হলেন রসূলের মুক্তদাস যায়দ। তারপর মুসলমান হলেন আবু বকর ইবনে আবু কুহাফা। তাঁর অন্য নাম ছিল আতিক। পিতা উসমান ইবনে আমির ইবনে আমর ইবনে কা'ব ইবনে সা'দ ইবনে তায়ম ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লুআই ইবনে গালিব ইবনে ফিহর। মুসলমান হওয়ার পর তিনি করলেন কি—এর মধ্যে আর রাখঢাক রাখলেন না, প্রকাশ্যে তাঁর বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করে বেড়াতে লাগলেন এবং যাকে পান তাকেই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর উপর ঈমান আনার জন্য আহ্বান জানাতে লাগলেন। তিনি ছিলেন উচ্চতর অভিজাত সমাজের লোক, বড় সুন্দর ভদ্র ছিল তাঁদের পরিবারের সকলের আচরণ। ছোট বড সবাই তাদের পছন্দ করত। কুরায়শদের বংশ-বৃত্তান্ত আর প্রাচীন ইতিহাস তিনি যেমন জানতেন অন্য কেউ তেমন জানত না। আবার তাঁদের দোষগুণের সংবাদও ছিল তাঁর নখদর্পণে। যেমন বিরাট বণিক, তেমনি বিরাট ছিল তার হৃদয়, দয়া আর মায়াতে ভর্তি। সুবিধা-অসুবিধা, আপদে-বিপদে সবাই ছুটে আসত তাঁর কাছে পরামর্শের জন্য, কারণ তার যেমন ছিল পর্যাপ্ত জ্ঞান, তেমনি ছিল ব্যবসায়ে বিশাল অভিজ্ঞতা আর সর্বোপরি এমন সুন্দর মিষ্টি মেযাজ। যাদের তিনি বিশ্বাস করতেন, তাঁর কাছে আসত যারা সবাইকে তিনি আল্লাহ্র পথে, ইসলামের পথে আসার জন্য আহ্বান জানালেন।

[ইবনে কাসিরের ভাষ্য এরূপ: এর পরদিন এসেছিলেন আলী ইবনে আবু তালিব। তখন তাঁরা দুজনে নামায পড়ছিলেন। আলী জিজ্ঞেস করলেন, 'এসব কি মুহাম্মদ ?' রসূল করীম (সা) জবাব দিলেন, 'এটা আল্লাহ্র ধর্ম। এই ধর্ম তাঁর একান্ত নিজস্ব। এই ধর্ম দিয়েই আল্লাহ্ নবী প্রেরণ করেন। আমি সেই এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ্র পথে আপনাকে আহ্বান করছি। আসুন, তাঁর ইবাদত করুন, আল-লাত আর আল-উজ্জার উপাসনা পরিত্যাগ করুন।'

আলী বললেন, 'এমন তাজ্জব কথা আমি জন্মে আর শুনিনি তো কখনো। আমার কেমন যেন ধাঁধা লাগছে। ঠিক আছে আমি আগে একটু আবু তালিবকে জিজ্ঞেস করে নিই।'

কিন্তু আল্লাহ্‌র বাণী তিনি নিজে প্রচারে ব্রতী হওয়ার আগে রসূল চান না, একথা জানজানি হোক। সুতরাং তিনি বললেন. 'আপনি নিজে যদি ইসলাম গ্রহণ না করেন, তাহলে বিষয়টি গোপন রাখবেন।'

সেই রাত অপেক্ষা করলেন আলী। তারপর আল্লাহ্ তাঁর হৃদয়ে গেঁথে দিলেন ইসলামের মর্মবাণী। পরদিন অতি প্রত্যুষে তিনি গেলেন রসূলের কাছে। বললেন, তার প্রতি কি হুকুম রসূলের জানানো হোক।

রসূল করীম (সা) বললেন. সাক্ষ্য দিন যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তাঁর কোন শরীক নেই আল-লাত আর আল-উজ্জার পূজা বন্ধ করুন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিহার করুন।'

তাই করলেন আলী। মুসলমান হলেন তিনি। তিনি ভয় করতেন আবু তালিবকে। তাই রসূলের কাছে আসাটা বন্ধ করলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এই কথাটিও গোপন রাখলেন, তার নামায পড়া কেউ যাতে না দেখে তাতেও সতর্ক থাকলেন।

মুসলমান হলেন যায়দ ইবনে হারিসও। দুজনেই চুপচাপ রইলেন মাসখানিক। তারপর আলীর যাতায়াত শুরু হলো রসূলের কাছে। আল্লাহ্‌র এক বিশেষ আশীর্বাদ বর্ষিত ছিল আলীর উপর। ইসলাম প্রচার শুরু হওয়ার পূর্বেই তিনি ছিলেন রসূলের ঘনিষ্ঠতম সহযোগী।

আবু বকরের আমন্ত্রণে যে সব সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন

আমার শ্রবণ-সূত্রে আবু বকরের আহ্বানে যাঁরা মুসলমান হয়েছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন: উসমান ইবনে আফ্ফান ইবনে আবুল 'আস ইবনে

উমাইয়া ইবনে আবদ্ শামস্ ইবনে আবদ্ মানাফ ইবনে কুসাই......[১] ইবনে লুআই আবদুর রহমান ইবনে আউফ ইবনে আবদ ইবনে আল-হারিস ইবনে জুহ্রা ইবনে লুআই, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস। (শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন মালিক ইবনে ওহায়ব ইবনে আবদ্ মানাফ...ইবনে লুআই), তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে উসমান ইবনে আমর ইবনে কা'ব ইবনে সাদ...ইবনে লুআই।

তাঁর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার পর এদের সকলকে তিনি নিয়ে এলেন রসূলের কাছে, তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং সবাই একত্রে নামায আদায় করলেন। আমি প্রায়ই রসূল (সা)-কে বলতে শুনেছিঃ 'যাঁকেই আমি ডেকেছি ইসলামের পথে, তিনিই অনীহা প্রকাশ করেছেন, সন্দেহ করেছেন, দ্বিধা করেছেন। করেন নি কেবল একজন। তিনি আবু বকর। আমি ডাকতেই তিনি এলেন আমার সঙ্গে, পেছনে তাকান নি, কোন দ্বিধা প্রকাশ করেন নি।* এঁরা হলেন ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম আটজন সাহাবী। এঁরা নামায পড়লেন। মুহাম্মদ (সা) যে আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ, তা বিশ্বাস করেছেন।

এঁদের পর যারা মুসলমান হন তাঁরা হলেনঃ আবু উবায়দা ইবনে আল-জার্রা। এঁর ভাল নাম আমির ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আল-জার্রা ইবনে হিলাল ইবনে উহায়ব ইবনে ডাব্বা ইবনে আল-হারিস ইবনে ফিহ্র। আবু সালামা, এঁর ভাল নাম আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল আসাদ...ইবনে লুআই। আল-আরকাম ইবনে আবুল আরকাম। (শেষোক্ত জনের নাম ছিল আবদ্ মানাফ ইবনে আসাদ—এই আসাদ আবু জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর...ইবনে লুআইর নাম পদবী ধারণ করতেন।) উসমান ইবনে মাজুন ইবনে হাবিব ইবনে ওয়াহাব ইবনে হুযায়ফা...ইবনে লুআই। তাঁর দুই ভাই কাদামা ও আবদুল্লাহ্, পিতা মাজুন। উবায়দা ইবনে আল-হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে আবদ্ মানাফ...ইবনে

---

১. মাঝখানে অনেক নাম আছে। বাদ দেওয়া গেল সেগুলো।

*. তাবারির ভাষ্যে এটা নেই।

লুআই। সাঈদ ইবনে যায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল ইবনে আব্দুল উজ্জা ইবনে আবদুল্লা ইবনে কার্ত'…ইবনে লুআই এবং তাঁর স্ত্রী ফাতিমা পিতা আল-খাত্তাব ইবনে নুফায়েল, যার কথা একটু আগে উল্লেখ করা হল। এই ফাতিমা ছিলেন উমর বিন আল-খাত্তাবের ভগ্নি। আসমা বিনতে আবু বকর, আর তাঁর ছোট্ট মেয়ে আয়েশা। খাব্বাব ইবনে আল-আরাত, ইনি ছিলেন বানু জুহরার মিত্র। উমায়র ইবনে আবু ওয়াক্কাস, ইনি ছিলেন সা'দের ভ্রাতা। আবদুল্লাহ্ ইবনে সামুদ ইবনে আল-হারিস ইবনে শাম্‌স ইবনে মাখজুম ইবনে সাহিলা ইবনে কাহিল ইবনে আল-হারিস ইবনে তামিম ইবনে সা'দ ইবনে হুযায়ল, ইনিও বানু জুহরার মিত্র ছিলেন। মাসুদ ইবনে আল-কারি, ইনি ছিলেন রাবিয়া বিনতে আজর ইবনে সা'দ ইবনে আবদুল উজ্জা ইবনে হামালা ইবনে গালিব ইবনে মুহাল্লিম ইবনে আইদা ইবনে সুবায় ইবনে আলহুন ইবনে খুজায়মা, ইনি আল-কারা বংশোদ্ভূত। সালিত ইবনে আমর ইবনে আবদু শামস ইবনে আবদু উদ ইবনে নসর…ইবনে লুআই এবং তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে সালামা ইবনে মুগাররিবা। ইনি (আসমা) ছিলেন তামিমি বংশজাত। খুনায়স ইবনে হুযাফা ইবনে কায়স ইবনে আদিই ইবনে সা'দ ইবনে সাহ্‌ম ইবনে আমর …ইবনে লুআই। আমির ইবনে রাবিয়া আনয ইবনে ওয়াইল, ইনি ছিলেন আল-খাত্তাব ইবনে নুফায়েল ইবনে আবুল উজ্জা-র পারিবারিক মিত্র। আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহ্‌শ ইবনে রিআব ইবনে ইয়ামার ইবনে সাবিরা ইবনে মুররা ইবনে কবির ইবনে গান্‌ম ইবনে দুদান ইবনে আসাদ ইবনে খুযায়মা এবং তদীয় ভ্রাতা আবু আহমদ—এঁরা উভয়েই বনু উমাইয়ার মিত্র ছিলেন। জাফর ইবনে আবু তালিব এবং তদীয় স্ত্রী আসমা বিনতে উমায়স ইবনে নুমান ইবনে কা'ব ইবনে মালিক ইবনে খাসামের কুহাফা। হাতিব ইবনে আল-হারিস ইবনে মা'মার ইবনে হাবিব ইবনে ওয়াহাব ইবনে হুযাফা…ইবনে লুআই এবং তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিনতে আল-মুজাল্লিল ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু কায়স ইবনে আবদু উদ্ ইবনে নসর ইবনে মালিক……ইবনে লুআই। তাঁর ভ্রাতা খাত্তাব ইবনে আল-হারিস এবং তদীয় স্ত্রী ফুকায়হা বিনতে ইয়াসার। সামার ইবনে আল-হারিস-এর নাম উপরে

বলা আছে। আশ-শাইব ইবনে উসমান ইবনে মাজুন (এ'র নামও উপরে একবার উল্লেখ করা হয়েছে)। আল-মুত্তালিব ইবনে আজহার ইবনে আবদু আউফ ইবনে আব্দ ইবনে আল-হারিস…ইবনে লুআই এবং তাঁর স্ত্রী রামলা বিনতে আবু আউফ ইবনে সুবায়রা ইবনে সুয়ায়দ…ইবনে লুআই। আন-নাহ্হাম-এর পুরো নাম ছিল নুয়ায়ম ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আসিদ…ইবনে লুআই। আমির ইবনে ফুহায়রা, ইনি ছিলেন আবু বকরের মুক্ত দাস। খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আল-আস ইবনে উমাইয়া…ইবনে লুআই এবং তাঁর স্ত্রী উমায়না বিনতে খালাফ ইবনে আসাদ ইবনে আমির ইবনে বায়াদা ইবনে সুবায়…আদি পুরুষ খুজা', হাতিব ইবনে আমর ইবনে আবদু শামস…ইবনে লুআই; আবু হুযায়ফা; ওয়াকিদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদু মানাফ ইবনে আরিন ইবনে সালিবা ইবনে ইয়ারবু ইবনে হানযালা ইবনে মালিক ইবনে যায়দ মানাত ইবনে তামিম; ইনি বানু আদি ইবনে কা'ব-এর মিত্র ছিলেন। খালিদ, আমির, আকিল, আইয়াস—এ'রা সবার পিতা ছিলেন আল বুকায়র ইবনে আবদু ইয়ালিল ইবনে নাশিব ইবনে খি'য়ারা ইবনে সাদ ইবনে লায়স্ ইবনে বাকর ইবনে আবদু মানাত ইবনে কিনানা—এ'রা বানু আদি-র মিত্রদল ছিলেন। আম্মার ইবনে ইয়াসির, ইনি বানু মাখজুম ইবনে ইয়াকাজার মিত্র ছিলেন। সুহায়ব ইবনে সিনান, ইনি নাসির বিন কাসিত-এর পরিবারের লোক ছিলেন, আর এই সুহায়ব বানু তায়ম ইবনে মুররার মিত্র ছিলেন।

রসূল (সা)-এর প্রকাশ্য প্রচার অভিযান এবং তার প্রতিক্রিয়া

দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ শুরু করল নারী পুরুষ নির্বিশেষে। সমস্ত মক্কায় সে সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে গেল, সব মানুষের মুখে এই কথা ছাড়া অন্য কোন কথা নেই। তারপর আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে আদেশ দিলেন, যে সত্য তিনি লাভ করেছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করার জন্য। আল্লাহ্র পথে সবাইকে আহ্বান করার জন্য। তিন বছর রসূল করীম (সা) সে কথা গোপন করে ছিলেন। তারপর আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর ধর্ম প্রচারের

হুকুম দিলেন। আর আল্লাহ্ বললেন, 'এবং তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে প্রচার কর, এবং অংশীবাদীদের উপেক্ষা কর।"[১] তারপর আবার বললেন, তোমার পরিবারকে ও নিকট-আত্মীয়দের সতর্ক করে দাও, যে সব অনুসারী তোমাকে অনুসরণ করছে, তাদের সঙ্গে এক হয়ে নাও।[২] অন্যত্র, 'বলো, আমি স্পষ্ট ভাষায় সাবধান করে দিচ্ছি।'[৩]

(তাবারির ভাষ্য : আলী ইবনে আবু তালিব সূত্রে; আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস সূত্রে; আবদুল্লাহ্ ইবনে আল-হারিস ইবনে নওফেল ইবনে আল হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব সূত্রে; আল মিনহাল ইবনে আমর সূত্রে; আবদুল্লা ইবনে আল-গাফফার ইবনে আল-কাসিম সূত্রে; ইবনে ইসহাক সূত্রে; সালামা সূত্রে; ইবনে হামিদ বলেছেন : 'তোমার পরিবারকে, তোমার নিকট-আত্মীয়দের সতর্ক করে দাও' এই আয়াত যখন তাঁর কাছে নাযিল হলো তখন নবী করীম আমাকে ডাকলেন, বললেন, 'আল্লাহ্ আমাকে, আমার পরিবারকে, আমার আত্মীয়-স্বজনদের সাবধান করে দিতে হুকুম দিয়েছেন। এই কাজ আমার অসাধ্য। আমি জানি, আমি এই বাণী তাদের কাছে প্রচার করতে গেলেই ভীষণ তিক্ততার সৃষ্টি হবে, কাজেই আমি চুপ করে ছিলাম। তারপর জিবরাঈল এলেন আমার কাছে; বললেন, 'হুকুম মতো কাজ না করলে প্রভু আমাকে শাস্তি দেবেন। তুমি যাও, কিছু খাবার আয়োজন করো. খাসির একটা রান আর কাপে করে দুধ থাকে যেন, তারপর আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের ডেকে এক জায়গায় জড়ো, কর যাতে সবাইকে আমি হুকুমমতো আমার কথা জানিয়ে দিতে পারি। তাঁর কথামতো আমি সবাইকে ডেকে নিয়ে এলাম। প্রায় চল্লিশ জন হলেন তাঁরা। তার মধ্যে ছিলেন তাঁর চাচা আবু তালিব, হামযা, আল-আব্বাস এবং আবু লাহাব। তাঁরা সবাই জড়ো হলেন। নবী করীম (সা) আমাকে হুকুম দিলেন, যে খাদ্য তৈরী করেছি তা নিয়ে আসার জন্য।

---

১. কুরআন ১৫ : ৯৪।

২. কুরআন ১৫ : ৮, ৯।

৩. কুরআন ২৬ : ২১৪।

আমি হুকুম তামিল করলাম। খাবার নিয়ে এলাম। রসূলে করীম (সা) এক টুকরা গোশত মুখে দিয়ে তা দাঁত দিয়ে টুকরো টুকরো করলেন। তারপর তা রেখে দিলেন প্লেটে। বললেন, 'আল্লাহ্‌র নামে এটা আপনারা খান।' সবাই খেলেন। এতো খেলেন যে, আর খেতে পারছেন না কেউ। আমি দেখলাম খানচায় কেবল হাতের ওঠানামা। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, যে খাবার আমি দিয়েছিলাম, তা একজন লোকই দিব্যি খেতে পারত। তারপর তিনি বললেন, 'এদের কিছু পান করতে দাও।' আমি দুধ ভর্তি পেয়ালা নিয়ে এলাম। সেই দুধ তারা পান করতে লাগল। সেই এক পেয়ালা দুধ সবাই মিলে পরম পরিতৃপ্তি সহকারে পান করল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না আমি। আমার জীবনের কসম, যে দুধ ছিল তা একজনই অনায়াসে পান করে নিতে পারত। নবী করীম (সা) সমবেত সকলের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে যাবেন এমন সময় হঠাৎ আবু লাহাব আগেই উঠে দাঁড়ালেন; বললেন, 'তোমাদের সবাইকে এই লোক যাদু করে ফেলেছে। একথা শুনে রসূলে করীম (সা) কিছু বলতে পারার আগেই যে যেদিকে পারল চলে গেল। পরদিন তিনি আমাকে বললেন, 'এই লোক আমি কিছু বলার আগেই কথা বলে ফেলল, ভেগে গেল সব লোক, কিছুই বলতে পারলাম না তাদের। কাজেই কালকে যেমন করেছিলে, আজকে আবার তাই করো।' সব কিছু ঘটল ঠিক গতকালকের মতো। রসূল অতঃপর বললেন, 'হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণ! আমার চেয়ে আরো মহৎ কোন বাণী নিয়ে এই জাতির কাছে আগে আর কেউ এসেছে কি না আমার জানা নেই। আমি আপনাদের ইহকাল এবং পরকালের জন্য সর্বোত্তম বস্তু নিয়ে এসেছি। আল্লাহ্ আমাকে আদেশ দিয়েছেন আপনাদের তার পথে আনার জন্য। আমার ভাই বলুন, স্বজন বলুন, উত্তরাধিকারী বলুন, সব এইখানে আছেন। এখন বলুন আমার এই কাজে আপনাদের মধ্যে কারা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন? সবাই চুপ করে রইল। এর মধ্যে আমি ছিলাম সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে ফ্যাকাশে চোখ, যত ছিল দেহটি মোটা তত ছিল পায়ের দিকটা চিকন। সেই আমিই বলে উঠলাম, 'হে রসূলুল্লাহ্ (সা)! আমি আপনাকে সাহায্য

করব, আমি আছি আপনার সঙ্গে।' তিনি আমার কাঁধে হাত রাখলেন, বললেন, 'আপনাদের মধ্যে এ-ই হলো আমার ভাই, আমার স্বজন, আমার উত্তরাধিকারী। এর কথা আপনারা শুনবেন, এর কথা মানবেন।' সবগুলো লোক উঠে দাঁড়িয়ে হাসি শুরু করল। তারা আবু তালিবকে বলল, 'কি বলছে শোন হে, তোমার ছেলের হুকুম তোমার তামিল করতে হবে!')

(তাবারির আরেকটি ভাষ্য : আল-হাসান ইবনে আবুল হাসান সূত্রে; আমর ইবনে উবায়দ সূত্রে; ইবনে ইসহাক সূত্রে; সালামা সূত্রে; ইবনে হামিদ বলেছেন : এই আয়াত যখন রসূল করীম (সা)-এর উপর নাযিল হয়, তখন তিনি উপত্যকায় গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণ, 'হে আবদুল মানাফের সন্তানগণ, হে কুসাইর সন্তানগণ'—এমনি করে তিনি কুরায়শদের সমস্ত গোত্রের নাম ধরে সম্বোধন করলেন। তারপর বললেন, 'আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করছি, আমি তাঁর শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি।')

নামায পড়ার জন্য রসূল করীম (সা)-এর সঙ্গীরা চলে যেতেন পাহাড়ের কাছে, যাতে নামাযের সময় কেউ তাদের না দেখে। একদিন সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস কয়েক জন সাহাবী (রসূলের সঙ্গী) সমেত নামায পড়ছিলেন মক্কার এমনি এক সঙ্গীন উপত্যকায়, তখন ওখানে এসে চড়াও হলো একদল পৌত্তলিক। তারা তাঁদের বাধা দিল। নামাযের জন্য তারা তাদের খুব গালমন্দ করল। কথা কাটাকাটি হতে হতে এক পর্যায়ে তা হাতাহাতি ও মারামারিতে চলে গেল। একজন পৌত্তলিককে সা'দ উটের চোয়ালের এক হাড্ডি দিয়ে আঘাত করলেন—লোকটা তাতে আহত হলো, আঘাতের স্থান থেকে রক্ত নির্গত হলো।

ইসলামে সে-ই ছিল প্রথম রক্তপাত।

প্রকাশ্যে রসূল করীম (সা) যখন ইসলাম প্রচারে ব্রতী হলেন আল্লাহ্‌র আদেশ অনুযায়ী, তখন তাঁর গোত্রের লোকজন তাঁকে কোন বাধা দেয়নি, কিংবা শত্রুতা করেনি। যতদূর আমি শুনেছি—বাধা দিয়েছে তখন, যখন

রসূল করীম (সা) তাদের উপাস্য দেবদেবীর অসারতা সম্পর্কে উক্তি করতে শুরু করলেন। তাদের দেবদেবী সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা সবাই তাকে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করল। ইসলামের সাহায্যে আল্লাহ্ যাদের রক্ষা করলেন. তাঁরা ছিলেন মাত্র অল্প কয়েকজন। তাঁরা ছাড়া আর সবাই শত্রু হলো নবী করীম (সা)-এর। পিতৃব্য আবু তালিব রসূল করীম-(সা)-কে আগের মতোই স্নেহ করে যেতে লাগলেন, তাকে সব রকমের সহ-যোগিতা ও সমর্থন দিয়ে যেতে লাগলেন। রসূল (সা) আল্লাহ্‌র নির্দেশও মেনে চলতে লাগলেন, কোন কিছুই তা থেকে তাকে বিরত করতে পারল না। কুরায়শরা যখন দেখলেন কিছুতেই নিবৃত্ত করা যাচ্ছে না তাঁকে, তাদের কাছে থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন নবী, তাদের দেবদেবীদের অপমান করে যাচ্ছেন, তাঁর চাচা প্রশ্রয় দিচ্ছেন তাঁকে, তাঁকে আশ্রয় দিচ্ছেন, সমর্থন দিচ্ছেন, তাদের খাতিরে কিছুতেই তাঁকে ত্যাগ করেন না, তখন ওরা সবাই সদলবলে গেলেন আবু তালিবের কাছে। যাঁরা গিয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল, উতবা ও শায়বা। উভয়েই রাবিআ ইবনে আবদ শামসের পুত্র, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব আবুল বাখতারি যার পুরো নাম ছিল আল-আস ইবনে হিশাম ইবনে আল-হারিস ইবনে আসাদ, আল আসওয়াদ ইবনে আল মুত্তালিব ইবনে আসাদ, আবু জেহেল (এ'র অন্য নাম আমর, উপাধি ছিল আবুল হাকাম) ইবনে হিশাম ইবনে আল মুগিরা, আল ওয়ালিদ ইবনে আল মুগিরা, নুবাই ও মুনাব্বিহ উভয়েই আল-হাজ্জাজ ইবনে আমির ইবনে হুযায়ফার পুত্র এবং আল-আস ইবনে ওয়াইল।

তাঁরা বললেন, 'হে আবু তালিব! আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের দেব-তাদের অভিসম্পাত দিয়েছে, আমাদের ধর্মকে অপমান করেছে, আমাদের জীবনধারাকে উপহাস করেছে, বলেছে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা ভুল করেছে। আপনি এর বিহিত করুন, আর না হয় আমাদের উপর এর সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিন। কারণ আপনিও আমাদের মতোই প্রতিপক্ষের লোক। আমরা ওকে মিস্‌মার করে দেবো।,

আপোসের ভাষায় কথা বললেন আবু তালিব। তাঁদের বোঝালেন খুব নরম ভাষায়। তিনি বললেন, তিনি দেখবেন কি করা যায়। তারা তাঁর কথা মেনে চলে গেল।

রসূল করীম (সা) তার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি আল্লাহ্র ধর্ম প্রকাশ্যে প্রচার করে যেতে লাগলেন, সবাইকে আল্লাহ্র পথে আসার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। ফলে কুরায়শদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আরো খারাপ হতে লাগল। তাঁর বন্ধুরা সব শত্রু হয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। ওরা ভীষণ বলাবলি করতে লাগল তাঁর কথা, একজনকে আরেকজন উস্কানি দিতে লাগল।

ও'রা আবার গেলেন আবু তালিবের কাছে। বলল, 'আপনাকে আমরা সবাই মানি। আমাদের মুরুব্বী আপনি। আপনার ভাতিজার কার্য-কলাপ বন্ধ করার জন্য আমরা এসেছিলাম আপনার কাছে, আপনি কিছুই করেন নি। বলে, আমাদের বাপদাদারা সব খারাপ ছিল, আমাদের চালচলনকে নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করে, আমাদের দেবদেবীদের অপমান করে ওরা। ঈশ্বরের কসম, আপনি ওর সম্পর্কে একটা কিছু করবেন, না হয় আমরা আপনাদের দুজনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। হয় আপনারা থাকবেন, না হয় আমরা থাকব। ঠিক এই ভাষায় না হোক, এমনি কথা ওরা এসে বললেন আবু তালিবকে।

বলেই তাঁরা চলে গেলেন।

দুঃখ পেলেন আবু তালিব। তিনি ভীষণ ভাবিত হলেন। তাঁর আপন লোকজনের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবে, নিজের লোক দুশমন হবে। অথচ রসূল (সা)-কে ত্যাগ করা, তাঁকে ওদের হাতে ছেড়ে দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

ইয়াকুব ইবনে উতবা ইবনে আল-মুগিরা ইবনে আল-আখনাস আমার কাছে বলেছেন যে তাঁর কাছে বলা হয়েছে যে, কুরায়শদের এবম্বিধ কথা শোনার পর আবু তালিব ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডেকে পাঠালেন; বললেন, 'এবার আমাকে নিষ্কৃতি দাও, নিজেকেও বাঁচাও। যে বোঝা আমি বহন করতে পারব না, সে বোঝা আমার কাঁধে চাপিয়ে দিও না।'

রসূলে করীম (সা) ভাবলেন, তাঁর চাচা বুঝি তাঁর প্রতি বিরূপ হয়েছেন, সুতরাং তিনি তাঁকে ত্যাগ করবেন। বুঝি তিনি তাঁর সাহায্য ও সমর্থন থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছেন। তিনি বললেন, "হে চাচা, আমার আল্লাহ্‌র নামে কসম খেয়ে বলছি, ওরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাঁ হাতে চন্দ্রও এনে দেয়, আর বলে 'এইসব তুমি ত্যাগ করো' আমি ছাড়ব না। আল্লাহ্ আমাকে হয় বিজয়ী করবে, না হয় আমি ধ্বংস হয়ে যাব, তার আগে আমি থামব না।"

একথা বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন রসূল (সা)। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। চলে যাবেন বলে কয়েক কদম এগোলেন। অমনি আবু তালিব বলে উঠলেন, 'এসো, ফিরে এসো ভ্রাতুষ্পুত্র।'

রসূল (সা) ফিরে এলেন।

আবু তালিব বললেন, 'তোমার যেখানে খুশি যাও, যা খুশি বলো। আল্লাহ্‌র নামে শপথ, আমি কোনদিন কোন কিছুর জন্য তোমাকে ত্যাগ করব না।'

কুরায়শরা বুঝতে পারল, আবু তালিব রসূলে করীম (সা)-কে ত্যাগ করবেন না। বরং তাদের সঙ্গেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। উমারা ইবনে আল-ওয়ালিদ ইবনে আল-মুগিরাকে সঙ্গে নিয়ে তারা তাঁর কাছে গেলেন। আমি যতদূর শুনেছি, সেখানে গিয়ে তাঁরা বললেন, 'আবু তালিব, এর নাম উমারা। কুরায়শদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে বলিষ্ঠ জোয়ান। ওকে আপনি গ্রহণ করুন, ওর বুদ্ধি আর সাহায্যের সুবিধা নিন। পুত্র হিসেবে গ্রহণ করুন তাকে আর আপনার ওই ভাতিজাকে ছেড়ে দিন আমাদের হাতে। সে আমাদের ধর্ম, আমাদের বাপ-দাদাদের ধর্মের নামে অপবাদ দিচ্ছে, সে আমাদের মধ্যে বিভেদ ডেকে আনছে, আমাদের চালচলনকে উপহাস করছে। ওকে আমরা হত্যা করব। তার বদলে এই একে নিন, মানুষের বদলে মানুষ।'

তিনি বললেন, 'এ এক অসম্ভব বাজে কথা বলছ তোমরা, এক অশুভ জিনিস আমার ঘাড়ে চাপাতে চাচ্ছ। আমি যদি বলি, তোমার ছেলেকে আমাকে দাও আমি তাকে খাওয়াব পরাব, বদলে আমার ছেলেকে নাও, হত্যা করো নিয়ে তাঁকে, সেটা কি যুক্তিসম্মত হবে? আল্লাহ্‌র কসম, এ কোনদিন হবার নয়।'

আল-মুতিম বিন আদি বলল, 'আপনার লোকজন আপনার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছে, আপনি যা না-পছন্দ করেন তা করে নি। আমার মনে হয় তাদের সঙ্গে আপনি আর থাকতে চান না।'

আবু তালিব জবাব দিলেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, তারা আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে নি। আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য, আমার বিরুদ্ধে লাগবার জন্য সবাই তোমরা জোট বেঁধেছ। কাজেই তোমাদের যা খুশি করতে পার।'

অথবা এমনি কিছু তিনি বললেন।

পরিস্থিতি সঙ্গীন হয়ে গেল। বিবাদ উত্তেজনা বৃদ্ধি করে চলল। সব লোক দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল. প্রকাশ্যে তারা তাদের শত্রুতা ঘোষণা করে যেতে লাগল।

আবু তালিব একটি কবিতা লিখলেন তখন। এতে মুতিম এবং আবদু মানাফ গোত্রের অন্যান্য যারা তাঁকে ত্যাগ করেছিল, তাদের এবং কুরায়শদের মধ্যে তার অন্যান্য শত্রুদের আক্রমণ করা হয়েছে। তাঁর কাছে তারা কি চেয়েছিল, কি জন্য সবাইকে তিনি বিমুখ করলেন, এইসব কথা কবিতায় বলা আছে।

কবিতাটি নিম্নরূপ:

আমর আর আল-ওয়ালিদ আর মুতিমকে বলে দাও
তোমাদের আশ্রয়ের চেয়ে বরং আমাকে একটা জোয়ান উটের বাচ্চা দাও,
দুর্বল, অসন্তুষ্ট, গজগজ করা,

নিজের প্রস্রাবে নোংরা করা তার পৃষ্ঠদেশ,
দলের পেছনে থাকে, চলে ঠেলতে ঠেলতে।
পাহাড়ের পাদদেশে যখন এসে থামে, ওকে তুমি নকুল বলতে পার তখন।
আমার দুটো ভাই আছে, আমারই পিতামাতার সন্তান তারা,
ওদের কাছে কোন সাহায্য চাইলে, বলে, 'এটা আমাদের কর্ম নয়।'
কর্ম তাদের ঠিকই, কিন্তু তারা পড়ে গেছে,
যেমন করে পাথর পড়ে যায় যু-আলাফ পাহাড় থেকে।
বিশেষ করে আবদু শামস আর নওফেলের কথা বলছি আমি,
পোড়া কয়লার মতো ওরা আমাদের ফেলে দিয়েছে।
আপন ভাইকে সবার কাছে ছোট করেছে, গীবত গেয়েছে তার নামে
তাদের এখন হাত নেই।
ইতর জাতের সাথে তারা হাত মিলিয়েছে, ইতর হয়েছে
যাদের পিতাদের সম্পর্কে নানা কথা বলে লোকে, তাদের সাথে চলে।
তায়ম, মাখজুম আর জুহরা—এরা ওই জাতের মানুষ,
সাহায্য নেবার বেলায় তারা আমার দোস্ত।
আল্লাহ্র কসম, চিরকাল তাদের সঙ্গে দুশমনি থাকবেই আমাদের,
আমাদের শেষ বংশধর জীবিত থাকা পর্যন্ত তা চলবে।
ওদের মন, ওদের চিন্তা নির্বোধের,
ওদের বিচারের কোন ক্ষমতাই নেই।

তারপর কুরায়শরা রসূলে করীম (সা)-এর সঙ্গীদের যাঁরা মুসলমান হয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে লোকজনদের লেলিয়ে দিতে শুরু করল। সমস্ত গোত্র যারা মুসলমান হয়েছেন, তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাঁদের মারধোর করে তাঁদের ধর্ম ত্যাগ করার জন্য প্ররোচিত করতে লাগল। আল্লাহ্ তাঁর চাচার মাধ্যমে রসূলে করীম (সা)-কে রক্ষা করলেন। চাচা আবু তালিব যখন দেখলেন, কুরায়শদের মতলব খারাপ, তখন তিনি

১. বানু-আসাদের দেশের এক পাহাড়ের নাম।

বানূ হাশিম আর বানূ আল-মুত্তালিবকে ডাকলেন। রসূল করীম (সা)-কে বাঁচানোর জন্য তিনি তাদের সাহায্য চাইলেন। তারা সাহায্যদানে সম্মত হলো। কেবল একজন ছাড়া। সে হলো আবূ লাহাব, আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত শত্রু।

তাঁর গোত্রের কাছ থেকে এবম্বিধ সাড়া পেয়ে, তাদের এবম্বিধ অনুগ্রহের জন্য ভীষণ পুলকিত হলেন আবূ তালিব। তিনি তাঁদের প্রশস্তি গাইতে লাগলেন, তাঁদের অতীত কীর্তিকে মানুষের কাছে তুলে ধরতে লাগলেন। বললেন, তাদের সকলের মধ্যে রসূল করীম (সা) শ্রেষ্ঠ, তাঁর মর্যাদা স্বতন্ত্র। তিনি ভাবলেন, তাতে করে তাঁদের মনোবল দৃঢ়তর হবে এবং রসূলের প্রতি তাঁরা সদয় হবেন। তিনি (আবূ তালিব) বললেন :

কুরায়শরা একদিন যদি কোন গর্বে এক হয়
আবদ মানাফ হবে তাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয়।
আর যদি আবদ মানাফের বংশের সব সজ্জনের হিসাব নেওয়া হয়
হাশিম হবে তাঁদের মধ্যে মহত্তম, সর্বোত্তম।
ওরা যদি ওদের গৌরবে একপ্রাণ হয়,
তাহলে একদিন মুহাম্মদ (সা) হবেন সবচেয়ে মহৎ, সবচেয়ে সম্মানিত
কুরায়শরা সবাইকে লেলিয়ে দিল আমাদের পেছনে,
কিন্তু কিছু করতে পারে নি আমাদের, তারাই ছিল কেবল তাদের দলে।
আমরা প্রাচীনকাল থেকেই কোনদিন অবিচারের কাছে মাথা নত করিনি
গর্বে যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আমাদের দিকে তাদের
তাকাতে বাধ্য করেছি আমরা।
বিপদে তাদের দুর্গ পাহারা দিয়েছি আমরা,
সমস্ত প্রাসাদ থেকে হটিয়েছি শত্রু।
শুষ্ক বন সবুজ হয়েছে আমাদের হাতে, আমাদের যত্নে গাছেরা
শিকড় মেলে, বেড়ে উঠে দলে দলে।

আল-ওয়ালিদ ইবনে আল-মুগিরা

মেলার সময় হলো। কতিপয় কুরায়শ এলেন আল-ওয়ালিদ ইবনে আল-মুগিরার কাছে। আল-ওয়ালিদ জ্ঞানী-গুণী লোক। তাঁদের তিনি বললেন, 'মেলার সময় হয়ে এলো। সব আরবরা এখানে আসবে। ওরা সবাই নিশ্চয়ই এই লোকের কথা এর মধ্যে জেনে গেছে। তাদের কাছে কি বলবে তোমরা সবাই মিলে ঠিক করে নাও। যাতে এক একজন এক এক কথা না বলে। তাহলে কেউ কারো কথা বিশ্বাস করবে না।"

তারা বলল, আপনিই বলুন ওকে কি বলা যায়।'

তিনি বললেন, না, 'তোমরা বলো, আমি শুনে যাই।'

ওরা বলল, 'ওটা একটা 'কাহিনী।"

তিনি বললেন, 'আল্লাহ্র কসম, ও কাহিনী নয়। ও তো দুর্বোধ্য ভাষায় বিড় বিড় করে না, ছন্দ মিলিয়ে কথা বলে না।'

'তাহলে ওকে ভূতে ধরেছে।'

'না, তাও নয়। ভূতে ধরা লোক আমরা দেখেছি। ওর গলায় বিকৃতি নেই শরীরে টান নেই, ফিসফিস করে সে কথাও বলে না।'

ওরা বলল, 'তাহলে ও কবি একটা।'

'না, কবি নয়। কারণ কবিতার সব ধরন-ধারণ ছন্দ-টন্দ আমাদের জানা আছে।'

'তাহলে ও যাদুকর।'

'না' আমরা যাদুকরের যাদু সব দেখেছি। ও তো কাউকে থুতু দেয় না, কোথাও কোন বান্ মারে না।'

তারা প্রশ্ন করল, 'তাহলে কি বলব, এ্যাঁ, আবু আবদু শামস্ ?'

তিনি বললেন, 'আল্লাহ্র নামে বলছি, ওর কথা খুব মিষ্টি, ওর শিকড় যেন খেজুর গাছের, তার শাখায় শাখায় ফল। যা যা তোমরা বললে, সব যে মিথ্যে তা সহজেই ধরা পড়ে যাবে। তবে এই যে বললে ও যাদুকর, এটা বরং সত্যের কাছাকাছি। যাদুকর, এমন এক বাণী নিয়ে এসেছে, যা

বাপের কাছ থেকে, ভাইয়ের কাছ থেকে, স্ত্রীর কাছ থেকে, পরিবারের কাছ থেকে মানুষকে কেড়ে নিয়ে আলাদা করে দেয়।'

একথা শুনে ওরা সব চলে গেল। যেসব পথে মেলায় লোক আসবে সেসব পথের মাথায় ওরা বসতে শুরু করল। যারাই সে পথ দিয়ে যাতায়াত করল তাদেরই তারা মুহাম্মদ (সা)-এর কার্যকলাপ সম্বন্ধে সাবধান করে দিতে লাগল। আল-ওয়ালিদ সম্বন্ধে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন :

ও আমার সৃষ্টি, ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও,
ওকে আমি দিয়েছি বিপুল ধনরত্ন,
দিয়েছি নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ,
দিয়েছি সচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ
এরপর সে আমার কাছে আরো কামনা করল,
তা হবে না, কারণ জেনেশুনে সে আমার ইঙ্গিতের
অসম্মান করেছে।

আমি তাকে ভীষণ শাস্তি দেব। সে-ই পরিকল্পনা করেছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অভিশাপ পড়ুক তার উপর, সে সিদ্ধান্ত দিয়েছে। নিশ্চিহ্ন হোক সে, সে সিদ্ধান্ত দিয়েছে। ও আবার তাকিয়ে দেখল। ভ্রূকুঞ্চিত করল, মুখ বিকৃত করল।'

তারপর একবার পিছিয়ে গিয়ে আবার সদম্ভে ফিরে এল, বলল, 'এ তো সেই পুরনো যাদু ভিন্ন আর কিছু নয়।'[১]

তাঁর সঙ্গে অন্য যারা ছিল, যারা রসূল করীম (সা) এবং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা ওহীর বর্ণনা করতে গিয়ে একটা জঘন্য শব্দ ব্যবহার করেছিল, আল্লাহ্ তাদের উপরও আয়াত নাযিল করেছেন। বলেছেন, 'তোমার কাছে আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছিলাম, তাদের কথা বলে যারা অনেক দলে

১. কুরআন ৭৪ : ১১-২৫।

বিভক্ত, যারা কুরআনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে ফেলেছে। তোমার প্রভুর শপথ, আমি তাদের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করব।'[১]

ওরা যাকে পেল তাকেই রসূলে করীম (সা) সম্বন্ধে সেই অপপ্রচার করল। যারা মেলায় এসেছিল সবাই রসূলে করীম (সা)-এর খবর তাদের বর্ণনা অনুযায়ী জেনে গেল। সমস্ত আরবে তাঁকে নিয়ে হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল। আবু তালিব শংকিত হলেন, সমস্ত লোক তাঁর আর তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে চলে যাবে, তিনি ঠেকাতে পারবেন না তাদের। তিনি তখন একটি কবিতা রচনা করলেন। এই গাঁথার মাধ্যমে তিনি মক্কার হারাম শরীফের শরণার্থী হলেন, ওখানে তাঁর পদমর্যাদার দোহাই দিয়ে। সে কবিতায় তার দেশের সমস্ত বিখ্যাত মনীষীর প্রশস্তি গাইলেন এবং অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তাদের ও অন্য সকলকে বলে দিলেন তিনি রসূলকে ত্যাগ করবেন না, কোন কিছুর বিনিময়ে তাকে কোন বিপদের মুখে যেতে দেবেন না, তাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে যদি জীবন দিতে হয় তার জন্যও তিনি প্রস্তুত। তাঁর সেই গাঁথা কবিতা নিম্নরূপ ঃ

দেখলাম, কেউ আর ভালবাসে না আমাদের
সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে আমাদের সঙ্গে, সমস্ত আত্মীয়তা,
আমাদের প্রকাশ্য শত্রুতায়, অনিষ্ট কামনায় সবাই মত্ত,
চলে আমাদের প্রাণের শত্রুর আদেশে,
দল বেঁধেছে আমাদের বিরোধী সমস্ত ইতরদের সঙ্গে,
আমাদের আড়ালে ক্রোধে নিজেদের আঙ্গুল কামড়ায়,
তখনই আমি তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালাম ক্রুদ্ধ বর্শা নিয়ে,
হাতে ঝলমলে তলোয়ার এবং পূর্বপুরুষের কাছ থেকে
                                        পাওয়া অন্যান্য অস্ত্র।
কা'বার চতুর্দিকে আমার গোত্রের লোকজন, আমার ভাইদের
                                        ডেকে জড়ো করলাম,

১. কুরআন ১৫ ঃ ৯০।

ওরা লাল গোলাপ স্পর্শ করে দাঁড়াল
গেটের দিকে মুখ করে,
ওখানে এমনি করে সবাই শপথ নেয়,
হাজীদের উটে বসে হাটু গেড়ে,
যেখানে ইসাফ আর নায়লার মাঝখানে বহে রক্তধারা
কাঁধে আর ঘাড়ে চিহ্ন ধরে আসে পোষা উট,
ছয় থেকে নয় বছর বয়স তাদের,
গলায় তাদের মন্ত্রপূত কবচ, কাঁচের অলঙ্কার
ঝুলে যেন ফলভারে খেজুর শাখা।
আমার সমস্ত প্রতিপক্ষ, সমস্ত মিথ্যুক
শত্রুদের থেকে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার প্রভুর কাছে।
আশ্রয় প্রার্থনা করি দুঃসহ অপবাদ থেকে,
এবং তার কাছ থেকে যে অজানা নিয়ম আনে আমাদের ধর্মে।
সাউরের শপথ, শপথ তাঁর যিনি সাবিরকে প্রতিষ্ঠা করেছেন,
হিরায় আরোহণ অবরোহণ করে যে তার শপথ,[১]
মক্কার পবিত্র মসজিদের শপথ,
যে আল্লাহ্ অন্যমনস্ক নন, তাঁর শপথ,
পরম আদরের সকাল বিকেল তওয়াফ করা
কৃষ্ণ পাথরের শপথ,
পাথরে এখনো অমলিন ইবরাহীমের পদচিহ্নের শপথ,
আবরণবিহীন যে নগ্ন পদ
মারওয়া সাফায় ছুটে বেড়াতো,
আর তার ভেতরের সমস্ত প্রতিমার শপথ,
হাজী আসতেন পবিত্র প্রভুর গৃহে
নগ্নপদে শ্রদ্ধাভরে, তাদের শপথ,
সুদূর পবিত্র স্থান ইলালে যেতেন তাঁরা,

১. হিরা, সাউর, সাবির মক্কার পাহাড়।

যেখানে নহরে বইত পানি, তাঁর শপথ
পাহাড়ের চূড়োয় উঠতেন তাঁরা,
হাতে টেনে উঠাতেন উট, তার শপথ
রাত্রির জমায়েত, মিনার গন্তব্য
আছে আর কোন স্থান, আর কোন গন্তব্য পবিত্রতরো ?
ঘরে-ফেরা ঘোড়া ত্রস্তে যেতো জনতার ভীড় ঠেলে,
যেন ঝড়বৃষ্টি থেকে ছুটে পালাচ্ছে, সেই জনতার শপথ,
বিশাল প্রস্তর স্তূপ, তার চূড়ো লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়তেন তারা,
তার শপথ ;

আল-হিসাবের সমতলে থাকতেন কিন্‌ডা,
বাকর ইবনে ওয়াইলের হাজী যেতেন তার পাশ কেটে,
দুই মিত্রশক্তি সুদৃঢ় করত বন্ধন তাদের ;
একতায় গ্রথিত হতো তারা, তার শপথ,
আকাসিয়া (বাবলা জাতীয় গাছ) আর আস-সিফার গুল আর জঙ্গল
ভেঙে

উড়ন্ত উটপাখির মত ধেয়ে যেতেন তারা, তাদের সেই গতির শপথ।
এর চেয়ে শ্রেয় আছে আর কোন আশ্রয়, আশ্রয় সন্ধান করে যে ?
আছে কোন খোদা ভীরু জন, যিনি তা দিতে পারেন ?
আমাদের শত্রুগণ ধেয়ে আসে,
দেখে তুর্ক আর কাবুলের[১] ফটক রুদ্ধ হয়ে আছে আমাদের দেহে।
তোমরা মিথ্যুক, আল্লাহ্‌র ঘরের শপথ, আমরা মক্কা ছেড়ে যাব না,
যেতে হয় তোমরা যাও, তোমাদের দ্বন্দ্ব দূর না হলে আমরা যাব না।
পবিত্র প্রভুর গৃহের শপথ, তোমরা মিথ্যুক,
মুহাম্মদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে দেবো না আমরা ;
তার জন্য আগে আঘাত করবো, তীর ছুড়বো,
তার চতুষ্পার্শ্বে যখন আমাদের লাশ পড়ে থাকবে,

১. তুর্ক আর কাবুল দুই পাহাড়ের নাম। এ বিষয়ে মতভেদ আছে।

তখন তাকে তোমরা পাবে, তার আগে নয়,
আমাদের স্ত্রীপুত্র, পরিবার, তাদের কথা বাদ দাও,
অস্ত্র ধরবে এক জনতা, লড়বে তোমাদের সাথে,
যেমন করে পানিবাহী উট খালি থলে নিয়ে গা-ঝাড়া দেয় তেমনি,
আমার বর্শায় ছিন্নভিন্ন করবে শত্রুর দেহ
মুখ থুবড়ে পড়বে রক্তাক্ত।
আল্লাহ্‌র কসম ! যদি তেমন কিছু হয়
আমাদের সেরা তলোয়ার বাজবে ঝনঝন,
যুদ্ধ হবে সমানে সমান,
নওজোয়ান যোদ্ধার হাতে অসিতে বিদ্যুৎ ঝলসিত হবে,
সে যোদ্ধা বিশ্বস্ত, সত্যের শমন বীর
যুদ্ধ করে যাবে দিন, মাস, বছর,
এক বছর, দুই বছর, আরো, আরো।
যে নেতা আপন লোকদের রক্ষা করে,
তাকে ত্যাগ করে, সে কোন্ জাতের লোক তোমাদের ধারণা ?
করুণা আর মমতা তারা পায়
কোন দুর্বলচিত্ত বদমেজাজীর কাছে নয়,
পায় মহৎ কোন জনের কাছে, যার জন্য বৃষ্টি দেয় মেঘ,
যে ইয়াতীমকে সাহায্য করে, বিধবাদের রক্ষা করে,
হাশিমের বংশজাত লোক, যারা ভালর জন্য নিশ্চিহ্ন হতে প্রস্তুত,
সেই তার কাছে।
আসিদ আর তার প্রথম সন্তান আমাদের হেয় করেছে,
আমাদের কেটে টুকরো করেছে, যাতে অন্যেরা আমাদের গিলতে পারে ;
উসমান কিংবা কনকুজও আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল না,
কিন্তু তারা সমস্ত গোত্রের কথা মেনে চলেছে।
উবায়কে মেনেছে তারা, মেনেছে আব্দ ইয়াগূতের পুত্রের কথা,
অন্য লোকে কি বলেছে আমাদের নিয়ে কর্ণপাত করে নি,

সুবায় আর নওফেলও ভাল ব্যবহার করেছে আমাদের সঙ্গে,
আমাদের প্রতি বিমুখ হয়েছে এমন অনেকে
কিন্তু তবু তারা সদয় থেকেছে।
ওরা যদি অস্ত্র ত্যাগ করে, বন্ধু হতে চায় আমাদের
আমরাও তাই করবো কাঁটায় কাঁটায়।
আবু আমর বেটা ঘৃণাই কেবল করবে আমাদের,
আমাদের শুধু মেষপালক আর উটচালক করে রাখতে চাইবে,
সন্ধ্যায় ও রাতে যে গোপনে কানমন্ত্র লাগায় আমাদের বিরুদ্ধে।
বলে যাও হে আবু আমর তোমার চাতুরি চলুক।
আল্লাহ্র নামে সে শপথ করে, আমাদের সঙ্গে ছলনা করবে না,
অথচ সে কর্ম ছাড়া আর কিছুই তাকে করতে দেখি না।
আমাদের জন্য এতো ঘৃণা তার
মক্কার পাহাড়ের চূড়ো আর সিরিয়ার দুর্গের মাঝখানে
সব ঠাঁই মিলেও তাকে ধারণ করতে সক্ষম হবে না।
আবুল ওয়ালিদকে প্রশ্ন করো, আমাদের নামে এতো কলঙ্ক রটিয়ে
প্রতারক বন্ধুর মতো বিমুখ হয়ে, কি কাজটি সে করেছে ?
তোমার কথা মাথা পেতে নিত সর্বজন,
আমাদের প্রতি সখ্যভাব ছিল, তুমি তো নির্বোধ নও।
হে উতবা, আমাদের সম্বন্ধে শত্রুরা কি বলে কান দিও না।
হিংসুক মিথ্যুক ওরা ঘৃণা ও নীচতা ওদের মজ্জায়।
আবু সুফিয়ান অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হেঁটে গেল আমার সম্মুখ দিয়ে
বীরদর্পে, যেন পৃথিবীর কত বিখ্যাত লোক সে,
উঁচু স্থানে গেল, ঠাণ্ডা পানি খেল,
দেখাল যেন আমাদের ভুলে নি সে।
মুখে বলে, সে আমাদের বন্ধু, কৃতকর্মের জন্য দুঃখিত,
কিন্তু হৃদয়ের ভিতরে আছে কুমতলব লুকানো।
হে মুতিম, যখন সাহায্য চেয়েছ, আমি তো তোমাকে ত্যাগ করিনি,

শত্রুরা তোমার দিকে তেড়ে এল, তোমার সমকক্ষ শক্তি তাদের,
তখন তো তোমাকে বর্জন করি নি।
হে মুতিম, জনগণ তোমাকে একটা দায়িত্ব দিয়েছে,
আমাকে দায়িত্ব দিলে আমি তো তা এড়িয়ে যাই না।
আবদু শামস আর নওফেলকে আল্লাহ্ শাস্তি দিন,
কঠিন শাস্তি, দ্রুত, আমাদের হয়ে,
ঠিক দোষ অনুযায়ী, এক কণাও কম নয়,
পাল্লার মাপে, পাল্লার মাপ কখনো মিছে হয় না।
বানু খালাফ আর গায়াতিলের সঙ্গে যারা
আমাদের বদল করেছিল, তারা ছিল নির্বোধ।
বংশের প্রশ্নে আমরা হাশিমের আদি খাঁটি বংশের লোক,
এসেছি কুসাইয়ের পরিবার থেকে।
সাহ্ম আর মাখজুম দল বেঁধেছিল আমাদের বিরুদ্ধে
সমস্ত ইতর বদমাশ নিয়ে।
আবদু মানাফ, তুমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জন,
যে কোন বহিরাগতের সঙ্গে দল বেঁধো না তুমি।
তুমি দুর্বল, নরম,
এর মধ্যে এক অন্যায় কাজ করে ফেলেছ।
আগে তোমরা ছিলে এক পাত্রের নিচের ইন্ধন,
এখন তোমরা হয়ে গেছ বহু পাত্রের বহু আধারের লাকড়ি।
বানু আবদু মানাফ আমাদের ত্যাগ করে,
আমাদের পরিত্যক্ত করে, আমাদের নিজেদের ঘরে বন্দী রেখে
আনন্দ পায়, পাক ! আমরা যদি মানুষ হই, যা তুমি করেছ
আমরা তার শোধ নেব, যুদ্ধের পুরো কষ্ট তোমাদের সহ্য
করতে হবে।
লুআই বিন গালিবের সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্ত লোক,
সমস্ত বীর সর্দার, সবাই আমাদের সঙ্গে নির্বাসিত।

নুফায়েলের পরিবারবর্গ, পৃথিবীর কদর্যতম মানুষ,
মা'দের বংশে সবচেয়ে ঘৃণ্য লোক তারা।
কুসাইকে বলে দাও, আমাদের দুঃখ আগুন জ্বালাবে বিদেশে,
কুসাইকে আরেকটা সুসংবাদ দিও, আমাদের পরে শত্রুরা
ছিন্নভিন্ন হয়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।
অথচ কুসাইদের উপর কোন রাতে বিপদ আপতিত হলে
আমরাই সর্বাগ্রে তাদের রক্ষার জন্য এগিয়ে যেতাম।
নিজেদের ঘর রক্ষার জন্য বীরের মতো যদি যুদ্ধ করতো তারা,
আমরা তখন তাদের মা-বোনদের রক্ষা করতাম।
অথচ ওদের মধ্যে কোন বন্ধু বা ভাতিজা
দরকারে কোন কাজেই আসে না।
অবশ্য কিলাব বিন মুররার কিছু কিছু লোক আছে,
তাদের আমরা দলত্যাগকারী বলে চিহ্নিত করি না।
আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জুহায়র নিঃসন্দেহে এক চমৎকার পুরুষ,
খাপ থেকে খোলা তলোয়ার যেন,
গর্বিততম শেখদের মধ্যে গর্বিততম সে,
সবচেয়ে খান্দান বংশের সন্তান সে।
স্থায়ী অনুরাগী হিসেবে আমি আহমদ
আর তার ভাইদের প্রতি সমর্পিত প্রাণ।
তার মতো মানুষ আর কেউ হতে পারবে না।
বিচারে সমদর্শী সে,
নম্র, ন্যায়পথ প্রদর্শিত, ন্যায়পরায়ণ, গম্ভীর,
আল্লাহ্‌র বন্ধু, সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র চিন্তায় মগ্ন।
আল্লাহ্‌র কসম! এখানে কোন কাজ আমরা করব না,
যাতে আমাদের পূর্বপুরুষ শেখদের গরিমা নষ্ট হয়,
যা থাকে কপালে, তাকেই অনুসরণ করব আমরা।
শুধু কথায় নয়, কাজে, পরম নিষ্ঠায়।

তারা জানে, আমরা আমাদের পুত্রকে মিথ্যুক বলছি না,
কাজে মিথ্যা নিয়ে বেসাতি নয় আমাদের।
আহ্‌মদ এমন এক শিকড় গেঁথেছে আমাদের জীবনে,
দর্পিতের আক্রমণ কিছুই করতে পারবে না তাঁর।
তাকে আমি ছায়া দিয়েছি, রক্ষা করেছি সব কিছুর বিনিময়ে।

[আবু তালিবের কবিতায় উল্লিখিত কিছু ব্যক্তির পরিচয় দেওয়া গেল।*

গায়াতিলরা হলো বানূ সাহ্‌ম ইবনে হুসায়সের বংশধর। আবূ সুফিয়ান হচ্ছে ইবনে হারব ইবনে উমাইয়া।

মুতিমের পরিচয়ঃ মুতিম ইবনে আদি, ইবনে নওফেল ইবনে আবদ মানাফ। জুহায়র হচ্ছে ইবনে আবূ উমাইয়া ইবনে আল-মুগিরা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে মাখজুম-এর মাতা ছিলেন আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিব। উসমান হলো তালহা ইবনে উবায়দুল্লা আত্-তায়মির ভাই ইবনে উবায়দুল্লা। কুনফুজ হলো ইবনে উমায়র ইবনে জুদান ইবনে আমর ইবনে কা'ব ইবনে সা'দ ইবনে তায়ম ইবনে মুররা। আবুল ওয়ালিদ হচ্ছে উতবা ইবনে রাবিআ এবং উবায় হলো আল-আখনাস ইবনে শারিক আস-সাকাফি। সাকাফি আবার বানু জুহরা ইবনে কিলাবের মিত্র।[১]

আল-আসওয়াদ হলো ইবনে আবদ ইয়াগুত ইবনে ওহাব ইবনে আবদ মানাফ ইবনে জুহ্‌রা ইবনে কিলাব। সুবায় হলো বানূ আল হারিস ইবনে ফিহরের ভাই। নওফেল হচ্ছে ইবনে খুয়ায়লিদ ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উজ্জা ইবনে কুসাই। ইনি ছিলেন ইবনে আল আদাভিয়া, কুরায়শ বংশের অন্যতম শয়তান। আবূ বকর আবূ তালহা ইবনে উবায়দুল্লা ইসলাম গ্রহণ করলে পরে এই লোকই তাঁদের দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। এই থেকেই তাঁরা 'দড়ি-বাঁধা-দুজন' উপাধি পেয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধে আলী একে হত্যা করেন। আবূ আমর হলো কুরজা

১. এটি এবং এর পরবর্তী অনুচ্ছেদ ইবনে হিশামের নামে বর্ণিত।

* অনুবাদক।

ইবনে আবু আমর ইবনে নওফেল ইবনে আবদ মানাফ। 'বিশ্বাসঘাতক লোকজন' মানে বানু বকর ইবনে আবদ মানাত ইবনে কিনানা। এইসব আরবদের কথা আবু তালিব তাঁর কবিতায় উল্লেখ করেছেন।

রসূল (সা)-এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল চতুর্দিকে। মদীনায়ও তাঁর নাম উচ্চারিত হতে লাগল। এমন কি তখন রসূল (সা)-এর সবচেয়ে বেশী খবর রাখত আউস আর খাযরাজ গোত্রের লোকজন। সমস্ত আরবে তাদের মত রসূল (সা) সম্পর্কে এমন আর কেউ জানত না। তার কারণ তারা য়াহুদী রাব্বিদের পাশে বসবাস করত, রাব্বিদের প্রবচনের সঙ্গে পরিচিতি ছিল তাদের। মদীনায় রসূল (সা)-এর খবর পেঁাছল, তারা সবাই শুনল কুরায়শদের সঙ্গে গোলমাল হচ্ছে রসূলের। তখন বানু ওয়াকিফের ভাই আবু কায়স ইবনে আল-আসলাত একটি পদ্য রচনা করেন।

কুরায়শদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ছিল আবু কায়সের। কারণ তঁার স্ত্রী আর্নাব বিনতে আসাদ ইবনে আবদুল উজ্জার ইবনে কুসাই-র মাধ্যমে আত্মীয়তার বন্ধন ছিল তাদের সঙ্গে। একসঙ্গে বছরের পর বছর সস্ত্রীক কুরায়শদের সঙ্গে বাস করেছেন তিনি। একটি গঁাথা রচনা করে তিনি তাতে সমস্ত এলাকার পবিত্রতার গুণ-কীর্তন করলেন, ওখানে কুরায়শদের হানা-হানি করতে বারণ করলেন, সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে থাকতে বললেন, তাদের সমস্ত দোষ-গুণের বর্ণনা দিলেন, রসূল (সা)-কে রক্ষা করার পরামর্শ দিলেন এবং যেমন করে আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন, হাতীর যুদ্ধে রক্ষা করেছিলেন তাদের, তা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

হে অশ্বারোহী, লুআই ইবনে গালিবের যখন দেখা পাও
আমার একটা বার্তা তাকে দিয়ো,
তার সংবাদ তোমাদের চেয়ে অনেক দূরে যার বাস,
তোমাদের খবর শুনে যে ব্যথিত, বিষণ্ণ এবং উদ্বিগ্ন।
আমি এক সরাইখানা হয়ে গেছি আদর-যত্নের,
তার জন্য সমস্ত কর্তব্যকর্ম করতে পারি না।
শুনেছি তোমরা নাকি ভাগ হয়ে গেছ অনেক শিবিরে

যুদ্ধের আগুন উস্কে দেয় এক পক্ষ, ইন্ধন যোগায় অন্যদল।
আল্লাহ্‌র কাছে আমার প্রার্থনা, তিনি তোমাদের রক্ষা করুন
মন্দ কাজ থেকে,
তোমাদের নোংরা ঝগড়া থেকে, বৃশ্চিকের ছলনাময় আক্রমণ থেকে,
মানহানিকর সংবাদ আর গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে,
যা নাকি তীক্ষ্ন সূচের মত বিদ্ধ করে অনিবার্য।
প্রথমে তাদের আল্লাহ্‌র কথা মনে করিয়ে দিয়ো,
তারপর পথশ্রান্ত গজলা-হরিণ বধের নিষেধ লঙ্ঘনের পাপের কথা বল।[১]
তাদের বলো (আল্লাহ্ বিচারের মালিক),
তোমরা যুদ্ধে মেতে গেলে আর থামতে পারবে না।
একে ঘাটানোর অর্থ একটি মন্দকে লালন করা,
এ এক রাক্ষস, কাছের দূরের সব কিছু গিলে ফেলে,
আত্মীয়তা ধ্বংস করে দেয়, ধ্বংস করে মানুষকে,
ঘাড় থেকে, পিঠ থেকে মাংস খুবলে নেয় সে।
ইয়ামনের মিহি বস্ত্র আর পরা হবে না তোমাদের,
কারণ সৈনিক হলে পরিচ্ছদ ভিন্ন হয়, পোশাক, কোট,
মুখোস, ধূসর-বর্ণ বর্ম,
পতঙ্গের চোখের মতো তার বোতাম।
যুদ্ধ থেকে সাবধান! ওকে দূরে সরিয়ে রাখবে।
বদ্ধ ডোবার পানির চুমুক বড় কটু হয়।
যুদ্ধ—প্রথম প্রথম মানুষের কাছে বড় রমণীয় লাগে,
কিন্তু পরে এক কুৎসিত ডাইনীকে চিনতে তাদের কষ্ট হয় না।
দুর্বলকে সে পুড়ে মারে নির্মমের মতো,
আর সবলের দিকে ছুড়ে মারে মৃত্যুঘাতী বাণ।

---

১. পবিত্র স্থানে পশু হত্যা বারণ ছিল। কবি বলতে চান, যেমন পশুর রক্তপাত নিষেধ, সেখানে যুদ্ধ ও মানুষের রক্তপাতও আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ বলে ধরতে হবে।

দাহিসের যুদ্ধে কি হয়েছিল জান না ?
কিংবা হাতিবের যুদ্ধে ? ওখান থেকে শিক্ষা নাও !
কতো কতো শরীফ মানুষ নিধন হলো,
গৃহস্থ উদার মন, অতিথির কোন অভাব হতো না যার,
পাতিলের নিচে তার বিরাট গাদা ছাইয়ের,
সর্ব প্রশংসিত জন, সচ্চরিত্র, তার তলোয়ার
উন্মুক্ত হতো কেবল সঙ্গত কারণে।
যেন পানি ঢেলে দিচ্ছে কেউ যত্রতত্র,
যেন চতুর্দিকে বাতাস উড়িয়ে দিচ্ছে মেঘমালা।
সত্যবাদী জানে-শুনে এমন কেউ সেসব যুদ্ধের বিবরণ দেবে তোমাদের,
(কারণ আসল জ্ঞান অভিজ্ঞতার ফসল বটে।)
তোমাদের বর্শা অতএব বিক্রি করে দাও তাদের কাছে
যারা যুদ্ধ ভালবাসে, মনে রেখো তোমাকে জবাবদিহি করতে
হবেই, এবং আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ বিচারক।
মানুষের প্রভু, তিনি ধর্ম এক নিয়েছেন বেছে,
বেহেশতের প্রভু ছাড়া সুতরাং আর কাউকে দিয়ো না তোমাকে পাহারা
দিতে,
আমাদের জন্য একটি হানিফি বর্ম তৈরী করে দাও।
তোমরা আমাদের লক্ষ্যবস্তু, ভ্রমণপথ স্থির করে আকাশ,
তোমরা এই জাতির আশ্রয় এবং আলো,
তোমরা পথ দেখাও, তোমাদের গুণের অভাব নেই।
মানুষের যদি মূল্যমান ধরা হতো, তাহলে তোমরা হতে মাণিক্য,
সর্বশ্রেষ্ঠ উপত্যকা তোমাদের, সে বড় মহৎ গৌরব।
তোমরা মহৎ এবং প্রাচীন জাতিকে ধারণ করছ।
এই জাতির মধ্যে কোথাও বিদেশী রক্ত নেই।
দেখো, অভাবী মানুষ তোমাদের দ্বারেই আসে,
দলে দলে ক্ষুধার্ত মানুষের ঢেউ।

সবাই জানে তোমাদের নেতারা
মিনার দরজায় সর্বোত্তম মানুষ বটে,
মন্ত্রণায় সর্বোত্তম, আচরণে মহত্তম,
তাবৎ গোত্রমালায় সবচেয়ে সত্যবাদী।
তোমরা সবাই উঠো, তোমাদের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করো,
পাহাড়ের মধ্যবর্তী এই গৃহের কোণ স্পর্শ করো।
তিনি তোমাদের এক কঠিন পরীক্ষা দিয়েছিলেন,
আবু ইয়াকসূমের দিনে, সৈন্যদলের সেনাপতি,
অশ্বারোহী বাহিনী তার ছিল সমভূমে,
আর পদাতিক বাহিনী ছিল গিরিপথে।
আল্লাহ্‌র সাহায্য যখন পেঁৗছল তোমাদের কাছে,
তার সৈন্যদল তাদের প্রতিহত করল, ঢিল ছুড়ে,
ধুলোয় তাদের ঢেকে দিল সমস্ত।
সঙ্গে সঙ্গে লেজ গুটিয়ে পালাল তারা,
বিপুল বাহিনী থেকে মুষ্টিমেয় কতিপয় ফিরে গেল শুধু।
তোমরা ধ্বংস হও যদি, আমরাও শেষ হবো, শেষ হবে
শুভ, যা দিয়ে মানুষ জীবন ধারণ করে
এই হলো একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষের কথা।

হাকিম ইবনে উমাইয়া ইবনে হারিসা ইবনে আউকাস আস-সুলামি ছিলেন বানু উমাইয়ার একজন মিত্র। তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। রসূল (সা)-এর প্রতি দৃঢ়বদ্ধ বৈরিতা থেকে আপন গোত্রের লোকদের ফেরানোর জন্য তিনি নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেছিলেন। ইনি সদ্বংশজাত ও জ্ঞানী-গুণী মানুষ ছিলেন।

যিনি সত্য কি তা নির্দেশ করেন তিনি কি সত্য পালন করেন,
এবং সত্যে যে ক্রুদ্ধ হয়, সে কি সত্য শ্রবণ করে ?
যে নেতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সমস্ত জাতির প্রত্যাশা,
তিনি কি কাছের কি দূরের বন্ধু সংগ্রহে তৎপর হয় ?

যিনি বায়ু নিয়ন্ত্রণ করেন আমি কেবল তাকেই মানি,
অন্য কাউকে মানি না,
এবং তোমাদের আমি চিরতরে ত্যাগ করলাম।
আমি কায়মনে নিঃশেষে নিজেকে আল্লায় সমর্পণ করলাম,
বন্ধুরা আমাকে ভীত করে যদিও।

রসূল (সা)-এর প্রতি তাঁর আপন লোকের আচরণ

কুরায়শ গোত্র রসূল করীম (সা) এবং নবদীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ কুরায়শদের পক্ষে এক পর্যায়ে গভীর মর্মপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল। তখন তারা কবিতায় নির্বোধ লোককে রসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল। রসূলকে তারা মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করতে লাগল। তাঁকে অপমান করতে শুরু করল। রটনা করতে লাগল তিনি কবি, যাদুকর, জ্যোতিষী, ভূতে-ধরা মানুষ। রসূল কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র আদেশ অনুসারে তাঁর ধর্ম প্রচার করে যেতে লাগলেন। কিছুই তিনি গোপন করলেন না। কুরায়শদের ধর্মকে পরিত্যাজ্য ঘোষণা করলেন, তাদের দেবদেবীকে ত্যাগ করলেন। এতে করে তাদের বৈরীভাবকে তিনি উত্তেজিত করলেন। নিজেদের অবিশ্বাসে উপরন্তু তারা অটলই থেকে গেল।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আল-আস-এর সূত্রে ইয়াহিয়া ইবনে উরওয়া ইবনে আল-জুবায়রের পিতা এবং তার পিতার সূত্রে ইয়াহিয়া আমাকে বলেছেন যে, রসূল করীম (সা)-এর প্রতি কুরায়শদের শত্রুতা প্রদর্শন করার নিকৃষ্টতম পথ কোন্‌টি ছিল তা আবদুল্লাহ্‌কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। আবদুল্লাহ্ জবাব দিয়েছিলেন, 'একদিন কা'বা প্রাঙ্গণে হাতিমের কাছে কুরায়শদের সমস্ত মান্যগণ্য লোক বসে গল্প করছিল। ওখানে আমিও ছিলাম। কথায় কথায় রসূল করীম (সা)-এর কথা উঠল। তারা একবাক্যে বলল, এই বেটা তাদের যে রকম কষ্ট দিচ্ছে এরকম কষ্ট তাদের জীবনে কেউ আর দেয় নি। ও তাদের জীবনধারাকে বলছে অর্থহীন, তাদের পিতৃপুরুষকে অপমান করেছে, তাদের ধর্মকে হেনস্তা

করেছে, তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, তাদের দেবদেবীকে অভিসম্পাত দিয়েছে। তাদের সহ্যের সীমা পার হয়ে গেছে অথবা এমনি কিছু ধরনের কথা।'

ওরা কথা বলছিল তাঁকে নিয়েই। এমন সময় তিনি এলেন ওখানে। এলেন তাদের কাছাকাছি। হজরে আসওয়াদে চুমু খেলেন। তারপর তাদের পাশ কাটিয়ে কা'বা শরীফ তওয়াফ করতে লাগলেন। ওদের পাশ কেটে যাওয়ার সময় ওরা তাঁকে উদ্দেশ্য করে কিছু খারাপ গালি বর্ষণ করলে। আমি তাঁর চেহারা দেখে সেটা বুঝলাম। উনি তওয়াফ করে চললেন। দ্বিতীয়বারের মতো তিনি যখন তাদের পাশ কেটে যাচ্ছিলেন, তখনো ওরা ঠিক একইভাবে তাঁকে আঘাত করে অপমানজনক উক্তি করল। এটাও আমি তাঁর চেহারা দেখেই বুঝলাম। তিনি তৃতীয়বারের মতো তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, তখনো ওরা একই রকম আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করল। রসূল করীম (সা) তখন থামালেন, বললেন, 'আপনারা কি আমার কথা শুনবেন, হে কুরায়শবৃন্দ? যার হাতে আমার জান তার কসম, আমি আপনাদের জন্য খুন এনেছি।'

শুনে ওরা সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল বজ্রাহতের মত। সবচেয়ে বেশি লাফালাফি করছিল এতক্ষণ যে জন সে তাঁকে অত্যন্ত নরম গলায় বলল, 'চলে যান আবুল কাসিম, আপনি চলে যান। কারণ খুনাখুনির কাজ আপনার নয়।'

রসূল করীম (সা) চলে গেলেন।

পরদিনও তারা একই স্থানে এসে জমায়েত হলো। আমিও ছিলাম সেখানে। গতকাল রসূল (সা) ও তাদের মধ্যে কি হয়েছিল, প্রকাশ্যে সে লোক তাদের গরম গরম কি যেন কথা শোনাল এবং তারপর ওকে কিছু না করে যেতে দেওয়া হলো, কেন কি বৃত্তান্ত একে অন্যকে জিজ্ঞেস করতে লাগল। ঠিক তখনই রসূল করীম (সা) এলেন। ওরা সবাই একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে তাঁকে ঘিরে ধরল। বলল, 'তুমি আমাদের দেবদেবী, আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে আকথা-কুকথা বলেছ? তুমিই সেই লোক?'

রসূল করীম (সা) বলিলেন, 'হ্যা, আমিই সেই লোক।'
দেখলাম ওদের একজন তাঁর জামা চেপে ধরল।

চীৎকার করে তখন আবু বকর কেঁদে উঠলেন, ওদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন; বললেন, 'আল্লাহ্ আমার প্রভু, শুধু এই কথা বলার অপরাধে একটা মানুষকে আপনারা হত্যা করবেন?

তারপর ওরা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

রসূল (সা)-এর প্রতি কুরায়শদের এর চেয়ে খারাপ ব্যবহার করতে আমি দেখি নি।

আবু বকরের কন্যা উম্মে কুলসুমের পরিবারের একজন আমাকে বলেছেন যে, উম্মে কুলসুম বলেছেন, 'সেদিন আবু বকর ঘরে ফিরলেন চুল-ছেঁড়া মাথা নিয়ে সুন্দর চুল-দাড়িওয়ালা মানুষ ছিলেন তিনি। ওরা তাঁকে দাড়ি ধরে টান-হেচঁড়া করেছিল।'

হামযা ইসলাম গ্রহণ করলেন

আসলুম গোত্রের প্রখর স্মৃতিসম্পন্ন এক ভদ্রলোক আমার কাছে বলেছিলেন যে, আস-সাফা-তে রসূল করীম (সা)-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আবু জেহেল রসূল করীম (সা)-কে খুব অপমান করে এবং তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করে। তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথা বলে এবং তাঁর নামে কলঙ্ক রটানোর চেষ্টা করে। রসূল করীম (সা) একটি কথাও বলেন নি তার সঙ্গে। আবদুল্লাহ্ ইবনে জুদান ইবনে আমর ইবনে কা'ব ইবনে সা'দ ইবনে তায়ম ইবনে মুররা-র এক মুক্ত দাস তখন তাদের বাড়িতে ছিল। সে সমস্ত অপমানের ভাষা স্বকর্ণে শুনল। আবু জেহেল চলে গেলে পরে সেই মুক্ত দাস ছুটে গেল কা'বার কাছে। ওখানে কুরায়শরা বসে জটলা করছিল। ওখানে গিয়ে বসল সে। কিছুক্ষণ পর ওখানে হাযির হলেন হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব। তাঁর কাঁধে ঝুলানো তীর-ধনুক। শিকার থেকে ফিরছেন হামযা। শিকার তাঁর প্রিয়

নেশা। শিকার থেকে কোনদিন সরাসরি বাড়ি ফিরতেন না, আগে কা'বা তওয়াফ করতেন। আজকেও কা'বা তওয়াফ করে ওখানে জমায়েত কুরায়শদের কাছে এসে থামলেন, সালাম জানিয়ে ওদের সঙ্গে গল্প-গুজব শুরু করলেন। হামযা ছিলেন কুরায়শদের মধ্যে সবচেয়ে শক্ত-সমর্থ মানুষ। যেমন শক্তি, তেমনি জেদী।

রসূল করীম (সা) তখন বাড়ি চলে গেছেন।

হামযার সঙ্গে পথে দেখা হলো সেই মুক্ত দাসের। হামযাকে সে জিজ্ঞেস করল, আবুল হাকাম ইবনে হিশাম তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তার খবর তিনি জানেন কি না। রসূল করীম (সা) বসা ছিলেন। ওখানে সে তাঁকে অপমান করল, অভিসম্পাত দিল, গালি-গালাজ করল। জবাবে রসূল করীম (সা) একটি কথাও বলেন নি। সব শুনে রাগে আগুন ধরে গেল হামযার শরীরে। কারণ আল্লাহ্ তাঁকে ইযযত দিয়েছেন। শুনেই তিনি দৌড় দিলেন. কোনদিকে তাকালেন না, কাউকে সালাম পর্যন্ত জানালেন না, তিনি আবু জেহেলকে ধরবেন, তারপরে অন্য কথা। আবু জেহেলকে ধরবেন, শাস্তি দেবেন, তার আগে অন্য কোন কথা নয়। কা'বা প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখলেন অন্যান্য লোকজনের মধ্যে আবু জেহেল বসে আছে। ওর একেবারে কাছে গিয়ে ঘা ঘেঁষে তিনি দাঁড়ালেন। ধনু হাতে নিয়ে তা দিয়ে ওর উপর লাগিয়ে দিলেন এক ঘা, বললেন, 'আমি যদি ওর ধর্ম গ্রহণ করি, ওকে অপমান করতে পারবে তুমি? যা ওকে বলেছিলে, বলতে পারবে? আমি তোমাকে মারলাম, তুমি পাল্টা আমাকে মারো দেখি, মুরদ কতো!'

বানু মাখজুমের কিছু লোক উঠে দাঁড়াল। ওরা আবু জেহেলকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল। কিন্তু আবু জেহেলই তখন বলে উঠল, 'না, আবু উমরাকে আপনারা বাধা দেবেন না। আল্লাহ্‌র কসম, আমি তার ভাতিজাকে ভীষণ অপমান করেছি।'

হামযার ইসলাম গ্রহণ পূর্ণ হলো। তিনি রসূল করীম (সা)-এর নির্দেশ মেনে চলতে শুরু করলেন। হামযা মুসলমান হয়ে গেলেন।

কুরায়শরা বুঝতে পারল রসূল করীমের হাত মজবুত হচ্ছে, হামযার মধ্যে তার শক্তি ও আশ্রয় নিহিত হয়েছে। কাজেই তারা হাল ছেড়ে দিল। তাঁকে হয়রানির কিছু কিছু পথ তারা ত্যাগ করল।

রসূল করীম (সা) সম্বন্ধে উতবার উক্তি

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল-কুরাজির সূত্রে ইয়াযিদ ইবনে জিয়াদ আমাকে বলেছেন যে কুরায়শদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উতবা ইবনে রাবিআ একদিন কুরায়শদের সঙ্গে জামা'আতে বসা ছিলেন। কা'বা প্রাঙ্গণে এক জায়গায় একা বসা ছিলেন নবী করীম (সা)। উতবা ইবনে রাবিআ তখন বললেন, 'মুহাম্মদের কাছে যদি আমি যাই, তাঁর কাছে কিছু প্রস্তাব দিই এবং তার কিছু কিছু যদি সে মেনে নেয় আমাদের কাছে যা চায় তাই যদি দিয়ে দিই আর বিনিময়ে সে আমাদের শান্তিতে থাকতে দেয়, তাহলে কেমন হয় ?'

এটি হামযার ইসলাম গ্রহণের পরের ঘটনা। রসূলের অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের দল ভারী হচ্ছে। এটি কুরায়শরা লক্ষ্য করছে নিঃশব্দে। উতবার প্রস্তাব সবার খুব পছন্দ হলো। উতবা তখন রসূল করীম (সা)-এর কাছে গিয়ে বসলেন। বললেন, 'বৎস, তুমি তো আমাদেরই লোক। কত উচ্চ বংশে তোমার জন্ম তুমি তো জানই, কত পুরনো খান্দানী ঘর তোমাদের। তুমি তোমার জাতির কাছে এসেছ এক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নিয়ে। সে জিনিস দিয়ে তুমি তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছ, তাদের জীবনধারাকে উপহাস করছ, বলছ তাদের পূর্ব-পুরুষ সব অবিশ্বাসী। আমার কথা শোন, আমার কতগুলো প্রস্তাব আছে। এর একটা-না-একটা তোমার কাছে হয়তো গ্রহণযোগ্য হতে পারে।'

রসূল করীম (সা) তাকে প্রস্তাবগুলো দেওয়ার জন্য সম্মতি দিলেন।

উতবা বললেন, 'তুমি যদি টাকা চাও আমরা সবাই আমাদের সম্পত্তি তোমাকে দিয়ে দেবো, তুমি হবে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী মানুষ। তুমি যদি ইযযত চাও, আমরা তোমাকে আমাদের সর্দার বানাবো, কেউ

তোমার কথা ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। তুমি যদি রাজ্য চাও, আমরা তোমাকে রাজা বানাবো। আর যে ভূত তোমার কাঁধে ভর করে তাকে তুমি যদি দূর করতে না পার, তাহলে আমরা ওঝা ডাকব, আমরা সর্বস্ব দিয়ে হলেও তোমাকে সুস্থ করে তুলব, কারণ যার উপর ভূতের আছর হয় সে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ভূত তাকে ছাড়ে না।'

হয়তো এই ভাষায় নয়, কিন্তু কথা ছিল এই ধরনের।

রসূল করীম (সা) ধৈর্য সহকারে শুনে গেলেন। পরে বললেন, 'এখন আপনি আমার কথা শুনুন, ''দয়াময় পরম দয়াবান আল্লাহর নামে, হা-মীম, আমি যা বলছি তা দয়াময়, পরম করুণাময়ের কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা আরবী কুরআনরূপে অবতীর্ণ হয়েছে, এর সমস্ত আয়াত জ্ঞানী মানুষের জন্য বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে, সুসংবাদের মতো সতর্কবাণীর মতো, কিন্তু তাদের অনেকেই মুখ ফিরিয়ে রেখেছে, তারা কিছুই শুনবে না, তারা বলে, 'তুমি যার প্রতি আমাদের আহ্বান করছো তার প্রতি আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত।[১]

রসূল করীম (সা) তারপর আরো আবৃত্তি কার শোনালেন উতবাকে।

উতবা গভীর মনোযোগে শুনে গেলেন, তার দু'হাত পেছন দিকে, সেই তার দেহের ভর। সিজদার জায়গায় এসে রসূল করীম (সা) বক্তব্য শেষ করলেন, সিজদা দিলেন। তারপর বললেন, 'যা শুনবার তা আপনি শুনলেন আবুল ওয়ালিদ। এখন কি করবেন করুন।'

উতবা আপন সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেলেন, সঙ্গীরা দেখলেন, তার মুখভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। তারা আলোচনার ফলাফল জানতে চাইল। তিনি বললেন, তিনি এমন কথা শুনে এসেছেন যা জীবনে কোনদিন শুনেন নি। যা শুনেছেন তা কবিতা নয়, যাদু নয়, মন্ত্র নয়। বললেন, 'আমার কথা শোন, আমি যা করি তাই তোমরা করো। ওর পেছনে তোমরা লেগো না। আল্লাহ্র কসম, যে কথা আমি শুনে এলাম তা জ্বলবে

১. কুরআন ৪১ : ১।

চতুর্দিকে। যদি অন্য আরবরা তাকে হত্যা করে, তারা তোমাদেরও ছাড়বে না। ও যদি আরবদের ভাল করতে পারে, ওর আধিপত্য হবে তোমাদের সার্বভৌমত্ব, তার ক্ষমতা হবে তোমাদের ক্ষমতা, ওকে দিয়ে তোমরা সমৃদ্ধ হবে, সুখের মুখ দেখবে।'

ওরা বলল, 'কথা দিয়ে ও আপনাকে যাদু করে ফেলেছে।'

তিনি বললেন, 'আমার কথা তোমরা শুনলে। এখন তোমরা যা ভালো মনে করো, করো।'

রসূল করীম (সা) এবং কুরায়শ নেতাদের মধ্যে আপোস-আলোচনা এবং গুহা সম্পর্কিত সূরার শানে নযুল

মক্কায় কুরায়শ বংশের বিভিন্ন গোত্রের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ইসলাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল, যদিও কুরায়শরা মুসলমানদের সাধ্যমতো নিপীড়ন করেই চলছিল। সাঈদ ইবনে জুবায়র এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের একজন মুক্ত দাসের বরাত দিয়ে একজন হাদীসবেত্তা আমাকে বলেছেন যে, কুরায়শ বংশের সমস্ত গোত্রের নেতৃস্থানীয় সকলেই সূর্যাস্তের পর কা'বা-র বাইরে জমায়েত হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল উতবা ইবনে রাবি'আ, তাঁর ভাই শায়বা, আবু সুফিয়ান ইবনে হার্‌ব আন-নাদর ইবনে আল-হারিস, বানু আবদুদ্ দারের ভাই, আবুল বখতারি ইবনে হিশাম, আল-আসওয়াদ ইবনে আল-মুত্তালিব ইবনে আসাদ, জামা'আ ইবনে আল-আসওয়াদ, আল-ওয়ালিদ ইবনে আল-মুগিরা, আবু জেহেল ইবনে হিশাম, আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া, আল-আস ইবনে ওয়াইল, নুবাই ও মুনাব্বিহ ইবনে আল-হাজ্জাজ—এরা উভয়েই সাহম গোত্রের এবং উমাইয়া ইবনে খালাফ এবং সম্ভবত আরো অনেকে। তারা স্থির করল, মুহাম্মদকে তারা ডেকে পাঠাবে, তার সঙ্গে কথা বলে সমস্ত বিষয় ফয়সালা করবে, যাতে ভবিষ্যতে তার কিছু হলে সে তাদের কোন দোষ দিতে না পারে। সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন নবী

করীম (সা)। কারণ তিনি ভেবেছিলেন, তার নসিহতে কাজ হয়েছে। তাদের সকলের ভালমন্দের জন্য তিনি চিন্তা করতেন, তাদের দুষ্ট জীবনধারা পীড়া দিত তাঁকে। তিনি এলেন, আসন গ্রহণ করলেন। তারা বলল, তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য তাঁকে ডাকা হয়েছে। মুহাম্মদ তাঁর গোত্রের সঙ্গে যে ব্যবহার করছে, এমন ব্যবহার তাদের সঙ্গে কেউ করে নি এর আগে। ওরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোর কথা আবার বলল। সে পুরনো অভি-যোগ, ইতিপূর্বে বহুবার যা আনা হয়েছে। যদি তিনি টাকা চান তারা তাঁকে সবচেয়ে বিত্তশালী লোক বানিয়ে দেবে। ইযযত চান যদি তিনি, তাঁকে তারা তাদের রাজপুত্র বানাবে। যদি সার্বভৌমত্ব চান তিনি, তাঁকে রাজা বানাবেন। তাঁকে যদি ভূতে আছর করে থাকে, যে ভাবে হোক ঔষধ দিয়ে তাকে ভাল করা হবে।

রসূলে করীম (সা) জবাব দিলেন যে, তার এরকম কোন অভিলাষ নেই। তিনি দৌলত চান না, ইযযত চান না, তিনি সাম্রাজ্যের ভিখারি নন। আল্লাহ্ তাঁকে পাঠিয়েছেন একজন পয়গম্বর হিসেবে, তাঁর কাছে নাযিল করেছেন এক ধর্মগ্রন্থ, তাঁকে আদেশ দিয়েছেন একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীর ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য। তিনি তাদের কাছে তাঁর প্রভুর বাণী নিয়ে এসেছেন, তাদের ভাল উপদেশ দিয়েছেন। তারা যদি সে উপদেশ শুনে তাহলে তারা ইহকাল ও পরকালে শান্তি পাবে। আর তারা যদি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তিনি ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করবেন, আল্লাহ তাঁর সমস্যা সমাধান করে দেবেন। নবী করীম (সা) বস্তুত যা বলছিলেন, এই হলো তার সারমর্ম।

তারা বলল, 'দেখো মুহাম্মদ, তুমি যদি আমাদের একটি প্রস্তাবও গ্রহণ না করো, ঠিক আছে, তাহলে যা চাই তা তুমি আমাদের দাও। তুমি তো জানো, আমাদের যত পানি আর জমির অভাব, এমন আর কারো নেই। আমাদের মতো এমন দুঃখ-কষ্টের জীবন আর কারো নেই। তাহলে তুমি যে বলছো তোমার প্রভু তোমাকে পাঠিয়েছেন, তোমার সেই প্রভুকে তুমি

বলো, যে সব পাহাড় আমাদের বন্দী করে রেখেছে তা সরিয়ে নিতে। আমাদের দেশকে সমতল করে দিতে বলো তোমার প্রভুকে। সিরিয়া ও ইরাকে যেমন নদী আছে, তেমনি নদী আমাদের দিতে বলো তাঁকে। তাঁকে তুমি বলো, আমাদের সমস্ত পূর্ব পুরুষকে পুনরুজ্জীবিত করে দিতে। পুনরুজ্জীবিতের মধ্যে যেন কুসাই ইবনে কিলাব থাকে, কারণ তিনি একজন প্রকৃত শেখ ছিলেন। তাহলে আমরা তাদের জিজ্ঞেস করতে পারবো, তুমি যা বলে বেড়াচ্ছ তা সত্য কি মিথ্যা। তাঁরা যদি বলেন, তুমি যা বলছো তা সব সত্য, যদি আমরা যা যা চাইলাম সব তুমি আমাদের দিতে পারো, তাহলে তোমার কথা বিশ্বাস করব, আমরা জানতে পারবো আল্লাহ্‌র সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি, জানতে পারবো, তোমার কথামতো প্রকৃতই তিনি তোমাকে রসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছেন।'

নবী করীম (সা) বললেন যে তাঁকে ওই রকম কোন উদ্দেশ্য নিয়ে পাঠানো হয় নি। তিনি তাদের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী পেঁৗছে দিয়েছেন। এখন ইচ্ছা করলে তারা তা গ্রহণ করে এর সুফল ভোগ করতে পারে। অথবা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্‌র বিচারের প্রতীক্ষায় থাকতে পারে। তারা বলল, তারা যা চেয়েছে তা যদি তিনি করতে না পারেন তাহলে তিনি নিজের স্বার্থেই একটা কাজ করতে পারেন। তিনি আল্লাহ্‌কে বলুন একজন ফিরিশতা পাঠাতে, ফিরিশতা এসে বলুন তিনি যা বলেছেন তা সত্য এবং তারা যা বলছে তা মিথ্যা। সে ফিরিশতা এসে তাঁকে বাগান, প্রাসাদ ইত্যাদি তৈরী করে দিক, তাঁর অভাব-অনটন মেটানোর জন্য তাঁকে সোনারূপা মণিমুক্তা এনে দিক। তিনিও তো তাদের মতোই রাস্তায় দণ্ডায়মান, তাঁদের মতো তাঁরও জীবিকা উপার্জনের একটি উপায় থাকা দরকার। তা যদি তিনি করতে পারেন তাহলে তারা তাঁর মূল্য এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্বীকার করে নেবে, স্বীকার করে নেবে রসূল বলে তাঁর দাবি সত্য।

তিনি বললেন, এর কোনটাই তিনি করতে পারবেন না, কোন বস্তু তিনি আল্লাহ্‌র কাছে চাইতে পারবেন না, কারণ এর জন্য তাঁকে প্রেরণ করা হয় নি। তিনি আগে যা বলেছিলেন, তার পুনরাবৃত্তি করলেন।

তারা বলল, 'তাহলে আসমানগুলো টুকরো টুকরো হয়ে আমাদের উপর ভেঙ্গেই পড়ুক সে ব্যবস্থাই করো। কারণ তুমি তো বেশ জোর দিয়ে বলছো তোমার প্রভু যা ইচ্ছে করেন তাই করতে পারেন। তা না করা পর্যন্ত তোমার কোন কথা আমরা বিশ্বাস করব না।'

নবী করীম (সা) বললেন, এটা হলো আল্লাহ্‌র ব্যাপার। তিনি তাদের সঙ্গে তেমন ব্যবহার করতে চাইলে করবেন।

তারা বলল, 'তোমার প্রভু কি জানতেন না যে আমরা তোমার সঙ্গে বসব, তোমাকে এইসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব? তিনি তোমার কাছে এসে কিভাবে তুমি আমাদের প্রশ্নের জবাব দেবে তা শিখিয়ে দিতে পারেন নি, আমরা তোমার বার্তা গ্রহণ না করলে তিনি আমাদের কি করবেন, তোমাকে তা বলতে পারলেন না? আমাদের কাছে খবর এসেছে ওই বেটা ইয়ামামা, যাকে আর-রহমানও ডাকে কেউ কেউ, তোমাকে সব কিছু শিখিয়ে দেয়। আল্লাহ্‌র কসম, ওই রহমানের উপর আমরা কিছুতেই ঈমান আনব না। আমাদের বিবেক খুব পরিষ্কার। আল্লাহ্‌র কসম, আমরা তোমাকে ছাড়ব না, আমাদের প্রতি যে ব্যবহার করেছ, তা ভুলব না, হয় আমরা তোমাকে শেষ করব আর নয় তুমি আমাদের শেষ করবে।'

কেউ বলল, 'আমরা ফিরিশতাদের পুজা করি। ওরা আল্লাহ্‌র কন্যা।'

অন্যেরা বলল, 'আল্লাহ্ আর তোমার ফিরিশতাদের এনে আমাদের কাছে জামিন রাখ, তাহলে তোমার কথা বিশ্বাস করব, তার আগে নয়।'

এ কথার পর রসূল করীম (সা) ওখান থেকে উঠে চলে গেলেন। তাঁর উঠার সঙ্গে সঙ্গে উঠল আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু উমাইয়া ইবনে আল-মুগিরা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর ইবনে মাখজাম (ইনি তার চাচী আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের ছেলে) বলল, 'শোন মুহাম্মদ, তোমার জ্ঞাতিগোষ্ঠী তোমার কাছে কতগুলো প্রস্তাব দিল, তুমি তার একটাও রাখলে না। প্রথমে তারা নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে কিছু জিনিস

জানতে চাইল। তোমার দাবি অনুযায়ী আল্লাহ্‌র সাথে তোমার সম্পর্কটা জানা ছিল যাদের উদ্দেশ্য। ওটা জানতে পারলে তোমার কথার উপর তাদের ঈমান আনা সহজ হতো। তুমি কিছুই করলে না। তারপর তারা প্রস্তাব দিল, তোমার নিজের স্বার্থের অনুকূলে কয়েকটি কাজ করার জন্য, তাতে করে তারা বুঝতে পারত তুমি তাদের চেয়ে বড়। আল্লাহ্‌র সঙ্গে তোমার সম্পর্কটাও তাদের কাছে পরিষ্কার হতো। সেটাও তুমি করো নি। তারপর তারা তাদের উপর কতগুলো শাস্তি আরোপ করার জন্য অনুরোধ জানাল, যে শাস্তির ভয় তুমি তাদের দেখাচ্ছো। তা-ও তুমি করো নি।' হুবহু এই সংলাপ নয়, তার বক্তব্য ছিল এ-ই। তিনি আরো বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, তুমি যদি আসমানে একটা মই লাগাও, তা বেয়ে উঠো, আমি নিজের চোখে দেখি, যতক্ষণ না তোমার ফিরিশতারা তোমার সঙ্গে এসে সাক্ষ্য দেয় তুমি যা বলছো তা সব সত্য, ততক্ষণ আমি তোমার কথা বিশ্বাস করব না। আল্লাহ্‌র কসম, যা যা বললাম, তা যদি করও তাহলেও তোমার কথা বিশ্বাস করা আমার উচিত হবে বলে মনে হয় না।'

কথাগুলো বলেই আবদুল্লাহ্ চলে গেল।

রসূল করীম (সা)-ও ফিরলেন আপন ঘরে, বিষণ্ণ, আহত। আশা করে দৌড়ে গিয়েছিলেন, তারা তাঁর নসিহতে তাঁর ধর্ম গ্রহণ করবে। গিয়ে দেখলেন সে আশা বৃথা। দেখলেন, তারা তাঁর প্রতি বৈরী।

রসূল করীম (সা) চলে গেলে পরে প্রথমে কথা বলল আবু জেহেল। তার বিরুদ্ধে সেই পুরানো অভিযোগগুলো উচ্চারণ করল। বলল, 'আল্লাহ্‌কে সাক্ষী মেনে আমি বলছি, কালকে আমি তার জন্য পথ চেয়ে থাকব, আমার হাতে থাকবে বিরাট এক পাথর, পাথরটাকে সর্বশক্তি দিয়ে কোনমতে তুলে রাখব। ও যখন নামাযে সিজদা দেবে, আমি ওই পাথর মেরে ওর মাথার খুলি গুড়ো করে ফেলব। আমাকে তোমরা রাখো আর মারো যাই করো, এরপর বানু আবদু মানাফ করুক আমাকে যা করতে পারে।' এই ছিল আবু জেহেলের বক্তব্য।

সবাই বলল, কেউ তাকে মারবে না, কেউ বেঈমানী করবে না যে যা করবে বলেছে তা করতে পারে।

পরদিন ভোর হলো। পাথর নিয়ে আবু জেহেল বসে আছে নবী করীমের আসার পথে, তাঁর প্রতীক্ষায়। প্রতিদিনের মতো সেই সকালেও নবী করীম (সা) নামাযে গেলেন।' মক্কায় অবস্থানকালে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। নামায পড়তেন দক্ষিণ কোণ ও জেরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে। তাতে করে কা'বা থাকতো তাঁর এবং সিরিয়ার মাঝখানে। নামায পড়বার জন্য উঠে দাঁড়ালেন নবী করীম (সা)। কুরায়শরা তখন বসে আছে আবু জেহেল কি করে দেখবে বলে। সিজদায় গেলেন রসূল করীম (সা)। পাথর উঠাল আবু জেহেল, এগিয়ে গেল তাঁর দিকে। তাঁর কাছে এসে গেল এবং ঠিক তক্ষুনি হঠাৎ পেছন ফিরে পালিয়ে এল সে, ভয়ে রক্তহীন মুখ পাথরের সঙ্গে লেগে শুকিয়ে গেছে তার হাত, পাথর ছিটকে পড়ে গেছে তার হাত থেকে।

কুরায়শরা জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে। সে জবাব দিল যে তার কাছে যেতেই একটা মর্দা উট তার পথ রুখে দাঁড়াল। বলল, 'ইয়া আল্লাহ্, উটের এমন মাথা, এমন কাঁধ, এমন দাঁত আমি আর দেখি নি, আর এমন ভাব করল, মনে হলো আমাকে খেয়ে ফেলবে।'

আমাকে একজন বলেছে যে রসূল করীম (সা) বলেছিলেন, 'উনি ছিলেন জিবরাঈল (আ)। ও কাছে এলেই তাকে তিনি ধরতেন।'

আবু জেহেলের কথা শুনে উঠে দাঁড়াল আন-নজর ইবনে আল-হারিস ইবনে কালাদা ইবনে আল-কামা ইবনে আবদু মানাফ ইবনে আবদুদ দার ইবনে কুসাই, বলল; 'হে কুরায়শগণ, তোমাদের সামনে এখন যে সমস্যা তার সমাধান তোমরা জানো না। মুহাম্মদ যখন যুবক ছিল, তোমরা সবাই তাকে ভালবাসতে। তোমাদের মধ্যে সে ছিল সবচেয়ে সত্যবাদী, সবচেয়ে বিশ্বাস-যোগ্য। তারপর যখন তোমরা দেখলে ওর মাথার চুলে পাক ধরল, সে

তোমাদের কাছে এক বার্তা নিয়ে এল, তখন তোমরা বললে—ও একজন যাদুকর। কিন্তু যাদুকর সে নয়। কারণ যাদুকর কি জিনিস আমরা তা জানি, আমরা তাদের থুতু, গেরো সব দেখেছি। তোমরা বললে, সে একজন স্বগীয় লোক, কিন্তু আমরা সেরকম লোকও দেখেছি এর আগে, তাদের ব্যবহার আচার-আচরণ দেখেছি, শুনেছি তাদের ছন্দমিলের কবিতা। তোমরা বললে—ও একজন কবি। কিন্তু ও তো কবি নয় মোটেই, কারণ আমরা সব জাতের কবিতা আগে শুনেছি। তোমরা বললে, ওকে ভূতে ধরেছে। কিন্তু ও তো ভূতে-ধরা মানুষের মতো বড়ো বড়ো দম নেয় না, ফিস ফিস করে কথা বলে না, আবোল-তাবোল বলে না। কুরায়শ বংশের সবাইকে বলছি, তোমাদের বিষয় তোমরা বুঝে নাও, কারণ আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের উপর সমূহ বিপদ নাযিল হয়েছে।'

এই আন-নাদর ইবনে আল-হারিস ছিল কুরায়শদের মধ্যে শয়তান বিশেষ। ও রসূল করীমকে সুযোগ পেলেই অপমান করত, তার সঙ্গে প্রকাশ্যে শত্রুভাব পোষণ করত। সে আল-হিরায় গিয়েছিল, ওখান থেকে পারস্যের রাজা-রাজড়ার গল্প, রুস্তম-ইসবান্দিয়ারের গল্প শুনে এসেছে। তারপর রসূল করীম (সা) যখন একটা সভা ডেকে সবাইকে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, আল্লাহ্‌র প্রতিশোধ গ্রহণের ফলে অতীতে কোন জনগোষ্ঠীর কি হয়েছিল তা বলে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তখন বক্তব্য শেষ করে রসূল করীম (সা) উপবেশন করার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল আন-নাদর। বলল, 'ওর চেয়ে অনেক ভাল গল্প আমি বলতে পারব, তোমরা আমার কাছে এসো।' তারপর আন-নাদর পারস্যের রাজার গল্প, রুস্তমের আর ইসবানদিয়ারের গল্প বলা শুরু করল। গল্প শেষ করে সে বলল, 'কোন দিক দিয়ে মুহম্মদ আমার চেয়ে ভাল গল্প বলিয়ে, তোমরা বলো?'

ইবনে আব্বাস, আমার জানামতে বলতেন, এই লোককে কেন্দ্র করে কুরআন শরীফের আটটি আয়াত নাযিল হয়েছিল। 'তার কাছে আমার আয়াত আবৃত্তি করা হলে সে বলে, 'এগুলো তো সেকালের উপকথা মাত্র।'[১]

১. কুরআন ৬৮ঃ১৫।

কুরআন শরীফে এইরূপ আরো উপকথা সম্পর্কিত আয়াত আছে। সবগুলো এর বেলায় প্রযোজ্য।

আন নাদরের এসব কথা শুনে তারা তাকে এবং উকবা ইবনে আবু মুআয়তকে মদীনার য়াহুদী রাব্বিদের কাছে পাঠাল। বলল, 'যাও তাদের কাছে মুহাম্মদের কথা জিজ্ঞেস করে এসো, তার বর্ণনা তাদের কাছে দিয়ো, সে যা যা বলে তার বিবরণ দিয়ো। তারা সব জানে, কারণ তারাই ঐশী গ্রন্থের প্রথম সম্প্রদায়, নবীদের সম্পদে তাদের যে জ্ঞান আছে তা আমাদের নেই।'

তারা তাদের কথামতো রাব্বিদের কাছে গেল; বলল, 'আপনারা তাওরাতের লোক, আমরা আপনাদের কাছে এসেছি, আপনারা আমাদের বলে দেবেন কেমন করে আমরা আমাদের গোত্রের এই লোককে গ্রহণ করব।'

রাব্বিরা বললেন, 'আমরা তিনটি জিনিসের কথা বলব, সেগুলো আপনারা তাকে জিজ্ঞেস করবেন। তিনি যদি সঠিক জবাব দিতে পারেন, জানবেন তিনি একজন খাঁটি নবী। আর যদি যথার্থ জবাব দিতে না পারেন, জানবেন এই লোক এক প্রতারক, তখন তাকে নিয়ে যা খুশী আপনারা করতে পারেন। তাকে জিজ্ঞেস করবেন, প্রাচীনকালে কয়েক জন যুবক অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, তাদের আসলে কি হয়েছিল। এ বিষয়ে খুব সুন্দর একটা গল্প আছে জানবেন। এক শক্তিশালী দিগ্বিজয়ী ছিলেন—যিনি পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত সীমায় পৌঁছেছিলেন—তার কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন। তাকে জিজ্ঞেস করবেন আত্মা কি। যদি তিনি জবাব দিতে পারেন, তাঁকে অনুসরণ করবেন। কারণ তাহলে বুঝতে হবে তিনি একজন পয়গম্বর। জবাব দিতে না পারলে জানবেন সে লোক এক প্রতারক, অতএব তাকে আপনারা কি করবেন, আপনারাই ভাল জানেন।'

লোক দুজন ফিরে এল মক্কায়। কুরায়শদের বলল, মুহাম্মদকে ঠিক করার কায়দা তারা জেনে এসেছে। তিনটি প্রশ্নের কথা তারা বলল।

তারা মুহাম্মদের কাছে এল, তিন প্রশ্নের উত্তর দিতে বলল তাঁকে। তিনি তাদের বললেন, 'আপনাদের প্রশ্নের উত্তর কালকে আমি দেবো।' কিন্তু তিনি 'ইনশাল্লাহ্' শব্দটি বলেন নি। ওরা চলে গেল।

লোকশ্রুতি অনুযায়ী পনেরো দিন অতিক্রান্ত হলো, এ বিষয়ে কোন ওহী এলো না, জিবরাঈল (আ)-ও এলেন না। মক্কার লোক তখন দুষ্ট প্রচারণায় মেতে উঠল। তারা বলতে লাগল, 'মুহাম্মদ বলেছিল পরদিনই জবাব দেবে, কিন্তু আজকে পনেরো দিন, আমরা কোন জবাব পেলাম না।'

এতে ভীষণ ব্যথিত হলেন নবী করীম (সা)।

তারপর একদিন জিবরাঈল (আ) এলেন, নাযিল করেন সূরা কাহ্ফ (গুহা)। ওখানে তাঁর বিষণ্ণতার জন্য তাঁকে কিছু কটুকথা শোনানো হলো। তাঁকে যুবক, শক্তিমন্ত দিগ্বিজয়ী আর আত্মার সম্পর্কে প্রশ্ন তিনটির জবাব দেওয়া হলো।

আমি শুনেছি, জিবরাঈল (আ) এলে পরে রসূল করীম (সা), তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনি আমার কাছে আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম।' জিবরাঈল (আ) উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমরা কেবল আল্লাহ্র নির্দেশে অবতীর্ণ হই। আমাদের সামনে, পেছনে এবং তাদের মধ্যখানে কি আছে তার মালিক তিনি এবং আপনার প্রভু বিস্মৃত হন না।'[১]

সেই সূরা তিনি শুরু করেন আল্লাহ্র নিজস্ব প্রশংসা দিয়ে। তাতে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়ত ও প্রেরণ এবং আরবের লোকজনের সে সত্য গ্রহণে বিপত্তির কথা বলা আছে। আল্লাহ্ বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি তার সেবকের কাছে গ্রন্থ নাযিল করলেন।[২] তাঁর সেবক বলতে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বুঝানো হয়েছে।

---

১. কুরআন ১৯ঃ ৬৫।

২. সূরা ১৮।

তিনি ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছ থেকে একজন প্রেরিত পুরুষ।' এখানে তারা তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে যা জানতে চেয়েছিল তা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে।' এর মধ্যে তিনি (আল্লাহ্) রুঢ়তা দেন নি, সেটাকে সরল করে দিয়েছেন।' তার অর্থ, সব সমান করে দিয়েছেন, কোথাও কোন পার্থক্য রাখেন নি। 'তাঁর (আল্লাহ্র) তরফ থেকে এক কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য' মানে হলো এই পৃথিবীতেই তার অত্যাসন্ন রায়ের পরিণাম পেতে হবে। 'এবং পরকালের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি' হলো সেই আপনার প্রভুর কাছ থেকেই প্রাপ্য, যিনি আপনাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন। 'যারা বিশ্বাস করে, সৎকর্ম করে, তাদের জন্য যে চিরস্থায়ী উত্তম পুরস্কারের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে সেই চিরস্থায়ী আস্তানা। 'ওখানে তারা আর মৃত্যু বরণ করবে না' –তারা মানে যারা আপনার বার্তাকে সত্য বলে গ্রহণ করেছে অন্যান্যদের বর্জন করা সত্ত্বেও, এবং আপনি যে যে কাজ করতে বলেছেন তা করছে। 'এবং তাদের সতর্ক করে দেওয়ার জন্য যারা বলে যে আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' কুরায়শরা বলত, 'আমরা আল্লাহ্র কন্যা দেবদূতদের পূজা করি।' এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে। 'তাদের কিংবা তাদের পূর্বপুরুষদের এ বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই'—তারা মানে যারা তুমি তাদের ত্যাগ করেছ আর তাদের ধর্মবোধকে অপমান করেছ বলে ব্যথিত হয়েছে। 'তাদের মুখ নিঃসৃত বাক্য কি ভয়ানক' বাক্য মানে যখন তারা বলে দেবদূতরা আল্লাহ্র কন্যা। 'তারা মিথ্যা বৈ আর কিছু বলছে না এবং তোমার হাতেই তাদের ধ্বংস সাধন হতে পারে' হে মুহাম্মদ! 'তারা এই বাণী বিশ্বাস না করলে তুমি ব্যথা পাবে–' তাদের প্রতি রসূল করীম (সা) যে আশা করেছিলেন, সেই আশা ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে উদগত ব্যথার কথা বলা হয়েছে এখানে। 'পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে, আমি তাদের এর শোভা করেছি, মানুষকে এই পরীক্ষা করবার জন্য যে, এদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ কে।' অর্থাৎ কারা আমার (আল্লাহ্র) নির্দেশ মেনে চলবে এবং আমাকে মান্য করবে।' এবং নিশ্চয়ই আমরা তার উপর যা কিছু আছে তা উদ্ভিদশূন্য

মৃত্তিকায় পরিবর্তন করব'—অর্থ হলো, পৃথিবীতে এবং তার উপরে যা আছে সব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং প্রত্যেককে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে, আমি, তাদের কাজ অনুযায়ী পুরস্কার দেবো। সুতরাং হতাশ হয়ো না, যা তুমি শুনছ, যা তুমি দেখছ, তাতে দুঃখ পেয়ো না।

এরপর এলো গল্পের কথা। তারা রসূলকে কিছু যুবকের কথা জিজ্ঞেস করেছিল। আল্লাহ্ বলেন: 'তুমি কি মনে করো যে গুহা ও রকিমের অধিবাসীরা আমার অন্যতম বিস্ময়কর নিদর্শন।' অর্থাৎ মানুষের কাছে আমি যে সব নিদর্শন পাঠিয়েছি, তাতে আরও বিস্ময়কর বস্তু আছে। তারপর আল্লাহ্ বলেন, 'যুবকেরা গুহায় আশ্রয় নেওয়ার পর বলল, "হে আমাদের প্রতিপালক. তুমি নিজে থেকে আমাদের অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদের কাজে-কর্মে আমাদের পরিচালিত কর।' অতঃপর আমি তাদের গুহায় কয়েক বৎসর ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছিলাম। পরে আমি তাদের জাগ্রত করলাম এই কথা জানবার জন্য যে দুই দলের মধ্যে কোনটি তাদের অবস্থানকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।' তারপর তিনি (আল্লাহ্) বলেন, 'আমি তোমার কাছে তার যথার্থ বর্ণনা দিচ্ছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, আমি তাদের সৎপথে চলার তওফিক বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম। আমি তাদের মনের জোর বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তারা তখন উঠে দাঁড়াল, বলল, 'আমাদের প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক। আমরা কখনো তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যের পূজা করব না, যদি করি তবে তা অত্যন্ত ঈশ্বর বিগর্হিত কাজ হবে। তার মানে তারা আমার সঙ্গে অন্য কোন কিছুর শরীক করে নি, যেমন করে তোমরা না জেনে শুনে করেছ। আমাদের এই স্বজাতিগণ তাঁর (আল্লাহ্র) পরিবর্তে অনেক উপাস্য (ইলাহ্) গ্রহণ করেছে, যদিও এই-সব ইলাহ সম্বন্ধে তারা কোন স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করতে পারে না। তাহলে যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তার চেয়ে অধিক

সীমালঙ্ঘনকারী আর কে হতে পারে ? তোমরা যখন ওদের থেকে আলাদা হয়ে গেলে, ওরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করবেন। তোমরা দেখে থাকবে, সূর্য উদয়-কালে সূর্য তাদের গুহার দক্ষিণ দিকে হেলে থাকে এবং অস্তকালে তাদের গুহা অতিক্রম করে বাম দিক দিয়ে। আর তারা থাকে গুহার প্রশস্ত চত্বরে।' 'এ হলো আল্লাহ্‌র বহু নিদর্শনের অন্যতম — অর্থাৎ সেই গ্রন্থের লোক যারা তাদের কাহিনী জানে, যারা তাদের ইতিহাসের বিবরণ প্রদানের মাধ্যমে তোমার নবুয়তের সত্যতা যাচাই করার জন্য ওই লোকগুলোকে তোমাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে বলল, তাদের জন্য এই প্রমাণ হাযির করা হলো। আল্লাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন তিনিই সৎপথপ্রাপ্ত, আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার অন্য কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক থাকে না। এবং তোমার মনে হবে তারা ছিল জাগ্রত কিন্তু আসলে ছিল নিদ্রিত। আমি ওদের পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডানে কিংবা বামে এবং ওদের কুকুর ছিল গুহাদ্বারে সম্মুখের দুই পা প্রসারিত করে। তুমি যদি ভাল করে ওদের পর্যবেক্ষণ করতে তাহলে পেছন ফিরে পলায়ন করতে এবং তাদের ভয়ে আতঙ্কিত হতে, এখান থেকে 'যারা নিজেদের মধ্যে তর্ক করছিল, তারা বলল' এই পর্যন্ত ভাষ্যের উদ্দেশ্য ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সম্পন্ন ওই সব মানুষদের পরিচিত করানো। 'তারা বলতে লাগলো—চলো আমরা এক সৌধ নির্মাণ করি'— আমরা মানে য়াহুদী রাব্বিবৃন্দ, যারা এইসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার পরামর্শ দিয়েছিল। তারা ছিল তিনজন, তাদের কুকুরটি ছিল চতুর্থ জন। আবার কেউ কেউ বলে, তারা ছিল পাঁচজন এবং ষষ্ঠজন ছিল তাদের কুকুরটি। সবাই ওরা বলল অনুমানের উপর নির্ভর করে।' তার অর্থ বিষয়টি সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। আবার তারা বলে সাতজন, তাদের কুকুর ছিল অষ্টম জন। বলুন, আমার প্রতিপালকই তাদের সংখ্যা ভাল জানেন। তাদের প্রকৃত সংখ্যা কেবল কতিপয় লোক জানে, সুতরাং সাধারণ আলোচনা ব্যতীত

এ দিয়ে তাদের সঙ্গে এক করতে যেয়ো না, অর্থাৎ তাদের কাছে অহংকার প্রকাশ করবে না।' এবং এদের কাউকে ওইসব বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করো না।' কারণ ওদের কারো এসব বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই। এবং কখনো কোন বিষয়ে 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে' এই কথা না বলে 'আমি আগামী কাল এটা করব' একথা বলবে না। যদি ভুলে যাও তবে তোমার প্রভুকে স্মরণ করবে, বলবে 'সম্ভবত আমার প্রভু আমাকে গুহাবাসীদের বিবরণ জানার চেয়েও বড় সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করবেন।' এর অর্থ হলো, ওদের কথার জবাবে বেফাঁস কোন কথা বলবে না। যদি বলো, কালকে এর উত্তর দেবো, তাহলে তার সঙ্গে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার শর্ত যোগ করবে, আর যদি তাকে ভুলে যাও তাহলে তাঁর কথা সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করবে এবং বলবে তারা আমাকে যে কথা জিজ্ঞেস করছে আল্লাহ্ হয়তো তার চেয়েও ভালো অনেক তথ্য আমাকে জানাবেন আমাকে সুপরিচালিত করার জন্য, কারণ তোমরা তো জানো না, আমি এ নিয়ে কি করছি এখন। 'এবং তারা গুহার মধ্যে ছিল তিন শত বছর এবং আরো নয় বছর।' অর্থাৎ একথা তারা বলবে। 'তুমি বল, 'তারা কতো দিন ছিল তা আল্লাহ্ ভাল জানেন। আকাশ ও পৃথিবীর অজ্ঞাত রহস্য তাঁর জানা। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা। তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক নেই এবং তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বের অংশীদার করেন না।' অর্থাৎ, তারা যে সব বিষয় জানতে চাচ্ছে তার কোনটাই তার অজানা নেই।

শক্তিশালী দিগিবজয়ী সম্বন্ধে যা তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন, 'এবং তারা তোমাকে জুল-কারনায়ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। তুমি বল, আমি তার বিষয় তোমাদের কাছে বর্ণনা করব।' আমি পৃথিবীতে তাকে ক্ষমতা দিয়েছিলাম এবং সমস্ত বিষয়ের উপর ও পন্থা নির্দেশ করে দিয়েছিলাম। সে সেই পথ অবলম্বন করেছিল।' গল্প প্রসঙ্গ এখানেই সমাপ্ত।

বলা হয়, তিনি যে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, মরলোকের আর কেউ তা করতে পারে নি। সমস্ত পথ ছিল তার সামনে প্রসারিত, তিনি পূর্বে পশ্চিমে সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করলেন। পৃথিবীর যে দেশেই তিনি পা

রেখেছেন সে দেশেরই কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তারপর এমনি করে সৃষ্টিজগতের শেষ সীমায় তিনি পেঁছেছিলেন।

বিদেশীদের সামনে পারসীয়দের গল্প বলত এক লোক। সে গল্প লোক-মুখে ছড়িয়ে পড়তো সবখানে। সে লোক আমাকে বলেছিল যে জুল কার-নায়ন ছিলেন একজন মিসরীয়। তার প্রকৃত নাম ছিল মাজর্বান ইবনে মারজাবা। মারজাবা গ্রীক ছিলেন। তার পূর্ব পুরুষ ছিল ইউনান ইবনে ইয়াফিছ ইবনে নুহ।

খালিদ ইবনে মাদান আল কালাই-য়ের সূত্রে সাউর ইবনে ইয়াযিদ আমাকে বলেছেন যে রসূল করীমকে জুলকারনায়ন সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'তিনি ছিলেন এক ফিরিশতা, দড়ি দিয়ে সমস্ত পৃথিবী জরীপ করেছিলেন।' এই সাউর ইসলামী যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

খালিদ বলেছেন, উমর একজন লোককে অন্য কাকে যেন জুলকার-নায়ন বলে সম্বোধন করতে শুনেছিলেন, এবং তখন রসূল করীম বলে-ছিলেন, "আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন, তোমরা ফিরিশতার নামে ছেলে-মেয়েদের নাম রাখছ কেন, নবীদের নামে নাম রেখে আর বুঝি সুখ পাচ্ছ না ?"

নবী করীম একথা সত্যি সত্যি বলেছিলেন কিনা তা একমাত্র আল্লাহ্ বলতে পারবেন। যদি বলে থাকেন, তাহলে যথার্থই বলেছিলেন।

আত্মা সম্বন্ধে তারা যে প্রশ্ন করেছিল সে বিষয়ে আল্লাহ্ বলেছেন, 'তারা আপনাকে আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছে। আপনি বলুন, আত্মা আমার প্রভুর আদেশ থেকে উদ্ভূত আর এ বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান খুব অল্প।'[১]

ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে আমাকে কে একজন বলেছে যে, তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেছেন যে, রসূল করীম মদীনা এলে পরে য়াহূদী

১. কুরআন ১৭ : ৮৫।

রাব্বিরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এই যে আপনি বললেন, এ বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান খুব অল্প, এতে কি আমাদের কথা বলেছেন, নাকি আপনার গোত্রের লোকদের কথা বলেছেন?' তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'আপনাদের উভয়ের কথা, তাঁরা বললেন, 'তথাপি আপনি যে গ্রন্থ আনয়ন করেছেন, তাতে আপনি পাঠ করবেন যে, আমাদের তওরাত গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল এবং সে গ্রন্থে সব রহস্যের সন্ধান আছে।' তিনি জবাব দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্‌র জ্ঞানের তুলনায় তা কিছুই না। অবশ্য যা ছিল তা মানলে তা-ই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। তারা যা জিজ্ঞেস করেছিলেন। সে সম্পর্কে আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করেছেন। বলেছেন, 'যদি পৃথিবীর সমস্ত গাছ কলম হয়, সমুদ্র হয় কালি, আর সেই সমুদ্রে সপ্ত সমুদ্র যুক্ত হয় তাহলেও আল্লাহ্‌র গুণগান লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শক্তিশালী এবং জ্ঞানী।'[১] তার অর্থ হলো আল্লাহ্‌র জ্ঞানের তুলনায় তওরাত কিছুই না। তার লোকজন নিজেদের স্বার্থে কিছু কিছু জিনিস চেয়েছিল, যেমন পাহাড় সরিয়ে নিতে হবে, মাটি সমান করে নিতে হবে, তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। সে বিষয়েও আল্লাহ্ ওহী নাযিল করেছেন। বলেছেন, 'যদি এমন কোন কুরআন থাকত যা দিয়ে পাহাড় সরানো যায়, মাটি সমান করা যায়, মৃতকে দিয়ে কথা বলানো যায়, তাহলে সে হতো এই কুরআনই, কিন্তু সব জিনিসের অবস্থানের মালিক আল্লাহ্।' এর অর্থ হলো, যা তোমরা করতে বলছ তা আমি যখন ইচ্ছা করতে পারি, কিন্তু এখন আমি করব না।, তারা বলেছিল, "তোমার জন্য নাও।" অর্থাৎ তোমার জন্য বাগান বানাও, প্রাসাদ বানাও, সম্পদ সংগ্রহ কর, আল্লাহ্‌কে বল একজন ফিরিশতা পাঠাতে যে এসে সাক্ষ্য দেবে তুমি যা বলছ তা সত্য এবং দরকার হলে তোমাকে রক্ষা করবে। এ বিষয়েও আল্লাহ্ বাণী পাঠিয়েছেন। বলেছেন, 'এবং তারা বলল, এ কেমন রসূল, খায়-দায়, হাটে-বাজারে যায়। তার কাছে কোন ফিরিশতা প্রেরণ করা হলো

১. কুরআন ৩১ঃ২৭।

না, যে তার সঙ্গে থাকতে পারত সতর্ককারীরূপে। তাকে ধনভাণ্ডার দেওয়া হলো না কেন, কেন একটা বাগান নেই তার, যা থেকে সে আহার করতে পারত?' সীমালংঘনকারীরা আরো বলে, 'তোমরা তো এক যাদু-গ্রস্ত লোকের অনুগামী হচ্ছো। দেখো, ওরা তোমার কেমন উপমা দেয়, ওরা পথভ্রষ্ট, ওরা পথ খুঁজে পাবে না। তিনি কত মহান, তিনি ইচ্ছা করলে এর চেয়েও অনেক উৎকৃষ্ট বস্তু দিতে পারেন—দিতে পারেন উদ্যান যার নিচে দিয়ে প্রবাহিত হবে নহর। দিতে পারেন প্রাসাদ।'[১] অর্থাৎ যাতে রসূলকে বাজারে যেতে না হয় জীবিকা অর্জনের জন্য।

ওদের এইসব কথাবার্তা সম্বন্ধে আল্লাহ্ আরো বলেছেন, 'তোমার আগে আমি যে দূত পাঠিয়েছিলাম, তারাও আহারাদি করত, হাটে-বাজারে যেতো। আমি তোমাদের মধ্যে কোন কোন জনকে অপরের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ তৈরী করে পাঠিয়েছি। তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে কি? তোমার প্রভু সব দেখেন।'[২] অর্থ, তোমার একজনকে অন্যের জনা পরীক্ষা স্বরূপ তৈরী করেছি, যাতে তোমরা দৃঢ় হতে পারো। আমি যদি চাইতাম যে, সমস্ত পৃথিবী আমার রসূলের পক্ষে চলে আসবে, যাতে কেউ তার বিরোধিতা করতে না পারে, আমি তা-ও করতে পারতাম।

আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়ার বক্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন, 'এবং তারা বলেছে, 'তোমাতে আমরা কখনো বিশ্বাস স্থাপন করব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি থেকে এক প্রস্রবণ নির্গত করাও, তোমার খেজুরের বা আঙুরের এক বাগান হবে এবং তার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করবে নদী-নালা, অথবা তোমারই কথা অনুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলবে অথবা আল্লাহ্ ও ফিরিশ্তাদের আমাদের সামনে উপস্থিত করবে, অথবা তোমার একটি স্বর্ণনির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণ আমরা কখনো বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ তুমি আমাদের জন্য এক কিতাব

১. কুরআন ২৫ : ৮।

২. ঐ

অবতীর্ণ না করবে, যা আমরা পাঠ করব।' আপনি বলুন, 'পবিত্র মহান্ আমার প্রভু। আমি তো কেবল একজন মানুষ, একজন রসূল।'[১]

ওরা বলেছিল, 'আল ইয়ামামার রহমান নামে এক লোক তোমাকে এইসব কথাবার্তা শিখিয়ে দেয় বলে আমরা শুনেছি। ওর কথা আমরা কোনদিন বিশ্বাস করব না।' এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন, 'অতীতে যেমন পাঠিয়েছি, তেমনি আমি তোমাকে পাঠিয়েছি এক জাতির প্রতি, যার পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে, পাঠিয়েছিলাম তাদের কাছে সেই কথা বলার জন্য, যে কথা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করছি। তথাপি তারা দয়াময়কে অস্বীকার করে। বলুন, 'তিনিই আমার প্রভু, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি এবং আমার প্রত্যাবর্তন হবে তাঁরই কাছে।[২]

আবু জেহেলের কথা ও বক্তব্য বিষয়ে আল্লাহ্ বলেছেন, 'সে যখন তার দাসকে নামায পড়ার সময় নামায পড়তে নিষেধ করে তখন তাকে দেখেছ ? তুমি কি দেখেছ, ও যথার্থ পরিচালিত হচ্ছিল কিনা, অথবা আল্লাহ্র ভয়ে হুকুম জারী করেছিল কিনা ? সে মিথ্যা বলেছিল কিনা, পশ্চাদ-পসরণ করেছিল কিনা তুমি দেখেছ ? সে কি জানে না যে আল্লাহ্ সব দেখেন ? যা সে করছে তা করা যদি সে বন্ধ না করে, তাহলে আমরা তার কপালের চুল ধরে টেনে আনব, সেই মিথ্যাবাদী পাপাচারী চুলগুলো। ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের ডাকুক না, আমরা ডাকব দোযখের প্রহরীদের। তুমি নিশ্চয়ই তার কথা শুনবে না। তুমি সিজদা কর, তোমার প্রভুর কাছে এস।

তাদের টাকা পয়সা সম্পর্কে রসূলের কাছে তারা যে প্রস্তাব দিয়েছিল যে বিষয়ে আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ করেছেন, 'বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন পুরস্কার চাই না, সে সম্পদ তোমাদের থাক। আমার পুরস্কার কেবল আল্লাহ্র চিন্তা এবং তিনি সমস্ত কিছুই প্রত্যক্ষ করেন।[৩]

---

১. কুরআন ১৭ : ৯০।
২. কুরআন ১৩ : ৩০।
৩. কুরআন ৩৪ : ৪৬।

রসূল করীম (সা) তাদের কাছে সত্য আনয়ন করলেন। সে যে সত্য তা তারা বুঝতে পারল। তারা বুঝল, তিনি একজন প্রেরিত পুরুষ, অনেক অজ্ঞাত সংবাদ তিনি নিয়ে এসেছেন তাদের কথামতো। কিন্তু তখন তাদের হিংসা হলো, ফলে সেই সত্য তারা স্বীকার করল না, তারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে দুর্বিনীত হয়ে গেল, প্রকাশ্যে তার নির্দেশকে তাচ্ছিল্য করতে লাগল, আশ্রয় নিল বহু ঈশ্বরবাদের সীমার ভেতরে।

ওদের একজন বলল, 'ওই সব কুরআনের কথা শুনবে না। ওটাকে বাজে জিনিস বলে ধরে নাও, তাহলেই ওটা বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না।' তার অর্থ, ওটাকে বাজে এবং মিথ্যা বলে ধরে নাও, ধরে নাও ওটা উন্মাদের প্রলাপ—তাহলেই তোমার সুবিধা হবে। আর যদি এ নিয়ে কখনো ওর সঙ্গে এক করো, যুক্তি দেখাও, তাহলে সুবিধা পাবে ও।

রসূল করীম (সা) ও তাঁর বাণীকে উপহাস করতে গিয়ে একদিন আবু জেহেল বলেছিল, 'মুহাম্মদ বলে আল্লাহ্‌র যে সব সৈন্যসামন্ত তোমাদের দোযখে শাস্তি দেবে এবং পৃথিবীতে থাকার সময় বন্দী করে রাখবে, তারা সংখ্যায় মাত্র উনিশ জন। আর তোমরা তো সংখ্যায় অনেক। তোমরা একশ জন তাদের একজনেরর সমান নও, এটা কি করে হয়?' সে প্রসঙ্গে আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ করলেন, 'দোযখের প্রহরী আমরা ফিরিশতাদের বানিয়েছি এবং তাদের সংখ্যা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরীক্ষাস্বরূপ রেখেছি...' এই রুকুর শেষ পর্যন্ত। এই আয়াত নামাযের মধ্যে রসূল করীম (সা) যখন আবৃত্তি করছিলেন তখন ওরা সব পালিয়ে গিয়েছিল। ওরা তা কিছুতেই শুনবে না। নামাযের মধ্যে রসূলের ওই আবৃত্তি কেউ শুনতে চাইলে তা চুরি করে শুনতে হতো কুরায়শদের ভয়ে। আর তবু যদি কেউ টের পেতো যে সে গোপনে শুনেছে এটা তারা জানতে পেরেছে তাহলে সে পালিয়ে যেতো। এবং আর কোনদিন সে শুনতে আসত না। রসূল করীম (সা) যদি স্বর নিচু করে পড়তেন তাহলে গোপন শ্রোতা ভাবতো অন্যরা তো এসব শুনতে পাবে না, অথচ সে দিব্যি শুনতে পাচ্ছে। অবশ্য সমস্ত কান পেতে তাকে শব্দগুলোকে ধরতে হতো।

আমর ইবনে উসমানের মুক্ত দাস দাউদ ইবনে আল-হুসায়ন আমার কাছে বলেছেন যে ইবনে আব্বাসের মুক্ত দাস ইকরিমা তাদের বলেছে যে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস তাদের বলেছেন যে ওই সব লোকদের উদ্দেশ্য করেই প্রত্যাদেশ এসেছিল, "নামাযে উচ্চৈস্বরে সূরা পড়বে না, আবার ফিস-ফিস করেও পড়বে না, মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে।"[১] তিনি বলেছেন, 'নামাযে উচ্চৈস্বরে সূরা পড়বে না', তাহলে তারা চলে যাবে। 'আবার নিঃশব্দেও পড়বে না' কারণ তাহলে যারা শুনতে চায়, গোপনে যারা শুনতে আসে তারা শুনতে পাবে না। শুনতে পেলে হয়তো কোন কোন কথা তাদের মনে ধরবে এবং তাতে লাভবান হবে।

কুরআনের প্রথম উচ্চস্বর পাঠক

ইয়াহ্য়িয়া ইবনে উরওয়া তাঁর পিতার সূত্রে আমাকে বলেছেন যে মক্কায় রসূল করীম (সা)-এর পর আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসূদ উচ্চকণ্ঠে কুরআন শরীফ পড়েন। একদিন রসূল করীম (সা)-এর সাহাবীগণ একত্রিত হয়ে আলোচনা করছিলেন এবং তখনই ধরা পড়ল যে কুরায়শরা উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ এখনো শোনে নি। প্রশ্ন উঠল, তাদের কে জোরে কুর-আন পাঠ করে শোনাবে? তখন আবদুল্লহ্ বললেন, সে কাজটি তিনি করবেন। সবাই বলল, তাঁকে দিয়ে এ কাজ করাতে ভরসা পাচ্ছেন না। তারা এমন একজন প্রভাবশালী বংশের লোক চান, যিনি ওরা সবাই মিলে আক্রমণ করলে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। আবদুল্লাহ্ জবাব দিলেন, 'আমাকে একা সে কাজ করতে দিন, কারণ আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করবেন।'

পরদিন সকালে তিনি গেলেন পবিত্র কা'বা প্রাঙ্গণে। কুরায়শরা তখন সভায় বসেছিল। তিনি মাকামে-ইবরাহীমে পেঁৗছে পড়লেন, 'বিসমিল্লা-হির রহ্মানির রাহিম'। পড়লেন গলা চড়িয়ে। পড়লেন, 'তিনি পরম দয়ালু, যিনি কুরআন শিখিয়ে দিলেন'। তারপর তিনি তাদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন, যাতে সবাই তাঁকে দেখতে পায়। তিনি পড়লেন, 'এই দাসীর পুত্র কি বলছে?'

১. কুরআন ১৭ : ১১০।

ওরা সবাই যখন উপলব্ধি করল, তিনি মুহাম্মদ (সা) যা আবৃত্তি করে নামায পড়েন তাই তিনি পাঠ করে যাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা উঠে ওর মুখে সমানে কিলঘুষি চালাতে লাগল। তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না, পড়েই যেতে লাগলেন, কারণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়েছে, তাকে পড়ে যেতেই হবে। তারপর তিনি গেলেন তার সঙ্গীদের কাছে, মুখে মারের দাগ নিয়ে। তাঁরা বললেন, ঠিক যা আমরা আশংকা করেছি তা-ই হয়েছে।'

তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র দুশমনদের এর আগে কোনদিন এতো ঘৃণ্য মনে হয় নি আমার কাছে। তোমরা যদি বলো, তাহলে আমি কালকে আবার যাব, আবার তাদের সামনে একই কাজ করব।'

তাঁরা বললেন, 'না, যথেষ্ট করেছেন আপনি। ওরা যা শুনতে চায় না, আপনি তাদের তা শুনিয়ে দিয়ে এসেছেন।'

কুরায়শরা রসূল করীম (সা)-এর কুরআন পাঠ শুনল

মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব আল-জুহ্‌রি আমাকে বলেছেন যে তাকে কেউ বলেছে যে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, আবু জেহেল ইবনে হিশাম এবং বানু জুহ্‌রার মিত্র আল-আখনাস ইবনে শারিক ইবনে আমর ইবনে ওয়াহাব আস-সাকাফী একদিন রাতে রসূল করীম (সা)-এর বাড়িতে গিয়েছিল রসূল করীম (সা)-এর নামায পড়া শোনার জন্য। প্রত্যেকে বসার এমন জায়গা বেছে নিল, যাতে সব কিছু স্পষ্ট করে শুনতে পায়। কে কোথায় বসেছে তা আবার কেউ জানল না। ওরা সারা রাত কাটিয়ে দিল শুনে শুনে। তারপর ভোর হয়ে গেল যখন, ওরা সবাই উঠে পড়ল। ফেরার পথে সবার সঙ্গে সবার দেখা হয়ে গেল। প্রত্যেকে প্রত্যেককে হুঁশিয়ার করে দিল, 'অমন কাজ আর কখনো করবে না। কারণ বলা তো যায় না, অল্পবুদ্ধি কেউ দেখে ফেললে তার মনে সন্দেহ জাগবে। ওরা সবাই চলে গেল। দ্বিতীয় রাতে সবাই আবার যে যার স্থানে এসে বসল, সারারাত শুনল। পরদিন

ভোরে সেই আগের দিনের ভোরের মতো ঘটল ঘটনা। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো তৃতীয় রাতেও। তার পরের রাতে তারা বলাবলি করল, 'আগামীকাল এখানে আর আসব না আমরা, এই কসম না খেয়ে আমরা আজকে যাব না।' তারা প্রতিজ্ঞা করল, প্রতিজ্ঞা করে যে যার পথে চলে গেল। ভোরে ছড়ি হাতে আল-আখনাস গেল আবু সুফিয়ানের বাড়িতে। মুহাম্মদ (সা)-এর মুখ থেকে যা সে শুনেছে তার উপর তার মতামত জানতে চাইল। আবু সুফিয়ান জবাব দিল, 'আল্লাহ্‌র কসম, যা শুনেছি তার কিছু কিছু জিনিস আমি জানি, তাদের অর্থ বুঝি। আর কিছু শুনেছি যার না জানি অর্থ, না বুঝি তার উদ্দেশ্য।'

আল-আখনাস বলল, 'আমারও সেই একই কথা।'

আল-আখনাস অতঃপর গেল আবু জেহেলের বাড়িতে। তাকেও সেই একই কথা জিজ্ঞেস করল।

আবু জেহেল জবাব দিল, 'কি কথা শুনেছি! আরে আমরা আর বানু-আবদু মানাফরা তো ইযযতের প্রতিদ্বন্দ্বী। তারা গরীবকে খাইয়েছে, আমরাও খাইয়েছি। ওরা পরের বোঝা কাঁধে নিয়েছে, আমরাও নিয়েছি। ওরা দরাজ-দিল, আমরাও তাই। আমরা দুই ঘরই পাশাপাশি একই গতিতে উন্নতি করেছি। আমরা একই তেজের দুইটি ঘোড়ার মত। ওরা বলছে, "আমাদের এক নবী আছে, আসমান থেকে তার কাছে ওহী আসে।" আমাদের ওই জিনিস কখন হবে? আল্লাহ্‌র কসম, আমরা কোনদিন তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করব না, কোনদিন তাকে সত্যবাদী বলে মানব না।'

আল-আখনাস তখন উঠে চলে গেল।

রসূল করীম (সা) কুরআন শরীফ আবৃত্তি করে তাদের শোনালেন, আল্লাহ্‌র পথে আসার জন্য তাদের আহ্বান করলেন। ওরা তাকে উপহাস করল। বলল, 'আমাদের অন্তর ঘোমটা দেওয়া, তোমার কোন কথা আমরা বুঝি না। আমাদের কানের ভেতরে আছে বোঝা; তুমি কি বল আমরা শুনি না। একটা পর্দা আমাদের তোমার কাছ থেকে আলাদা করে রেখেছে।

কাজেই তোমার পথ তুমি দেখ, আমাদের পথ আমরা দেখব। তোমার কোন কথা আমরা বুঝি না।

তখন আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ করলেন, 'এবং যখন তুমি কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তাদের মধ্যিখানে প্রচ্ছন্ন এক পর্দা রেখে দেই।'[১] এখান থেকে 'এবং যখন তুমি কুরআনে বলো যে 'তোমার প্রভু এক' তখন তারা সরে পড়ে' এই পর্যন্ত। এর অর্থ হলো, তাদের কথামতো আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়ে থাকি, কান কোন ভারী জিনিস দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে থাকি এবং তোমার এবং তাদের মাঝখানে পর্দার আড়াল দিয়ে থাকি, তাহলে তারা তোমার কথা বুঝবে কেমন করে? অর্থাৎ ওরা যা বলছে তা আমি করি নি। 'যখন ওরা কান পেতে তোমার কথা শুনে তখন তারা কেন কান পেতে শুনে তা আমি ভাল করে জানি। এবং আরো জেনো, গোপনে আলোচনাকালে সীমা লঙ্ঘনকারীরা বলে, 'তোমরা এক যাদুগ্রস্ত লোককে অনুসরণ করছ।' অর্থাৎ এমনি করে আমার বার্তায় কর্ণপাত না করার জন্য লোকজনকে তারা হুকুম দেয়। 'দেখো ওরা তোমার কি রকম উপমা দেয়, 'তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, তারা পথ খুঁজে পাবে না।' অর্থাৎ তারা তোমার সম্পর্কে ভ্রান্ত উপমা তৈরী করেছে, তারা যথার্থ পথ পাবে না, তাদের কথা সরল নয়। 'এবং তারা বলে, আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হবো?' অর্থাৎ তুমি আমাদের বলতে এসেছ যে মরার পর আমাদের অস্থি যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, যখন মজ্জা শুকিয়ে যাবে, তখনো আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে—যা নাকি হবার নয়। 'বল, তোমরা পাথরই হও আর লোহাই হও অথবা এমন কিছু, যা তোমাদের ধারণায় কঠিন, তারা বলবে 'কে আমাদের পুনরুত্থিত করবে?' বল, তিনি যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন।' অর্থাৎ যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছিলেন, তোমরা জানো কি থেকে তা করেছিলেন, তিনিই পুনরুত্থিত করবেন, কারণ যিনি ধুলো থেকে তোমাদের সৃষ্টি করতে পারেন, তার কাছে এ কাজটা নিশ্চয়ই খুব কঠিন নয়।

---

১. সূরা ১৭।

ইবনে আব্বাসের সূত্রে মুজাহিদ তদীয় সূত্রে আবদুল্লাহ্ বিন আবু নাজিহ্ আমাকে বলেছেন যে, ইবনে আব্বাস বলেছিলেন, 'অথবা এমন কিছু যা তোমাদের ধারণায় খুব কঠিন" বলতে কি বোঝায় আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "মৃত্যু।'

নিচু শ্রেণীর মুসলমানদের বহু ঈশ্বরবাদী কর্তৃক নির্যাতন

তখন রসূল করীমকে যারাই অনুসরণ করত তাদের সকলের প্রতি প্রকাশ্য শত্রুতা প্রদর্শন করতে লাগল। যে সব গোত্রে মুসলমান ছিল, তাদের তারা আক্রমণ করেছে, তাদের বন্দী করে, তাদের খেতে দেয় নি, পানি দেয় নি, তাদের মক্কায় তীব্র গরমে উদাম করে রেখে দিয়েছে। উদ্দেশ্য যাতে তারা তাদের ধর্ম বর্জন করে। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অনেকে হাল ছেড়ে দিয়েছে। আবার অনেকে তাদের প্রতিহত করেছে, আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে থেকে।

বিলাল, যাকে পরে আবু বকর মুক্ত করেছিলেন, তখন বানু জুমাহ্‌র মালিকানায় ছিলেন। জন্মগতভাবে দাস। তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত মুসলমান। মনে প্রাণে খাঁটি মানুষ। তাঁর পিতা ছিলেন রিবাহ্ আর মাতা হামামা। উমাইয়া ইবনে খালাফ ইবনে ওয়াহাব ইবনে হুযায়ফা ইবনে জুমাহ্ তাকে দিনের প্রখরতম সময়ে বের করে নিয়ে এসে খোলা মাঠে চিৎ করে শুইয়ে দিত, বুকের উপর চাপিয়ে দিত ভারী এক বিশাল পাথর। তাঁকে সে বলত, 'হয় এখানে এইভাবে তুমি মরবে আর না হয় মুহাম্মদকে ছাড়বে এবং আল-লাত ও আল-উজ্জাকে পূজা করবে। এমনি অত্যাচার সহ্য করতে করতে বিলাল বললেন, 'আহাদ, আহাদ, 'এক, এক।'

আপন পিতার বরাত দিয়ে হিশাম ইবনে উরওয়া আমাকে বলেছেন: এমনি করে অত্যাচারের মুখে বিলাল যখন 'এক, 'এক' বলছিলেন, তখন ও দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন ওয়ারাকা ইবনে নওফেল। ওয়ারাকাও তখন বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম বিলাল, এক, এক।' তখন তিনি

গেলেন উমাইয়া আর বানূ জুমাহ্‌র কাছে। তারাই এই নিপীড়নের নায়ক। তাদের তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র নামে আমি কসম খাচ্ছি, এমনি করে ওকে যদি আপনারা হত্যা করেন তাহলে ওর কবরে আমি স্মৃতিসৌধ বানাব।'

একদিন এমনি নিগ্রহের সময় সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন আবু বকর। তাঁর বাড়ি ওই গোত্রের এলাকায় ছিল। তিনি উমাইয়াকে বললেন, 'এই বেচারাকে এমন অত্যাচার করছেন, আপনার আল্লাহ্‌র কোন ভয় নেই? কত দিন চলবে এরকম?'

উমাইয়া বলল, 'ওকে তো তোমরাই নষ্ট করেছ, কাজেই তার এই অবস্থা থেকে তোমরাই বাঁচাও না কেন?'

আবু বকর বললেন, 'তাই আমি করব। আমার কাছে এক কালো ক্রীতদাস আছে। এর চেয়েও জোয়ান, শক্তিশালী। ও একজন নাস্তিক। বিলালের সঙ্গে তাকে আমি বদলাব।'

যে কথা সেই কাজ। আবু বকর তাকে ওখান থেকে উদ্ধার করে মুক্ত করে দিলেন।

মদীনায় হিজরত করার আগে আবু বকর ইসলামের ইতিহাসের ছয়জন ক্রীতদাসকে মুক্ত করেছিলেন। বিলাল ছিলেন সপ্তম জন। তাদের নাম আমির ইবনে ফুহায়রা, ইনি বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং বিরে মাউনার যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন; উম্মে উবায়স এবং জিন্‌নিরা (তাকে মুক্ত করার সময় তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়ে গিয়েছিল, কুরায়শরা বলেছিল, 'আল-লাত আর আল-উজ্জা তার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু জিন্‌নিরা বলেছিল, 'পবিত্র ঘরের কসম, এটা মিথ্যে কথা। আল-লাত আর আল-উজ্জার ক্ষতি করার ক্ষমতাও নেই, সারাবার ক্ষমতাও নেই; তারপর আল্লাহ্ তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন)।

তিনি আন-নাহ্‌দিয়া ও তাঁর কন্যাকে মুক্ত করেছিলেন। কন্যার মালিক ছিল বানূ আবদুদ দারের এক রমণী। তাদের মালিক তাদের ময়দা

ভাঙ্গানোর জন্য পাঠাচ্ছিল। ওইদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন আবু বকর। মালিক মহিলা বলল, 'আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের কখনো আমি মুক্তি দেব না।' আবু বকর বললেন, 'আপনার কসম প্রত্যাহার করে নিন।' মালিক বলল, 'ঠিক আছে, প্রত্যাহার করলাম। আপনারাই তাদের নষ্ট করেছেন, কাজেই আপনারাই তাদের মুক্ত করুন না কেন?' দাম একটা ধার্য হলো। আবু বকর বললেন, 'আমি ওদের কিনে নিলাম। ওরা এখন মুক্ত।' মেয়ে দুটো বলল, 'ময়দাটা ভাঙ্গিয়ে ওঁকে এনে দিয়ে যাব না আমরা?' তিনি বললেন, 'সে তোমাদের অভিরুচি।'

বানু আদি ইবনে কা'ব গোত্রের বানু মুআম্মিলের এক ক্রীতদাসী মুসলমান হয়েছিল। ও দিক দিয়ে আবু বকর যাচ্ছিলেন। ইসলাম ত্যাগ করার জন্য উমর বিন আল-খাত্তাব শাস্তি দিচ্ছিলেন তাকে। উমর তখন বহু ঈশ্বরবাদী। মেয়েটাকে মারতে মারতে নিজেই ক্লান্ত হয়ে গেলেন। বললেন, 'তোমাকে মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে গেছি বলে তোমাকে রেহাই দিলাম।' মেয়েটা বলল, 'আল্লাহ্ যেন আপনাকে ঠিক এমনি করেই শাস্তি দেন।' আবু বকর তক্ষুণি তাকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দিলেন।

আপন পরিবারসূত্রে আমির ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আল-জুবায়র এবং তদীয় সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আতিক বলেছেন: আবু কুহাফা তাঁর পুত্র আবু বকরকে বললেন, 'তুমি দেখছি খালি দুর্বল ক্রীতদাসদের মুক্ত করে যাচ্ছ! মুক্তই যদি করবে তাহলে শক্ত-সমর্থ লোককে করো না কেন। আপদে-বিপদে তোমাকে রক্ষা করতে পারবে?'

আবু বকর বললেন, 'আমি যা করছি তা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে করছি।'

বলা হয়ে থাকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিম্নোক্ত আয়াত আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ করেছিলেন: 'কেউ দান করলে, সাবধান হলে, যা ভাল তা গ্রহণ করলে' এখান থেকে 'এবং কাহারও প্রতি অনুগ্রহের প্রতিদান

প্রত্যাশায় নয়, কেবল তার মহান প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সে সন্তোষ লাভ করবেই'[১] এই পর্যন্ত।

বানূ মাখজাম মুসলমান আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে তার জনক-জননীসহ মক্কার প্রচণ্ড রোদের মধ্যে বাইরে বেঁধে রাখত। আমি শুনেছি, রসূলে করীম (সা) একদিন ওদিক দিয়ে যাওয়ার সময় তা দেখে বললেন, 'সবর কর হে ইয়াসিরের পরিবারবর্গ। তোমাদের সকলের সাক্ষাতের স্থান হবে বেহেশত।' ওরা তার মাকে হত্যা করল, কারণ সে ইসলাম বর্জন করতে রাযী হয় নি।

ভয়ানক বদ ছিল আবু জেহেল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে সে-ই মক্কাবাসীদের ক্ষেপিয়ে তুলল। কেউ মুসলমান হয়েছে শুনলেই সে তার কাছে ছুটে যেতো। যদি দেখত সে লোক সমাজের কেউকেটা কেউ, তাকে রক্ষা করার জন্য আত্মীয়-স্বজন আছে তখন তাকে গালি-গালাজ করত সে, তাকে বিদ্রূপ করত। বলত, 'বাপ-মার ধর্ম ত্যাগ করলে, তোমার বাপ-মা তোমার চেয়ে ভাল মানুষ ছিল তো। সবখানে আমরা প্রচার করে দেবো—তুমি এক গাদ্দার, তুমি এক বুদ্দু, তোমার সুনাম মিসমার করে দেবো।' মুসলমান হওয়া লোক ব্যবসায়ী হলে বলত, 'তোমার কাছ থেকে কেনাকাটা বয়কট করব আমরা, তোমাকে ফকির বানিয়ে ছাড়ব।' আর যদি ধর্মান্তরিত লোক সাধারণ কেউ হতো, হতো সহায় সম্বলহীন, তাহলে তাকে নিজে মারত, অন্যকে মারার জন্য ডাকত।

সা'দ ইবনে জুবায়রের সূত্রে হাশিম ইবনে জুবায়র আমাকে বলেছেন, 'আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে বলেছিলাম, "বহু-ঈশ্বর-বাদীরা তাদের এমনই অত্যাচার করছে যে, তার দলে ধর্মান্তর মার্জনীয় হয়ে গিয়েছিল।" তিনি বললেন, "জি, তাই, আল্লাহ্‌র কসম, তাই। যাকে ওরা ধরে মারত, তাকে না দিত খাবার, না পানি, মারের ঠেলায় সে সোজা হয়ে বসতে পারত না, ফলে শেষে ওকে যা বলা হতো,

১. কুরআন ৯২ঃ ৫।

তা-ই করত।” তাকে ওরা বলত “তোমার ঈশ্বর আল-লাত আর আল-উজ্জা, আল্লাহ্ নয়, কেমন?” সে বলত, “হ্যাঁ”। এমন হতো শেষে যে, ওখানে গুবরে পোকা জাতীয় কোন পোকা পাওয়া গেলে সেটা দেখিয়ে তারা জিজ্ঞেস করত “এই পোকাটাই তোমার ঈশ্বর, আল্লাহ্ নয়, হ্যাঁ?” সে বলত, হ্যাঁ। তার ইচ্ছা থাকত শাস্তি থেকে কোনমতে রেহাই পাওয়া।'

আল-জুবায়র ইবনে উকাসা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু আহমদ আমাকে বলছে যে, তাকে কে একজন বলেছিল যে বানু মাগজুমের কতিপয় লোক হিশাম ইবনে আল-ওয়ালিদের কাছে গিয়েছিল হিশামের ভাই আল-ওয়ালিদ ইবনে আল-ওয়ালিদের ইসলাম গ্রহণের পর। তারা ঠিক করল মুসলমান হওয়া কিছু জোয়ান মানুষকে তারা পাকড়াও করবে। যাদের ধরা হলো তাদের মধ্যে ছিল সালমা ইবনে হিশাম এবং আইয়াশ ইবনে রাবিআ। এখন আল-ওয়ালিদের বদমেযাজকে ওরা সবাই ভয় পেতো। কাজেই তারা বলল, 'এই নতুন ধর্ম চালু করেছে বলে এই লোকগুলোকে আমরা নসিহত করতে চাই। এতে করে অন্যান্য লোকের সুবিধা হবে।' সে বলল, 'ঠিক আছে, তাকে নসিহত করুন, কিন্তু সাবধান, ওকে হত্যা করবেন না।' সে তখন আবৃত্তি করলঃ

আমার ভাই উকায়স, কেউ তাকে হত্যা করবে না,
করলে যুদ্ধ হবে আমাদের মধ্যে চিরকাল।

'তার জীবন সম্পর্কে সাবধান, আল্লাহ্‌র কসম, যদি তোমরা তাকে হত্যা কর, আমি তোমাদের খান্দানের সবগুলো সেরা মানুষকে খতম করব, একটাকেও জ্যান্ত রাখব না।'

ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, 'ঈশ্বর এই বেটার বিচার করুন! যা বলেছে তারপর কে যেচে নিজের ঘাড়ে বিপদ নেবে! কারণ, এই একটা লোককে হত্যা করলে একটার বদলে আমাদের সবগুলো সেরা লোক হারাব।'

ওরা চলে গেল। এমনি করে আল্লাহ্ তাদের কবল থেকে রক্ষা করে দিলেন তাঁকে।

আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত

রসূলে করীম (সা) তাঁর অনুগামিগণের উপর আরোপিত নিদারুণ উৎপীড়ন প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছেন। তাঁর গায়ে কেউ হাত দিতে পারছে না, কারণ (এক) আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক; (দুই) পিতৃব্য আবু তালিবের সহায়তা। তিনি তাদের রক্ষা করতে পারছেন না। তিনি তাদের বললেন: 'তোমরা ইচ্ছা করলে আবিসিনিয়ায় চলে যেতে পার, সে-ই তোমাদের জন্য ভাল হবে। ওখানকার রাজা অন্যায়-অবিচার সহ্য করেন না, আর ওটা আমাদের বন্ধু দেশ। ওখানে থাকবে, একদিন আল্লাহ্ সময়ে তোমাদের দুঃখ দূর করবেন।' তখন কিছু লোক, ধর্মান্তরের এবং পৌত্তলিকদের ধর্ম নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে যাওয়ার আশঙ্কায় আবিসিনিয়া হিজরত করল। ইসলামে এই-ই ছিল প্রথম হিজরত।

যে সব মুসলমান প্রথমে গিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন: বানু উমাইয়া:... উসমান ইবনে আফ্‌ফান...সঙ্গে তাঁর স্ত্রী রসূল করীমের কন্যা রোকাইয়া।

বানু আবদু শাম্‌স:... আবু হুযায়ফা ইবনে উতবা...সঙ্গে স্ত্রী সাহলা বিনতে সুহায়ল ইবনে আমর, ইনি বানু আমির ইবনে লুআইর বংশ-জাত।

বানু-আসাদ ইবনে আবদুল উজ্জা: আল-জুবায়র ইবনে আস-সাওয়াম ...বানু আবদুদ্‌দার:...মুস্‌আব ইবনে উমায়র।

বানু জুহরা ইবনে কিলাব: আবদুর রহমান ইবনে আউফ...

বানু মাখজুম ইবনে ইয়াকজা:...আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ ...সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী উম্মে সালামা বিনতে আবু উমাইয়া ইবনে আল-মুগিরা...[1]।

১. ডট চিহ্ন দিয়ে পূর্বে প্রদত্ত বংশ-ধারা নির্দেশ করা হলো।

বানু জুমাহ্ ইবনে আমর ইবনে হুসায়স: উসমান ইবনে মাজ্‌উন…

বানু আদি ইবনে কা'ব: আমির ইবনে রাবিআ, ইনি আনজ ইবনে ওয়াইলের আল-খাত্তাব বংশের একজন মিত্র, এর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী নায়েলা বিনতে আবু হাসমা ইবনে হুযায়ফা:

বানু আমির ইবনে লুসাই আবু সাবারা ইবনে আবু রুহম ইবনে আবদুল উজ্জা ইবনে আবু কায়স…ইবনে আমির। কারো কারো মতে ইনি ছিলেন আবু হাতিব ইবনে আমর ইবনে আবদু শামস, একই বংশজাত। বলা হয় ইনিই সর্বপ্রথম আবিসিনিয়ায় পেঁৗছেন।

বানু আল-হারিস: সুহায়ল ইবনে বায়দা…

আমার জানামতে আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরতকারী ছিলেন এই দশজন।

পরে গিয়েছিলেন জাফর ইবনে আবু তালিব। তাঁদের অনুসরণ করে গেল একের পর এক মুসলমান। সবাই গিয়ে জমায়েত হলো আবিসিনিয়ায়। কেউ সপরিবারে, কেউ একা।

বানু হাশিম: জাফর…সঙ্গে নিয়েছিলেন স্ত্রী আসমা বিনতে উমায়েস ইবনে আন-নুমান…। আবিসিনিয়ায় ইনি আবদুল্লাহ্‌র জন্ম দেন।

বানু উমাইয়া: উসমান ইবনে আফফান…সঙ্গে স্ত্রী রুকাইয়া…আমর ইবনে সাঈদ ইবনে আল-আস…সঙ্গে স্ত্রী ফাতিমা বিনতে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া ইবনে মুহাররিদ ইবনে খুমাল ইবনে শাক ইবনে রাকাবা ইবনে মুখদিজ আল কিনানি এবং তার ভাই খালিদ ও তদীয় স্ত্রী উমায়না বিনতে খুলাফ বংশের খালাফ। ইনি আবিসিনিয়ায় সাঈদ এর কন্যা আমা-র জন্ম দেন। পরে তাঁর বিয়ে হয়েছিল আল-জুবায়র ইবনে আল-আওয়ামের সঙ্গে এবং তার ঔরসে আমর ও খালিদের জন্ম হয়। বানু আসাদ ইবনে খুজায়মা তার মিত্রদের মধ্যে গিয়েছিলেন: আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহশ ইবনে আসাদ এবং তার ভাই উবায়দুল্লাহ্ ও তদীয় স্ত্রী উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব…এবং কায়স ইবনে আবদুল্লাহ্ ও তার স্ত্রী বারাকা বিনতে ইয়াসার, যিনি ছিলেন আবু সুফিয়ানের

একজন মুক্ত দাস এবং মুয়াকিব ইবনে আবূ ফাতিমা। এরা সবাই সাঈদ ইবনে আল-আস-এর পরিবারের লোক। এরা ছিলেন সাতজন।

বানূ আবদ্ শামস : আবূ হুযায়ফা ইবনে উতবা...আবূ মূসা আল-আশ'আরি, যার প্রকৃত নাম ছিল আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়স, ইনি উতবার পরিবারের মিত্র ছিলেন। এরা হলেন দুইজন।

বানূ নওফেল ইবনে আবদ্ মানাফ : উতবা ইবনে গাজওয়ান ইবনে জাবির ইবনে ওয়াহাব ইবনে নাসিব...ইবনে কায়স ইবনে আয়লান। ইনি তাদের মিত্র। এখানে একজন।

বানূ আসাদ'...আল জুবায়র ইবনে আল আওয়াম,...আল-আসওয়াদ ইবনে নওফেল;...ইয়াযিদ ইবনে জামাআ'...আমর ইবনে উমাইয়া ইবনে আল-হারিস। এরা চারজন।

বানূ আবদ ইবনে কুসাই : তুলায়ব ইবনে উমায়র...একজন।

বানূ আবদুদ্ দার : মুস'আব ইবনে উমায়র; সুয়ায়বিত ইবনে সাদ, জাহম ইবনে কায়স...সঙ্গে স্ত্রী উম্মে হারমালা বিনতে আব্দুল আসওয়াদ ...খুজা থেকে, এবং তাঁর দুই পুত্র আমর ও খুজায়মা; আবুল রুম ইবনে উমায়র ইবনে হাশিম;...ফিরাস ইবনে আন-নাদর ইবনে আল-হারিস ...পাঁচজন

বানূ জুহরা : ...আবদুর রহমান ইবনে আউফ;...আমির ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (আবূ ওয়াক্কাস ছিলেন মালিক ইবনে উহায়ব)...আল-মুত্তালিব ইবনে আজহার...সঙ্গে স্ত্রী রামলা বিনতে আবূ আউফ ইবনে দুবায়রা। ...আবিসিনিয়ায় তার গর্ভে পুত্র আবদুল্লাহ্‌র জন্ম হয়। তাদের মিত্র : হুযায়ল বংশের : আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ...ও তার ভাই উতবা। বাহ্‌রা বংশের : আল-মিকদাদ ইবনে আমর ইবনে সালাবা ইবনে মালিক ইবনে রাবিআ ইবনে ছুমামা ইবনে মাতরুদ ইবনে আমর ইবনে সা'দ ইবনে জুহায়র ইবনে লুআই ইবনে সালাবা ইবনে মালিক ইবনে আশ-শারিক ইবনে আবূ আহওয়াজ ইবনে আবূ ফাইশ ইবনে দুরাইম ইবনে আল-কায়ন ইবনে

আহওয়াদ ইবনে বাহ্‌রা ইবনে আমর ইবনে আলহাফ ইবনে কুদা'। (তাকে মিকদাদ ইবনে আল-আসওয়াদ ইবনে আবদু ইয়াগুত ইবনে ওহাব ইবনে আবদু মানাফ ইবনে জুহরা বলে ডাকা হতো, কারণ ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই তাকে তিনি দত্তক নিয়েছিলেন এবং আপন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন)। এরা হলেন ছয়জন।

বানু তায়ম ইবনে মুররা : আল হারিস ইবনে খালিদ···সঙ্গে স্ত্রী রায়তা বিনতে আল-হারিস ইবনে জাবালা।···আবিসিনিয়ায় তার গর্ভে পুত্র মূসা ও কন্যা আয়শা যয়নব ও ফাতিমার জন্ম হয়; আমর ইবনে উসমান ইবনে আমর। এখানে দুইজন

বানু মাখজুম ইবনে ইয়াকাজা :···আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ··· সঙ্গে স্ত্রী উম্মে সালামা বিনতে আবু উমাইয়া ইবনে আল-মুগিরা। এর গর্ভে কন্যা যয়নব আবিসিনিয়ায় জন্মগ্রহণ করে। (তার নাম ছিল আবদুল্লাহ্ এবং তার স্ত্রী নাম ছিল হিন্দ।) শাম্মাস ইবনে উসমান ইবনে আশ-শারিদ; হাব্বার ইবনে সুফিয়ান ইবনে আবদুল আসাদ এবং তার ভাই আবদুল্লাহ্।' হিশাম ইবনে আবু হুযায়ফা ইবনে আল-মুগিরা; সালামা ইবনে হিশাম; আইয়াশ ইবনে আবু রাবিআ··· এদের মিত্রের মধ্যে ছিল মুয়াত্তিব ইবনে আউফ। ইনি ছিলেন খুজা' বংশের, এর অন্য নাম ছিল আয়হামা। আটজন।

বানু জুমাহ ইবনে আমর : উসমান ইবনে মাজুন···এবং তাঁর পুত্র আস-সাইব; তার দুই ভাই কুদামা ও আবদুল্লাহ্; হাতিব ইবনে আল-হারিস···সঙ্গে স্ত্রী ফাতিমা বিনতে আল-মুজাল্লিল···এবং তার দুই পুত্র মুহাম্মদ ও আল-হারিস; তার ভাই হাত্তাব ও তাঁর স্ত্রী ফুকায়হা বিনতে ইয়াসার সুফিয়ান ইবনে মা' মার···সঙ্গে দুই পুত্র জাবির ও জুনাদা তার স্ত্রী হাসানা যিনি তাদেরই মাতা ছিলেন; এবং তাদের মাতার দিককার ভাই শুরাহ বিল ইবনে আবদুল্লাহ্, ইনি গাউস বংশের লোক ছিলেন। উসমান ইবনে রাবিআ ইবনে উহবান ইবনে ওয়াহাব ইবনে হুযাফা। এগার জন।

বানু সাহম ইবনে আমর···খুনায়স ইবনে হুযাফা···আবদুল্লাহ্ ইবনে আল-হারিস ইবনে কায়স ইবনে আদি ইবনে সা'দ ইবনে সাহম, হিশাম

ইবনে আল-আস ইবনে ওয়াইল ইবনে সা'দ ইবনে সাহম; কায়স ইবনে হুযাফা…আবু কায়স ইবনে আল-হারিস…আবদুল্লাহ্ ইবনে হুযাফা… আল-হারিস ইবনে আল-হারিস…মা' মার ইবনে আল-হারিস;…বিশর ইবনে আল-হারিস…এবং তার তামিমি মাতার গর্ভজত সাঈদ ইবনে আমর নামে এক ভাই; সাঈদ ইবনে আল-হারিস, আল-সাইব ইবনে আল-হারিস; উমায়র ইবনে রিয়াব ইবনে হুযায়ফা ইবনে মুহাশশিম,…মাহমিয়া ইবনে আল যাজা, ইনি বানু জুবায়দ গোত্র থেকে তাদের মিত্রজন। চৌদ্দজন লোক।

বানু আদি ইবনে কা'বঃ মাহমার ইবনে আবদুল্লাহ্…উরওয়া ইবনে আবদুল উজ্জা…আদি' ইবনে নাদলা ইবনে আবদুল উজ্জা … তা তার পুত্র আন-নুমান, … আমির ইবনে রাবিআ, আনজ ইবনে ওয়াইল বংশের আল খাত্তাবের পরিবারের ইনি মিত্র, সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী লায়লা। পাঁচজন লোক।

বানু আমির ইবনে লুআইঃ আবু সাবরা ইবনে আবু রুহম…সঙ্গে স্ত্রী উম্মে কুলসুম বিনতে সুহায়ল ইবনে আমর… আবদুল্লাহ্ ইবনে মুখরামা ইবনে আবদুল উজ্জা, আবদুল্লাহ্ ইবনে সুহায়ল … সালিত ইবনে আমর ইবনে আবদু শামস …এবং তার ভাই আস-সাকরান ও তদীয় স্ত্রী সাউদা বিনতে জামা' আ ইবনে কায়স ইবনে আবদু শামস…মালিক ইবনে জামা'আ ইবনে কায়স…সঙ্গে স্ত্রী আম্‌রা বিনত আস-সাদি ইবনে ওয়াকদান ইবনে আবদু শামস … হাতিব ইবনে আবদু শাম্‌স … সা'দ ইবনে খাওলা, তাদের এক বন্ধু ইনি। আটজন লোক।

বানু আল-হারিস ইবনে ফিহরঃ আবু উবায়দা ইবনে আল-জাররা, ইনি ছিলেন আমির ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আল-জাররা, সুহায়ল ইবনে বায়দা, ইনি ছিলেন সুহায়ল ইবনে ওয়াহাব ইবনে রাবিআ ইবনে হিলাল ইবনে উহায়ব দাব্বা … (কিন্তু সব সময় মাতার নামে পরিচিত ছিলেন, মাতা ছিলেন দা'দ বিনতে জাহদাম ইবনে উমাইয়া ইবনে জারিব ইবনে আল-হারিস…এবং সব সময় অবশ্য তাকে বায়দা বলেই ডাকা হতো), আমর ইবনে আবু সার ইবনে রাবিআ, আইয়াদ ইবনে জুহায়র ইবনে আবু

শাদ্দাদ ইবনে রাবিআ ইবনে হিলাল ইবনে উহায়ব ইবনে দাব্বা ইবনে আল-হারিস, তবে বলা হয়ে থাকে যে, এ তথ্য ভ্রান্ত এবং রাবিআ ছিলেন হিলাল ইবনে মালিক ইবনে দাব্বার পুত্র...এবং আমর ইবনে আল-হারিস ...উসমান ইবনে আবদু গানম্ ইবনে জুহায়র এবং সা'দ ইবনে আবদু কায়স ইবনে লাকিত...ও তদীয় ভ্রাতা আল-হারিস। আটজন লোক।

সহগামী বা পরে জাত শিশু ছাড়া আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের সংখ্যা ছিল তিরাশি। তা-ও যদি আম্মার ইবনে ইয়াসির তাদের সঙ্গে থেকে থাকত। না থাকার সম্ভাবনাই বেশী।

আবিসিনিয়ায় আবদুল্লাহ্ ইবনে আল-হারিস ইবনে কায়স ইবনে আদি ইবনে সা'দ ইবনে সাহম একটি কবিতা লিখেছিলেন, তার কিছু অংশ নিম্নে দেওয়া হলো। তারা সকলেই সেখানে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, নিগাসের আশ্রয়ের জন্য সকলেই খুব কৃতজ্ঞ ছিলেন। সেখানে সবাই আল্লাহ্‌র ইবাদত করতেন নির্ভয়ে, নিগাস তাদের সব রকমের সাহায্য ও আতিথেয়তা প্রদান করেছিলেন।

হে অশ্বারোহী, আমার কাছ থেকে একটি বার্তা নিয়ে যাও
তাদের কাছে যারা আল্লাহ্‌র ধর্মের প্রকাশ্য প্রদর্শন চায়,
আল্লাহ্‌র নিগৃহীত সমস্ত বান্দার কাছে,
মক্কার উপত্যকায় নিপীড়িত, শান্তিপ্রাপ্ত সব জনের কাছে,
তাদের বলো, আমাদের কাছে আল্লাহ্‌র দেশ বড় প্রশস্ত,
অপমান, লজ্জা আর দুর্জনের হাত থেকে আমরা নিরাপদ,
সুতরাং অপমানের জীবন আমাদের নেই আর,
লজ্জায় মরি না, অপবাদ থেকে নিরাপদ নই।
আল্লাহ্‌র রসূলকে আমরা অনুসরণ করি; এবং তারা
রসূলের বাণী প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা ছলনাময়।[১]

১. এই বাক্য অর্থময়।

যারা পাপাচারে লিপ্ত তাদের উপর তোমাদের শাস্তি পড়ুক,
তারা যাতে উঠতে না পারে, আমাকে নষ্ট করতে না পারে, সেজন্য
আমাকে রক্ষা করো।

কুরায়শরা তাদের দেশছাড়া করেছে, তার কথা আবদুল্লাহ্ ইবনে আল-হারিস বলেছে, তাদের কিছু লোককে তিনি ভৎর্সনাও করেছেন।

আমার হৃদয় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে,
অস্বীকার করে আমার আঙ্গুল, তোমাকে যা বলছি, সত্য বলছি।
আমি তাদের সঙ্গে কেমন করে যুদ্ধ করব, যারা আমাদের
এই সত্য শিখিয়েছে যে, সত্যের সঙ্গে মিথ্যেকে মিশিয়ো না ?
জিন পূজারীরা তাদের পবিত্র ভূমি থেকে নির্বাসিত করেছে তাদের
কাজেই এখন অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত তারা;
আদি ইবনে সা'দের মধ্যে যদি কিছু বিশ্বস্ততা থাকত
তার সদাচার আর আত্মীয়তার সূত্র থেকে জাত,
তাহলে আমি সেই গুণাবলী তোমাদের মধ্যেও আশা করতে পারতাম,
আল্লাহ্‌র কৃপায়, কেননা আল্লাহ্ ঘুষ খেয়ে কিছু করেন না।
হতভাগা বিধবাদের প্রশস্ত আশ্রয়ের বদলে আমি পেলাম,
এক কুকুরের ছানা, এক কুত্তী যার জননী !

তিনি আরো বলেন ঃ

ওইসব কুরায়শ যারা অস্বীকার করেছে আল্লাহ্‌র সত্য
তারা আদ আর মাদিয়ান এবং আল হিজরের সমস্ত প্রত্যাখ্যানকারীর
মতো মানুষ !
আমি যদি এক প্রচন্ড ঝড় বহাতে না পারি, তাহলে পৃথিবীর
প্রসারিত ভূমি এবং সমুদ্র যেন আমাকে গ্রাস করে।
সেই দেশে, যেখানে আছেন মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র খাদেম।
আমার হৃদয়ে কি আছে আমি তা ব্যাখ্যা করব
যখন সন্ধান হবে তন্ন তন্ন।

কবিতার এই দ্বিতীয় অংশের জন্য আবদুল্লাহ্‌কে 'আল-মুবরিক; বজ্র স্রষ্টা (অথবা ভয়স্রষ্টা) বলা হতো।

উসমান ইবনে মাজনুর সঙ্গে তার চাচাতো ভাই উমাইয়া ইবনে খালাফ ইবনে ওয়াহাব ইবনে হুযায়ফা ইবনে জুমাহ্ তার ধর্মবিশ্বাসের জন্য খারাপ ব্যবহার করত। সেজন্য উসমান নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন। তখন উমাইয়া তার আপন গোত্রে একজন নেতা ছিল।

হে তায়ম ইবনে আমর, যে শত্রুতা করতে এসেছে তাকে দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি,
কারণ আমাদের মধ্যখানে সমুদ্র এবং বিশাল বিরাট পাহাড়-পর্বত, [১]
মক্কার উপত্যকায় আমি বড় আরামে ছিলাম, ওখান থেকে আমাকে তাড়িয়েছ তুমি
আমাকে এই ঘৃণ্য শ্বেত প্রাসাদে থাকতে বাধ্য করেছ। [২]
তোমরা পালক লাগাও তীরের, এই পালকে কোন কাজ হবে না,
তীরে ধার দাও, তীরের পালক সব তোমাদের;
যুদ্ধ কর তোমরা সমর্থ অভিজাত মানুষের সঙ্গে
একদা যাদের সাহায্য চাইতে, তাদের ধ্বংস করছ তোমরা।
সেদিন তোমরা বুঝবে যে দিন দুর্ভাগ্য নেমে আসবে তোমাদের উপর,
বুঝবে যেদিন অচেনা মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করবে,
বুঝবে কি তোমরা করেছ।

উসমান যাকে তায়ম ইবনে আমর বলে সম্বোধন করেছেন, তিনি হলেন জুমাহ্। তার অন্য নাম ছিল তায়ম।

হিজরতকারীদের ফেরত আনার জন্য কুরায়শরা আবিসিনিয়ায় লোক পাঠাল

কুরয়াশরা দেখল রসূলে করীম (সা)-এর অনুগামীরা আবিসিনিয়ায়

১. এই কবিতার অর্থ সম্বন্ধে অনেক মতানৈক্য।
২. এখানেও অর্থের অস্পষ্টতা।

বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে নিরাপদে জীবন যাপন করছে, তখন তারা ঠিক করল তাদের দুজন শক্ত-সমর্থ লোক পাঠাবে নিগাসের কাছে। নিগাসকে তারা বলবে ওদের ফেরত পাঠানোর জন্য। উদ্দেশ্য তাদের ধর্ম ত্যাগের জন্য প্ররোচিত করা এবং তাদের শান্তিতে জীবন যাপনের গৃহ ভেঙ্গে দেওয়া। তারা আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু রাবি'আ এবং আমর ইবনে আল-আস ইবনে ওয়াইলকে পাঠাল। তারা সঙ্গে নিয়ে গেল নিগাস আর তার সভাসদদের জন্য কিছু উপহার সামগ্রী। আবু তালিব তাদের এই পরিকল্পনা টের পেয়ে গেলেন। নিগাসের উদ্দেশ্যে তখন তিনি নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন, যাতে নিগাস তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন, তাদের রক্ষা করেন :

জাফর আর আমর কি হালে আছে যদি জানতাম
(প্রায়ই নিকটতম আত্মীয় হয় হীনতম দুশমন)।
নিগাস এখনো জাফর আর তার অনুচরদের আদর করে,
নাকি তাকে বাধ্য করে নিয়েছে দুষ্ট জনেরা ?
আপনি মহৎ, আপনি সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত থাকুন,
কোন শরণার্থী আপনার সঙ্গে অসুখী থাকে না।
জানবেন, আল্লাহ্ আপনার সুখ বৃদ্ধি করেছেন,
সমস্ত সমৃদ্ধি আপনার বশংবদ।
আপনি হলেন এক নদী, তার জল প্রাচুর্য দুকূল উপচে যায়,
ছলকে পড়ে গিয়ে শত্রু মিত্র সবার কাছে।

রসূল করীম (সা) স্ত্রী উম্মে সালমা বিনতে আবু উমাইয়া ইবনে আল-মুগিরার সূত্রে আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আল-হারিস ইবনে হিশাম আল-মাখজুমি এবং তার সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম আল-জুহরি বলেছেন, 'আবিসিনিয়া পৌঁছলে নিগাস আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। নিরাপদে আমরা ধর্মকর্ম করে যেতে লাগলাম, আমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী করি, কথায় বা কাজে কেউ আমাদের কোন ক্ষতি করে না। কুরায়শরা এই সংবাদ জানতে পারল। তারা

ঠিক করল, দুজন দৃঢ়চেতা লোক পাঠাবে নিগাসের কাছে, মক্কার সবচেয়ে সুন্দর জিনিস পাঠাবে তাদের সঙ্গে উপহার হিসাবে। মক্কার চামড়ার সামগ্রী তখন খুব প্রসিদ্ধ। নিগাসের সভাসদদেরও উপহার দেওয়ার জন্য তারা সঙ্গে করে অনেক চামড়ার সামগ্রী নিল। তারা পাঠিয়েছিল আবদুল্লাহ এবং আমরকে। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, শরণার্থী প্রসঙ্গে নিগাসের সঙ্গে কিছু বলার আগেই যেন সভাসদদের উপহার দিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তারা দেবে নিগাসের উপহার। সভাসদদের সঙ্গে কথা বলার আগেই তাঁকে অনুরোধ করবে তাদের লোকজনদের ফেরত দেওয়ার জন্য। এই নির্দেশ আবদুল্লাহ এবং আমর অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করল। প্রত্যেক সভাসদকে তারা বলল, "রাজার দেশে এসে আমাদের কতগুলো নির্বোধ লোক আশ্রয় নিয়েছে। তারা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছে, আবার আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করেনি। তারা এমন এক নবাবিষ্কৃত ধর্ম নিয়ে এসেছে, যার সম্পর্কে আপনি বা আমরা কেউ কিছু জানি না। আমাদের নেতৃবৃন্দ আপনাদের রাজার কাছে আমাদের পাঠিয়েছেন তাদের ফেরত দেওয়ার নিমিত্ত রাজাকে অনুরোধ করার জন্য। কাজেই আমরা যখন রাজাকে বলব তাদের ফেরত দেওয়ার জন্য, তখন অনুগ্রহপূর্বক রাজাকে বলবেন শরণার্থীদের আমাদের কাছে সমর্পণ করার জন্য। বলবেন, রাজা যেন তাদের সঙ্গে কোন কথা না বলেন। কারণ ওদের লোকজনের ভীষণ অন্তদৃষ্টি, আর নিজেদের দোষত্রুটির কথা খুব ভালো করে জানে।' সভাসদরা তাদের কথায় রাযী হলো। তারপর তারা উপঢৌকন নিয়ে গেল রাজার কাছে। রাজার উপঢৌকন গ্রহণ করার পর যা তারা বলেছিল সভাসদদের কাছে শরণার্থীদের সম্পর্কে, রাজাকেও তা বলল। মুসলমানদের বক্তব্য রাজা নিগাস শুনুক এটা কিছুতেই আবদুল্লাহ্ এবং আমর চায় না। উপস্থিত সভাসদরা বলল, 'ওরা যা বলছে ঠিকই বলছে, ওদের দেশ থেকে আসা শরণার্থীদের খবর ওদেরই ভাল জানার কথা।' সুতরাং তারা রাজার কাছে সুপারিশ করল, রাজা যেন তাদের এদের কাছে সমর্পণ করেন, যাতে এরা তাদের আপন জনদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। নিগাস ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। বললেন, 'না, আল্লাহ্‌র কসম, তাদের আমি ফেরত দেবো

না। যারা আমার আশ্রয় চেয়েছে, আমার রাজ্যে ঘর বেঁধেছে, অন্যকে ফেলে আমার কাছে এসেছে তাদের সম্বন্ধে এই দুজন যা বলছে সে সম্পর্কে তাদের ডেকে তাদের সঙ্গে কথা না বলে আমি তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব না। এরা যা বলছে তা-ই যদি হয় ওরা, তাহলে ওদের আমি দিয়ে দেবো, ওদের ফেরত পাঠাবো নিজেদের লোকের কাছে। কিন্তু ওদের কথা যদি মিথ্যে হয়, তাহলে আমি তাদের রক্ষা করব, আমার আশ্রয়ে তাদের সমস্ত সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করে দেবো।'

তিনি তখন রসূল করীম (সা)-এর সঙ্গীদের ডাকলেন। রাজার দূত শমন নিয়ে এল তাদের কাছে। তারা একত্রে জমায়েত হলো, পরস্পরকে বলল, 'কি বলবে তুমি তার কাছে গিয়ে?' তারা বলল, 'আমরা যা জানি তা-ই বলব, আল্লাহ্‌র রসূল (সা) আমাদের যা বলতে বলেছেন তাই বলব, তা যাই ঘটুক কপালে।' রাজার দরবারে এসে তাঁরা দেখলেন রাজ-পুরোহিতরা ওখানে তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ খুলে বসে আছে। রাজা তাদের জিজ্ঞেস করলেন, কি তাদের এমন ধর্ম যার জন্য স্বজন স্বদেশ তারা পরিত্যাগ করেছে অথচ তার কিংবা অন্য কারো ধর্মও গ্রহণ করে নি তারা। জাফর ইবনে আবু তালিব তখন বললেন, 'মহারাজ, আমরা অসভ্য লোক ছিলাম। পুতুল পূজা করতাম, মরা জীবজন্তু খেতাম, আরো জঘন্য কাজ করতাম, স্বাভাবিক সম্পর্কের মর্যাদা রাখতাম না, অতিথিদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতাম এবং আমাদের মধ্যে সবলরা দুর্বলদের গিলে খেতো। এমনি করে আমাদের দিন কাটছিল। তারপর আল্লাহ্ আমাদের কাছে একজন নবী পাঠালেন। তাঁর বংশধারা, সত্যনিষ্ঠা এবং ভদ্রতাবোধ সম্পর্কে আমাদের কোন সংশয় নেই। তিনি আমাদের আহ্বান জানালেন, আল্লাহ্‌র একত্ব স্বীকার করে নিতে, তার উপাসনা করতে এবং যে পাথর ও প্রতিমার পূজা বংশানুক্রমে আমরা করে আসছি, তা বন্ধ করে দিতে। তিনি আমাদের সত্য কথা বলতে, আমাদের প্রতিজ্ঞা পালন করতে, আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং অতিথিদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি

আমাদের অপরাধ ও রক্তপাত থেকে বিরত থাকতে বললেন। জঘন্য কাজ, মিথ্যা কথা বলা, ইয়াতীমের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, সতী নারীর নামে কলংক আরোপ করতে তিনি নিষেধ করলেন আমাদের। তিনি আদেশ করলেন এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে, তার সঙ্গে কাউকে বা কোন কিছুকে শরীক না করতে। তিনি নামায, যাকাত এবং রোযা (ইসলামের শর্ত অনুযায়ী) পালন করতে নির্দেশ দিলেন। আমরা তাঁর সত্যকে স্বীকার করে নিলাম, তাঁর উপর ঈমান আনলাম। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তিনি যা এনেছেন, সব কিছু আমরা অনুসরণ করা শুরু করলাম। আমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন শরীক না করে তাঁর ইবাদত শুরু করলাম। তিনি যা নিষেধ করলেন, তাকে আমরা হারাম বলে জানলাম। তিনি যা হালাল করলেন তাকেই আমরা হালাল বলে জানলাম। এতেই আমাদের লোক-জন আমাদের আক্রমণ করল, আমাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করল, আমাদের ধর্ম বিশ্বাস ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র উপাসনা ছেড়ে তাদের পৌত্তলিকতায় ফিরে যেতে প্ররোচিত করল, আমরা এক সময় যে সব মন্দ কাজ করতাম তা হালাল বলে গ্রহণ করার জন্য আমাদের প্ররোচিত করতে লাগল। সুযোগ পেলেই তারা যখন আমাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করতে শুরু করল, আমাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলল, আমাদের ধর্ম তুলে কথা বলতে শুরু করল, তখন আমরা আপনার দেশে চলে আসি, কারণ অন্য সমস্ত রাজার চেয়ে আপনার উপর আমাদের আস্থা বেশি। আপনার আশ্রয়ে আমরা এখানে সুখে আছি, আমরা বিশ্বাস করি মহারাজ, যতদিন আমরা আপনার কাছে থাকব ততদিন আমাদের উপর কোন অন্যায় আপনি হতে দেবেন না।'

নিগাস জিজ্ঞেস করলেন, তাদের কাছে ঐশী কোন বস্তু আছে কিনা। জাফর বললেন, আছে। নিগাস হুকুম করলেন সে জিনিস তাকে পাঠ করে শোনাতে। তখন জাফর সূরা কাফ-হা-ইয়া-আঈন-সাদ[১] থেকে পাঠ করে শোনালেন। তার সেই পাঠ শুনে অশ্রুতে

১. সূরা ১৯।

দাড়ি সিক্ত হলো রাজার, পুরোহিতদের হাতের গ্রন্থ ভিজে গেল। তারপর নিগাস বললেন, এই বস্তু এবং যীশু যা এনেছিলেন তা একই সত্যের অংশ, তা একই উৎস থেকে এসেছে। তোমরা দুজন এখন যেতে পারো। আল্লাহ্‌র কসম, ওদের আমরা কোনদিন তাদের হাতে ছাড়ব না, তাদের প্রতি কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না।'

ওরা দুজন চলে গেল। আমর বলল, 'কালকে আমি তাকে এমন এক কথা বলব, ওদের সবার ভিত নড়ে যাবে। এদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ছিল একটু ধর্মভীরু। সে বলল, 'তা করো না' ওরা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করছে সত্য কিন্তু তবু ওরা আমাদের আত্মীয় তো!' সে বলল, ঈশ্বরের শপথ, আমি তাকে বলব যে ওরা বলে ম্যারির পুত্র যীশু একটা সৃষ্ট জীব।' ভোরবেলা সে রাজার কাছে গেল, বলল, তারা ম্যারির পুত্র যীশু সম্বন্ধে ভয়ানক এক কথা বলেছে, কাজেই তাঁর উচিত তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করা। তিনি তাই করলেন। ওদের জীবনে এমন ঘটনা আর কোনদিন ঘটেনি। সবাই জড়ো হয়ে একে অপরকে জিজ্ঞেস করতে লাগল—যীশু সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে কি তারা বলবে। তারা ঠিক করল, আল্লাহ্ যা বলেছেন, রসূল যা এনেছেন তাই তারা বলবে। তাতে যা হবার তা হবে। কাজেই তারা যখন রাজদরবারে হাযির হলো রাজা সে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, তখন জাফর জবাব দিলেন, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের নবী যে প্রত্যাদেশ পেয়েছেন তাই আমরা বলি। প্রত্যাদেশ হয়েছে, তিনি (যীশু) আল্লাহ্‌র দাস এবং তাঁর নবী এবং তার আত্মা, এবং তার বাক্য যা তিনি আশীর্বাদপুষ্ট কুমারী ম্যারির ভেতরে প্রবিষ্ট করিয়েছিলেন।' নিগাস তখন মাটি থেকে একটা দণ্ড তুলে নিলেন। বললেন, 'ঈশ্বরের শপথ! তোমরা যা যা বললে ম্যারির পুত্র যীশু তার চেয়ে এই দণ্ড পরিমাণও বেশী নন।' সে কথা শুনে উপস্থিত সভাসদরা ফোঁস ফোঁস শব্দ করে উঠল। তিনি বললেন, 'তোমরা ফোঁস কর আর যাই কর, ঈশ্বরের শপথ, আমি যা বলেছি বলেছি। তোমরা যাও, তোমরা আমার রাজ্যে নিরাপদ।'

তারপর তিনি তিনবার বললেন, 'যে তোমাদের অভিসম্পাত দেবে তাকে জরিমানা করা হবে। এক পাহাড় স্বর্ণ দিলেও কাউকে আমি তোমাদের আঘাত করতে দেবো না। ওদের উপঢৌকন ওদের কাছে ফিরিয়ে দাও; ওসবে আমার কোন প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর যখন আমাকে আমার রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন তখন আমার কাছ থেকে কোন ঘুষ নেন নি। তাহলে আমিও নেবো না। মানুষ আমার যা করতে চাইছিল ঈশ্বর আমার তা করেন নি, কাজেই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মানুষ আমাকে যা করতে বলছে, আমিই বা তা করব কেন।' সুতরাং মর্মাহত ওরা সব চলে গেল, সঙ্গে নিয়ে গেল প্রত্যাখ্যাত উপঢৌকনরাজি। আমরা রয়ে গেলাম তাঁর সঙ্গে, পরম সুখে নিরাপদে।

এমনি করে আমাদের দিন কাটছিল। তখন হঠাৎ এক বিদ্রোহী তার সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হলো। আমরা এত বিষণ্ণ জীবনে আর হই নি। আমাদের উদ্বেগ ছিল, এই বিদ্রোহী না আবার নিগাসকে কাবু করে ফেলে; কারণ নিগাস আমাদের কথা যত জানত, সে লোক তত জানত না। নিগাস তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। দুই তীরে দুই বিবদমান পক্ষ, মধ্যিখানে নীল নদ। রসূলে করীম (সা)-এর সাহাবীগণ এমন কাউকে খুঁজছিলেন যে অকুস্থলে গিয়ে যুদ্ধের খবর নিয়ে আসবে। আল-জুবায়র ইবনে আল-আওয়াম নিজে থেকে যেতে চাইল। সেই ছিল আমাদের মধ্যে কনিষ্ঠতম ব্যক্তি। পানির একটা ভিস্তি ফেলানো হলো, সেটা বুকের নিচে বেঁধে সে নীলের বুকে ঝাঁপ দিল। সাঁতরাতে সাঁতরাতে সে গেল সেই যুদ্ধস্থলে, যেখানে দুইপক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন। আরো এগিয়ে গেল সে। ওদের সামনে গিয়ে হাযির একেবারে। ইতিমধ্যে আমরা প্রার্থনা করছিলাম আল্লাহ্‌র কাছে শত্রুদের বিরুদ্ধে নিগাসকে জয়ী করার জন্য। আপন রাজ্যে তাঁর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য। প্রার্থনা করছিলাম আর কি ঘটে না ঘটে অপেক্ষা করছিলাম। তখনই আমরা দেখলাম ছুটে আসছে

আল-জুবায়র। দুহাতে উড়াচ্ছে কাপড়, চীৎকার করে বলছে, 'শুনছ, তোমরা শোন, নিগাস জয়লাভ করেছে, আল্লাহ্ তাঁর দুশমনদের নিকেশ করে দিয়েছে, আপন রাজ্যে তার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' আল্লাহ্‌র কসম, আমরা জীবনে এমন আনন্দিত আর কোনদিন হইনি। ফিরে এলেন নিগাস, আল্লাহ্ ধ্বংস করেছেন তাঁর দুশমনদের, রাজ্য তাঁর টিকে রইল, আবিসিনিয়ার সমস্ত দলপতিগণ তাকে সমর্থন জানাল। আমরা পরম আনন্দে দিন কাটাতে লাগলাম। তারপর একদিন আমরা মক্কায় গেলাম—আমাদের রসূলে করীম (সা)-এর কাছে।

কেমন করে নিগাস আবিসিনিয়ার রাজা হলেন

আল-জুহ্‌রি বলেছেনঃ রসূলে করীম (সা)-এর স্ত্রী উম্মে সালমা সূত্রে প্রাপ্ত আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান প্রদত্ত একটি হাদীস আমি উরওয়া ইবনে আল-জুবায়রের কাছে বর্ণনা করেছি। উক্ত হাদীসে আবু বকর বলেছেনঃ

তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহ্ যখন আমার সাম্রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তখন আমার কাছ থেকে তো কোন ঘুষ নেন নি যে, আমি এর জন্য এখন উৎকোচ গ্রহণ করব। বলেছিলেন, মানুষ আমার বিরুদ্ধে যা করতে চেয়েছিল আল্লাহ্ তা করেন নি, কাজেই তারা তাঁর বিরুদ্ধে যা করতে চাচ্ছে তা আমি করব কেন? এসব কথায় তিনি কি বলতে চাইছিলেন জান?' আমি বললাম, 'আমি জানি না।' তখন তিনি বললেন যে আয়েশা তাঁকে বলেছেন যে রাজা ছিলেন নিগাসের আব্বা, নিগাস ছিল তার একমাত্র পুত্র। নিগাসের এক খুল্লতাতের ছিল বারো জন পুত্র, তারা সবাই ছিল রাজপরিবারের সদস্য। আবিসিনিয়াবাসীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, 'নিগাসের আব্বাকে হত্যা করে তার ভাইকে রাজা বানালে ভাল হয়, কারণ নিগাসের মাত্র এক পুত্র, অথচ তার ভাইয়ের বারোটি ছেলে। তার ভাইয়ের পর উত্তরাধিকার নিয়ে কোন সমস্যা হবে না এবং তাতে আবিসিনিয়ার ভবিষ্যৎ চিরকালের জন্য নিরাপদ থাকবে।'

সুতরাং তারা নিগাসের আব্বাকে আক্রমণ করল, তাকে হত্যা করল, ভাইকে বানাল রাজা। এবং এমনি করে চলল বেশ কিছুকাল।

পিতৃব্যের সঙ্গে থেকে বড় হলো বালক নিগাস, বুদ্ধিমান, দৃঢ়চেতা। তিনি পিতৃব্যের উপর এত প্রভাব বিস্তার করে চললেন যে, যখন আবিসিনীয়রা তা উপলব্ধি করল, তারা তখন ভয় পেতে লাগল। ভয়—যদি সিংহাসন লাভ করে ফেলেন নিগাস, তাহলে তাদের সকলকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করবেন, কারণ তিনি জানেন যে তারাই তার পিতৃহন্তা। কাজেই তারা তাঁর পিতৃব্যের দ্বারস্থ হলো। বলল, 'হয় আপনি একে হত্যা করুন, না হয় একে নির্বাসন দিন। কারণ তার হাতে আমাদের প্রাণের আশংকা করছি আমরা।' রাজা জবাব দিলেন, 'তোমাদের মাথা খারাপ! গতকাল আমি তার পিতাকে হত্যা করেছি, আর আজকে করব তাকে? ঠিক আছে, আমি তাকে নির্বাসন দেবো।' তাকে তারা বাজারে নিয়ে গেল, এক বণিকের কাছে বিক্রি করে দিল ছয়শত দিরহামে। বণিক তাকে এক নৌকায় তুলে নিয়ে চলে গেল। এদিকে সেই সন্ধ্যাতেই হেমন্তের ঝড়ের মেঘ অন্ধকার করে দিয়েছিল আকাশ। পিতৃব্য রাজা গেলেন সেই মেঘের নিচে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে। ওখানে বজ্রপাতে মৃত্যু হল তার। আবিসিনীয়রা ভয়ে গেল তার পুত্রদের কাছে। ওখানে আরেক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। তিনি ছিলেন এক দঙ্গল নির্বোধের জনক। এর মধ্যে একটিও চোখে পড়ার মত নয়। আবিসিনিয়ার অবস্থা কাহিল হয়ে দাঁড়াল। ওরা অবস্থা বিপাকে আতংকিত হয়ে গেল, পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝে দেখো, তোমাদের রাজা, যে আমাদের সব গোলমাল মেটাতে পারবে, হলো গিয়ে এই যাকে তোমরা আজকে সকালে বিক্রি করে দিয়ে এসেছ। যদি দেশকে বাঁচাতে চাও তাহলে যাও, যেখান থেকে পারো তাকে ধরে নিয়ে এসো।'

অতএব তারা সবাই বের হলো রাজার সন্ধানে। সেই বণিকের সন্ধানে, যার কাছে বিক্রি করা হয়েছে তাঁকে। খুঁজতে খুঁজতে তাকে পাওয়া গেল। নিগাসকে বণিকের কাছ থেকে তারা নিয়ে এল প্রাসাদে, মাথায় তাঁর রাজমুকুট পরিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁকে রাজা বলে ঘোষণা করে দিল।

সেই বণিক যার কাছে বিক্রি করেছিল রাজাকে, সে এসে তাদের বলল, 'তোমরা আমার টাকা ফেরত দাও, নইলে আমি তাঁকে সব বলে দেবো।'

ওরা বলল, 'তোমাকে এক পয়সাও দেবো না।'

বণিক বলল, 'তাহলে ঈশ্বরের দিব্যি, আমি তাঁর কাছে সব খুলে বলে দেবো।'

ওরা বলল, 'যাও, বলো গে। এই তো তিনি।'

বণিক রাজার সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'মহারাজ, আমি বাজারের এইসব লোকজনের কাছ থেকে একটি যোয়ান ক্রীতদাস কিনেছিলাম ছয়শত দিরহাম দিয়ে। তারা টাকা নিয়ে ক্রীতদাস আমাকে দিয়ে দিয়েছিল। আমি ক্রীতদাস নিয়ে যখন চলে যাচ্ছিলাম, ওরা আমার পেছনে ছুটে গিয়ে আমাকে ধরল, আমার ক্রীতদাসকে জোর করে নিয়ে এল। অথচ টাকা ফেরত দেয় নি।'

নিগাস বললেন, 'হয় এর টাকা আপনারা ফেরত দিন, নয় সেই যোয়ান লোককে তার হাতে ছেড়ে দিন, যেখানে খুশি তাকে নিয়ে যাবেন ইনি।'

তারা বলল, 'না, তাকে দেব না, আমরা তাকে টাকা ফেরত দিচ্ছি।'

এইজন্য তিনি কথাগুলো বলেছিলেন। তাঁর দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব ও ন্যায়বিচারের শক্তি সম্বন্ধে এই তথ্যই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

আয়েশা সূত্রে উরওয়া ইবনে আল-জুবায়র এবং তদীয় সূত্রে ইয়াযিদ ইবনে রুমান আমাকে বলেছেন যে, আয়েশা বলেছেন : 'নিগাসের মৃত্যুর পর নাকি তাঁর কবরে সব সময় একটা আলো জ্বলত।'

নিগাসের বিরুদ্ধে আবিসিনীয়দের বিদ্রোহ

পিতার বরাত দিয়ে জাফর ইবনে মুহাম্মদ আমাকে বলেছেন যে, আবিসিনীয়রা একযোগে নিগাসের কাছে গিয়ে বলল, 'আপনি আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছেন।'

তারপর তারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

নিগাস জাফর আর সঙ্গীদের জন্য এক জাহাজ প্রস্তুত করলেন, তাদের ডেকে বললেন, 'জাহাজে উঠে তৈরী হয়ে যান। যদি আমি পরাজিত হই, যেখানে খুশি চলে যাবেন। আর যদি জয়লাভ করি তাহলে যেখানে আছেন তখন সেখানেই থাকবেন।'

তারপর একটা কাগজ নিয়ে তাতে লিখলেন, 'তিনি [রসূল (সা)] সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র দাস এবং রসূল। তিনি সাক্ষ্য দেন যে ম্যারির পুত্র যীশু তাঁর (আল্লাহ্‌র) দাস, তার আত্মা এবং তার বাক্য যা তিনি ম্যারির ভেতরে নিক্ষেপ করেছিলেন' লিখে কাগজ তার জামার ডান কাঁধের কাছে পকেটে রেখে দিলেন। তারপর তিনি গেলেন আবিসিনীয়দের কাছে। তারা সবাই তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। তিনি বললেন, 'হে জনগণ, তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে বেশি দাবী আছে না?'

তারা বলল, 'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে তোমাদের মধ্যে আমার জীবন কি রকম কাটছে বলে মনে কর তোমরা?'

ওরা বলল, 'চমৎকার।'

—'তোমাদের সমস্যাটা কি তাহলে?'

'আপনি আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছেন। আপনি বলছেন যীশু একজন ক্রীতদাস।'

'তোমরা যীশুকে কি বলো?'

'আমরা বলি, তিনি ঈশ্বরের পুত্র।'

জামার উপরে বুকের কাছে হাত রাখলেন নিগাস, যার অর্থ হয়, 'তিনি সাক্ষ্য দেন যে ম্যারির পুত্র যীশু এর চেয়ে বেশি কিছু ছিলেন না।

"এর" বলতে তিনি যা লিখেছিলেন, তা বুঝিয়েছিলেন। ওরা সব খুশি হয়ে চলে গেল।

এই সংবাদ পেঁছিল রসূল করীম (সা)-এর কানে।

নিগাসের মৃত্যুর পর তিনি তার জন্য মুনাযাত করেছিলেন, তার পাপ ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে হাত উঠিয়েছিলেন।

উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করলেন

আমর ও আবদুল্লাহ্ কুরায়শদের কাছে ফিরে এল খালি হাতে, রসূল করীম (সা)-এর সাহাবীগণকে আনতে পারে নি তারা, মাঝখান থেকে নিগাসের কাছে লাভ করেছে তীব্র গঞ্জনা। এদিকে উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি খুব কঠিন লোক, শক্ত-সমর্থ ও একগুঁয়ে। তাঁর আশ্রিত জনদের আক্রমণ করে—এমন সাহস কারো নেই। তিনি এবং হামযার বলে বলীয়ান হয়ে রসূল করীম (সা)-এর সাহাবীগণ নিজেদের অবস্থান কুরায়শদের তুলনায় দৃঢ়তর করে ফেললেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ বলতেন, 'উমরের মুসলমান হওয়ার আগে আমরা কা'বায় নামায পড়তে পারতাম না। তারপর উমর কুরায়শদের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে কা'বায় নামায পড়ল, তাঁর সঙ্গে আমরাও পড়লাম।' রসূল করীম (সা)-এর সাহাবীগণ আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পর উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

আল-বাক্কাই বলেছেন ঃ১

সা'দ ইবনে ইবরাহীমের সূত্রে মিসার ইবনে কিদাম বলেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ বলেছেন ঃ "উমরের ইসলাম গ্রহণ ছিল এক বিজয় বিশেষ, তাঁর মদীনায় হিজরত ছিল বড় রকমের সাহায্য, আর তাঁর প্রশাসন ছিল এক ঐশী অনুগ্রহ। তাঁর মুসলমান হওয়ার আগে আমরা কা'বায় নামাযই পড়তে পারতাম না। তারপর তিনি কুরায়শদের

১. এতে বোঝা যায় এটা ইবনে ইসহাকের টীকা, যা নাকি ইবনে হিশাম ব্যবহার করেছিলেন। অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে আছে 'ইবনে হিশাম বলেছেন'।

সঙ্গে যুদ্ধ করে করে কা'বায় ঢুকলেন, সেখানে নামায পড়লেন, তার সঙ্গে পড়লাম আমরা।'

আবদুর রহমান ইবনে আল-হারিস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আইয়াশ ইবনে আবু রাবি'আ বলেছেন আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমির ইবনে রাবিআর সূত্রে এবং তিনি পেয়েছেন তার আম্মা উম্মে আবদুল্লাহ বিনতে আবু হাসমা সূত্রে। জানা যায় উম্মে আবদুল্লাহ বলেছেন ঃ আমাদের তখন আবিসিনিয়া যাওয়ার দশা। আমির গিয়েছিল বাইরে কিছু দরকারী জিনিস আনতে। উমর এসে দাঁড়াল আমর পাশে। তখন সে বহু-ঈশ্বরবাদী। তার কাছ থেকে তখন বড় দুর্ব্যবহার, বড় যাতনা পাচ্ছিলাম আমরা। পাশে দাঁড়িয়ে উমর বলল, "তাহলে উম্মে আবদুল্লাহ, তুমিও যাচ্ছ?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, আমরা আল্লাহ্‌র দেশে যাচ্ছি। তোমরা তো খুনীর মতো ব্যবহার করলে আমাদের সঙ্গে। এখন আল্লাহ্ আমাদের জন্য একটা পথ খুলে দিয়েছেন।" উমর তখন বলল, "ঠিক আছে, আল্লাহ্ তোমাদের সহায় হোন।" তখন আমি দেখলাম উমরের চোখেমুখে একটা নরম বিগলিত ভাব। এমনটি ওর চেহারার মধ্যে আমি আগে কোনদিন দেখিনি। ও চলে গেল। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, আমরা চলে যাব এটা তার কাছে খুব পীড়াদায়ক মনে হচ্ছে। দরকারী জিনিস নিয়ে একটু পর ফিরে এল আমির। আমি তাকে বললাম, "একটু আগে উমর এসেছিল, আহা! তুমি যদি ওর চোখেমুখে আমাদের জন্য মায়া আর দুঃখ যেমন উথলে উঠছিল, দেখতে আবদুল্লাহ্‌র বাপ!" তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ও মুসলমান হবে বলে আমার আশা আছে কিনা। আমি বললাম যে আছে। তার উত্তরে তিনি বললেন, "যে লোকটাকে তুমি দেখেছ, আল-খাত্তাবের খচ্চর মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত সে মুসলমান হবে না।" কথাটা তিনি বলেছিলেন তার প্রতি গভীর হতাশায়, ইসলামের বিরুদ্ধে তাঁর কাঠিন্য ও রূঢ়তাকে স্মরণে রেখে।

আমি যতদূর শুনেছি উমরের ইসলাম গ্রহণের বৃত্তান্ত নিম্নরূপ ঃ

তাঁর বোন ফাতিমা বিনতে আল-খাত্তাব-এর বিয়ে হয়েছিল সা'দ ইবনে যায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফায়ল-এর সঙ্গে। ওরা দুজনেই ইসলাম গ্রহণ করে। সে সংবাদ উমরের কাছে গোপন রাখল। এদিকে তারই গোত্রের বানু আদি ইবনে কাবের বংশের নুয়ায়ম ইবনে আবদুল্লাহ্ আন-নাহ্‌হামও ইসলাম গ্রহণ করে আত্মীয়-স্বজনের ভয়ে সেই কথা গোপন রাখল। খাব্বাব ইবনে আল-আরাত্ প্রায়ই ফাতিমার কাছে এসে তাকে কুর'আন পাঠ করে শোনাতেন। একদিন উমর বেরিয়ে এলেন। হাতে তলোয়ার, তিনি রসূলকে আর তাঁর সাহাবীদের চান। রসূল এবং তাঁর সাহাবীগণ প্রায় জন্য চল্লিশেক লোক তখন আস-সাফার বাড়িতে জমায়েত হয়েছিলেন। তার মধ্যে মহিলাও ছিল। রসূল করীমের সঙ্গে ছিলেন তাঁর পিতৃব্য হামযা, আবু বকর এবং আলী। এরা সবাই মুসলমান হয়েছিলেন কিন্তু আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন নি।

নুয়ায়মের সঙ্গে দেখা হলো উমরের। নুয়ায়ম তাকে কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করলেন। উমর বললেন, 'আমি ধর্মত্যাগী মুহাম্মদকে ধরতে যাচ্ছি, যে মুহাম্মদ কুরায়শদের মধ্যে ভাঙ্গন এনেছে, তাদের আচার-অনুষ্ঠানের উপহাস করেছে, তাদের ধর্মবিশ্বাসকে অপমান করেছে, তাদের দেবদেবীদের অপমান করেছে, তাকে আমি হত্যা করব।'

নুয়ায়ম বলল, 'তুমি বুঝতে পারছ না উমর, কি তুমি করতে যাচ্ছ! তুমি কি মনে কর, মুহাম্মদকে হত্যা করলে বানু আবদ মানাফ তোমাকে দুনিয়ার মাটিতে হাঁটতে দেবে? এর চেয়ে তুমি নিজের বাড়ি গিয়ে নিজের ঘর ঠিক করো না কেন?'

উমর বললেন, 'আমার ঘরের আবার কি হয়েছে?'

'তোমার ভগ্নিপতি, তোমার ভাতিজা সাঈদ, তোমার বোন ফাতিমা—সবাই তো মুসলমান হয়ে গেছে। তারা এখন মুহাম্মদের ধর্ম পালন করে। কাজেই আগে গিয়ে তাদের ঠিক কর তুমি।'

উমর ফিরে এলেন বোনের বাড়িতে। বোন এবং ভগ্নিপতিকে তখন খাব্বাব পাণ্ডুলিপি থেকে সূরা তা-হা পাঠ করে শোনাচ্ছিল। উমরের গলা শুনেই খাব্বাব একই ছোট কুঠরিতে বা অন্য ঘরে গিয়ে লুকাল। কাগজের পাতা নিয়ে ফাতিমা উরুর নিচে লুকিয়ে ফেলল। এদিকে উমর কিন্তু বাড়ির কাছে এসে খাব্বাবের পাঠ শুনে ফেলেছেন। কাজেই ঢুকেই তিনি হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'ওটা কি বাজে জিনিস আমি শুনলাম?'

ওরা বলল, "কিছু শোনোনি তুমি।"

উমর বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, আমি শুনেছি। আমি আরো শুনেছি তোমরা মুহাম্মদের ধর্ম অনুসরণ করছ।'

উমর ভগ্নিপতি সাঈদকে ধরে ফেললেন বলার সঙ্গে সঙ্গেই। ফাতিমা উঠে এসে স্বামীকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলেন। উমর ফাতিমাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিলেন। পড়ে গিয়ে ফাতিমা আঘাত পেলেন। এমনি উন্মাদের মতো আচরণ করছিলেন যখন উমর। তখন তাঁরা দু'জন বললেন, 'হ্যাঁ।' আমরা মুসলমান, আমরা আল্লাহ্‌তে এবং তাঁর রসূলের উপর ঈমান এনেছি। তোমার এখন যা খুশি করতে পার।'

উমর বোনের রক্ত দেখলেন। খারাপ লাগল তাঁর, বোনের রক্তপাত ঘটিয়েছেন তিনি। তিনি ফিরে দাঁড়ালেন। বোনকে বললেন, 'ঠিক আছে, ওই কাগজটা তোমরা যে পড়ছিলে আন ওটা আমাকে দাও, আমি দেখব কি জিনিস মুহাম্মদ এনেছে।' কারণ উমর লেখাপড়া জানতেন,. তিনি লিখতে পারতেন।

তাঁর কথার জবাবে তাঁর বোন জানালেন যে, উমরকে তা দিতে তিনি ভরসা পাচ্ছেন না।

উমর বললেন, 'ভয় নেই।'

দেবদেবীর নাম নিয়ে কসম খেলেন, পড়া হলে সে কাগজ তিনি ফেরত দেবেন। শুনে ফাতিমার মনে আশার সঞ্চার হলো, হয়তো তিনি

মুসলমান হতে পারেন। বললেন, 'ভাইজান, আপনি বহু ঈশ্বরের পূজা করেন, আপনি তাই অপবিত্র। কেবল পাক মানুষ এটা স্পর্শ করতে পারে।'

উমর উঠলেন, অযূ করলেন। তখন ফাতিমা সূরা তা-হা লেখা কাগজখানি তাঁকে প্রদান করলেন। শুরুটা পড়েই তিনি বলে উঠলেন, 'কি সুন্দর, কি মহান কথা!'

একথা শুনেই লুকানোর স্থান থেকে বেরিয়ে এলেন খাব্বাব। বললেন, আল্লাহ্‌র নামে বলছি উমর, আমার মনে হয় আল্লাহ্ তাঁর রসূলের ডাকের ভেতর দিয়ে আপনাকে এক বিশেষ আসন দেবেন। আমি কাল রাতেই রসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, "ইয়া আল্লাহ্! আবুল হাকাম ইবনে হিশাম অথবা উমর বিন আল-খাত্তাবকে দিয়ে ইসলামকে মজবুত কর।" উমর! আল্লাহ্‌র পথে আসুন, আল্লাহ্‌র কাছে আসুন।'

উমর তখন বললেন, 'ঠিক আছে, আমাকে নিয়ে চল মুহাম্মদের কাছে। আমি ইসলাম গ্রহণ করব। খাব্বাব বললেন যে রসূল করীম (সা) কতিপয় সাহাবীর সঙ্গে আস-সাফার বাড়িতে আছেন। উমর কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে রসূল করীম (সা) এবং তাঁর সাহাবীদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তিনি তাঁদের দরজায় এসে আঘাত করলেন। তাঁরা সবাই উমরের গলা শুনে চিনতে পারলেন। একজন সাহাবী দরজার ফাঁক দিকে বাইরের দিকে তাকালেন, দেখলেন খোলা তলোয়ার হাতে উমর দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি রসূলের কাছে গিয়ে বললেন, 'উমর তলোয়ার নিয়ে এসেছে।'

হামযা বললেন, 'ওকে আসতে দাও। ও যদি ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে এসে থাকে, আমরা ভাল ব্যবহার করব। আর যদি বদ মতলব নিয়ে এসে থাকে, ওর তলোয়ার দিয়েই ওকে হত্যা করব আমরা।'

রসূল করীম (সা) হুকুম দিলেন। প্রবেশ করলেন উমর।

রসূল করীম (সা) উঠে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন. তাঁর কোমর কিংবা মধ্যাঙ্গের পরিচ্ছদ জড়িয়ে ধরলেন, জোরে তাঁকে টান দিলেন,

বললেন, 'কেন এসেছেন ইবনে খাত্তাব? এখনো কি আল্লাহ্‌র পথে আসবার সময় হয় কি আপনার?'

উমর বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ্, আমি আপনার কাছে এসেছি আল্লাহ্‌র উপর আর তাঁর রসূলের উপর, রসূল আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যা বহন করে এনেছেন তার উপর ঈমান আনার জন্য।'

রসূলে করীম (সা) এত জোরে আল্লাহ্‌র কাছে শোকরিয়া আদায় করলেন যে বাড়ির সমস্ত মানুষ তা থেকে টের পেয়ে গেল যে উমর মুসলমান হয়েছেন।

সাহাবীগণ চলে গেলেন। উমর এবং হামযা উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এখন আর ভয় নেই। রসূলকে তাঁরাই রক্ষা করবেন। তাঁদের মাধ্যমেই তাঁদের দুশমনদের কাছ থেকে ন্যায়বিচার পাওয়া যাবে এখন থেকে।

উমরের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে এ-ই হলো মদীনাবাসী হাদীস বেত্তাদের ভাষ্য।

মক্কাবাসী আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু নাজিহ্, সাহাবী আতা ও মুজাহিদ অথবা অন্যান্য হাদীস বেত্তার সূত্রে বলেছেন যে, উমরের ধর্মান্তর সম্বন্ধে তিনি নিজে যা বলতেন তা হলো এরূপঃ 'আমি ইসলাম থেকে অনেক দূরে ছিলাম। সেই ধর্মবিহীন সময়ে আমি ছিলাম এক মদখোর মাতাল, সারাদিন রাত মদে চুর হয়ে থাকতাম এবং তা আমার খুব ভাল লাগত, আমি বেশ ফূর্তিতে ছিলাম। আল-হাজওয়ারায় আমাদের একটা আড্ডা ছিল, ওখানে[১] যেতো সব কুরায়শরা। জায়গাটা ছিল উমর ইবনে আবদ ইবনে ইমরান আল-মাখজুমির বাড়ির কাছে। একদিন রাতে আমি ওখানে গেলাম। আশা ছিল ওখানে আমার প্রাণের দোসরদের পাব। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, কেউ নেই ওখানে। তখন ভাবলাম, ঠিক আছে, কি যেন নাম এক মদবিক্রেতা, তখন মক্কায় মদ বিক্রি করত, তার কাছে যাব, ওর

১· এটা মক্কার বাজার ছিল।

কাছ থেকেই কিছু মদ কিনে খাব। ওখানে গিয়ে তাকেও পেলাম না। তখন ভাবলাম, তাহলে কা'বাঘরের চারপাশে সাত কি সত্তর বার তাওয়াফ করলে মন্দ হয় না। মসজিদে এলাম, তাওয়াফ করব, দেখি রসূলে করীম (সা) নামায পড়ছেন দাঁড়িয়ে। সিরিয়ার দিকে মুখ তাঁর। তাঁর এবং সিরিয়ার মাঝখানে ছিল কা'বা শরীফ। তিনি ছিলেন হজরে আসওয়াদ এবং দক্ষিণ কোণের মাঝখানে। ও'কে দেখে ভাবলাম, ঠিক আছে, একটু শুনেই দেখি না মুহাম্মদ কি বলেন? শোনার জন্য ও'র কাছে এলে তিনি ঘাবড়ে যাবেন। তাই আমি হিজরের দিক থেকে আড়াল দিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে চলে এলাম। ইতিমধ্যে মুহাম্মদ (সা) নামাযের সূরা আবৃত্তি করছেন, আমি তাঁর কিবলার কাছে চলে এলাম, আমার ঠিক সামনেই তিনি, আড়াল শুধু কা'বার। কুরআন পাঠ শোনার পর আমার মন নরম হয়ে গেল, আমি কেঁদে ফেললাম এবং তখনই ইসলাম প্রবেশ করল আমার অন্তরে। আমি ওখানে কিন্তু দাঁড়িয়েই রইলাম। এক সময় রসূল (সা)-এর নামায শেষ হলো। তিনি চলে গেলেন। যাওয়ার সময় তিনি যেতেন আবু হুসায়নের বাড়ির পাশ দিয়ে। সেটা তাঁর পথেই পড়ত। তাতে করে হাজীদের সাফা-মারওয়ার দৌড়ানোর পথ তাঁকে পার হয়ে যেতে হতো। তারপর তিনি যেতেন আব্বাস আর ইবনে আজহার ইবনে আবদু আউফ আল-জুহরির বাড়ির মাঝখান দিয়ে। তারপর আল আখনাস ইবনে শারিকের বাড়ির পাশ দিয়ে গিয়ে তিনি নিজের বাড়িতে ঢুকতেন, তাঁর বাসস্থান ছিল আল-দারুল রাকতায়। এটি ছিল মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের যিম্মায়। আমি তাঁকে অনুসরণ করে যেতে লাগলাম। যখন তিনি আব্বাস আর ইবনে আজহারের বাড়ির মাঝখানে, আমি তাঁকে ধরে ফেললাম। আমার গলা তিনি চিনলেন, ভাবলেন, আমি তাঁকে অনুসরণ করেছি, তাঁর সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করার জন্য। তাই তিনি তেড়ে উঠলেন, বললেন, 'এমন সময় আপনি এখানে!' আমি জবাব দিলাম যে আমি আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং তাঁর আনীত জিনিসের উপর ঈমান আনার জন্য এসেছি। তিনি আল্লাহ্কে তক্ষুনি শোকরিয়া জানালেন। বললেন, "আল্লাহ্ আপনাকে হিদায়ত করেছেন।" তিনি আমার বুকে বুক মিলিয়ে কোলাকুলি করলেন। প্রার্থনা

করলেন যাতে আমার ঈমানের শক্তি অটুট থাকে। তারপর আমি চলে এলাম আমার পথে। তিনি চলে গেলেন নিজ বাড়িতে।' আসল সত্য যে কি তা আল্লাহ্ জানেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের মুক্তদাস নাফি, ইবনে উমরের বরাত দিয়ে বলেছেন: আমার পিতা মুসলমান হওয়ার পর বলেছিলেন, 'তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে দ্রুত খবর চালান করতে পার ?' একজন জামিল ইবনে মা'মার আল-জুমাহি-র নাম বলল। তিনি তার কাছে গেলেন। আমি গেলাম তার পেছন পেছন, কি করেন দেখবার জন্য। আমি তখন খুব ছোট, কিন্তু সব বুঝতাম। জামিলের কাছে গিয়ে তিনি বললেন, তিনি মুসলমান হয়েছেন, মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্ম গ্রহণ করেছেন, একথা জামিল জানে কিনা। তার কথা শেষ হতে না হতেই, আল্লাহ্‌র কসম, সে লাফ মেরে উঠে মাটি থেকে জামাটা তুলেই এক দৌড়, তার পেছনে উমর আর আব্বার পেছনে আমি। মসজিদের দরজায় এসে সে প্রাণপণে চীৎকার করে উঠল, 'উমর ধর্মত্যাগ করেছে!' কা'বার সভাস্থলে তখন কুরায়শরা বসা ছিল। জামিলের পেছনে চীৎকার করে বলে উঠলেন উমর, 'মিথ্যা কথা! ও একজন মিথ্যাবাদী! আমি ধর্ম ত্যাগ করিনি, আমি মুসলমান হয়েছি। আশহাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।'

সবাই উঠে এসে একযোগে তাঁকে আক্রমণ করল। চলল যুদ্ধ দুপুর পর্যন্ত। উমর মার খেতে খেতে আধমরা হয়ে গেলেন। তিনি বসে পড়লেন। ওরা সবাই তাঁকে ঘিরে দণ্ডায়মান। তিনি বললেন, 'তোমাদের যা খুশি কর, আমি আল্লাহ্‌র নামে কসম খাচ্ছি, আমি একা না হয়ে যদি আমার সঙ্গে তিনশ জন লোক থাকত তাহলে সমানে সমানে যুদ্ধ করতে পারতাম।'

ঠিক তখুনি কুরায়শদের একজন শেখ এলেন সেখানে। ইয়ামনি আলখাল্লা আর হাতের কাজ করা জামা তার গায়ে। তিনি এসে দাঁড়ালেন, জিজ্ঞেস করলেন কি বিষয়। উমরের ধর্মান্তর গ্রহণের কথা তাঁকে বলা হল। তিনি বললেন, 'কেউ যদি নিজের ধর্ম বেছে নেয়, তাহলে বাধাটা

কিসের? তোমরা কি করতে চাচ্ছ? তোমরা কি মনে কর বানূ আদি তাদের একটা মানুষকে তোমাদের হাতে এমনি করে ছেড়ে দেবে? ওকে ছেড়ে দাও বলছি।'

আল্লাহ্‌র কসম, ওরা সব সরে গেলো, মনে হলো যেন সমস্ত কাপড় খুলে খসে পড়লো।[১]

আমার আব্বা মদীনা চলে যাওয়ার পর একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যেদিন তিনি মুসলমান হলেন। কুরায়শরা তাকে আক্রমণ করলে পরে একটা লোক এসে সবাইকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সে লোকটা কে। তিনি বলেছিলেন, সে ছিল আমার পুত্র, আল-আস ইবনে ওয়াইল আল-সাহমি।

উমরের গোত্রের কি পরিবারের লোক হবেন আবদুর রহমান ইবনে আল-হারিস। তিনি বলেছেন যে উমর বলেছেন, 'আমি যে রাতে মুসলমান হলাম, সে রাতেই আমার ইচ্ছা হচ্ছিল। রসূল (সা) এর সবচেয়ে দুর্ধর্ষ শত্রু কে হতে পারে আমি বের করব এবং তাকে গিয়ে বলব যে আমি মুসলমান হয়েছি। আবূ জেহেলের কথা আমার মনে এল।' এ দিকে উমরের মাতা হলেন হানতামা বিনতে হিশাম ইবনে আল-মুগিরা। পরদিন সকালে আমি তার দরজায় গিয়ে আওয়াজ করলাম। ও বেরিয়ে এল, বলল, 'এসো এসো, কি খবর ভাগিনে?' আমি বললাম যে, আমি তাকে বলতে এসেছি, আমি আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং তিনি যা এনেছেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। ও সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল আমার মুখের উপর। বলল, 'ঈশ্বরের অভিসম্পাত পড়ুক তোমার উপর। লানত পড়ুক তোমার এই সংবাদের উপর।'

একটি বয়কট ঘোষণার দলীল

কুরায়শরা বুঝতে পারল রসূল (সা)-এর সাহাবীগণ অন্য এক দেশে শান্তিতে নিরাপদে বসবাস করছে, শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে নিগাস,

১. অর্থ, সমস্ত ভয় অন্তর্হিত হলো।

দেখল, উমর মুসলমান হয়ে গেছেন। তিনি এবং হামযা উভয়ে রসূল (সা) ও তাঁর সাহাবীদের পক্ষে আছেন এবং ইসলাম সমস্ত গোত্রে ও বংশে দ্রুত প্রসার লাভ করছে। তখন তারা একতাবদ্ধ হল। তারা সিদ্ধান্ত নিল বানু হাশিম আর বানু মুত্তালিবকে বয়কট করে তারা একটা দলীল প্রণয়ন করবে। বয়কট অনুযায়ী ওই দুই গোত্রের কারো সঙ্গে তারা তাদের মেয়ে বিয়ে দেবে না। ওদের মেয়ে বিয়ে করবেও না এবং তাদের সঙ্গে কোন জিনিস বেচাকেনা করবে না। শর্ত সম্বন্ধে সবাই একমত হলে ওরা একটা দলীলে তা লিপিবদ্ধ করল। তারা অতঃপর সমস্ত শর্ত ঈশ্বরের শপথ গ্রহণপূর্বক মেনে নিয়ে কা'বাঘরের মধ্যিখানে তা ঝুলিয়ে রাখল, যাতে তাদের দায়-দায়িত্বের কথা সব সময় মনে থাকে। এই দলীলের লেখক ছিল মনসুর ইবনে ইকরিমা ইবনে আমির ইবনে হাশিম ইবনে আবদু মানাফ ইবনে আবদুদ্ দার ইবনে কুসাই। তার বিরুদ্ধে আল্লাহ্র কাছে অভিসম্পাত করেছিলেন রসূল (সা)। পরে তার কয়েকটি আঙ্গুল শুকিয়ে গিয়েছিল।

কুরায়শদের এবম্বিধ আচরণের পর বানু হাশিম আর বানু আল-মুত্তালিবের দুটো গোত্র আবু তালিবের সঙ্গে মিলিত হয়ে তার সঙ্গে একটি সন্ধিপত্রে আবদ্ধ হলেন। আবু লাহাব আবদুল উজ্জা বানু হাশিম থেকে বের হয়ে গেল এবং কুরায়শদের সঙ্গে হাত মিলাল।

হুসায়ন ইবনে আবদুল্লাহ্ আমাকে বলেছেন যে স্বজাতিদের ত্যাগ করে কুরায়শদের দলে ভিড়বার পর একদিন আবু লাহাব হিন্দ বিনতে উতবাকে বলেছিল, 'আল-লাত অর আল-উজ্জাকে আমি দেখি নাই? যারা তাদের ত্যাগ করে তাদের প্রতিপক্ষকে সাহায্য করেছে তাদের আমি ত্যাগ করি নাই?' হিন্দ বলেছিল, 'হ্যাঁ, তা করেছ বটে, ঈশ্বর তোমাকে তার জন্য যেন পুরস্কৃত করেন, হে আবু উতবা। আমাকে বলা হয়েছে—আবু লাহাব আরো বলেছিল, 'মুহাম্মদ এমন সব জিনিসের লোভ দেখায় যেগুলো আমি চোখে দেখি না। বলে, মরবার পর নাকি ওসব হবে। কিন্তু তারপর আমার হাতে নগদ সে কি দিতে পেরেছে? তারপর সে দুই

হাত মেলে আস্ফালন করেছে। বলেছে, 'তুমি ধ্বংস হও। মুহাম্মদ যা যা বলে তার কিছুই তো তোমার মধ্যে দেখছি না।' এর জন্যই আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ করেছিলেন, 'আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক আবু লাহাব।'[১]

কুরায়শদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কার্যকর করার পর আবু তালিব বলেছিলেন ঃ

লুআইকে, বানু কা'বের লুআইকে
আমাদের কি দশা বল।
তুমি কি জানতে না আমরা মুহাম্মদকে লাভ করেছি,
প্রাচীনতম গ্রন্থের মূসার মত যিনি এক নবী,
সমস্ত মানবকুলে কেবল তার উপর প্রেম বর্ষিত হয়েছে,
আল্লাহ্ যাকে ভালবাসেন, তার চেয়ে বড় আর কেউ নেই,
তোমাদের ঝুলানো দলীল হবে
খোঁড়া উটের[২] চীৎকারের মত এক বিপদ সংকেত ?
জাগো হে, জেগে উঠো, কবর খননের আগে,
অপরাধী আর নিরপরাধ এক হওয়ার আগে।
অপবাদকারীদের অনুসরণ করো না, ছিন্ন করবে না
আমাদের ভালবাসা আত্মীয়তার বন্ধন।
দীর্ঘকালীন লড়াই ডেকে এনো না,
যারা যুদ্ধ আনে তারাই যুদ্ধের ছোবল সহে।
মসজিদের প্রভুর শপথ, আহমদকে আমরা ছাড়ব না,
ছেড়ে দেবো না দুঃসহ দুর্ভাগ্য আর কালের আপদের হাতে,
ছাড়ব না, তোমাদের এবং আমাদের হাত, ঘাড়
কাসাসের[৩] ঝলসানো ইস্পাত কেটে না নিলে

১. কুরআন ১১১।
২. কুরআন ২৬ ঃ ১৪২-এ বর্ণিত সালিহের উটের প্রতীক।
৩. বানু আসাদের এক পাহাড়, তাতে ছিল লৌহখনি।

এক সংকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে, যেখানে ছিন্ন ভিন্ন বর্শা পড়ে থাকবে,
তৃষ্ণার্ত জনতার মত উপরে চক্কর দেবে কৃষ্ণমস্তক শকুনি।
সেখানে অশ্বের দাপাদাপি,
এবং বীরের চীৎকার, সে যুদ্ধের ক্রোধেরই মত।
আমাদের পিতা হাশিম কোমর বেঁধে কি
তলোয়ার আর বর্শা শিখিয়েছিল তাঁর পুত্রদের?
যুদ্ধে আমরা ক্লান্ত হই না, যুদ্ধ আমাদের দ্বারা ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত;
দুর্ভাগ্য এসে গেলে তাকে নিয়ে কোন অভিযোগ করি না।
আমরা আমাদের মাথা এবং শৌর্য অক্ষুণ্ণ রাখি
যখন শ্রেষ্ঠতম বীরপুরুষ ভয়ে আধমরা হয়।

এমনি করে ওদের কাটল দুই কি তিন বছর। তাদের পিঠ ঠেকল এসে দেয়ালে। তবু কখনও কখনও কুরায়শদের কাছে কোন অচেনা বন্ধুর কাছ থেকে সাহায্য আসত।

কারো কারো মুখে একটা ঘটনার কথা শোনা যায়। আবু জেহেলের সঙ্গে একদিন দেখা হল হাকিম ইবনে হিযাম ইবনে খুওয়ায়লিদ ইবনে আসাদের এক গলিপথে। হাকিমের সঙ্গে ছিল এক ক্রীতদাস, তার খালা এবং রসূল (সা)-এর স্ত্রী খাদীজার জন্য সে ময়দা নিয়ে যাচ্ছিল মাথায় করে। আবু জেহেল তার পথ আটকায়, বলে, 'বানু হাশিমের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছ? ঈশ্বরের দিব্য, তুমি আর তোমার এই খাবার এই জায়গায় আটকে রেখেই তোমাকে মক্কায় বয়কট করব।'

তখন আবুল বখতারি এলেন ওখানে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, হচ্ছে কি এখানে?'

আবু জেহেল জানাল যে, হাকিম বানু হাশিমের কাছে খাবার নিয়ে যাচ্ছে।

১. বানু আসাদের এক পাহাড়, তাতে ছিল লৌহখনি।

আবুল বখতারি বলল, 'এই খাবার তো নিয়ে যাচ্ছে তার খালার কাছে। তার খালাই তার জন্য পাঠিয়েছে। তুমি তার নিজের খাবার নিয়ে যেতে বাধা দিচ্ছ? পথ ছেড়ে দাও বলছি!'

আবু জেহেল পথ ছাড়বে না। দুজনে হাতাহাতি লেগে গেল। আবুল বখতারি উটের একটা চোয়াল নিয়ে তাকে আঘাত করল, আবু জেহেল আঘাত পেয়ে পড়ে গেল, তাকে জোরে লাথি মারল আল-বখতারি। এত সব ঘটনা একটু দূরে দাঁড়িয়ে হামযা দেখছিলেন। তারা চাইল না এই খবর রসূল (সা) কিংবা তাঁর সাহাবীদের কাছে যাক, তাদের এই দুরবস্থায় তারা আনন্দ-উল্লাসও করল না।

ওদিকে রসূল (সা) দিনরাত প্রকাশ্যে ও গোপনে তাঁর লোকজনদের নসিহত করে যাচ্ছিলেন, নির্ভয়ে প্রচার করে যাচ্ছিলেন আল্লাহ্‌র বাণী।

রসূল (সা)-এর প্রতি আপনজনের দুর্ব্যবহার

তাঁর পিতৃব্য এবং বানু হাশিমের লোকজন তাঁকে ঘিরে রাখলেন, কুরায়শদের আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করে চললেন। কুরায়শরা যখন দেখল, তাঁর নাগাল পাচ্ছে না তারা, তখন তারা তাকে নিয়ে ঠাট্টা ও হাসহাসি করতে লাগল। তার সঙ্গে কেউ কেউ ঝগড়াও শুরু করল। কুরায়শদের দুষ্টামি ও শত্রুতা প্রসঙ্গে কুরআন শরীফে আয়াত নাযিল হতে লাগল, কখনো সাধারণ ভাষায় আবার কখনো নাম ধরে। যাদের নাম ধরে আয়াত নাযিল হল, তাদের মধ্যে আছে তাঁর চাচা আবু লাহাব ও তাঁর স্ত্রী উম্মে জামিল, 'ইন্ধন বহনকারী'। আল্লাহ্ তাকে এই নাম দিয়েছিলেন, কারণ রসূলের আসা-যাওয়ার পথে সে নাকি কাঁটা পুঁতে রাখত। এই জোড়া সম্বন্ধে তাই আল্লাহ্ বলেছেন:

ধ্বংস হোক আবু লাহাব, ধ্বংস হোক হাত তার
তার বিত্ত রোজগার কোন কাজে আসে নাই তার,
দগ্ধ হবে সে লেলিহান অগ্নিতে,

ইন্ধন বহনকারী তার স্ত্রীও জ্বলবে তাতে
তার গলা চেপে থাকবে খেজুর আঁশের দড়ি।[১]

আমাকে কে যেন বলেছে যে, ইন্ধন বহনকারী উম্মে জামিল যখন শুনল যে তার ও তার স্বামী সম্বন্ধে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, তখন যে পাথরের একটা নোড়া নিয়ে ছুটে গিয়েছিল রসূল (সা)-এর কাছে। তিনি তখন কা'বা মসজিদের পাশে আবু বকরের সঙ্গে বসা ছিলেন। সে ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিন্তু রসূল (সা)-কে দেখতে পেল না, দেখতে পেল কেবল আবু বকরকে। আবু বকরকে সে তার সঙ্গী কোথায় জিজ্ঞেস করল 'কারণ আমি জানলাম সে আমাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছে, হিজা[২] বানিয়েছে, ঈশ্বরের কসম, তাকে পেলে আমি এই পাথর দিয়ে তার মুখ থেঁতলে দেব। ঈশ্বরের কসম, আমি একজন কবি। তারপর বলল সে :

ওই হতচ্ছাড়াকে আমরা জানি না,
তার বাক্য আমরা মানি না
তার ধর্ম আমরা না পছন্দ করি, ঘৃণা না করে পারি না।[৩]

এই বলে সে চলে গেল। আবু বকর রসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, সে তাঁকে দেখতে পেয়েছিল কি না। রসূল (সা) বললেন যে, সে তাঁকে দেখতে পায় নি, কারণ আল্লাহ্ তার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন।

রসূলকে কুরায়শরা গালি দিত 'মুজাম্মাম' বলে। তিনি বলতেন, 'তোমাদের অবাক লাগে না দেখে, কুরায়শরা যে ক্ষতি আমার করতে চায় আল্লাহ্ তা প্রতিহত করেন? ওরা আমাকে শাপশাপান্ত করে, আমাকে ব্যঙ্গ করে বলে 'মুজাম্মাম' (ঘৃণ্য) 'অথচ আমি মুহাম্মদ (প্রশংসিত)।'

আরেকজনের কথা আছে কুরআনে। সে হলো উমাইয়া ইবনে খালাফ ইবনে ওয়াহাব ইবনে হুযায়ফা ইবনে জুমাহ। রসূল (সা)-কে দেখলেই সে

১. সূরা ১১১।
২. হিজা—ব্যঙ্গ কবিতা
৩. মূল কবিতা ছন্দোবদ্ধ।

তাঁকে যা-তা অপবাদ দিত এবং গালি দিত। তাকে নিয়ে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'দুর্ভোগ নামুক তাদের উপর, যারা সম্মুখে ও পশ্চাতে লোকের নিন্দা করে; যে অর্থ জমায় ও বারবার তা গণনা করে, যে মনে করে তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে। না, তা কখনো হবে না। সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামা নরকে; হুতামা কী তা কি তুমি জান? সে হলো আল্লাহ্‌র প্রজ্বলিত হুতাশন, তা গ্রাস করবে হৃদয়কে। সে আগুন তাদের পরিবেষ্টিত করে রাখবে দীর্ঘ দীর্ঘ স্তম্ভে।'[১]

রসূল (সা)-এর সঙ্গী খাব্বাব ইবনে আল-আরাত্ ছিলেন মক্কার একজন কামার। তিনি তলোয়ার বানাতেন। কিছু তলোয়ার তিনি বিক্রি করেছিলেন আল-আস ইবনে ওয়াইলের কাছে। এইজন্য তার কাছে কিছু টাকা পেতেন। টাকার তাগিদ নিয়ে একদিন তিনি তার কাছে গেলেন। সে বলে উঠল, 'আরে, তোমার বন্ধু মুহাম্মদ, যার ধর্ম তুমি মান, সে বলে না যে বেহেশ্‌তে খালি সোনা-রুপা, কাপড়-চোপড়, চাকর-বাকর, যা চাও তা-ই পাবে?'

খাব্বাব বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'তাহলে কিয়ামতের দিন ইস্তক আমাকে একটু সময় দাও না বাপু, আমার ওই বাড়িতে গিয়েই তোমার ঋণ আমি শোধ করে দেব। কারণ ঈশ্বরের কসম খেয়ে বলছি, ঈশ্বরের কাছে তোমার আর তোমার বন্ধুর চেয়ে আমার প্রভাব কিছু কম হবে না, সে আমার চেয়ে বেশি হিস্‌সা পাবে না হে।'

তখন তার সম্বন্ধে নাযিল করলেন, 'তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, 'আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবেই। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়ে গেছে?' এখান থেকে 'সে যা বলে তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার কাছে আসবে নিঃসঙ্গ অবস্থায়' এই পর্যন্ত।[২]

১. সূরা ১০৪।
২. কুরআন ১৯ : ৭৭—৮০।

আমি শুনেছি, আবূ জেহেল একদিন এসে রসূল (সা)-কে বলল, 'ঈশ্বরের দোহাই মুহাম্মদ, হয় তুমি আমাদের দেবদেবীদের গালি-গালাজ বন্ধ করবে, না হয় আমরাও তোমার ওই আল্লাহ্‌কে গালি-গালাজ শুরু করব।' এর উপর আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ, 'আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তারা যাদের ডাকে, তোমরা তাদের গালি দিও না, কেননা, তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞানতাবশত তাহলে আল্লাহ্‌কেও গালি দেবে।'[১]

আমার কাছে কে যেন বলেছে, এরপর রসূল (সা) তাদের দেবদেবীদের আর সমালোচনা করেন নি, কেবল তাদের আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করতেন।

যখন রসূল (সা) কোন বৈঠকে বসতেন, লোকজনকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করতেন, কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং পূর্ববর্তী পুরুষদের পরিণতির কথা বলে তাদের সাবধান করতেন, তখন আন-নযর ইবনে আল-হারিস ইবনে আল-কামা ইবনে কালাদা ইবনে আবদু মানাফ তা শুনত। রসূল করীম (সা) উঠে চলে গেলে সে তাঁকে অনুসরণ করে সবাইকে বীর রুস্তম ইসফান্দিয়ার ও পারস্যের রাজাদের কাহিনী শুনাত। বলত, 'ঈশ্বরের কসম, মুহাম্মদ তো আর তার চেয়ে ভাল গল্প বলতে পারে না! সে তো পুরনো কিসসা-কাহিনী নকল করে কথা বলে, এই আমি যেমন বললাম।'

তখন আল্লাহ্ তার সম্পর্কে বললেন, 'এবং তারা বলে প্রাচীনকালের গল্প-কাহিনী এগুলো, এগুলো সে নকল করে রেখেছে, এগুলো দিনরাত তাকে পাঠ করে শোনান হয়। বলুন, যিনি আকাশ ও মাটির রহস্য জানেন তিনি এটা প্রেরণ করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি দয়ালু, ক্ষমাশীল।'[২]

তার সম্পর্কে বলা হয়েছে 'তার কাছে আমার আয়াত আবৃত্তি করা হলে সে বলে, 'এ তো সেকালের উপকথা।'[৩]

১. কুরআন ৬ঃ ১০৮।
২. কুরআন ৮৩ঃ ১৩।
৩. কুরআন ৮৩ঃ ১৩।

আবার বলা হয়েছে, 'দুর্ভোগ আছে প্রত্যক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর, যে আল্লাহ্‌র আয়াতের আবৃত্তি শুনে অথচ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে নিজ মতবাদে অটল থাকে, যেন সে তা শুনে নি। তাকে এক মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।'[১]

একদিন রসূল (সা) বসা ছিলেন কা'বা মসজিদে। এটা আমার শোনা ঘটনা। সঙ্গে ছিলেন আল-ওয়ালিদ ইবনে আল-মুগিরা। একটু পর আন-নযর ইবনে আল-হারিস এসে ওদের সঙ্গে বসল। ওখানে কতিপয় কুরা-য়শও ছিল। রসূল (সা) যখন কথা বলছিলেন তখন আন-নযর বাধা দিচ্ছিল। তারপর রসূল (স) তার সঙ্গে কথা বলে তার মুখ বন্ধ করালেন। তারপর তাকে এবং উপস্থিত সবাইকে পড়ে শোনালেন, 'নিশ্চয়ই তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর তারা জাহান্নামের ইন্ধন। তোমরা তাতে প্রবেশ করবে। যদি তারা ইলাহ্ হতো তাহলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত না। ওরা সবাই তাতে (জাহান্নামে) স্থায়ীভাবে থাকবে। সেখানে অংশীবাদীরা চীৎকার করবে, কিন্তু তারা কেউ কিছু শুনতে পাবে না।'[২]

রসূল করীম (সা) তখন উঠলেন। ওখানে এসে বসল আবদুল্লাহ্ ইবনে আল-জিবারা আস-সাহমি। আল ওয়ালিদ তাকে বলল: 'ঈশ্বরের কসম! এই একটু আগে আন-নযর আবদুল মুত্তালিবের নাতির সঙ্গে টিকতে পারল না, আর মুহাম্মদ বলেছে যে আমরা আর আমাদের দেবতারা নাকি জাহান্নামের ইন্ধন।'

আবদুল্লাহ্ বলল: আমি ওকে পেলে প্রতিবাদ করতাম। মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস কর তো, "আল্লাহ্ ছাড়া জেহেনায় আর যাদের পূজা করা হচ্ছে এবং যারা পূজা করছে, তারা সবাই কি জাহান্নামের ইন্ধন?" আমরা পূজা করি দেবতাদের, য়াহুদীরা পূজা করে উজায়েরের, খৃস্টানরা পূজা করে ম্যারির পুত্র যীশুকে।" আল ওয়ালিদ এবং অন্য যারা উপস্থিত ছিল সবাই আবদুল্লাহ্‌র কথায় চমকিত হলো। ওদের মনে হলো

১. কুরআন ৪৫ : ৭।

২. কুরআন ২১ : ৯৮।

আবদুল্লার যুক্তির খুব ধার। রসূল করীম (সা)-কে একথা বলা হলে তিনি বললেন : 'আল্লাহ্ ছাড়া আর যে সমস্ত জিনিস পূজা পেতে চায় তারা যারা তাদের পূজা করে তাদের সঙ্গে থাকবে। তারা পূজা করে কেবল শয়তানকে আর যাদের তারা হুকুম করে তাদের।'

এদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, 'যাদের জন্য আমার কাছ থেকে পূর্ব থেকে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে, তাদের সেই কল্যাণ থেকে দূরে রাখা হবে। তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং ওখানে তারা তাদের খায়েশমতো চিরকাল তা ভোগ করবে।'[১] এর অর্থ ম্যারির পুত্র যীশু, উজায়ের এবং রাব্বি ও পুরোহিতদের যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করেছে এবং যাদের বিভ্রান্ত মানুষ আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে প্রতিপালক হিসেবে পূজা করে। তারা যে বলে তারা দেবতার কিংবা ফিরিশতার পূজা করে এবং তারা আল্লাহ্‌র কন্যা, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেছেন, 'তারা বলে, "দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।" তিনি পবিত্র, মহান। তাঁরা তো সম্মানিত দাস। তাঁরা প্রভুর আগে কথা বলেন না, তাঁরা তাঁদের প্রভুর নির্দেশমতো কাজ করে থাকেন।" এখান থেকে "তাদের মধ্যে যে বলবে 'আমিই ইলাহ্ তিনি ব্যতীত' তাকে আমি শাস্তি দেব জাহান্নামের, অমনি করে আমি সীমালংঘনকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি" এই পর্যন্ত।[২]

ম্যারির পুত্র যীশু যে আল্লাহ্ ছাড়াও পূজিত হতেন এবং তার যুক্তি তর্ক ও উপস্থিত সবার চমকিত হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, 'এবং যখন মরিয়ম-তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করে দেয়'[৩] অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তোমরা মেনে নিতে চাও না।

১. কুরআন ২১ : ১০১।
২. কুরআন ২১ : ২৬—২৯।
৩. কুরআন ৪৩ : ৫৭।

তারপর তিনি (আল্লাহ্) ম্যারির পুত্র যীশুর উল্লেখ করেন। বলেন, সে তো ছিল আমারই এক দাস, তাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম, বানিয়েছিলাম বনি-ইসরাইলের আদর্শস্বরূপ। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের পরিবর্তে ফিরিশতাদের পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করতে পারি। নিশ্চয়ই তার কাছে কিয়ামতের জ্ঞান ছিল। সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ করো না, আমাকে অনুসরণ করো। এটাই সরল পথ।' অর্থাৎ তাঁকে আমি যে মৃতকে জীবিত করার এবং রুগ্নকে সুস্থ করার ক্ষমতা দিয়েছিলাম, তাতেই নিহিত ছিল কিয়ামতের জ্ঞানের যথেষ্ট প্রমাণ। তিনি তাই বলেন, 'এ বিষয়ে কোন সন্দেহ পোষণ করো না, আমাকে অনুসরণ করো। এটাই সরল পথ।'

বানু জুহরার মিত্র আল-আখনাস ইবনে শারিক ইবনে আমর ইবনে ওয়াহাব আস-সাকাফি আপন সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা ছিলেন। তাঁর কথা শ্রদ্ধাভরে শুনতো সবাই। সে রসূল (সা)-কে বড় যন্ত্রণা দিত। রসূল (সা)-এর সব কথায় বাগড়া দিত, প্রতিবাদ করত। তার সম্বন্ধে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ, 'যে কথায় কথায় শপথ গ্রহণ করে, লাঞ্ছিত, একের কথা অপরের কাছে লাগায়, পশ্চাতে নিন্দাকারী, তাকে অনুসরণ করো না' এখান থেকে 'জানিম' শব্দ পর্যন্ত।[১]

'জানিম' শব্দটি তার বংশকে অপমান করার উদ্দেশ্যে 'ইতর' অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, তাকে যে বিশেষণে ভূষিত করা হতো তা-ই কেবল তিনি সমর্থন করেছেন। 'জানিম' মানে সম্প্রদায়ের দত্তক সদস্য। অন্ধ যুগে আল-খাতিম আত্-তামিমি বলেছিলেন ঃ

বাইরের লোককে ডেকে আনে ওরা ফালতুর মতো,
পশুচর্মে পা যেমন বাজে অতিরিক্ত তেমনি।

আল-ওয়ালিদ বলেছিল, আমি হলাম কুরায়শদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, সাকিফের নেতা আবু মাসউদ আমর ইবনে উমায়র আস-সাকাফির কথা না হয় বাদ দিলাম। তায়েফ আর মক্কায় আমাদের দুইজনকে বাদ দিয়ে

১. কুরআন ৬৮ ঃ ১০—১৩।

মুহাম্মদের কাছে আল্লাহ্ ওহী পাঠাচ্ছেন?' আমি শুনেছি এইজন্য তার সম্বন্ধে ওহী নাযিল হয়েছিল। 'তারা বলল, এই কুরআন যদি দুই শহরের এক মহান নেতার উপর নাযিল হতো' এখান থেকে, 'তারা যা জমা করে' এই পর্যন্ত।[১]

উবায় ইবনে খালাফ ইবনে ওয়াহাব ইবনে হুযাফা এবং উকবা ইবনে আবু মুয়াইত ছিল খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। উকবা একদিন রসূল করীম (সা)-এর কাছে বসে তাঁর কথা শুনছিল। সেই কথা জানতে পারল উবায়। উবায় তাকে ধরল। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি নাকি মুহাম্মদের সঙ্গে বসে তার কথা শুনেছ? ঈশ্বরের নামে কসম খাচ্ছি, আর যদি কোনদিন এই কাজ কর অথবা ওর মুখে গিয়ে থুতু ফেলে না আস, তাহলে তোমার মুখ দেখব না, তোমার সঙ্গে কথা বলব না। আল্লাহ্র শত্রু তা-ই করেছিল, তার উপর আল্লাহ্র লানত পড়ুক। এই দুজন সম্বন্ধে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ, "যেদিন সীমালংঘনকারী আপন দুই হাত কামড়াতে কামড়াতে বলবে, 'হায় আমি যদি রসূলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতাম' এখান থেকে 'মানুষকে পরিত্যাগ করে' পর্যন্ত।

উবায় রসূল করীম (সা)-এর কাছে একটা পুরনো হাড্ডি নিয়ে গিয়ে তা টুকরো টুকরো করল। বলল, 'মুহাম্মদ তোমার মতে আল্লাহ্ এই হাড্ডি আবার পুনরুজ্জীবিত করতে পারবে?'

তারপর সে সেগুলো হাতে পিষে গুড়ো গুড়ো করে রসূল করীম (সা)-এর মুখের উপর ছুঁড়ে মারল। রসূল করীম (সা) জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, পারবেন। আল্লাহ্ এটাকে এবং এটার মত হলে পরে তোমাকে পুনরুত্থিত করবেন। তারপর তিনি তোমাদের দোযখে পাঠাবেন।' তখন আল্লাহ্ তাদের সম্বন্ধে প্রত্যাদেশ করলেন, 'মানুষ আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে অদ্ভুত কথা রচনা করে। অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। এবং বলে পচে যাওয়া এই অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে? বল, এর

১. কুরআন ৪৩ : ৩০।

মধ্যে প্রাণ তিনিই সঞ্চার করবেন, যিনি এটা প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি সমস্ত সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা দিয়ে আগুন জ্বাল।[১]

আমাকে বলা হয়েছে রসূল করীম (সা) যখন কা'বা তওয়াফ করছিলেন একদিন, তখন আল-আসওয়াদ ইবনে আল-মুত্তালিব ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উয্‌যা, আল-ওয়ালিদ ইবনে আল-মুগিরা, উমাইয়া ইবনে খালাফ এবং আল-আস ইবনে ওয়াইল আস-সাহমি তাঁর সঙ্গে দেখা করল। এরা সবাই স্ব স্ব সম্প্রদায়ে মান্যগণ্য লোক। তারা বলল, 'মুহাম্মদ' তুমি যার উপাসনা করছ, আমরা তার উপাসনা করব এবং তুমিও আমরা যাদের উপাসনা করি তার উপাসনা করবে। তুমি এবং আমরা মিলে এক হয়ে যাব। তুমি যার ইবাদত কর সে যদি আমরা যার উপাসনা করি তার চেয়ে ভালো হয় তাহলে তার অংশ আমরা নেবো। আবার আমরা যার উপাসনা করি তা যদি তোমারটার চেয়ে ভালো হয় তার অংশ তুমি নেবে। এদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ নাযিল করলেন, 'বল হে অবিশ্বাসিগণ, তোমরা যার পূজা কর তাকে আমি পূজা করি না। আমি যার ইবাদত করি তার ইবাদত তোমরা কর না এবং তোমরা যার ইবাদত কর তার ইবাদত আমি করব না, এবং আমি যার ইবাদত করি তার ইবাদত তোমরা করবে না। তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার।[২]

(তাবারির মতঃ রসূল করীম (সা) আপন লোকজনদের ভালমন্দ চিন্তায় থাকতেন। তাদের আকর্ষণ করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতেন। তাদের দলে ভিড়ানোর জন্য কোন পন্থা উদ্ভাবনের জন্য আকুলি বিকুলি করতেন বলে কোথাও কোথাও উল্লেখ আছে। একটি পন্থার কথা ইবনে হামিদ আমার কাছে বলেছেন। বলেছেন যা সালামা বলেছেন ইবনে ইসহাক মদীনার ইয়াযিদ ইবনে যিযাদ সূত্রে ও ইয়াযিদ যা পেয়েছিলেন ইবনে কা'ব আল-কারাজির সূত্রে। পন্থাটি হলোঃ

১. কুরআন ৩৬ঃ ৭৮।

২. সূরা ১০৯।

রসূল করীম (সা) দেখলেন, তাঁর নিজের লোক তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। অাল্লাহ্‌র কাছ থেকে তিনি যা এনেছেন তার প্রতি তাদের বৈরী মনোভাব। এসব দেখেশুনে খুব কষ্ট পেতেন তিনি। ভাবতেন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যদি এমন একটা ওহী আসত যাতে তাঁর নিজের লোকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো হয়ে যায় তাহলে খুব ভালো হত। তিনি তাদের ভালবাসতেন, তাদের ভালমন্দ নিয়ে চিন্তা করতেন। কাজেই তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে যে বাধা উপস্থিত হচ্ছে তা দূর হয়ে গেলে ভালো হতো। কাজেই এর উপর তিনি ধ্যান করলেন, এটা তিনি মনে প্রাণে চাইলেন, এই জিনিস (ভাবনা) তাঁর কাছে খুব প্রিয় হয়ে দেখা দিল। তারপর আল্লাহ্ ইরশাদ করলেন, অস্তগামী নক্ষত্রের শপথ, তোমাদের সঙ্গী বিপথগামীও নয়, সে মনগড়া কথাও বলে না, এখান থেকে তোমরা কি ভেবে দেখেছ 'লাত' ও 'উজ্জা' সম্বন্ধে এবং তৃতীয় বস্তু 'মানাত' সম্বন্ধে? আল্লাহ্‌র এই বাণী পর্যন্ত এলেন তখন শয়তান, যে তার এই ধ্যান ও স্বজনদের সঙ্গে আপোসের ব্যাপারটা পছন্দ করছিল না, সে করল কি তার জিহ্‌বায় জুড়ে দিল, এরা হল মহান গারানিক,[১] যার মধ্যস্থতা অনুমোদিত।

কুরায়শরা এটা শুনে খুব আহ্লাদিত হয়ে গেল, তাদের দেবদেবী সম্পর্কে এমন প্রশংসাসূচক উক্তি শুনে তারা খুব খুশি হলো এবং তারা তার কথা শুনতে মনোযোগী হয়ে উঠল। বিশ্বাসিগণ কিছুই সন্দেহ করল না, তাদের রসূল (সা) আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যা আনেন তাই সত্য। তাতে কোন ভুল-ত্রুটি কিংবা মিথ্যে কামনা থাকতেই পারে না। সূরার শেষে সিজদার জায়গায় রসূল করীম (সা) সিজদা দিলেন। তাঁরাও দিলেন কারণ রসূল করীম (সা)-কে মান্য করা তাদের কর্তব্য। বহু-ঈশ্বরবাদী কুরায়শ এবং অন্যান্য যারা ছিল সেখানে, তারাও সিজদা করল, কারণ রসূল করীম (সা) তাদের দেবদেবীর নাম নিয়েছিলেন। কাজেই দেখা গেল, মসজিদের ভেতরে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সবাই সিজদায় প্রণত হলো। আল-ওয়ালিদ ইবনে আল-মুগিরা খুব বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি নত হতে পারতেন না, কাজেই তিনি সিজদায় যেতে পারেন না। এক মুঠো ধুলি

১. বড় আকৃতির পাখি বিশেষ। আকাশে অনেক উপর দিয়ে উড়ে থাকে।

হাতে নিয়ে তাতেই মাথা ঠেকিয়েছিলেন। তারপর সবাই যে যার পথে চলে গেল। কুরায়শরা আনন্দে আটখানা। তারা বলতে লাগল, 'মুহাম্মদ আমাদের দেবতা সম্পর্কে যা সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি তার আবৃত্তিতে বলেছেন তাদের দেবতারা হলেন গারানিক, যার মধ্যস্থতা অনুমোদিত।'

আবিসিনিয়ায় রসূল করীম (সা)-এর সাহাবাগণের কানে গেল সে কথা। তারা শুনল কুরায়শরা সব মুসলমান হয়ে গেছে। অতএব কিছু লোক তক্ষুনি রওয়ানা হয়ে গেছেন, কিছু থেকে গেলেন।

তখন জিবরাঈল এলেন রসূল করীম (সা)-এর কাছে। বললেন, 'এ কি করলে তুমি মুহাম্মদ? তুমি তাদের কাছে এমন কথা বলেছ, যা আমি আল্লাহ্র কাছ থেকে আনি নি, যা আল্লাহ্ কোন সময় বলেন নি।'

রসূল করীম (সা) ভীষণ ব্যথিত হলেন, তিনি আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হলেন। তখন আল্লাহ্ একটি প্রত্যাদেশ পাঠালেন, কারণ আল্লাহ্ তাঁর প্রতি বড় সদয় ছিলেন, তাঁকে শান্তি দিতে চাইতেন। তাঁর ভার লঘু করে দিতেন। তাঁকে বলতেন, তাঁর পূর্ববর্তী সমস্ত নবী ও রসূল ঠিক তাঁরই মত ইচ্ছা করতেন, ঠিক তাঁরই মত চাইতেন, শয়তান কেবল মাঝে মাঝে তাঁদের সেই চাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ইচ্ছেমতো একটা কিছু ঢুকিয়ে দিত। যেমন শয়তান এবার ঢুকিয়ে দিল তাঁর জিহ্বার মধ্যে। সুতরাং শয়তান যা ঢুকিয়েছিল তা খারিজ করে দিলেন আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্ তাঁর আপন আয়াত প্রতিষ্ঠা করলেন অর্থাৎ বলে দিলেন, 'তুমিও অন্যান্য নবী ও রসূলের মত একজন!' তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন: 'আমি তোমার পূর্বে যে সব রসূল কিম্বা নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই কিছু আবৃত্তি করেছে, তখনই শয়তান তাদের আবৃত্তিতে কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে, কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে, আল্লাহ্ তা বিদূরিত করেন। তারপর আল্লাহ্ তাঁর নিজের আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'[১] এমনি করে আল্লাহ্ তাঁর রসূলের দুঃখ মোচন

---

১. কুরআন ২২ : ৫২।

করলেন, সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত করলেন, তাদের দেবতা সম্বন্ধে যে সমস্ত শব্দ শয়তান আল্লাহ্‌র বাণীর ভিতরে প্রক্ষেপ করেছিল, তা বিদূরিত করেন। তিনি নাযিল করেন, 'তোমরা কি ভেবেছ পুত্রসন্তান তোমাদের জন্য আর কন্যা সন্তান আল্লাহ্‌র জন্য? এই রকম বণ্টন তো সঙ্গত নয়। এগুলো কতিপয় নামমাত্র, যা তোমাদের পূর্বপুরুষ ও তোমরা রেখেছ এখান থেকে তোমার প্রতিপালকই ভাল জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত এবং কে সৎপথপ্রাপ্ত এই পর্যন্ত। এর অর্থ হলো, কেমন করে তাদের দেবতাদের প্রক্ষেপ আল্লাহ্‌র সহাবস্থান করতে পারে?

শয়তানের এই প্রক্ষেপ খারিজ করে যখন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ওহী এলো, তখন কুরায়শরা বলল: "আল্লাহ্‌র সাথে তোমাদের দেবদেবীদের অবস্থান সম্পর্কে মুহাম্মদ আগে যা বলেছিল, তাতে এখন সে অনুতাপ করছে, সে তা বদল করে অন্য কিছু নিয়ে এসেছে।" এদিকে শয়তানের দেওয়া ওই শব্দগুলো সমস্ত পৌত্তলিকদের মুখে মুখে ঘুরে ফিরছিল। এখন তারা সবাই মুসলমানদের প্রতি রসূল করীম (সা)-এর প্রতি মারমুখো হয়ে উঠল। অন্যদিকে রসূল করীম (সা)-এর সাহাবীগণ যারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন, তাঁরা ফিরে আসছিলেন এই সংবাদের উপর যে মক্কার সব লোক মুসলমান হয়ে গেছে, তারা সবাই রসূল করীম (স)-এর সঙ্গে সিজদা করেছে। তাঁরা মক্কার কাছে এসে শুনলেন যে, এই খবর সত্য নয়। এখন তাঁরা আশ্রয় অথবা তাঁদের প্রত্যাবর্তন গোপন রাখার শর্ত ছাড়া ভেতরে আসতে পারছেন না। যাঁরা মক্কায় প্রবেশ করে মদীনায় হিজরত করা পর্যন্ত ওখানে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন উসমান ইবনে আফফান, সঙ্গে স্ত্রী—রসূল করীম (সা)-এর কন্যা রুকাইয়া, আবু হুযায়ফা ইবনে উতবা—সঙ্গে স্ত্রী সাহলা বিনতে সুহায়ল এবং আরো তেত্রিশ জন।

আল্লাহ্ যখন জাককুম গাছ দিয়ে তাদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছিলেন, তখন আবু জেহেল ইবনে হিশাম বলেছিল: 'মুহাম্মদ যে তোমাদের জাককুম গাছের ভয় দেখাচ্ছে, সেই গাছ তোমরা চেনো কুরায়শ ভাইসব?'

সবাই বলল যে, তারা তা চেনে না।

আবু জেহেল বলল, 'এটা হলো মাখন লাগানো ইয়াসরিবের খেজুর গাছ। ঈশ্বরের কসম, ওই গাছ পেলে সব আমরা এক টক্করে গিলে ফেলব !'

তখন তাকে নিয়ে আল্লাহ ইরশাদ করলেন, জাক্কুম গাছ হলো পাপীর খাদ্য, গলিত তাম্রের মত [১] তাদের পেটে তা ফুটতে থাকবে ফুটন্ত পানির মত অর্থাৎ আবু জেহেলের অনুমান সত্য নয়। আল্লাহ্ আরো বলেছেন, এবং সেই বৃক্ষ যা কুরআনে অভিশপ্ত হয়েছে, আমরা তাদের ভয় দেখাব কিন্তু তাতে তাদের তীব্র অবাধ্যতাই বৃদ্ধি পায়।[২]

একদিন আল-ওয়ালিদের সঙ্গে রসূল করীম (সা)-এর অনেকক্ষণ ধরে কথা হচ্ছিল। রসূল করীম (সা)-এর খুব ইচ্ছা যে ওয়ালিদ ইসলাম গ্রহণ করে। তখন সেদিক দিয়ে একজন অন্ধ লোক ইবনে উম্মে মাকতুম যাচ্ছিল। সে রসূলকে উদ্দেশ্য করে তাকে কিছু কুরআন পাঠ করে শোনাতে অনুরোধ করল। রসূল (সা) এতে খুব বিরক্ত হলো, তিনি আল-ওয়ালিদকে পথে আনার চেষ্টা করছিলেন, আর এই লোকটা তাকে বিরক্ত করছে এবং তাঁর সুযোগ নষ্ট করছে। লোকটার বিরক্তিকর কাকুতি মিনতি অসহ্য হয়ে উঠল। রসূল করীম (সা) ভ্রূকুটি করে ওখান থেকে চলে গেলেন। আল্লাহ্ তখন ইরশাদ করলেন, "অন্ধ লোকটা তাঁর কাছে এসেছিল, তিনি ভ্রূকুটি করে ওখান থেকে চলে গেলেন।" এখান থেকে গ্রন্থে তারা সম্মানিত উম্মত এবং পবিত্র এই পর্যন্ত।' তার অর্থ, আমি তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। বিশেষ কাউকে বাদ দিয়ে বিশেষ কারো জন্য তোমাকে পাঠাইনি। সুতরাং যে আমার খবর চায় তাকে বঞ্চিত করো না, আর যে তা চায় না, তার পেছনে সময় নষ্ট করো না।

---

১. কুরআন ৪৪ : ৪৩।

২. কুরআন ১৭ : ৬০।

৩. কুরআন ৮০।

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের প্রত্যাবর্তন

রসূল করীম (সা)-এর সাহাবীদের যারা আবিসিনিয়া চলে গিয়েছিলেন তাঁরা যখন শুনতে পেলেন যে মক্কার সব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে তখন তারা স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল। কিন্তু মক্কার কাছে এসে তাঁরা শুনলেন সে সংবাদ সত্য নয়। তাঁদের তখন নগরীতে প্রবেশ করতে হলো হয় কোন নগরবাসীর আশ্রয়ে অথবা সঙ্গোপনে। এঁদের কেউ কেউ মক্কায় তাঁর সঙ্গে বসবাস করছিলেন, তারপর তাঁর সঙ্গে মদীনায় হিজরত করেছিলেন, রসূল করীম (সা)-এর সঙ্গে বদর ও ওহুদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। অন্যান্যরা রসূল করীম (সা) থেকে একটু দূরে দূরে ছিলেন বদর ও ওহুদ যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত। এদের অনেকেই মক্কায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এঁরা হলেন ঃ

বানু আবদু শামস ইবনে আবদু মানাফ ইবনে কুসাই থেকে ঃ উসমান ইবনে আফ্‌ফান ইবনে আবদুল আস ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদু শাম্‌স ও তাঁর স্ত্রী রসূল করীমের কন্যা রুকাইয়া, আবু হুযায়ফা ইবনে উতবা ইবনে রাবিআ ও তাঁর স্ত্রী সাহ্‌লা বিনতে সুহায়ল ইবনে আমর এবং তাঁদের একজন মিত্র আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহশ ইবনে রিয়াব।

বানু নওফেল ইবনে আবদু মানাফ থেকে ঃ উতবা ইবনে গাজওয়ান। ইনি ছিলেন কায়স ইবনে আয়লান গোত্রভুক্ত একজন মিত্র তাদের।

বানু আসাদ ইবনে আবদুল উজ্জা ইবনে কুসাই থেকে ঃ আল-জুবায়র ইবনে আল-আউয়াম ইবনে খুওয়ায়লিদ ইবনে আসাদ।

বানু আবদুদ্ দার ইবনে কুসাই থেকে ঃ মুস'আব ইবনে উমায়র ইবনে হাশিম ইবনে আবদু মানাফ, সুয়ায়বিত ইবনে সাদ ইবনে হারমালা।

বানু আবদ বিন কুসাই থেকে ঃ তুলায়ব ইবন উমায়র ইবনে ওয়াহাব।

বানু জুহরা ইবনে কিলাব থেকে ঃ আবদুর রহমান ইবনে আউফ ইবনে আবদু আউফ ইবনে আবদ ইবনে আল-হারিস ইবনে জুহ্‌রা, আল-মিকদাদ ইবনে আমর, ইনি একজন মিত্র ছিলেন এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, ইনিও মিত্র।

বানূ মাখজূম ইবনে ইয়াকাজা ঃ আবূ সালামা ইবনে আবদুল আসাদ ইবনে হিলাল ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ও তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা বিনতে আবূ উমাইয়া ইবনে আল-মুগিরা; শাম্মাস ইবনে উসমান ইবনে আশ-শারিদ ইবনে সুওয়ায়দ ইবনে হারমি ইবনে আমির, সালামা বিনতে হিশাম ইবনে আল-মুগিরা। এ'কে তাঁর চাচা বন্দী করে রেখে-ছিলেন, কাজেই ইনি বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধের আগে মদীনা যেতে পারেন নি; আইয়াশ ইবনে আবূ রাবিআ ইবনে আল-মুগিরা। ইনি রসূল করীম (সা)-এর সঙ্গে মদীনা হিজরত করেন, তাঁর সঙ্গে গিয়ে-ছিলেন মাতার দিক থেকে তার দুই ভাই। তাঁরাই তাঁকে মক্কায় নিয়ে আসেন এবং তিন যুদ্ধ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের তত্ত্বাবধানে রাখেন। তাঁর এই ভাইদের নাম আবূ জাহেল ও আল-হারিস—উভয়ের পিতা হিশাম। এদের সঙ্গে একজন মিত্র ছিলেন আম্মার ইবনে ইয়াসির। ইয়াসির আবিসি-নিয়ায় গিয়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এবং মুত্তালিব ইবনে আউফ ইবনে আমির ইবনে খুজা'।

বানূ জুমাহ ইবনে আমর ইবনে হুসায়ন ইবনে কা'ব থেকে ঃ উসমান ইবনে মাজুন ইবনে হাবিব ইবনে ওয়াহাব ইবনে হুযাফা ও তাঁর পুত্র আস-সাইর ইবনে উসমান ঃ কুদামা ইবনে মাজউন এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে মাজউন।

বানূ সাহম ইবনে আমর ইবনে হুসায়ন ইবনে কা'ব থেকে ঃ খুনায়স ইবনে হুযাফা ইবনে কায়স ইবনে আদি, হিশাম ইবনে আল-আস ইবনে ওয়াইল। মক্কায় একে বন্দী করে রাখা হয়েছিল রসূল করীম (সা)-এর মদীনায় হিজরত করার পর। তিন যুদ্ধের পর-তাঁকে মুক্ত করা হয়।

বানূ আদি ইবনে কা'ব থেকে ঃ আমির ইবনে রাবিআ, তাদের একজন মিত্র ও তার স্ত্রী লায়েলা বিনতে আবূ হাতমা ইবনে হুযাফা ইবনে গানিম।

বানূ আমির ইবনে লুআই থেকে ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে মাখরামা ইবনে আবদুল উজ্জা ইবনে আবূ কায়স, আবদুল্লাহ্ ইবনে সুহায়ল ইবনে

আমর। রসূল করীম (সা)-এর মদীনায় হিজরত করার সময় এঁকে বন্দী করে রাখা হয়, বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকালে পৌত্তলিক কুরায়শদের পক্ষ ত্যাগ করে রসূল করীম (সা)-এর পক্ষে যোগ দেন। আবু সাবরা ইবনে আবু রুহম ইবনে আবদুল উজ্জা ও তাঁর স্ত্রী উম্মে কুলসুম বিনতে সুহায়ল ইবনে আমর; সাকরান ইবনে আমর ইবনে আবদু শামস ও তাঁর স্ত্রী সাওদা বিনতে জামাআ' ইবনে কায়স। রসূল করীম (সা)-এর হিজরতের আগেই ইনি মক্কায় ইন্তেকাল করেন, রসূল করীম (সা) তাঁর বিধবা সাওদাকে শাদী করেন। সবশেষে সাদ ইবনে খাওলা, তাদের একজন মিত্র।

বানু আল-হারিস ইবনে ফিহর থেকে: আবু উবায়দা ইবনে আল-জাররা, তার অন্য নাম ছিল আমির ইবনে আবদুল্লাহ্, আমর ইবনে আল-হারিস ইবনে জুবায়র ইবনে আবু শাদ্দাদ, সুহায়ল ইবনে বায়দা, ইনি হলেন ওয়াহাব ইবনে রাবিআ ইবনে হিলালের পুত্র, এবং আবু সার ইবনে রাবিআ ইবনে হিলাল।

আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় আগত তাঁর সাহাবাদের মোট সংখ্যা ছিল তেত্রিশ। আশ্রয়দানের কড়ারে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন বলে যাদের নাম আমাদের দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন, উসমান ইবনে মাজুন। একে আশ্রয় দিয়েছিলেন আল-ওয়ালিদ ইবনে আল-মুগিরা: আবু সালামা, এর রক্ষাকারী ছিলেন তাঁর পিতৃব্য আবু তালিব, আবু সালমার মাতা ছিলেন বাররা বিনতে আবদুল মুত্তালিব।

উসমান ইবনে মাজউন আল-ওয়ালিদের আশ্রয় ত্যাগ করেন

বর্তমান ঘটনা সালিহ্ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ আমাকে বলেছেন, তিনি শুনেছেন এমন একজনের কাছ থেকে যিনি তা পেয়েছিলেন উসমানের কাছ থেকে। সালিহ্ আমাকে বলেছেন: উসমান ইবনে মাজউন দেখালেন, রসূল করীম (সা)-এর সাহাবীগণ দুঃসহ

কষ্টে যখন জীবন ধারণ করছেন তখন তিনি আল-ওয়ালিদের আশ্রয়ে দিব্যি আরামে দিন গুজরান করছেন। তখন তিনি বললেন, 'এটা আমি সহ্য করতে পারি না, আমার সহধর্মী আর বন্ধু-বান্ধব আল্লাহ্‌র পথে এত কষ্ট করবে আর আমি একজন পৌত্তলিকের আশ্রয়ে নিরাপদে জীবন যাপন করব, এটা হয় না।'

তিনি তখন আল-ওয়ালিদের কাছে গিয়ে তাঁর আশ্রয় ত্যাগ করবেন বলে জানালেন।

আল-ওয়ালিদ বললেন, 'কেন বাপু, আমার কোন লোক তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে? কিছু বলেছে?'

উসমান বললেন, 'জিনা, আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে থাকতে চাই, অন্য কারো আশ্রয় নিতে চাই না।'

আল-ওয়ালিদ তখন তাঁকে মসজিদে গিয়ে প্রকাশ্যে তাঁর আশ্রয় ত্যাগ করতে বললেন। প্রকাশ্যেই তিনি তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তো। মসজিদে যাওয়ার পর আল-ওয়ালিদ বললেন, 'উসমান এসেছে, সে বলবে, আমার আশ্রয়ে আর থাকবে না সে।'

উসমান বলল, 'সত্য, তিনি আমাকে পরম বিশ্বাস ও সম্মানের সাথে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এখন আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো আশ্রয়ে থাকতে চাই না। কাজেই তাঁকে তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে আমি অব্যাহতি দিচ্ছি।'

এই বলে ছুটে চলে গেলেন উসমান।

আর একবার কুরায়শদের জমায়েতে ছিলেন লাবিদ ইবনে রাবিআ ইবনে মালিক, ইবনে জাফর ইবনে কিলাব। উসমানও ছিলেন সেখানে। লাবিদ একটা কবিতা আবৃত্তি করে সেখানে:

ঈশ্বর ছাড়া সব বৃথা হবে,

ঠিক! উসমান মাঝখানে থেকে বলে উঠল। লাবিদ আবৃত্তি করে যাচ্ছে:

আর সব সুন্দর নিশ্চয় বন্ধ হবে,

চীৎকার করে উঠলেন উসমান, 'মিথ্যে কথা! বেহেশতের আনন্দ কোনদিন বন্ধ হবে না।'

লাবিদ বললেন, 'আরে কুরায়শ সাহেব, আপনাদের বন্ধুরা তো কখখনো এমন বিরক্ত হতো না। এটা আবার কবে থেকে শুরু হলো?'

একজন জবাব দিল, 'আরে ও তো মুহাম্মদের গাদ্দার একটা। ওরা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছে তো! ওদের কথা বাদ দাও।'

রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন উসমান। অবস্থা কঠিন হয়ে দাঁড়াল তখন। কুরায়শদের সেই লোকটা উঠে দাঁড়াল, উসমানের চোখে লাগাল এক ঘুষি। উসমানের চোখ ফুলে কালো হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

উসমানের এই অবস্থা দেখে খুব কষ্ট পেলেন আল-ওয়ালিদ। বললেন, 'তুমি যদি বাছা আমার সঙ্গে থাকতে, তাহলে তোমার চোখের এই অবস্থা হতো না।'

উসমান বললেন, 'তা নয়, আমার ভাল চোখটার অবস্থাও যদি ওইটার মতো হয় আল্লাহ্‌র পথে, তাহলে ভাল হয়। আমি এমন একজনের আশ্রয়ে আছি, যিনি আপনার চেয়ে অনেক বেশি মজবুত, অনেক বেশি শক্তিশালী হে আবদ শামস্।'

আল-ওয়ালিদ তবু বললেন, 'তোমার জন্য কিন্তু আমার দরজা সব সময় খোলা থাকবে বাছা।'

উসমান তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন।

আবু সালামার সঙ্গে তার আশ্রয়দাতার সম্পর্ক

আমার পিতা ইসহাক ইবনে ইয়াসার আমাকে সালামা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর ইবনে আবু সালামার বরাত দিয়ে বলেছেন যে, তিনি তাঁকে বলেছিলেন, আবু সালামা যখন আবু তালিবের আশ্রয় প্রার্থনা করেন, তখন বানু মাখজুমের কিছু লোক তাঁর কাছে গিয়ে বলল: 'আপনি তো আমাদের হাত থেকে আপনার ভাতিজা মুহাম্মদকে রক্ষা করেছেন,

আশ্রয় দিয়েছেন। সেটা না হয় গেল, কিন্তু আপনি আমাদের লোককে আশ্রয় দিতে যাচ্ছেন কেন ?'

আবূ তালিব জবাব দিলেন, 'সে আমার আশ্রয় চেয়েছে, সে আমার ভাগ্নে। আমি আমার বোনের ছেলেকে রক্ষা করতে না পারলে, ভাইয়ের ছেলেকে রক্ষা করবো কি করে ?'

আবূ লাহাব উঠে দাঁড়াল। বলল, 'কুরায়শ ভাইসব' নিজের লোকদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য এই শেখকে আপনারা অনবরত আক্রমণ করছেন। ঈশ্বরের দোহাই, এসব বন্ধ করুন, না হয় আমরা তাঁর সঙ্গে একজোট হয়ে যাব, যতক্ষণ না তিনি যা চান তা পান।'

সবাই বলল তাঁকে বিরক্ত করার মতো কিছু করবে না তারা। কারণ তিনি রসূলের বিরুদ্ধে তাঁদের সাহায্য করেছেন, সহযোগিতা দিয়েছেন। তাঁর সমর্থন তাদের খুব প্রয়োজন।

তার এই কথা শুনে আবূ তালিবের মনে আশার সঞ্চার হলো। হয়তো রসূল করীম (সা)-কে রক্ষা করার প্রশ্নে তিনি তার সমর্থন পাবেন। এই আশার বশবর্তী হয়ে তাঁদের উভয়কে সাহায্য করার আবেদন জানিয়ে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন :

আবূ উতায়বা পিতৃব্য যার
সে আছে অহিংস এক বাগানে।
তাকে আমি বলি (এমন লোকের আমার উপদেশের প্রয়োজন কীসের ?)
সোজা শক্ত হয়ে দাঁড়াও হে আবূ মুতিব।
জীবনে এমন কাজ করবে না
যার জন্য কেউ মন্দ বলতে পারবে।
অন্যকে ছেড়ে দাও দুর্বলতার পথ,
তোমার জন্ম দুর্বল থাকার জন্য নয়!
লড়ো! কারণ যুদ্ধ ভালো,

আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত কোন যোদ্ধা হতমান হয় না।
তুমি কেমন করে তা করবে, তারা তো তোমার বড়ো ক্ষতি করে নি,
বিজয়ে কি পরাজয়ে তোমাকে ত্যাগ করে নি ?
আবদু শামস, নওফেল, তায়ম আর মাখজুম অন্যায় করেছে, আমাদের
ছেড়ে চলে গেছে, আল্লাহ্ তার শোধ নেবেন আমাদের হয়ে,
এত প্রেম এত ভালবাসার পর
কিছু অন্যায় লাভের আশায় তারা চলে গেল।
আল্লাহ্‌র ঘরের পাশে তোমাদের অবস্থান, তার শপথ !
আমরা কখ্খনো মুহাম্মদকে ছাড়ব না
শিবে[১] ধুলো-উড়ানো কোন দিবসের আগে।

আবু বকর ইবনে আল-দুগুন্নার আশ্রয় নেন এবং পরে তা ত্যাগ করেন

আমাকে বর্তমান ঘটনার কথা মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব আল-জুহ্‌রি বলেছেন উরওয়ার বরাত দিয়ে, উরওয়া তা পেয়েছিলেন আয়েশার সূত্রে। মক্কার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল। রসূল এবং তাঁর সাহাবীদের উপর কুরায়শদের নির্যাতন তীব্র আকার ধারণ করল। তখন আবু বকর হিজরত করার জন্য অনুমতি চাইলেন রসূল করীম (সা)-এর কাছে। রসূল করীম (সা) সম্মতি দিলেন। আবু বকর রওয়ানা হলেন। এক কি দুই দিনের পথ ভ্রমণের পর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ইবনে আল-দুগুন্নার সঙ্গে। ইনি হলেন বানু হারিস ইবনে আবদু মানাত ইবতে কিনানার ভাই এবং তখন আহাবিশদের প্রধান। (তারা হলো আল-হারিস; আলহুন ইবনে খুজায়মা ইবনে মুদরিকা এবং খুজায়ার বানু আল-মুসতালিক।)

ইবনে আল-দুগুন্নার কুশল প্রশ্নের জবাবে আবু বকর জানালেন যে, তাঁর সম্প্রদায় তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে, তাঁকে বের করে

১. সম্ভবত একটা পাহাড়ী স্থান।

দিয়েছে। তিনি খুব অবাক হলেন। বললেন, 'কিন্তু কেন? তুমি হলে সমাজের একটা অলংকারের মত, দুর্ভাগ্যে একজন বড় ভরসা, সব মানুষের আপদে-বিপদে ছুটে যাও, হ্যা? তুমি চলে এসো আমার কাছে, আমার সঙ্গে থাকবে তুমি।'

তিনি ফিরে চলে এলেন তাঁর সঙ্গে। ইবনে আল-দুগুন্না প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, তিনি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন, সুতরাং তাঁর সঙ্গে ভাল বৈ অন্য কোন ব্যবহার কেউ যেন না করে।

মুহাম্মদের বর্ণনাঃ বানু জুমাহ্-তে আবু বকরের বাড়ির দরজার লাগোয়া এক মসজিদে আবুবকর নামায পড়তেন। তাঁর মনটা ছিল খুব নরম। কুরআন পাঠের[১] সময় চোখ দিয়ে তাঁর দরদর করে পানি পড়ত। যুবা, ক্রীতদাস, রমণী তার এমনি ধারা আচরণে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখত। কুরায়শদের কয়েকজন ইবনে আল-দুগুন্নার কাছে গিয়ে বলল, 'একে আপনি আশ্রয় দিয়েছেন কি আমাদের ক্ষতি করার জন্য? গিয়ে দেখেন, মুহাম্মদ কি সব এনেছে, ওগুলো সে পড়ে আর কাঁদে। আর ওর চেহারা এত সুন্দর, আমাদের ভয় হচ্ছে ও আমাদের যোয়ানদের, মেয়েদের আর দুর্বলচিত্ত মানুষদের না দলে টেনে নেয়। ওকে বলে দেন ও নিজের বাড়ি গিয়ে যা খুশি করুক'

ইবনে আল-দুগুন্না তখন তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'আমাদের লোকের ক্ষতি করার জন্য তো তোমাকে আমি আশ্রয় দিইনি হে। ওই জায়গায় বসে তুমি পড়—এটা তাদের পছন্দ নয়। এতে ওরা আঘাত পাচ্ছে। তুমি বরং নিজের বাড়ি চলে যাও, ওখানে গিয়ে যা খুশি কর।'

আবু বকর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর আশ্রয় ত্যাগ করুন তিনি—এটাই তিনি চান কিনা। আল-দুগুন্না যখন বললেন—তাই তিনি চান তখন তাঁকে তিনি তাঁর ওয়াদা ফেরত দিলেন। আল-দুগুন্না তখন উঠে

---

১. এ থেকে প্রমাণিত হয় কুরআনের কিছু অংশ হিজরতের আগে লেখা হয়েছিল।

দাঁড়ালেন, কুরায়শদের বললেন, 'আবূ বকর এখন আর তাঁর আশ্রয়ে নেই, এখন তারা যা খুশি করতে পারে।'

আবদুর রহমান ইবনে আল-কাসিম তাঁর পিতা আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মদের বরাত দিয়ে আমাকে বলেছেন যে, একদিন আবূ বকর যখন কা'বায় যাচ্ছিলেন, তখন কুরায়শদের এক ষাণ্ডা তার মাথায় বালু ছুড়ে মেরেছিল। সেদিক দিয়ে তখন যাচ্ছিল আল ওয়ালিদ ইবনে আল-মুগিরা অথবা আল-আস ইবনে ওয়াইল। তিনি তাকে বললেন, 'দেখলেন আমার কি হাল করেছে বেটা?' লোকটা জবাব দিল, 'আমি করলাম কই, নিজের এই হাল তো নিজেই তুমি করলে হে!' তখন তিনি তিনবার আবৃত্তি করলেন, 'প্রভু হে কতো সহিষ্ণু তুমি!'

বয়কট খারিজ

বয়কট দলীলে কুরায়শরা বানু হাশিম আর বানু আল-মুত্তালিবকে যেখানে থাকার কথা লিখেছিল, সেখানেই তারা ছিল। তখন কতিপয় কুরায়শ সেই বয়কট প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করল। হিশাম ইবনে আমর…এর মতো এত তকলিফ আর কেউ করেনি, কারণ তিনি নাজলা ইবনে হাশিম ইবনে আবদ মানাফের ভাইয়ের ছেলে (তার মাতার দিক থেকে অবশ্য) আর বানু হাশিমের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তার আপন সম্প্রদায় খুব মান্যগণ্য করত তাঁকে। আমি শুনেছি তিনি ওই দুই গোত্রের লোকদের ওদের নিজেদের বাড়িতে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় সব জিনিস সরবরাহ করতেন। করতেন কি, উটের পিঠে খাবার নিয়ে তাদের বাড়ি যাওয়ার গলি মুখে এক উটের গলার দড়ি খুলে নিতেন, উটের পাছায় একটা থাপ্পড় লাগিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিতেন গলির ভেতরে তাদের বাড়িতে। কাপড়-চোপড় আনার সময়ও তাই করতেন।

একদিন তিনি গেলেন জুহায়র ইবনে আবূ উমাইয়া ইবনে আল-মুগিরার কাছে। জুহায়েরের মাতা ছিল আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিব। গিয়ে বললেন:

"আপনারা তো খুব খাচ্ছেন দাচ্ছেন, সেজেগুজে থাকছেন, মেয়েদের বিয়ে-শাদি দিচ্ছেন, অথচ ওদিকে আপনার মামাদের অবস্থাও তো আপনার জানা আছে। খুব ফুর্তিতে আছেন, তাই না? ওরা না পারে বেচতে, না পারে কিনতে, না পারে বিয়ে করাতে, না পারে বিয়ে দিতে। আল্লাহ্র নাম নিয়ে বলছি, তারা যদি আবুল হাকাম ইবনে হিশামের মামা হতো আর সে তোমাদের যা করতে বলেছে তা তোমরা তাদের বলতে, কিছুতেই তা সে মেনে নিত না।"

জুহায়র বলল, 'বাজে কথা বলো না হিশাম, আমি কি করতে পারি? আমি একা মানুষ। আমার সঙ্গে যদি আর একটা লোক থাকত, আমি বয়কট ভেঙ্গে দিতাম, ঈশ্বরের কসম।'

হিশাম বললেন, 'আমি একজনকে পেয়েছি। আমিই সেই।' জুহায়র বলল, 'আরেকজন যোগাড় কর।'

হিশাম গেলেন আল-মুতিম ইবনে আদির কাছে। বললেন, 'আপনারা কুরায়শদের কথা শুনবেন আর চোখের সামনে বানু আবদু মানাফের দুটো বংশ শেষ হয়ে যাবে—এটাই আপনাদের দিলের খায়েশ? একদিন দেখবেন, আজকে ওদের যা হাল করেছে ওরা, একদিন আপনাদেরকেও একই হাল করবে।'

আল-মুতিম সেই জুহায়রের মতই জবাব দিল। বলল, 'একজন চতুর্থ লোক সংগ্রহ করতে হবে।'

হিশাম গেলেন আবুল-বখতারি ইবনে হিশামের কাছে। আবুল বখতারি বলল পঞ্চম কাউকে যোগাড় করতে। হিশাম গেলেন জামা' ইবনে আল-আসওয়াদ ইবনে আল-মুত্তালিব ইবনে আসাদের কাছে, তাকে আত্মীয়তার দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিলেন। অন্য সবাই সম্মত আছে কিনা সে জানতে চাইলে হিশাম সবার নাম বললেন। ঠিক হলো রাতে তারা মক্কার উপরে আল-হাজুনের নিকটতম স্থানে মিলিত হবে। ওখানে তারা সেই দলীল বাতিল করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। প্রথম পদক্ষেপ ও প্রথম কথা বলার দায়িত্ব নিল জুহায়র।

পরদিন সবাই জমায়েত হলো যখন, লম্বা আলখাল্লা গায়ে জুহায়র সাতবার তওয়াফ করল কা'বা, তারপর সমবেত সবার কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন ঃ 'মক্কাবাসী বন্ধুগণ, বানু হাশিম যখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, বেচা-কেনার ক্ষমতা হারিয়েছে, তখন কি আমাদের খাওয়া-দাওয়া করা, কাপড়-চোপড় পরা ঠিক হচ্ছে ? আমি ঈশ্বরের কসম খেয়ে বলছি, বয়কটের এই দলীল ছিঁড়ে না ফেলা পর্যন্ত আমি বসব না !'

আবু জেহেল ছিল মসজিদের পাশে। সে অবাক হলো। চীৎকার করে বলে উঠল, 'আল্লাহ্‌র নামে তুমি মিথ্যা কথা বলছো হে। এই কাগজ কখ্খনো ছেঁড়া হবে না।'

জামা' বলে উঠল, 'তুমি তো তার চেয়েও বড় মিথ্যেবাদী হে। দলীল যখন লেখা হয়েছিল, তখনই এ নিয়ে আমরা কেউ খুশি ছিলাম না।'

আবুল-বখতারি বলল, 'ঠিকই বলেছে জামা'। কি সব ছাইভস্ম লেখা হয়েছে এতে, আমরা মোটেই খুশি নই, ওসব লেখা-টেখা আমরা মানিও না।'

আল-মুতিম বলল, 'তোমরা দুজনেই ঠিক বলেছ। ভিন্নকথা যে বলবে, সেই হবে মিথ্যেবাদী। আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে আমরা বলছি, এর মধ্যে আমরা আর নেই। এই দলীলের মধ্যে যা লেখা হয়েছে, তা আমরা মানি না।'

হিশামও একই কথা বললেন।

আবু জেহেল বলল, 'রাতে মনে হয় তোমরা আগেভাগে জোট বেঁধেছ। মনে হয় অন্য কোথাও তোমরা কথাবার্তা বলে তবে এসেছ।'

আবু তালিব তখন মসজিদের একপাশে বসা ছিলেন। আল-মুতিম যখন ছিঁড়ে ফেলার জন্য দলীল আনতে গেল, তখন দেখা গেল, সব দলীল পোকায় খেয়ে ফেলেছে, কেবল 'বিসমিল্লা' শব্দটি অক্ষত আছে। [তাবারির মত ঃ তখন কিছু লেখা হলে প্রথমে 'বিসমিল্লা' লেখার

রেওয়াজ ছিল।] দলীলের লেখক ছিল মানসূর ইবনে ইকরিমা। বলা হয়—তার হাত নাকি ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল।

দলীল ছেঁড়া হয়ে গেল, চলে গেল এর কার্যক্ষমতা। দলীল বাতিলে যারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল, তাদের প্রশংসা করে আবু তালিব নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন :

আল্লাহ্‌র কাজের কথা কি তাদের কানে যায় নি
যারা দূরে সমুদ্রের ওপারে থাকে (কারণ আল্লাহ্ সব মানুষের প্রতি দয়াশীল)

দলীল ছেঁড়া হয়ে গেছে সে বার্তা যায়নি তাদের কানে
আল্লাহ্‌র বিরোধী সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে ?
মিথ্যা এবং যাদু মেশানো ছিল তাতে
যাদু কোনদিন টেকে না।
এর সঙ্গে যারা জড়িত ছিল না, তারা জড়ো হলো দূরে কোথাও
এদিকে অশুভ সংকেতের পাখি উড়ে চলল তার মাথার উপরে।[১]
এমন এক ভয়ানক অপরাধ ছিল সে, ভাল হতো যদি এর জন্য
হাত এবং গলা ছিন্ন করা হতো,
পালিয়ে যেতো মক্কার সমস্ত মানুষ,
অশুভের ভয়ে কাঁপত তাদের হৃদয়,
দ্বিধায় জড়িত হতো কৃষক, কি করবে সে,
নিচু ভূমিতে যাবে নাকি পাহাড়ের উপরে—
মক্কার দুই পাহাড়ের মাঝখানে আসত যদি সৈন্যবাহিনী
তীর ধনু আর বর্শায় সজ্জিত।
মক্কায় যার ক্ষমতা বর্ধিষ্ণু সে জানুক,
মক্কার উপত্যকায় আমাদের গৌরব প্রাচীনতর।

১. কুরআন ১৭ : ১৪-তে 'সব মানুষের গলায় আমরা বেঁধে দিয়েছি তার অশুভ চিহ্নের পাখি'-এর সঙ্গে তুলনীয়।

ওখানে আমরা বড় হয়েছি, যখন মানুষের সংখ্যা ছিল নগণ্য
ওখানে থেকেছি সসম্মানে, সুখ্যাতিসহ।
অতিথিদের পূর্ণ সন্তোষে আমরা আহার দিই
মাইসিরের হাত পরিবেশন করতে করতে না কাঁপা পর্যন্ত।
আল-হাজুনে যারা অঙ্গীকার করেছিল বশ্যতার
এক দলপতির কাছে, যে দলপতি প্রজ্ঞায় সিদ্ধান্ত নেন,
আল-হাজুনের পাশে বসে, যুবরাজের মত তাদের আল্লাহ্ পুরস্কার দেবেন,

তারা মানুষ আরো মহীয়ান, আরো গৌরবময়।
ওখানে সমস্ত সাহসী মানুষ সাহায্য করেছে,
লম্বা আলখাল্লা তাদের গতি করেছিল মন্থর,
সেই পরম কর্তব্যে তারা ছুটে যাচ্ছিল
মশালধারীর হাতে যেমন জ্বলে শিখা।
লুআই ইবনে গালিবের বংশের সবচেয়ে মহৎ জন
তাদের প্রতি আচরিত কোন অন্যায়ে জ্বলে উঠে মুখ তাদের ক্রোধে।
তলোয়ারের দীর্ঘ খাপ, অর্ধেক তার নালা।
তার জন্য মেঘ দেয় বৃষ্টি এবং দোয়া।
রাজকীয় আতিথেয়তার রাজার পুত্র যুবরাজ,
অপূর্ব আয়োজন তাদের খাবারের, অপূর্ব সাধাসাধি।
নিরাপত্তা নির্মাণ আপন লোকের জন্য
চলাচলে সম্পূর্ণ নির্ভয়।
সমস্ত নির্দোষ মানুষ রক্ষা করেছে এই শান্তি।
এক মহান নেতা সেখানে ছিলেন প্রশংসিত।
এক রাতে তারা সেরে ফেলল তাদের কাজ
সবাই যখন ছিল নিদ্রামগ্ন; ভোরে তারা সব নিশ্চিন্ত-মেযাজ।
সাহল ইবনে বায়দাকে তারা পাঠিয়ে দিল হৃষ্ট-চিত্ত
আনন্দিত তাতে আবু বকর আর মুহাম্মদ
সবাই যখন আমাদের নির্যাতনে একত্রিত

সেই সকাল থেকে আমরা রয়েছি কি তখন প্রেমে আবদ্ধ পরস্পর।
অন্যায় কখন সমর্থন করিনি আমরা।
যা চেয়েছি তা পেয়েছি আমরা রক্তপাতহীন।
হে কুসাইর জ্ঞাতিজন, তোমরা কি ভেবে দেখবে না,
তাই কি তোমরা চাও (আমাদের হতে) যা আপতিত হবে তোমাদের উপর আগামীকাল?
কারণ তুমি আর আমি হলাম সেই প্রবাদের মত
তুমি কথা বলতে পারলেই কৈফিয়ত পাওয়া যেত, হে আসওয়াদ।[১]

আল-মুতিম ইবনে আদি'র জন্য শোক প্রকাশ করে এবং দলীল বাতিলে তার ভূমিকার কথা স্মরণ করে হাসান ইবনে সাবিত নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন:

চক্ষু হে মানুষের নেতা, অশ্রুতে অকৃপণ হও।
যদি শুকিয়ে যায়, ওখানে রক্ত ঢাল।
উভয় হজ্জ স্থানের নেতার জন্য শোক কর,
মানুষের মুখে যতদিন কথা সরবে, ততদিন তারা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

গৌরব কাউকে যদি অমর করতে পারত
গর্ব তাহলে মুতিমকে বাঁচিয়ে রাখত আজ।
তাদের হাত থেকে তুমি রসূল (সা)-কে রক্ষা করেছ, তারা
তোমার দাস হয়ে থাকবে যতদিন মানুষ লাব্বায়কা বলবে, হজ্জ বস্ত্র পরবে।

মাদকে, কাহতানকে এবং
জুরহুমের বাকি সবাইকে যদি তার কথা জিজ্ঞেস করা হয়,

১. আসওয়াদ একটি পাহাড়। ওখানে একটি মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। হত্যার কোন সূত্র পাওয়া যায় নি। মৃতের জ্ঞাতিজন পাহাড়কে উদ্দেশ্য করে একথা বলতে বলতে এটা প্রবাদ হয়ে দাঁড়ায়।
২. দিওয়ানে হাসান বিন সাবিত দ্রষ্টব্য।

তারা বলবে পরম বিশ্বস্ততায় সে তার রক্ষা করা কর্তব্য করেছে,
বলবে সে চুক্তি করলে তা পালন করে।
তাদের উপরে সূর্য তার চেয়ে মহৎ,
তার চেয়ে বিরাট কারো উপর আলো বিকীরণ করে না।
প্রত্যাখ্যান দৃঢ়, অথচ কোমল নরম মেযাজ তার
অন্ধকারতম রাত্রিতে গভীর ঘুমে মগ্ন অথচ সতর্ক অতিথির দায়িত্বে।

এই ব্যাপারে হিশাম ইবনে আমরের প্রশংসাও করেছেন হাসান ঃ
বানু উমাইয়াকে রক্ষা কি এমনি এক চুক্তি,
যা হিশামের অঙ্গীকারের মতো বিশ্বাসযোগ্য ?
এমন যে বিশ্বাসঘাতকতা করে না,
আল-হারিস ইবনে হুবাইয়িব ইবনে সুখাম বংশের কোন আশ্রিতের সঙ্গে।
বানু হিসল কাউকে আশ্রয় মঞ্জুর করলে
তাদের ওয়াদা রক্ষা করে তারা, তাদের আশ্রিত থাকে নিরাপদ।

আত্-তুফায়ল ইবনে আমর আদ্-দাউসির ইসলাম গ্রহণ

আপন সম্প্রদায়ের চরম দুর্ব্যবহারের মুখেও রসূল করীম (সা) তাদের সৎ পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মন্দ থেকে নিষ্কৃতির জন্য প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন। একদিকে আল্লাহ্ তাদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করলেন, অন্যদিকে তাঁর ধর্মে নবাগতদের তারা হুঁশিয়ার করে চলল।

আত্-তুফায়ল প্রায়ই বলতেন যে, তিনি যখন মক্কায় আসেন, রসূল করীম (সা) তখন ওখানে ছিলেন এবং কিছু কুরায়শ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে। (তিনি একজন উচুঁদরের কবি ও খুব বুদ্ধিমান লোক ছিলেন।) তারা বলল, 'এই লোকটা তাদের বিস্তর ক্ষতি করেছে। তাদের সম্প্রদায়কে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করেছে, তাদের একতা ধ্বংস করে দিয়েছে। 'প্রকৃতপক্ষে লোকটা যাদুকরের মতো কথা বলে, সেই কথায় বাপ, মা, ভাই, স্ত্রী থেকে মানুষ আলাদা হয়ে যায়। আপনি ও আপনার লোকজনের উপরও তার কথার পরিণাম এই রকম হবে বলে আমাদের ভয় হচ্ছে। কাজেই তার সঙ্গে কথা বলবেন না, তার কথা শুনবেন না।'

ওরা এরকম জিদ করল যে, আমি ঠিক করলাম, আমি তার কথা শুনব না, তার সঙ্গে কথা বলবও না। মসজিদে যাওয়ার সময় দৈবাৎ যদি তার একটা কি দুটো কথা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কানে চলে আসে সেই ভয়ে আমি একেবারে কানে তুলো গুঁজে দিলাম। মসজিদের কাছাকাছি গিয়ে দেখি কাবার পাশে নামাযে দাঁড়িয়েছেন আল্লাহ্র রসূল (সা)। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আল্লাহ্র বিধান ছিল—আমাকে তাঁর কিছু কথা শুনতে হবে এবং আমি এক সুন্দর কথা শুনে ফেললাম। আমি মনে মনে বললাম, 'আল্লাহ্ আমার প্রতি রহম করুন! এই আমি, একজন কবি, একজন বুদ্ধিমান মানুষ, যে ভাল-মন্দের ফারাক বুঝে, কাজেই আমি লোকটা কি বলছে—কেন শুনব না? তাঁর কথা যদি ভাল হয়, আমি তা গ্রহণ করব। বর্জন করব যদি তা মন্দ হয়।

যতক্ষণ রসূল করীম (সা) ওখানে ছিলেন, আমিও সেখানে ছিলাম। তারপর রসূল (সা) বাড়িতে গেলেন। আমি গেলাম তাঁর পেছনে পেছনে। তাঁর সঙ্গে আমি তার ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলাম। সবাই কি বলেছে আমাকে তাঁর সম্বন্ধে, আমি ওঁকে তা বললাম। বললাম, আমি এত ঘাবড়ে গিয়েছিলাম যে, আমি কানে তুলো দিয়ে গিয়েছিলাম, যাতে তাঁর কোন কথা আমার শুনতে না হয়। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল না যে আমি বধির থাকি। এক অপূর্ব সুন্দর বচন আমার কানে চলে এসেছে। বললাম, 'আমার কাছে সব খুলে বলুন।'

রসূল করীম (সা) আমার কাছে ইসলাম বিষয়ে সমস্ত কথা পরিষ্কার করে বললেন, আবৃত্তি করে শুনালেন কুরআন শরীফ। আল্লাহ্র শপথ, এমন সুন্দর, এমন সঙ্গত কথা আমি আগে আর কোনদিন শুনি নি। আমি তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে গেলাম, সত্যিকার সাক্ষ্য দিয়ে ঈমান আনলাম।

আমি বললাম, 'রসূলুল্লাহ্, আমার লোকজনের মধ্যে আমার যথেষ্ট ক্ষমতা আর প্রতিপত্তি। আমি যখন তাদের কাছে যাব, গিয়ে ইসলামের

দিকে তাদের আহ্বান করব, তখন আমার হাতে একটা আলামত থাকলে ভাল হয়। তাতে তাদের কাছে প্রচারে আমার সাহায্য হবে। এমন একটা আলামত আমাকে দেওয়ার জন্য আপনি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করুন।'

রসূল করীম (সা) বললেন, 'ইয়া আল্লাহ্, এঁকে একটা আলামত দিন।'

আমি ফিরে গেলাম আমার লোকজনের কাছে। আমার বাড়ি যাওয়ার পথে আমি গিরিপথটি অতিক্রম করে ঢালুতে যখন নামছিলাম, দেখলাম প্রদীপের মত একটা আলো জ্বলে আছে আমার দুই চোখের মধ্যিখানে। আমি বললাম, ইয়া আল্লাহ্, আমার মুখে নয়! ওরা তাহলে মনে করবে —আমি তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছি বলে এটা নিদারুন এক শাস্তি।'

তখন সেই আলো বিন্দু নড়ে উঠল, নড়ে চড়ে বসল এসে আমার চাবুক দণ্ডের মাথায়। আমি নেমে আসছি, চাবুক-দণ্ডের মাথায় মোম-বাতির শিখার মত সেই আলো বিন্দুর দিকে তাকিয়ে রইল আমার সমস্ত লোকজন।

আমি নিচে নামলাম। আমার আব্বা এলেন আমার কাছে। খুব বুড়ো মানুষ তিনি। আমি বললাম, 'আমার কাছ থেকে একটু দূরে থাকুন আব্বা। আপনার সঙ্গে আমার আর আমার সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক নেই।'

তিনি বললেন, 'কেন, কী হয়েছে বাছা?'

আমি বললাম, 'আমি মুসলমান হয়েছি, আমি মুহাম্মদের ধর্ম মানি।'

তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, তাহলে আমার ধর্মও তোমার ধর্ম বৎস।'

আমি তখন বললাম, 'তাহলে আপনি গোসল করে পাক-সাফ হোন, কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করুন। তারপর আসুন আমি যা শিখেছি, তাই আপনাকে শিখিয়ে দেব।'

তিনি, যা যা বললাম, তার সব করে এলেন। তাঁর কাছে আমি ইসলাম ধর্মের কথা বুঝিয়ে বললাম। তিনি মুসলমান হলেন।

তারপর আমার কাছে এলেন আমার স্ত্রী। আমি বললাম, 'তফাৎ যাও, তোমার সঙ্গে আমার আর আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।'

সে বলল, 'কেন' কেন? আমার আব্বা আম্মা মুক্তিপণ দিয়েছেন আপনাকে!'

আমি বললাম, 'তা নয়, ইসলাম আমাদের দুই ভাগ করে ফেলেছে। আমি মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেছি।'

সে বলল, 'তাহলে তোমার ধর্মই আমার ধর্ম।'

আমি বললাম, 'তাহলে যুল শারার[১] হিনায়[২] (পবিত্র অঙ্গন!) যাও, ওখানে নিজেকে পাক করে এস।'

যুল শারা হল এক দাউসের প্রতিমা আর হিনা হল তার এক অঙ্গন যা ওরা পবিত্র বলে গ্রহণ করেছিল। ওখানে পাহাড় থেকে বেয়ে আসা এক ক্ষীণধারা নদী রেখা ছিল।

ভয়ার্ত কণ্ঠে ও জিজ্ঞেস করল, 'যুল শারার থেকে আমার জন্য তোমার কোন অমঙ্গলের কারণ ঘটেছে কি?'

আমি বললাম, 'না, তা নয়, তার জন্য আমি জামিন আছি।'

সে চলে গেল। পাক-সাফ হয়ে ফিরে এল। আমি তাকে ইসলাম কি বুঝিয়ে দিলাম। সে মুসলমান হল।

আমি তারপর দাউসের কাছে ইসলাম প্রচার করতে শুরু করলাম। কিন্তু ওরা কেউ আমার কথায় কর্ণপাত করল না। মক্কায় আমি রসূল

১. এক দেবতার উপাধি।
২. এর সঠিক অর্থ স্পষ্ট নয়, তবে হিশামের অর্থ গ্রহণই বিধেয়।

করীম (সা)-এর কাছে ফিরে গেলাম। তাঁকে বললাম, 'হে রসূলুল্লাহ্, দাউসের সঙ্গে হাল্কা কার্যকলাপে[১] আমি অতিষ্ট হয়ে গেলাম। ওদের আপনি অভিশাপ দিন।'

রসূলুল্লাহ্ আমাকে বললেন, 'দাউসকে হিদায়ত করুন হে আল্লাহ্! আপনি আপনার লোকজনদের কাছে ফিরে যান, গিয়ে তাদের কাছে আস্তে আস্তে প্রচার করুন।'

আমি দাউসের দেশে সবাইকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে লাগলাম। এর মধ্যে রসূল করীম (সা) মদীনায় হিজরত করলেন। বদর, ওহুদ আর খন্দকের যুদ্ধ পার হয়ে গেল। রসূল করীম (সা) যখন খায়বরে, আমি আমার ধর্মান্তরিত নব্য মুসলমানের নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। দাউসের সত্তর আশিটি পরিবার নিয়ে আমি মদীনায় হাযির হলাম; খায়বরে রসূল করীম (সা)-এর সঙ্গে যোগদান করলাম। তিনি অন্যান্য মুসলমানের মত যুদ্ধে আহরিত সামগ্রীর সমান ভাগ আমাদের দিলেন।

আমি রসূল করীম (সা)-এর সঙ্গে থেকে গেলাম। ছিলাম আল্লাহ্র রসূল (সা)-এর কাছে মক্কা বিজয় পর্যন্ত। আমর ইবনে হুমামার প্রতিমা যুল কাফায়নকে পুড়ে ছাই করবার অনুমতি চাইলাম আমি তাঁর কাছে। তিনি আগুন জ্বালিয়ে বললেন :

আমি তোমার ভৃত্যদের কেউ নই যুল-কাফায়ন
তোমার চেয়ে প্রাচীনতর আমাদের জন্ম
তোমার বুকে এই আগুন ঢুকান আমার একান্ত বাসনা।

তারপর তিনি ফিরে এলেন মদীনায়। আল্লাহ্ তাকে গ্রহণ করা পর্যন্ত রসূল করীম (সা)-এর সঙ্গে তিনি ছিলেন। আরবরা বিদ্রোহ করলে তিনি মুসলমানদের পক্ষ নেন, তাদের হয়ে যুদ্ধ করেন। তুলায়হা ও সমস্ত

---

১. নম্রতর অর্থটি নেওয়া হয়েছে।

নেজ্দ পরিষ্কার করা পর্যন্ত তিনি তাদের সঙ্গে ছিলেন। তারপর তিনি পুত্র আমর সহ মুসলমানদের সঙ্গে ইয়ামামা গমন করেন। যাওয়ার পথে তিনি এক অলৌকিক দৃশ্য অবলোকন করেন এবং ব্যাখ্যার জন্য তা সঙ্গীদের কাছে ব্যক্ত করেন, 'আমি দেখলাম, আমার মাথা মুণ্ডন করা হয়েছে, আমার মুখ থেকে একটা পাখী বের হয়ে আসছে, এক রমণী এসে আমাকে তার জঠরের ভিতরে ভরে ফেলল এবং আমার পুত্র উদ্বিগ্ন হয়ে খুঁজছে আমাকে। এরপর দেখলাম, পুত্র আমার আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেল।'

সবাই বলল, এটা ভাল স্বপ্ন, এর ইঙ্গিত শুভ। কিন্তু তিনি বললেন, তিনি নিজেই তার ব্যাখ্যা প্রদান করবেন। মাথা মুণ্ডন মানে, মাথা তিনি নিচে নামিয়ে ফেলবেন, মুখ থেকে নির্গত পাখী হলো তার আত্মা, যে রমণী তার জঠরে নিল তাকে, সে হল ধরণী, ধরণী খুলে যাবে এবং তার ভেতরে তাঁকে লুকিয়ে রাখা হবে। তাঁকে পুত্রের বৃথা অনুসন্ধান মানে তিনি নিজে যে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তা লাভ করার জন্য চেষ্টা করবে সে।

আল-ইয়ামামায় তিনি শহীদ হন। তাঁর পুত্র মারাত্মকভাবে যখম হয়, পরে অবশ্য সে সুস্থ হয়ে গিয়েছিল। তিনি উমরের আমলে ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

ইরাশিটরা আবু জেহেলের কাছে উট বিক্রি করেছিল

রসূলে (সা) এর প্রতি শত্রুতা, ঘৃণা ও হিংসাত্মক কার্যকলাপে কখনও বিরত হত না আবু জেহেল। ফলে তাঁর সামনে পড়লেই আল্লাহ্ তাকে হেনস্তা করতেন।

আবদুল মালিক ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু সুফিয়ান আস্-সাকাফির স্মরণশক্তি খুব প্রখর ছিল। তিনি আমাকে বলেছেন ঃ

ইরাশের এক লোক কিছু উট নিয়ে এসেছিল মক্কায় বিক্রি করতে। আবু জেহেল তার কাছ থেকে সেগুলো কিনে নিল। কিনে নিল,

কিন্তু টাকা দিল না। লোকটা বিচার নিয়ে এল মসজিদে কুরায়শদের জমায়েতে। একপাশে বসা ছিলেন রসূলে করীম (সা)। লোকটা বলল, 'আবদুল হাকীম ইবনে হিশামের কাছে আমি টাকা পাই. টাকা দিচ্ছে না, আপনাদের মধ্যে কে আমাকে টাকা আদায় করতে সাহায্য করবেন? আমি বিদেশী মানুষ, পথিক, সে আমার টাকা দিচ্ছে না।'

তারা রসূলকে দেখিয়ে বলল, 'ওই যে লোকটা বসে আছে দেখছ? তার কাছে যাও, সে-ই তোমার ন্যায্য পাওনা আদায় করে দেবে।'

[বস্তুত তারা আবু জেহেল আর রসূলে করীম (সা)-এর মধ্যকার শত্রুতার কথা জানত বলে, তাকে নিয়ে মজাক করছিল।]

লোকটা রসূলে করীম (সা)-এর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'হে আল্লাহ্‌র বান্দা, আবদুল হাকাম ইবনে হিশাম আমার পাওনা টাকা দিচ্ছে না। আমি বিদেশী মানুষ, আমি পথিক মানুষ। ওখানে আমি সাহায্য চেয়েছিলাম, ও'রা আপনাকে দেখিয়ে দিল। আপনি তার কাছ থেকে আমার টাকা আদায় করে দিন। আল্লাহ্ আপনাকে সাহায্য করবেন।'

তিনি বললেন, 'তার কাছে আপনি যান।'
রসূলে করীম (সা) উঠে তার সঙ্গে চললেন।

কুরায়শরা একজনকে বলল, তাঁর পেছনে পেছনে যেতে। কি হয় দেখার জন্য।

রসূলে করীম (সা) আবু জেহেলের বাড়ীতে গিয়ে দরজায় আওয়াজ করলেন। ভেতর থেকে সে যখন বলল, কে? তিনি বললেন, 'আমি মুহাম্মদ! আপনি বেরিয়ে আসুন!'

আবু জেহেল বেরিয়ে এল। উত্তেজনায় কাঁপছে সে, মুখ শুকনো।
রসূলে করীম (সা) বললেন, 'এই ভদ্রলোকের টাকাটা দিয়ে দিন।'
সে বলল, 'আমি এক্ষুনি দিচ্ছি, এক মিনিট।'

ও ভেতরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল, লোকটাকে তার সব টাকা বুঝিয়ে দিল।

রসূল করীম (সা) চলে গেলেন। যাওয়ার আগে বললেন, 'যান, নিজের কাজে যান।'

ইরাশিট লোকটি কুরায়শদের জমায়েতে ফিরে গিয়ে বলল, 'আল্লাহ্ তাঁকে পুরস্কৃত করবেন, তিনি আমার টাকা আদায় করে দিয়েছেন।'

কুরায়শরা যে লোককে তাদের পেছনে পেছনে পাঠিয়েছিল, সে ফিরে এল। এসে যা যা দেখল সব বয়ান করল। বলল, 'এ তো ভারী অসাধারণ কাণ্ড। উনি তার দরজায় আঘাত করতেই আবু জেহেল বেরিয়ে এল, উত্তেজনায় রুদ্ধশ্বাস।'

তারপর যা যা ঘটেছে, সব খুলে বলল।

তার কথা শেষ হতে না হতেই সামনে এল আবু জেহেল, ওরা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'ঘটনা কি হে, মানুষ ? এমন কাণ্ড তো জীবনে শুনি নি।'

যে বলল, 'কিছুই বুঝতে পারছি না' আল্লাহ্‌র কসম, ও দরজায় আঘাত করল, আমি ওর গলার আওয়াজ শুনলাম, সঙ্গে সঙ্গে কি এক ভয় এসে আমাকে অস্থির করে ফেলল। বের হয়ে ওর সামনে দাঁড়াতেই দেখলাম, একটা মর্দা উট ওর মাথার উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছে। এমন উট, উটের এমন মাথা, ঘাড়, দাঁত আমি জীবনে দেখিনি। আল্লাহ্‌র কসম, তক্ষুনি টাকা না দিলে ওই উট আমাকে খেয়ে ফেলত।

রুকানা আল-মুত্তালিবি রসূল করীম (সা)-এর সঙ্গে কুস্তি লড়লেন

আমার আব্বা ইসহাক ইবনে ইয়াসার বলেছেনঃ কুরায়শদের মধ্যে রুকানা ইবনে আবু ইয়াযিদ ইবনে হাশিম ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে আবদ মানাফ ছিল সব চেয়ে স্বাস্থ্যবান ও সবচেয়ে তাগড়া যোয়ান। মক্কায় এক গিরিপথে একদিন তার সঙ্গে দেখা হলো রসূল করীম (স) এর।

রসূলে করীম (সা) বললেন, 'রুকানা, তুমি আল্লাহ্কে কেন ভয় করবে না, কেন আমার প্রচারিত ধর্ম মেনে নেবে না?'

সে বলল, 'আমি যদি বুঝতাম তুমি যা বলে বেড়াচ্ছ তা সত্য, তাহলে তোমাকে অনুসরণ করতাম অবশ্য।'

রসূল (সা) তাকে বললেন, তিনি যদি তাকে নিচে ফেলে দিতে পারেন, তাহলে তিনি যা বলছেন তা সত্য বলে সে মানবে কিনা। সে বলল, মানবে। শুরু হয়ে গেল কুস্তি। কায়দা মতো ওকে একবার বাগে পেতেই শক্ত করে ধরে মাটিতে ফেলে দিলেন, কিছুতেই সে তাঁকে ফেরাতে পারল না।

সে বলল, 'আরেকবার কর দেখি মুহাম্মদ।'

রসূলে করীম (সা) আবার তাকে ফেলে দিলেন।

সে বলল, এ তো বড়ো তাজ্জব ব্যাপার। তুমি কি সত্যিই আমাকে হারিয়ে দিতে পার?'

রসূল (সা) বললেন, 'তুমি যদি চাও তোমাকে আরও আশ্চর্য জিনিস দেখাতে পারি। ওই যে গাছটা দেখছ, গাছটাকে আমি ডাকব এবং ওটা আমার কাছে আসবে।'

সে বলল, 'ডাকুন ত দেখি।'

তিনি গাছটাকে ডাক দিলেন। গাছ এগিয়ে এসে রসূল করীম (সা)-এর সামনে দাঁড়াল। তখন রসূল (সা) বললেন, 'যাও, নিজের জায়গায় যাও।' গাছ চলে গেল আপন স্থানে।

রুকানা বানু আবদু মানাফে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে গল্প করল যে তাদের সম্প্রদায়ের লোক পৃথিবীর যে কোন যাদুকরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। যা সে দেখে এসেছে, জীবনে এমন জিনিস আর দেখে নি। তারপর মুহাম্মদ তার চোখের সামনে কি করেছে তার বর্ণনা দিল।

খৃস্টানদের এক প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণ করল

রসূলে করীম (সা) তখন মক্কায়। তাঁর কথা শুনে জনা বিশেক খৃস্টান এল অ্যাবিসিনিয়া থেকে। এসে দেখল, তিনি মসজিদে বসে আছেন। তারা তাঁর সঙ্গে বসল, তাঁকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। কিন্তু কুরায়শ সে সময় কা'বার চারদিকে জমা হয়ে ছিল। তাদের সমস্ত জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হলে পরে রসূলে করীম (সা) তাদের আল্লাহ্র পথে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন এবং কুরআন থেকে পাঠ করে শোনালেন।

কুরআন শরীফ শোনার পর তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বইতে শুরু করল। তারা আল্লাহ্র ডাকে সাড়া দিল, তাঁর উপর ঈমান আনল এবং তাঁর সত্যকে স্বীকার করে নিল। তাদের গ্রন্থে এতকাল যেসব বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছিল, তা তারা তাঁর মধ্যে প্রকাশিত দেখতে পেল।

ওরা যখন যাবার জন্য উঠল, তখন আবু জেহেল কয়েকজন কুরায়শ-সহ তাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল। বলল, হে আল্লাহ্, কিরকম খবিশ তোমরা হে! তোমাদের লোকজন তোমাদের পাঠাল এই লোক সম্বন্ধে খবরা-খবর নেওয়ার জন্য। আর তার সঙ্গে একটু বসেই নিজের ধর্ম ত্যাগ করে তার কথায় বিশ্বাস করে বসলে। তোমাদের মত এ রকম গাধা তো আমরা আর দেখি নাই।'

অথবা এমনি ধরনের কিছু কথা।

তারা বলল, 'আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনার সঙ্গে নির্বোধের মত আমরা তর্ক করব না। আমাদের ধর্ম আমাদের কাছে, আপনার ধর্ম আপনার কাছে। সবচেয়ে যা ভাল তা অন্বেষণ করতে আমরা অমনোযোগী হই নি।'

বলা হয়, এই খৃস্টানরা এসেছিলেন নজরান থেকে। তবে এটা সত্য কিনা তা আল্লাহ্ জানেন। আরও বলা হয়ে থাকে, এদের সম্পর্কেই

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছিলেন, 'এর আগে আমি যাদের কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এতে বিশ্বাস করে।' যখন তাদের কাছে এটি আবৃত্তি করা হয় তারা বলে, আমরা এতে বিশ্বাস করি, নিশ্চয়ই এটি আমাদের প্রভুর কাছ থেকে আসা সত্য। নিশ্চয়ই আমরা আগেও মুসলমান ছিলাম।' এখান থেকে 'আমাদের কাজের জন্য আমরা দায়ী এবং তোমাদের কাজের জন্য তোমরা দায়ী, তোমাদের প্রতি সালাম' আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না' এই পর্যন্ত।[১] তবে এটা সত্য কিনা তা-ও আল্লাহ্ই বলতে পারবেন।

আমি ইবনে শিহাব আল-জুহ্রিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এই আয়াত কাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল, সে বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'আমি সব সময় জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে শুনেছি যে এগুলো নাযিল হয়েছিল নিগাস ও তাঁর অনুচরদের সম্বন্ধে। আরো শুনেছি সূরা মায়িদার এই আয়াতগুলোও তাদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল। 'কারণ তাঁদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসারত্যাগী আছে আর তাঁরা অহংকারও করেন না' এখান থেকে 'সুতরাং আমাদের সাক্ষ্য-বহনকারীদের সঙ্গে একত্র তালিকাভুক্ত কর' এই পর্যন্ত।[২]

অনেক সময় রসূলে করীম (সা) তাঁর অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী সহচরদের নিয়ে মসজিদে বসতেন। যেমন খাব্বাব, আম্মার, আবু ফুকাইহা, ইয়াসার, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া ইবনে মুহারিরিতের মুক্ত দাস, সুহায়ব প্রমুখ। তখন কুরায়শরা তাঁদের দেখে বিদ্রূপ করত। বলত, 'দেখো দেখো, এরা হলো তার সাঙ্গপাঙ্গ। আল্লাহ্ কি শেষ পর্যন্ত ধরে ধরে এইসব জীবদের ঠিক করলেন আমাদের সৎপথ প্রদর্শনের জন্য? আমাদের কাছে সত্য প্রেরণ করার জন্য? মুহাম্মদ যা এনেছে, তা ভালই যদি হত, তাহলে এসব লোক তা প্রথমে পেতো না। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই এই জাতীয় লোকদের আমাদের উপরে স্থান দিত না।'

১. সূরা ২৮।
২. কুরআন ৫ : ৮২।

এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, 'যারা তাদের প্রভুকে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ডাকে তাদের তুমি বিতাড়িত করবে না। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয়, যার জন্য তুমি তাদের তাড়িয়ে দেবে। যদি তা তুমি কর, তাহলে তুমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এমনি করে আমরা একদলকে অন্যদল দ্বারা পরীক্ষা করিয়েছি, যাতে তারা বলে, 'আমাদের মধ্যে কি এদেরই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করলেন?' আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত নন? যারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে, তারা যখন তোমার নিকটে আসে, তখন তুমি তাদের বলো, 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক', তোমাদের প্রতি-পালক দয়া করাতে তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞানতাবশত যদি মন্দ কার্য করে এবং তারপর তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[১]

আমার জানামতে রসূল করীম (সা) প্রায়ই আল-মারওয়ায় বানু আল-হাজরামির ক্রীতদাস জাবর নামে এক যোয়ান খৃস্টানের দোকানে বসতেন। ওরা সবাই বলত, 'মুহাম্মদ যা আনে তার বেশির ভাগ জিনিস শিখিয়ে দেয় ওই জাবর খৃস্টান, বানু আল-হাজরামির ক্রীতদাস।'

আল্লাহ্ তাদের সেই কথার উপর নাযিল করেন, 'আমরা ভাল করে জানি তারা বলে, 'কেবলমাত্র একজন মরা মানুষই তাকে শিক্ষা দেয়'। যে ভাষায় কথা তারা বলে তা বিদেশী কিন্তু এ তো একেবারে বিশুদ্ধ আরবী বযান।[২]

সূরা আল-কাউসার নাযিল

আমি শুনেছি, রসূল করীম (সা)-এর কথা উঠলেই আল-আস ইবনে ওয়াইল আল-সাহমি বলত, 'ওর কথা বাদ দাও' ওর তো বালবাচ্চা

১. কুরআন ৬ঃ ৫২।
২. সূরা ১৬।

নেই। কাজেই ও মরে গেলে ওর স্মৃতিও শেষ হয়ে যাবে, তখন ওকে নিয়ে তোমাদের আর কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না।

এর উপর আল্লাহ্ নাযিল করলেন: 'আমরা তোমাদের আল-কাউসার দান করেছি[১]' এবং সে এমন এক জিনিস, যা সমস্ত পৃথিবী ও তার ভেতরে যা আছে সব কিছুর চাইতে ভাল। কাউসার মানে 'মহান'। লাবিদ ইবনে রাবিয়া আল-কিলাবি বলছিলেন:

মালহুবের[২] মালিকের মৃত্যুতে আমরা শোকগ্রস্ত হয়েছিলাম
এবং আল রিদায়[৩] আছে আর এক মহান মানুষের (কাউসার) ঘর।

আনাস ইবনে মালিক সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব আল-জুহরির ভাই আবদুল্লাহ্ ইবনে মুসলিম ও তদীয় সূত্রে জাফর ইবনে আমর আমাকে বলেছেন: 'রসূল করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এই যে আল্লাহ্ তাকে কাউসার দিয়েছেন সে কাউসারটি কি? তখন আমি তাকে বলতে শুনেছি যে, সে এক নদী সানা থেকে আয়লার সমান প্রশস্ত। এর মধ্যে পানির যে আধার তার সংখ্যা আকাশের যত তারা আছে তার সমান। পাখিরা ওখানে যায় উটের মুখের মতো মুখ বাড়িয়ে। তখন উমর বিন আল খাত্তাব বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ্! পাখিরা তাহলে খুব সুখী!' তিনি বললেন, 'সে পাখি যারা খাবে তারা তো আরো সুখী থাকবে।'

এই প্রসঙ্গে আমি তাঁকে (অথবা অন্য কোন প্রসঙ্গেও হতে পারে) বলতে শুনেছি, 'সে পানি যে পান করবে, তার আর কোনদিন তৃষ্ণা পাবে না।'

'তাঁর কাছে কোন ফিরিশতা পাঠানো হয় নি কেন' এর উপর প্রত্যাদেশ

নবী করীম (সা) সবাইকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছিলেন, তাদের কাছে ইসলাম প্রচার করছিলেন। তখন জামা' ইবনে আল-আসওয়াদ,

১. সূরা ১০৮।
২. বানু আসাদ ইবনে খুজায়মার এক নহর, অথবা বানু আবদুল্লাহ্‌র এক গ্রাম অথবা এক ঘোড়ার নাম হতে পারে।
৩. রিদা বানু আরজ ইবনে কা'বের পানি স্থান।

আন-নযর ইবনে আল হারিস, আল-আসওয়াদ ইবনে আবদু ইয়াগুত, উবাই ইবনে খালাফ ও আল-আস ইবনে ওয়াইল বলল, 'মুহাম্মদ' আপনার কাছে যদি একটা ফিরিশতা পাঠানো হতো, যে মানুষের কাছে আপনার কথা বলতে পারত, আপনার সঙ্গে ঘোরাফেরা করত, তাহলে না হয় বুঝতাম।

তাদের এই কথার উপরে আল্লাহ্ নাযিল করলেন, 'তারা বলে তাঁর কাছে একজন ফিরিশতা কেন পাঠানো হয় নি? আমি যদি ফিরিশতা একজন পাঠাতাম তাহলে সবকিছুর ফয়সালা হয়ে যেতো।

তাদের আর কোন সময়ই দেওয়া হতো না। যদি তাঁকে ফিরিশতা করতাম, তাহলে তাঁকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম. আর তাদের এমন বিভ্রমে ফেলতাম যেমন বিভ্রমে তারা এখনও পড়ে আছে।'

'আপনার আগেও রসূলদের উপহাস করা হয়েছে' এই আয়াতের নাযিল

আমি শুনেছি রসূল করীম যখনই আল ওয়ালিদ ইবনে আল-মুগিরা, উমাইয়া ইবনে খালাফ এবং আবু জেহেল ইবনে হিশামের পাশ দিয়ে যেতেন তারা তাকে গালি-গালাজ করত ও উপহাস করত; এতে তিনি খুব দুঃখ পেতেন। তখন এ প্রসঙ্গে নাযিল করলেন, 'আপনার পূর্বেও অনেক রসূলকেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছে, পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তাই তাদের পরিবেষ্টন করেছিল।'[২]

রাতের সফর, মি'রাজ

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের সূত্রে যিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাক্কাই আমাকে বলেছেন: ইসলাম যখন মক্কায় কুরায়শ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের

১. কুরআন ৬ : ৮।
২. কুরআন ৬ : ১০।

মধ্যে প্রসার লাভ করে, তখন একদিন রাতে মক্কার মসজিদ থেকে রসূলকে আয়েলিয়ার মসজিদ উঠিয়ে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যাওয়া হয়।

নিম্নোক্ত বিবরণ আমার কাছে এসেছে আবদুল্লা ইবনে মাসউদ, আবু সাঈদ আল-খুদরি, রসূল করীমের স্ত্রী আয়েশা, মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান, আল-হাসান ইবনে আবুল হাসান আল বসরী, ইবনে শিহাব আল-জুহরি, কাতাদা ও অন্যান্য হাদীসবেত্তা ও উম্মে হানি বিনতে আবু তালিবের কাছ থেকে। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য মিশিয়ে এটি সাজানো হয়েছে।

মিরাজের প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে তিনি যাকে যা বলেছেন সবই এখানে গ্রথিত হয়েছে। যাত্রার স্থান, বিষয় এবং সে সম্বন্ধে যা বলা হয় তা হলো এক অন্তর্ভেদী পরীক্ষা, এটা আল্লাহ্‌র শক্তি ও কর্তৃত্বের এক বিস্ময়বস্তু, যার মধ্যে নিহিত আছে বুদ্ধিমান মানুষের জন্য শিক্ষা; হিদায়ত এবং করুণা এবং বিশ্বাসীদের জন্য শক্তি। নিশ্চয়ই তা ছিল আল্লাহ্‌র এক কার্য, যার দ্বারা তিনি রাতের বেলা তাঁকে তাঁর ইচ্ছামতো নিয়ে গিয়েছিলেন—তাঁর ইচ্ছামতো কিছু কিছু আলামত তাঁকে (রসূলকে) দেখানোর জন্য, যাতে করে যে শক্তি ও সার্বভৌমত্ব বলে তিনি যখন যা চান তাই করেন, তা তিনি দেখতে পাবেন।

আমি শুনেছি আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলতেন: বুরাক হলো এমন এক বাহন যে তার দীর্ঘ পদক্ষেপ দ্বারা যতদূর চোখ যায় ততদূর যেতে পারে। রসূল করীম (সা)-এর আগে অন্যান্য নবীরা এই বাহনের পিঠে সওয়ার হয়েছেন। সেই বুরাক আনা হলো রসূল করীম (সা)-এর কাছে এবং তিনি তার উপর সওয়ার হলেন। তাঁর সঙ্গী [জিবরাঈল (আ)] গেলেন তার সঙ্গে আসমান ও পৃথিবীর মধ্যে সমস্ত আশ্চর্য বস্তু দেখার জন্য। তারপর তাঁরা এসে উপনীত হলেন জেরুযালেমের মসজিদে। সেখানে এসে তিনি দেখলেন ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্, মূসা (আ) ও ঈসা (আ) অন্যান্য নবীদের সঙ্গে এক জমাতে মিলিত হয়েছেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে নামায পড়লেন। তারপর তাঁর কাছে তিনটি পাত্র আনা হলো। একটিতে দুধ,

একটিতে মদ ও অন্যটিতে পানি। রসূল করীম (সা) বলেছেন : 'এইসব জিনিস যখন আমার সামনে এনে হাযির করা হলো, তখন আমি একটি দৈবকণ্ঠ শুনতে পেলাম : যদি তিনি পানি পান করেন তাহলে তিনি তার সমস্ত উম্মতসহ নিমজ্জিত হবেন, যদি তিনি মদ পান করেন তিনি তাঁর সমস্ত উম্মতসুদ্ধ উচ্ছন্নে যাবেন, এবং যদি তিনি দুধ পান করেন তিনি এবং তাঁর সমস্ত লোকজনসহ হিদায়ত প্রাপ্ত হবেন। যে পাত্রে দুধ, আমি তা উঠিয়ে নিয়ে সমস্ত দুধ পান করে ফেললাম। জিবরাঈল (আ) আমাকে বললেন, 'আপনি সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছেন, আপনি এবং আপনার সমস্ত উম্মত হে মুহম্মদ (সা)।'

আমাকে বলা হয়েছে যে আল-হাসান বলেছেন যে রসূল করীম (সা) বলেছেন : হিজরায় আমি যখন ঘুমোচ্ছিলাম, জিবরাঈল এসে আমার পায়ে খুঁচিয়ে আমাকে জাগিয়ে দিলেন। আমি উঠে চোখ মেলে তাকালাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। কাজেই শুয়ে পড়লাম। দ্বিতীয়বারের মতো তিনি এসে আমার পায়ে নাড়া দিলেন। আবার আমি উঠে বসে কিছুই দেখতে পেলাম না, আবার তাই শুয়ে পড়লাম। তৃতীয় বারের মতো তিনি এসে পায়ে আমাকে নাড়া দিলেন। আমি উঠে বসলাম। তিনি আমার বাহু ধরলেন। আমি তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে মসজিদের বাইরে দরজায় নিয়ে এলেন। ওখানে ছিল এক শ্বেতবর্ণ প্রাণী, অর্ধ-খচ্চর, অর্ধ-গর্দভ, দুই পাশে দুই পাখা, পাখা দুলিয়ে পা চালায় সে, সামনের প্রতি পা এক ক্ষেপে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর যায়। জিবরাঈল আমাকে তাঁর উপর চাপিয়ে দিলেন। তিনিও চললেন আমার সঙ্গে আমাকে তাঁর কাছাকাছি রেখে।

আমাকে বলা হয়েছে যে, কাতাদা বলেছেন যে তাঁকে বলা হয়েছিল যে রসূল করীম (সা) বলেছিলেন : আমি যখন তার উপর সওয়ার হতে গেলাম তখন সে চমকে উঠল। জিবরাঈল (আ) তার শেখরে তাঁর হাত রাখলেন। বললেন, 'তোমার লজ্জা করে না এরকম ব্যবহার করতে হে বুরাক? আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্র কাছে মুহাম্মদ (সা)-এর

চেয়ে বেশী সম্মানিত কেউ তোমার উপর এর আগে সওয়ার হয় নি। প্রাণীটি এত লজ্জা পেলো তখন, তার শরীর দিয়ে ঘাম বেরিয়ে গেল, স্থির হয়ে সে দাঁড়াল যাতে আমি সওয়ার হইতে পারি।'

আল-হাসান তাঁর বর্ণনায় বলেছেন: 'যেতে যেতে রসূল করীম (সা) এবং জিবরাঈল (আ) জেরুযালেম মসজিদে এসে হাযির হলেন। সেখানে তিনি দেখা পেলেন অনেক পয়গাম্বরদের মধ্যে ইবরাহীম (আ), মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর। ওখানে নামাযে ইমামতি করলেন রসূল করীম (সা)। তার পর দুটো পাত্র তাঁর সামনে এনে হাযির করা হলো। একটিতে তার মদ, অন্যটিতে দুধ। রসূল করীম (সা) দুধের পাত্র তুলে সব দুধ পান করলেন, মদের জায়গায় মদ রইল পড়ে। জিবরাঈল (আ) বললেন, "আপনি প্রকৃতির পথে সঠিক নির্দেশিত হয়েছেন মুহাম্মদ এবং আপনার উম্মতও তাই হবে। মদ আমাদের জন্য হারাম।" রসূল করীম (সা) তার পর ফিরে এলেন মক্কায়। পরদিন সকালে কুরায়শদের কাছে যা যা ঘটেছিল, সব বর্ণনা করলেন। তাদের অনেকে বলল, "ইয়া আল্লাহ্! এ তো পরিষ্কার গাঁজাখুরি। কারাভাঁর সিরিয়া যেতে লাগে একমাস আর ফিরতে একমাস আর মুহাম্মদ আসা যাওয়া করল এই একরাতে?' অনেক মুসলমানের ঈমান পর্যন্ত দোদুল্যমান হয়ে উঠল। আবু বকরের কাছে কেউ কেউ গিয়ে বলল, 'এখন আপনার বন্ধু সম্বন্ধে কি বলবেন আবু বকর? তিনি তো দাবি করে বসে আছেন, তিনি কাল রাতে জেরুযালেম গেছেন, ওখানে নামায পড়েছেন, তার পর আবার ফিরে এসেছেন মক্কায়।" আবু বকর জবাব দিলেন যে তারা রসূল করীম (সা)-এর নামে মিথ্যা কথা বলছে। তারা জানাল রসূল করীম (সা) সেই মুহূর্তে মসজিদেই আছেন, লোকজনকে সেই কাহিনীই শোনাচ্ছেন। আবু বকর বলছেন, "তিনি যদি বলে থাকেন তাহলে তা সত্যি। আর তাতে এত অবাক হবার কি আছে? তিনি আমাকে বলেন যে দূর আসমান থেকে আল্লাহ্ দিনে কি রাতে মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন এবং সে কথা আমি বিশ্বাস করি। তোমরা যে জিনিসের কথা শুনে চোখ কপালে তুলছ, সেটা তো তার

চেয়েও অসাধারণ ব্যাপার!" তিনি তখন রসূল করীম (সা)-এর কাছে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ওরা যা বলছে, সব সত্য কিনা। তিনি তখন বললেন, সব সত্য, তখন তিনি তাঁর কাছে জেরুযালেমের বর্ণনা দিতে অনুরোধ করলেন।

আল-হাসান বলেছিলেন যে তিনি বলেছিলেন, রসূল করীম (সা) যখন কথা বলছিলেন, তাঁকে একটু উপরে তুলে ধরা হয়েছিল, যাতে করে রসূল করীম (সা)-এর জেরুযালেমের বর্ণনা দেওয়ার সময় তিনি তাঁর মুখ দেখতে পান। একটি অংশের বর্ণনা শেষ হলেই আবু বকর বলে উঠতেন, 'সত্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহ্‌র রসূল।' এমনি করে বর্ণনা শেষ হলো। তখন রসূল করীম (সা) বললেন 'এবং আপনি আবু বকর, আপনি হলেন সিদ্দীক, সত্যবাদী।' তখন থেকেই তিনি এই উপাধি পান।

আল-হাসান আরো বলছেনঃ এই কারণে যারা ইসলাম সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছিল, তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ নাযিল করেনঃ 'আমি দিব্য দৃষ্টি কেবল তোমাকে দিয়েছিলাম মানুষের এবং কুরআনে বর্ণিত অভিশপ্ত বৃক্ষের জন্য একটি পরীক্ষা হিসাবে। আমরা তাদের ভয় দেখিয়েছি, কিন্তু তাতে কেবল তাদের ক্ষতিকর ভ্রমই বৃদ্ধি পেল।'[১]

এই হলো কাতাদা কর্তৃক কিছু সংযোজনসহ আল-হাসানের বর্ণনা।

আবু বকরের পরিবারের একজন সদস্য আমাকে বলেছেন যে আয়েশা (রা) প্রায়ই বলতেনঃ 'রসূল করীম (সা) যেখানে ছিলেন, সেখানেই ছিলেন, রাতে আল্লাহ্ তাঁর আত্মাকেই কেবল নিয়ে গিয়েছিলেন।'

ইয়াকুব ইবনে উতবা ইবনে আল-মুগিরা ইবনে আল-আখনাস আমাকে বলেছে যে মিরাজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান বলেছেন, 'সে ছিল আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রদত্ত এক সত্যিকারের দিব্যদৃষ্টি।' পরবর্তী দুই বর্ণনাকারীর সঙ্গে আল-হাসানের হাদীসের

১. সূরা ১৩।

কোন বিরোধ নেই। এর উপর আল্লাহ্ নাযিল করেছেন, 'সে মিরাজ কেবল তোমাকে আমি দিয়েছিলাম, মানুষের প্রতি এক পরীক্ষারূপে।' এর সঙ্গে আল্লাহ্ ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনীতে যখন ইবরাহীম তাঁর পুত্রকে বললেন, 'হে পুত্র, আমি স্বপ্নে দেখেছি, তোমাকে আমার কুরবানী করতে হবে'[১] তারও কোন বিরোধ নেই। সে জন্য স্বপ্নে পাওয়া প্রত্যাদেশ অনুযায়ী তিনি কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আমি বন্দুরে দেখেছি, এমনি করে জাগ্রত কি ঘুমন্ত অবস্থায় রসূল করীম (সা)-এর কাছে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ওহী আসত।

আমি শুনেছি রসূল করীম (সা) বলতেন, 'আমার চোখ ঘুমাত কিন্তু আমার অন্তর জেগে থাকত।' আল্লাহ্‌ই কেবল জানেন কেমন করে আসত প্রত্যাদেশ, কেমন করে তিনি এসব দেখতেন। তবে ঘুমন্ত হোন আর জাগ্রত হোন, ঘটনা সব সত্যি এবং প্রকৃত পক্ষেই ঘটেছিল।

আল-জুহরি দাবি[২] করেছেন যে, তিনি সাঈদ ইবন আল-মুসাইয়াবের কাছ থেকে জেনেছেন যে রসূল করীম (সা) নাকি সাহাবাদের কাছে সেই রাতে দেখা ইবরাহীম (আ), মূসা (আ)ও ঈসা (আ)-এর বর্ণনা দিয়েছেন। বলেছেন, 'আমার সঙ্গে ইবরাহীমের যত মিল, তত মিল আর কারো সঙ্গে আমি দেখিনি। মূসার মুখ টকটকে লাল, লম্বা, তার শরীরের চামড়া পাতলা, চুল কুঞ্চিত, নাক একটু বাঁকানো, শানুয়ার নাকের মত। মারির পুত্র গৌরবর্ণ মানুষ, মাঝারি উচ্চতা, বিরল কেশ, মুখে অনেক রেখা— মনে হয় এক্ষুনি তিনি গোসল করে এসেছেন। দেখলে মনে হবে তার মাথা পানিতে জবজবে ভেজা, যদিও পানি ছিল না তার মাথায়। তার মতো চেহারার একজন আছে তোমাদের মধ্যে সে হলো উরওয়া ইবনে মাসুদ আস-সাকাফি।

১. সূরা ৩৭।
২. এই শব্দ দ্বারা বক্তার সত্য কথনে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে।

রসূল করীম (সা)-এর মিরাজ সম্পর্কে উম্মে হানি বিনতে আবু তালিব ওরফে হিন্দ-এর কাছ থেকে কিছু বর্ণনা আমি পেয়েছি। তিনি বলেছেন: আমার বাড়িতে থাকা অবস্থায়ই তিনি মিরাজে গেছেন, অন্য কোনখান থেকে যাননি। সে রাতে তিনি আমার বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। সে রাতে তিনি এশার নামায পড়ে ঘুমোতে গেলেন। আমরাও ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরের একটু আগে রসূল করীম (সা) আমাদের জাগিয়ে দিলেন। আমরা ফজরের নামায পড়লাম। তারপর তিনি বললেন, 'উম্মে হানি, কালকে তো এইখানে এই উপত্যকায় আপনাদের সঙ্গে আমি এশার নামায পড়লাম। সে তো আপনি দেখেছিলেন। তারপর আমি জেরুযালেম গেলাম এবং ওখানে নামায পড়লাম। আবার এখানে আমি এক্ষুনি আপনাদের সঙ্গে ফজরের নামায পড়লাম, এই যেমন দেখলেন। তিনি বাইরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেই আমি তাঁর জামা চেপে ধরলাম, তাতে টান লেগে তাঁর পেট উদাম হয়ে গেল, যেন আমি এক ভাঁজ-করা মিসরীয় কাপড় ধরে টেনেছিলাম। আমি বললাম, 'রসূলুল্লাহ্ একথা কাউকে যেন বলবেন না, ওরা বলবে এটা মিথ্যা কথা, আপনাকে তারা অপমান করবে।'

তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম তাদের আমি বলবই।'

আমার এক নিগ্রো ক্রীতদাসীকে বললাম, রসূলের সাথে সাথে যাওয়ার জন্য, যেখানে যান সেখানে যাবে, কি তিনি বলেন, লোকে তাঁকে কি বলে শুনবে। তিনি তাঁদের বললেন সব কথা। সবাই খুব অবাক হলো, জিজ্ঞেস করল একথা যে সত্য তার প্রমাণ কি। তিনি জবাব দিলেন, তিনি অমুক উপত্যকায় অমুকের কারাভাঁর পাশ দিয়ে গেছেন, তিনি যে প্রাণীর উপর সওয়ার হয়েছিলেন, তাকে দেখে সবাই ভয় পেয়েছে, একটা উট ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। আমি তাদের বলে দিলাম "কোথায় আছে সে উট, কারণ আমি তো সিরিয়ার পথেই যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে দাজনানানে[১] পৌঁছে আমি অমুকের কারাভাঁ পার হয়ে গেলাম। দেখলাম,

১. তিহামার কাছাকাছি এক পাহাড়। আল-ওয়াকিদির মতে মক্কা থেকে ২৫ মাইল।

সবাই ঘুমিয়ে আছে। একটা পানির পাত্র ছিল, কিছু একটা দিয়ে তার মুখ ঢাকা। পানির ঢাকনা সরিয়ে আমি পানি পান করে আবার তা ঢেকে রাখলাম। এর প্রমাণ হলো তাদের সেই কারাভাঁ এই মুহূর্তে আত্-তানিম গিরিপথ দিয়ে আল বায়দা[১] থেকে নেমে আসছে, তাদের সবার আগে আছে এক ধূসর বর্ণের উট, উটের একদিকে এক কালো আর অন্য দিকে নানা বর্ণের বস্তা।" সবাই দ্রুত সেই গিরিপথের দিকে ছুটে গেল। প্রথমে যে উটের দেখা পেলো তার সঙ্গে রসূল করীম (সা)-এর বর্ণনার হুবহু মিল দেখতে পেল। তারা তাদের সেই পানির পাত্রের কথা জিজ্ঞেস করল। ওরা বলল যে, ঘুমানোর আগে তারা পাত্র পানিতে ভরে ঢেকে রেখেছিল। তারপর যখন জাগল, দেখল পাত্র ঠিকই ঢাকা আছে, কিন্তু পাত্র অর্ধেক খালি। মক্কায় অন্যান্য যারা ছিল তাদেরও তারা জিজ্ঞেস করল। সবাই বলল যে, হ্যাঁ, ঘটনা সত্য : ওরা সবাই ভয় পেয়েছিল, ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল একটা উট, কে যেন তাদের ডাকল তখন, ডেকে ওটা কোথায় বলে দিল, ওরা গিয়ে উদ্ধার করল উট।

বেহেশতে আরোহণ

আবু সাঈদ আল-খুদ্রির বরাত দিয়ে আমাকে এই বর্ণনা যিনি দিয়েছেন, তাঁকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই আমার। তিনি আমাকে বলেছেন : আমি রসূল করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি, জেরুযালেমে আমার কাজ শেষ হলে পরে আমার কাছে খুব সুন্দর একটা মই আনা হলো, এমন সুন্দর মই আমি আর জীবনে কোন দিন দেখি নি। সে এমন মই, যা মৃত্যু সম্মুখে নিকটবর্তী হলে মুমূর্ষু মানুষ দেখতে পায়। আমার সঙ্গী আমার সঙ্গে সেই মইয়ে সওয়ার হলেন। আমরা আসমানের একটি দরজায় এসে উপনীত হলাম। সে ফটকের নাম পাহারাদারের দরজা। যে দরজার দায়িত্বে ছিলেন ইসমাঈল নামে একজন ফিরিশতা। তাঁর অধীনে ছিলেন বারো হাজার ফিরিশতা, সেই বারো হাজারের প্রত্যেকের অধীনে ছিলেন

১. মক্কার কাছে এক পাহাড়। তানিম মক্কার খুব কাছে উচ্চ ভূমি।

আরো বারো হাজার ফিরিশতা। এই বর্ণনা দেবার সময় রসূলে করীম (সা) বলতেন, 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ আল্লাহ্র সৈন্য-সামন্তের খবর জানে না। জিবরাঈল আমাকে ওখানে নিয়ে গেলে, ইসমাঈল আমি কে জিজ্ঞেস করলেন। জিবরাঈল বললেন যে, আমি মুহাম্মদ। ইসমাঈল জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে কোন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কিনা অথবা আমাকে আসতে বলা হয়েছে কিনা। জিবরাঈলের কাছ থেকে সন্তোষজনক জবাব পাওয়ার পর ইসমাঈল আমাকে শুভেচ্ছা জানালেন, দোয়া করলেন।

একজন হাদীসবেত্তা রসূলের মুখ থেকে নিজে শুনে আমাকে বলেছেন যে রসূলে করীম (সা) বলেছেন: 'আমি যখন সর্বনিম্ন আসমানে প্রবেশ করলাম তখন ওখানে যত ফিরিশতার সঙ্গে দেখা হলো, সবাই হেসে আমাকে স্বাগত জানালো। একজন কেবল হাসলেন না, যদিও অন্য সকলের মতো দোয়া ঠিকই উচ্চারণ করলেন। তিনি হাসলেন না কিংবা তাঁর মুখভাবে আনন্দের কোন চিহ্ন প্রকাশিত হলো না। আমি জিবরাঈলকে তার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। জিবরাঈল বললেন যে, তিনি যদি এর পূর্বে কাউকে দেখে হেসে থাকতেন অথবা যদি পরে কাউকে দেখে হাসেন সে হবেন আপনি। কিন্তু তিনি হাসেন না। কারণ তিনি মালিক, দোযখের রক্ষী। আল্লাহ্র সঙ্গে জিবরাঈলের নৈকট্যপূর্ণ সম্পর্কের কথা তিনিই তোমাদের বলেছেন। বলেছেন, 'যার আজ্ঞা সেখানে পালিত হয় এবং যে বিশ্বাস-ভাজন'[১] সেজন্য তাঁকে আমি বললাম, "আমাকে দোযখ দেখানোর জন্য বলবেন না ওঁকে?" এবং তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই। হে মালিক, মুহাম্মদকে দোযখ দেখিয়ে দিন।" সেই কথার উপরে তিনি দোযখের আবরণ খুলে ফেললেন. লেলিহান আগুনের শিখা আকাশের দিকে উঠে গেল, মনে হলো সব গিলে নিঃশেষ করে ফেলবে সে শিখা। আমি জিবরাঈলকে বললাম সে আগুনকে যথাস্থানে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁকে আদেশ করতে। জিবরাঈল তা করলেন। এই আগুন প্রত্যাহার করে নেওয়াটাকে আমি একটি ছায়াপাতের সঙ্গে তুলনা করতে পারি; আগুনের শিখা

১. কুরআন ৮১ : ২১।

ফিরে গেল সেই সেখানে, যেখান থেকে তারা এসেছিল। তার উপরে ঢাকনা ফেলে দিলেন মালিক।'

এক হাদীসে আবু সাঈদ আল-খুদরি বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন: 'সর্বনিম্ন আসমানে প্রবেশ করার পর আমি দেখলাম সেখানে একটা মানুষ বসে আছে এবং তার সম্মুখ দিয়ে আত্মারা যাচ্ছে। কারো সঙ্গে সে ভাল করে কথা বলছে, দেখে উল্লসিত হচ্ছে, বলছে:

"এক ভাল দেহ থেকে আসা এক ভাল আত্মা," আবার অন্য কাউকে বলছে, ছ্যা:!" তারপর ভ্রূকুটি করে আবার বলেছে: "এক বদ আত্মা এসেছে এক বদ শরীর থেকে।" আমার প্রশ্নের উত্তরে জিবরাঈল আমাকে জানালেন যে ইনি আমাদের পিতা আদম (আ), তাঁর সন্তান-সন্ততিদের আত্মার পর্যালোচনা করছেন। একজন বিশ্বাসীর আত্মা তাঁর আনন্দকে উত্তেজিত করে, অন্যদিকে অবিশ্বাসীর আত্মা তাঁর ঘৃণার উদ্রেক করে, সেইজন্য তাঁর সেই ভিন্ন ধরনের উক্তি।

তারপর দেখলাম কিছু মানুষ—উটের মত তাদের ঠোঁট, হাতে আগুনের মত পাথর, সেই অগ্নি প্রস্তর তারা মুখের ভেতর দিয়ে ঢোকাচ্ছে আর তা বেরিয়ে আসছে তাদের পেছন দিয়ে। ওরা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছিল বলে এই অবস্থা—ওরা আমাকে জানাল।

তারপর দেখলাম ফিরাউনের পরিবারের মানুষের মত কিছু মানুষ। এই রকম পেট আমি আর দেখি নি, তাদের উপর দিয়ে পার হচ্ছিল কি যেন, মনে হচ্ছিল তৃষ্ণায় উন্মত্ত উট, তাদের দলিত করে যাচ্ছিল তাদের দোযখে নিক্ষেপ করার পর, এমন করে পদদলিত করছিল তাদের, তারা তাদের পথ থেকে কিছুতেই সরতে পারছিল না। এরা ছিল সুদখোর। তারপর আমি আরো কিছু মানুষ দেখলাম—তাদের একপাশে চর্বিযুক্ত ভাল মাংস এবং অন্যপাশে জিরজিরে পচা গোশত, দেখলাম ওরা ভাল চর্বিযুক্ত গোশত ফেলে রেখে পর্দা-পর্দা পচা গোশতটাই খাচ্ছে। যে সব রমণীকে আল্লাহ্ এদের জন্য নিয়মসিদ্ধ করে রেখেছিলেন তাদের কাছে

এরা যায় নি, গিয়েছিল আল্লাহ্ তাদের জন্য যাদের হারাম করে রেখেছিলেন, তাদের কাছে।

তারপর দেখলাম স্তনে হুড়কা লাগিয়ে ঝুলে আছে। স্বামীদের ঠকিয়ে এরা জারজ সন্তানের জন্ম দিয়েছিল।'

আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মদের সূত্রে জাফর ইবনে আমর আমাকে বলেছেন যে, রসূল করীম (সা) বলেছেন ঃ যে রমণী নিজ পরিবারে হারামী সন্তান আনয়ন করে, তার প্রতি আল্লাহ্‌র ক্রোধ বিশাল। তারা আপন সন্তানদের নিজ অংশ থেকে বঞ্চিত করে এবং হারিমের রহস্য জেনে ফেলে।'

সাঈদ আল-খুদরির হাদীসের পরবর্তী অংশ ঃ তারপর আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো দ্বিতীয় আসমানে। ওখানে ছিলেন দুই মামাতো ভাই, ম্যারির পুত্র যীশু এবং যাকারিয়ার পুত্র জন। তারপর এল তৃতীয় আসমান। ওখানে একজনকে দেখলাম তার মুখটি পূর্ণিমার চাঁদের মত। এই হলো আমার ভ্রাতা ইউসুফ, ইয়াকুবের পুত্র। তারপর এল চতুর্থ আসমান। ওখানে দেখা হলো ইদ্রিস নামের একজনের সঙ্গে। "এবং আমি তাকে এক সুউচ্চ আসনে উন্নীত করেছি"।[১] তারপর এল পঞ্চম আসমান। ওখানে দেখলাম একজন সাদা চুল দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত একজনকে, এমন সুন্দর মানুষ আমি আর কখনো দেখি নি। ইনি হলেন আপন লোক-জনের অতি প্রিয় মানুষ আরন, ইমরানের পুত্র। তারপর গেলাম ষষ্ঠ আসমানে। ওখানে পেলাম এক কৃষ্ণকায় লোককে, তাঁর নাক ছিল শানুয়ার মত বঙ্কিম। ইনি হলেন আমার ভাই মুসা, পিতা ইমরান। তারপর এল সপ্তম আসমান। দেখলাম সেই অমর প্রাসাদের[২] ফটকে এক সিংহাসনে বসে আছেন একজন। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা এই ফটক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন, কিয়ামতের আগে তাঁরা ফিরে আসবেন না। ইনি আমার পিতা ইবরাহীম। তিনি আমাকে বেহেশ্‌তে

---

১. কুরআন ১৯ ঃ ৫৮।

২. আল-বায়তুল মামুর।

নিয়ে গেলেন। ওখানে দেখলাম ঘন টকটকে লাল এক মেয়ে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম সে কার। কারণ ওকে দেখেই আমার খুব ভালো লাগল। তিনি বললেন, "যায়দ ইবনে হারিসের।" যায়দকে নবী করীম (সা) সেই সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন।

নবী করীমের কাছ থেকে প্রাপ্ত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের এক হাদীসে আমি আরেকটি তথ্য পেয়েছি: জিবরাঈল যখন তাঁকে একে একে সব আসমানে নিয়ে যাচ্ছিলেন, প্রবেশ করার অনুমতি চাচ্ছিলেন, তখন তাকে বলতে হতো, তিনি কাকে নিয়ে যাচ্ছেন। যাকে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি কোন দায়িত্ব লাভ করেছেন কি না[১] এবং তার জবাবের পর তারা বলতেন 'আল্লাহ্ তাকে পরমায়ু দিন, হে ভ্রাতা, হে বন্ধু!' এমনি করতে করতে তাঁরা পেঁছিলেন সপ্তম আসমানে এবং পরম প্রভুর কাছে। ওখানেই তাঁর উপর দিনে পঞ্চাশবার নামাযের আদেশ হয়েছে।

রসূলে করীম (সা) বলেছেন: 'প্রত্যাবর্তনের সময় সাক্ষাৎ ঘটল মূসার। আহ্, তিনি যে কি চমৎকার বন্ধু তোমাদের! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কত বারের নামাযের আদেশ হয়েছে আমার উপর। আমি বললাম, পঞ্চাশ। তিনি বললেন, "নামায হলো খুব ভারী জিনিস। আপনার উম্মত সব দুর্বল মানুষ, আপনি বরং আপনার প্রভুর কাছে আবার যান। এই সংখ্যাটি আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য আরো কমিয়ে দিতে বলুন।" তাই আমি করলাম। তিনি ওখান থেকে দশ পদ দূরে ছিলেন। আবার ফেরার সময় সেই মূসার সঙ্গে দেখা। আগে যা বলেছিলেন আমাকে, তিনি তার পুনরাবৃত্তি করলেন। আবার আমি গেলাম প্রভুর কাছে। এমনি করে তাঁর কাছে বার বার গিয়ে সংখ্যা কাটাতে কাটাতে দিন ও রাতে মিলে পাঁচ বার নামাযের হুকুম বহাল রইল। সেবারও মূসা আমাকে একই উপদেশ দিলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'আমি আমার প্রভুর কাছে বারবার গিয়েছি, নামাযের সংখ্যা কমানোর জন্য বার বার বলতে বলতে এইবার আমার

১. অথবা 'তাকে ডাকা হয়েছে কি না'।

লজ্জা লেগেছিল, আমি আর তাঁর কাছে যাব না। তোমাদের মধ্যে যে ঈমান ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে এইটুকু করবে, সে পঞ্চাশ নামাযের মর্তবা পাবে।"

উপহাসকারীদের প্রতি আল্লাহ্‌র আচরণ

সবাই তাঁকে মিথ্যাবাদী বলত, অপমান করত, তাঁকে উপহাস করত। তবু তিনি অটল রইলেন। আল্লাহ্‌র সহায়তার উপর ভরসা করে আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার কার্য চালিয়ে যেতে লাগলেন। প্রধান অপরাধী ছিল—উরওয়া ইবনে আল জুবায়রের সূত্রে ইয়াযিদ ইবনে রূমান আমাকে যেরকম বলেছে—পাঁচজন লোক। এরা সকলেই আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মানিত ও মান্যগণ্য মানুষ। এরা হলো : বানু আসাদ.. ...এর আল-আসওয়াদ ইবনে আল-মুত্তালিব ইবনে আসাদ আবু জামা'। [তার দেওয়া অপমান ও উপহাসের জন্য আমি রসূল করীম (সা)-কে এই বলে তাকে অভিসম্পাত দিতে শুনেছি, 'ইয়া আল্লাহ্! একে অন্ধ করে দিন, এর সন্তানকে আপনি কেড়ে নিন!'] বানু জুহরার......আল-আসওয়াদ ইবনে আবদ ইয়াগূত। বানু মাখজুম...এর আল-ওয়ালিদ ইবনে আল-মুগিরা...। বানু সাহম ইবনে আমর...এর আল-আস ইবনে ওয়াইল ইবনে হিশাম। বানু খুজা'-র ছিল আল-হারিস ইবনে আল তুলাতিলা ইবনে আমর ইবনে আল-হারিস ইবনে আবদ ইবনে আমর ইবনে লুআই ইবনে মালাকান।

অসৎ আচরণ যখন ওরা করেই চলল, যখন তাদের উপহাস বর্ধিত হয়েই চলল, অবিরাম, তখন প্রত্যাদেশ এল আল্লাহ্‌র কাছ থেকে :

"তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং অংশীবাদের উপেক্ষা কর। বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে এবং যারা আল্লাহ্‌র পাশে ইলাহ্ বসিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট। এবং শীঘ্র তারা এর পরিণাম জানতে পারবে।"[১]

একই ইয়াযিদ উরওয়া সূত্রে আমাকে জানিয়েছে (অথবা অন্য কোন হাদীসবেত্তার সূত্রেও হতে পারে) যে, মসজিদের তওয়াফ করছিল

১. কুরআন ১৫ : ৯৪।

যখন উপহাসকারীরা তখন জিবরাঈল এলেন রসূল করীম (স)-এর কাছে। তিনি দাঁড়ালেন। পাশে দাঁড়ালেন রসূল করীম (সা)। আল-আসওয়াদ যাচ্ছিল সম্মুখ দিয়ে। জিবরাঈল (আ) তার মুখে ছুড়ে দিলেন একটি সবুজ পাতা, সে অন্ধ হয়ে গেল। তারপর সামনে এল আল আসওয়াদ ইবনে আবদু ইয়াগুত। জিবরাঈল তার পেটের দিকে নির্দেশ করলেন, পেট ফুলতে ফুলতে ফেটে গেল, সরে গেল সে সঙ্গে সঙ্গে। তারপর এল আল্-ওয়ালিদ। ওর হাঁটুর নিচে পুরনো একটা ক্ষতচিহ্নের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি (কয়েক বছর আগে আলখাল্লা ঝুলিয়ে ও হাঁটতে হাঁটতে খুজা-র এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সেই লোক তখন তীরে পালক লাগাচ্ছিল, এক তীরের খোঁচা লেগেছিল তার চাদরে এবং পায়েও একটু ছড়ে গিয়েছিল, ব্যস এইটুকু)। কিন্তু সেই ক্ষত আবার তাজা হলো, সে মারা গেল তাতে। তারপর সেদিক দিয়ে যাবার পালা এল আল-আসের। তিনি তার পায়ের আঙ্গুলের উপরের জায়গাটুকু ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দিলেন। সে চলে গেল, তার গাধা চলল আল-তাইফের দিকে। এক কাঁটাগাছে বাঁধল তার জন্তুটি, কাঁটাগাছের কাঁটা বিঁধল তার পায়ে, তাতেই সে পটল তুলল। সবশেষে এল আল-হারিস। তিনি তার মাথা দেখিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মাথা ভরে গেল পুঁজে, সেই পুঁজ হত্যা করল তাকে।

আবু উযায়হির আল-দাউসির কাহিনী

আল-ওয়ালিদ যখন দেখল তার মৃত্যু সন্নিকট, সে তার তিন পুত্র-হিশাম, আল-ওয়ালিদ এবং খালিদকে ডাকল। বলল : পুত্রগণ, তোমাদের আমি তিনটা কাজ দিয়ে যাচ্ছি, ওগুলো করতে ভুলো না যেন। আমার রক্ত রইল খুজা-দের সঙ্গে। এর যেন বদলা নেওয়া হয়। আমি জানি তারা নিরপরাধ কিন্তু আমি মারা গেলে আমার ভয় হয় তোমরা কিছু না করলে লোকে তোমাদের নিন্দা করবে। সাকিফের কাছে আমি সুদের টাকা পাই, ওটা আদায় করবে। সবশেষে আমার যৌতুকের টাকা আছে আবু উযায়হির আল-দাউসির কাছে। ওর কাছ থেকে তা নিয়ে নিয়ো।'

আবূ উযায়হির তার মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল কিন্তু মেয়েকে তার কাছে যেতে দেয়নি, তাকেও তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত মেয়ের কাছে আসতে দেয় নি।

আল-ওয়ালিদের মৃত্যুর পর বানূ মাখজুম লাফিয়ে পড়ল খুজা' বংশের উপর, আল-ওয়ালিদের জন্য রক্তপণ দাবি করে বসল। বলল, 'তোমাদের লোকের তীরের খোঁচায় তিনি মারা গেছেন। সে ছিল বানূ-কা'বের লোক, বানূ আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিমের মিত্র। খুজা' তাদের দাবি মেনে নিতে রাযী হলো না। তারপর শুরু হলো কবিতা রচনার প্রতিযোগিতা। অবস্থা ক্রমে ক্রমে সঙ্গীন হয়ে উঠল। যার তীরের খোঁচায় মৃত্যু ঘটেছিল আল-ওয়ালিদের, সে ছিল খুজা বংশের বানূ কা'ব ইবনে আমর-এর লোক। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে মাখজুম এই কবিতা রচনা করেন:

আমি বাজি রাখছি, তোমরা শীগগির পালাবে
ডেকো শেয়াল সমেত আল-জাহরানকে নিস্তার দেবে।
আতরিকার পানি ছেড়ে চলে যাবে তোমরা
জানতে চাইবে, কোন্ আরাক গাছ ভালো সবচেয়ে।
আমরা আমাদের রক্তের বদলা না নিয়ে ছাড়ি না
যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করি, তারা নিজের পায়ে আর দাঁড়াতে পারে না।
আল-জাহরান আর আল-আরাক ছিল খুজার বানূ কা'বের শিবির-স্থল।

বানূ কা'ব ইবনে আমর আল-খুজাইর ভাই আল-জাউন ইবনে আবুল জাউন তার জবাব রচনা করে:

আল্লাহ্র কসম, আল-ওয়ালিদের জন্য অন্যায় রক্তপণ আমরা দেবো না
যতদিন না আকাশের তারার রং মুছে যাবে
তোমাদের যোয়ানরা একটা আরেকটার উপর আছড়ে পড়বে
দুজনেই মৃত্যুর মুখে অসহায় মুখ খুলবে।
তোমার রুটি তোমার খিচুড়ি খাওয়ার সময়
তোমরা সব কাঁদবে, চীৎকার করবে আল-ওয়ালিদের জন্য।

তারপর চলল অনেক তর্ক, অভিযোগ, পালটা অভিযোগ। এমনি করে এক সময় সবাই টের পেল তাদের ইযযত বিপন্ন। খুজা তখন কিছু রক্তপণ প্রদান করল। বাকিটার দাবি তারা ত্যাগ করল। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে পরে আল-জাউন বলেছিলেন:

আল-ওয়ালিদের জন্য রক্তপণ দিলাম আমরা
অনেক পুরুষ অনেক রমণী বিস্ময়ে মুখর হলো।
'তোমরা শপথ করোনি, আল-ওয়ালিদের অন্যায় রক্তপণ তোমরা দেবে না
নেহায়েত দুর্ভাগ্য নেমে না এলে ?"
আমরা কিন্তু যুদ্ধকে বদলিয়ে শান্তি এনেছি
এখন যেখানে খুশি যেতে পারে কোন পথিক।

কিন্তু ওখানেই নিরস্ত হয় নি আল-জাউন, আল-ওয়ালিদকে হত্যা করার জন্য গর্ব প্রকাশ করল। বলল, তারাই তাকে শেষ করেছে। কিন্তু সে কথা অসত্য। ফলে হুঁশিয়ারি অনুযায়ী তার পুত্র আল-ওয়ালিদ ও তার গোত্র পরিণতি ভোগ করল। আল-জাউন বলেছিল:

আল-মুগিরা দাবি করে নি,
কা'ব এক বিরাট শক্তি ?
অহংকার করো না আল-মুগিরা, কারণ তুমি তো দেখছই
বিশুদ্ধ আরব ও তার উপগোত্র সবাই একই পথে হাঁটে।
আমরা ও আমাদের পিতারা ওখানে জন্ম নিয়েছি
সাবিরের স্বস্থানে অবস্থানের মত তা সত্য।
আমাদের অবস্থা বুঝবার জন্য সেকথা বলেছে।
অথবা বলেছে আমাদের মধ্যে যুদ্ধ ডেকে আনবার জন্য।
কারণ ওয়ালিদের রক্তের কোন পণ দেওয়া হবে না।
তুমি জানো, যে রক্ত আমরা পান করি, তার দাম আমরা দিই না।
মহান যোদ্ধা বিষাক্ত তীরে বিদ্ধ করল তাকে,
তীরবিদ্ধ সে শ্বাসরুদ্ধ হলো।
অন্ধকার উপত্যকায় পড়ে গেল সে সটান।

যেন মাটিতে আপতিত উট এক।
আবূ হিশামের জন্য দুর্বল স্কন্দে কুঞ্চিত কেশ উট দিয়ে
অর্থদান দীর্ঘায়িত করার হাত থেকে আমি বেঁচে যাব এতে।

তারপর আবূ উযায়হিরকে একদিন জুল-মাজাজের বাজারে আক্রমণ করল হিশাম ইবনে আল-ওয়ালিদ। এদিকে এই উযায়হিরের কন্যা আতিকা ছিল আবূ সুফিয়ান ইবনে হার্বের স্ত্রী। আবূ উযায়হির ছিল আপন সম্প্রদায়ের একজন প্রধান। পিতার অছিয়ত অনুযায়ী সেই তাকেই হত্যা করল আল-ওয়ালিদের রক্তপণের জন্য, যে রক্তপণের টাকা তার কাছেই ছিল। এই ঘটনা ঘটে রসূল করীম (সা)-এর মদীনায় হিজরত করার পর। তখন বদরের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, নাস্তিক কুরায়শদের অনেক নেতা তখন নিহত। আবূ সুফিয়ান যখন জুল-মাজাজে, তখন ইয়াযিদ ইবনে আবূ সুফিয়ান বেরিয়ে পড়ল এবং বানু আবদু মানাফের লোকজনকে একত্রিত করল। লোকে বলাবলি করতে লাগল, শশুরের ক্ষেত্রে আবূ সুফিয়ানের ইযযত নষ্ট করা হয়েছে এবং তার জন্য তিনি শোধ নেবেন। পুত্রের কীর্তির কথা কানে যেতেই আবূ সুফিয়ান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মক্কায় চলে এলেন। তিনি ছিলেন নম্র কিন্তু বিচক্ষণ লোক। আপন সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য ছিল তার অসীম ভালবাসা। তিনি আশংকা করছিলেন, আবূ উযায়হিরের কারণে হয়তো কুরায়শদের মধ্যে গুরুতর গোলমাল দেখা দেবে। তিনি তখন সোজা চলে গেলেন বানু আবদু মানাফ ও আতর সুবাসিতদের সঙ্গে অবস্থান করা তার পুত্রের কাছে। পুত্রের কাছ থেকে বর্শা কেড়ে নিলেন, তা দিয়ে তার মাথায় জোরে আঘাত করলেন। বললেন, 'আল্লাহ্‌র লানত পড়ুক তোমার উপর! দাউসের একটা লোকের কারণে কুরায়শদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ হোক, এই তুমি চাও? রক্তপণ যদি ওরা নেয়, আমরা তা দেবো! এমনি করে বিষয়টার নিষ্পত্তি করেন তিনি।

আবূ সুফিয়ানের বিশ্বাসঘাতকতা ও কাপুরুষতার কারণে তাকে শরম

দেওয়ার জন্য এবং আবু উযায়হিরের হত্যাকে উপলক্ষ করে মানুষকে উত্তেজিত করার জন্য হাসান বিন সাবিত নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন :

একদিন ভোরে জেগে উঠল জুল-মাজাজের উভয় পার্শ্বের লোক
জাগল না কেবল মুগামাসে ইবনে হার্বের আশ্রিত জন !
তাকে রক্ষা করেনি পাদু গাধা, আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হলো সে।
হিন্দ তার পিতার লজ্জা ঢাকল না।
হিশাম ইবনে আল-ওয়ালিদ তার পরিচ্ছদে তোমাকে ঢেকে দিল,
তুমি তা পরে পরে ছিন্ন কর, তারপর আরো বানাও অমন।
তার কাছ থেকে সে যা চেয়েছিল পেয়েছিল তা, এবং বিখ্যাত হলো তাই,
কিন্তু তুমি তো ছিলে সম্পূর্ণ অপদার্থ।
বদরে হাযির থাকত যদি শেখরা
তপ্তরক্তে ভিজে যেতো জনতার চটি।

এই ব্যঙ্গ-কবিতা শোনার পর আবু সুফিয়ান বলেছিলেন : 'হাসান চায় দাউসের কে না কে একজনের জন্য আমরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করি। হায় আল্লাহ্ ! কী দুর্বল চিন্তাশক্তি।'

তায়েফবাসীদের মুসলমান হওয়ার পর খালিদ ইবনে আল-ওয়ালিদ একদিন কথা প্রসঙ্গে রসূল করীমের কাছে উল্লেখ করেন যে, তাঁর পিতা সাকিফের কাছে সুদ পেতেন। একজন হাদীসবেত্তা আমাকে বলেছেন যে, যে সব আয়াতে জাহিলিয়া সময়ের সুদ টেনে আনার কথা বারণ করা হয়েছে, তা এই খালিদের সুদ দাবি থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। প্রত্যাদেশে বলা হয়েছে : 'তোমরা যারা বিশ্বাস কর, তারা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তোমরা সত্যিকার ঈমানদার হলে সুদ হিসেবে যা পাওনা ছিল, তা ত্যাগ করে দাও' এখান থেকে এই অনুচ্ছেদের শেষ পর্যন্ত।[১]

আমাদের জানামতে আবু উযায়হিরের জন্য কোন প্রতিশোধ নেওয়া হয় নি। তবে কতিপয় কুরাশয়কে সঙ্গে করে দিরার ইবনে আল-খাত্তাব

১. কুরআন ২ : ২৭৮।

ইবনে মিরদাস আল-ফিহ্‌রী দাউসদের দেশে গিয়েছিল। ওরা উম্মে খায়লান নামে দাউসের এক মুক্ত দাসীর বাড়িতে গিয়েছিল। সে মেয়েদের চুল আঁচড়িয়ে দিত এবং বরদের জন্য কনে সাজিয়ে দিত। আবু উযায়হিরের হত্যার বদলা হিসেবে দাউস তাদের হত্যা করতে চাইল, কিন্তু উম্মে খায়লান ও অন্যান্য সমস্ত রমণী তাদের বাধা দিল এবং তাদের হয়ে লড়ল। সেই প্রসঙ্গে দিরার বলেছেন ঃ

উম্মে খায়লানকে আর তার মেয়েদের আল্লাহ্ ভাল করে পুরস্কৃত করুন
বিস্রস্ত বসন আর এলো চুলে তারা বেরিয়ে এসেছিল।
মৃত্যুর গ্রাস থেকে তারা রক্ষা করেছিল আমাদের
রক্তের বদলা নিতে যখন ওরা তেড়ে এসেছিল।
সে দাউসের কাছে গেল, পরম সুখে বয়ে গেল বালুকারাই,
তাদের টেনে নিয়ে গেল দুইদিকের স্রোতধারা।
আল্লাহ্ আমরকে ভাল করে পুরস্কৃত করুন। সে দুর্বল ছিল না.
আমার জন্য যথাসাধ্য করেছে সে।
আমি তলোয়ার খুললাম, তার ধার পরীক্ষা করলাম,
নিজে ছাড়া কার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব ?

আবু তালিব ও খাদীজার মৃত্যু

আপন ঘরে রসূলে করীম (সা)-এর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল আবু লাহাব, ইবনুল আসদা আল হুদালি..., উকবা ইবনে আবু মুয়াইত, আদি ইবনে হামরা আস-সাকাফি এবং ইবনুল আসদা আল হুযালি। এদের মধ্যে আল-হাকাম ছাড়া আর কেউ মুসলমান হয় নি। আমাকে কে একজন বলেছে, রসূলে করীম (সা) যখন নামায পড়তেন তখন এদের একজন তার দিকে ভেড়ার জরায়ু ছুড়ে মারত। অন্য একজন নাকি সে জিনিস রসূলে করীমের রান্নার পাতিলে খাবার প্রস্তুত হওয়ার সময় ফেলে রাখত। এমনি করে নামায পড়ার সময় রসূলে করীম (সা)-কে একেবারে দেওয়ালের সঙ্গে লেগে যেতে বাধ্য করা হতো। আপন পিতার সূত্রে

উমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উরওয়া ইবনে জুবায়র আমাকে বলেছেন যে, তারা যখন এই নোংরা জিনিসটা তার দিকে ছুঁড়ে মারত, রসূল করীম (সা) একটা কাঠিতে করে ওটা নিয়ে গিয়ে তার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেন। বলতেন, 'এটা কি ধরনের আশ্রয় আমাকে দিচ্ছেন হে বানু আবদু মানাফ ?" এই বলে তিনি সেটা রাস্তায় নিক্ষেপ করতেন।

খাদীজা এবং আবু তালিব একই বছরে ইন্তেকাল করেন। খাদীজার মৃত্যুর পর সঙ্কট দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। কারণ ইসলামে তিনি ছিলেন এক বিশ্বস্ত ভরসা। এবং রসূল করীম (সা) তাঁর সমস্ত দুঃখ-কষ্টের কথা তাঁর কাছেই বলতেন। আবু তালিবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগত জীবনে এক বড় শক্তি ও সমর্থন ও সমষ্টিগত জীবনে ভরসা ও আশ্রয় স্থল হারালেন। আবু তালিব ইন্তেকাল করেন মদীনায় হিজরতের বছর তিনেক আগে। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই কুরায়শরা তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করল, যা তাঁর পিতৃব্যের জীবদ্দশায় কিছুতেই করতে সাহস পেতো না। এক বেতমিজ ছোকরা সত্যি সত্যি তাঁর মাথায় ধুলো ছুঁড়ে মেরেছিল।

পিতা উরওয়ার সূত্রে হিশাম আমাকে বলেছে যে, এই ঘটনার পর রসূল করীম (সা) সেই ধুলো মাথায় করে ফিরেছিলেন। তাঁর এক মেয়ে সেই ধুলো সাফ করতে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে জারেজার। তিনি বলেছিলেন, কাঁদে না আম্মা, আল্লাহ্ তোমার আব্বাকে রক্ষা করবেন। তখন তিনি প্রায়ই বলতেন, আবু তালিব বেঁচে থাকতে কুরায়শরা এরকম দুর্ব্যবহার আমার সঙ্গে কোনদিন করেনি।"

আবু তালিব অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর সঙ্গীন অবস্থা সম্বন্ধে যখন কুরায়শরা অবহিত হলো তখন ওরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, হামযা ও উমর উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে, মুহাম্মদের (সা) সুখ্যাতি সমস্ত কুরায়শ গোত্রে ছড়িয়ে পড়েছে, এখন ওদের আবু তালিবের কাছে যাওয়া উচিত। এবং আবু তালিবের সঙ্গে একটা আপোস মীমাংসা করা উচিত, নইলে তাদের সমস্ত কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যাবে।

আল-আব্বাস ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাবাদ ইবনে আব্বাস তাঁর পরিবারের একজনের সূত্রে এবং সে একজন ইবনে আব্বাসের সূত্রে আমাকে যে হাদীস বলেছে তা হলো, রাবিআর পুত্র উতবা ও শায়বা, আবু জেহেল ও উমাইয়া ইবনে খালাফ এবং আবু সুফিয়ান ছোট বড়ো কয়েক জনকে নিয়ে আবু তালিবের কাছে গিয়ে বলল: 'আপনার সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক, সে তো আপনি জানেন। আপনি এখন মৃত্যুশয্যায়, আপনার জন্য এখন আমরা উদ্বিগ্ন। আপনার ভাতিজার সঙ্গে আমাদের একটু গোলমাল আছে, সে-ও আপনি জানেন। আপনি এখন তাকে ডাকুন, আমরা একটা আপোস করি এই বলে যে সে আমাদের কোন কিছুতে থাকবে না, আমরাও তার কোন কথায় থাকব না। তার ধর্ম তার থাকবে, আমাদের ধর্ম আমাদের।' রসূল করীম (সা) এলে পরে আবু তালিব বললেন, 'প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! এই এরা গণ্যমান্য মানুষ সব, এঁরা এসেছেন, তোমাকে এঁরা কিছু দেবেন এবং তোমার কাছ থেকে কিছু নেবেন।' তিনি বললেন, 'জি, আপনারা আমাকে এমন একটা শব্দ দেন, যার দ্বারা আপনারা আরবদের শাসন করতে পারবেন এবং পারসিকরা আপনাদের পদানত হবে।' আবু জেহল বলল, 'হায়, এমন দশটা শব্দ হলেও চলবে।' তিনি বলেন: 'আপনাদের বলতে হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এবং আপনারা আল্লাহ্র পাশে যাদের পূজা করেন, তাঁদের ত্যাগ করতে হবে।' তারা তাঁদের হাতে তালি বাজালো। বলল 'সব দেবতাকে মিলিয়ে তুমি কি একটা দেবতা বানাতে চাও মুহাম্মদ? সে তো সাংঘাতিক একটা কিছু হবে।'

তারপর তারা পরস্পরকে বলল, 'তোমরা যা চাও তার কিছুই এই লোক তোমাদের দেবে না। কাজেই যাও, গিয়ে তোমাদের পিতা পিতামহের ধর্ম আচরণ কর, তারপর একদিন আল্লাহ আমাদের মধ্যে যে ভাল বিচার করে দেবেন। এই বলে তারা চলে গেল।

আবু তালিব বললেন, 'বাছা, আমার তো মনে হয় না তুমি তাদের কাছে অসাধারণ কিছু চেয়েছ।' একথা শুনে রসূল করীম (সা)-এর

মনে আশার সঞ্চার হলো যে হয়তো তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আপনিই সেকথা বলুন চাচা। তাহলে আমি কিয়ামতের দিন আপনার জন্য সুপারিশ করতে পারব।' রসূলে করীম (সা)-এর চোখে মুখে ঐকান্তিক আগ্রহ দেখে তিনি বললেন, 'আমার মৃত্যুর পর তুমি ও তোমার পিতার অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হবে এমন ভয় যদি আমার না থাকত, কুরায়শরা ভাববে আমি মৃত্যু ভয়ে একথা বলেছি—এই ভয়ও যদি না থাকত, তাহলে আমি তা বলতাম। এখন আমি তা বলব কেবল তোমার আনন্দের জন্য।' তাঁর মৃত্যু যখন সমাসন্ন হলো, আল-আব্বাস তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখল তাঁর ঠোঁট নড়ছে। তাঁর মুখের কাছে তখন তিনি কান বাড়িয়ে দিলেন। তিনি বললেন, 'ভ্রাতুষ্পুত্র, 'ভ্রাতুষ্পুত্র, আল্লাহ্র কসম, তুমি তাঁকে যা বলতে বলেছ, তিনি তা বলেছেন।' রসূল করীম (সা) জবাব দিলেন, 'কিন্তু আমি তো তা শুনি নি।'

এই সব প্রস্তাব নিয়ে তাঁর কাছে যারা এসেছিল। তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেনঃ 'সাদ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের! তুমি অবশ্যই সত্যবাদী। কিন্তু 'সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে' এখান থেকে শুরু করে 'সে কি বহু ইলাহের পরিবর্তে এক ইলাহ্ বানাইয়া লইয়াছে? এ তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! তাদের প্রধানরা সরে পড়ে, বলে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের দেবতার পূজায় তোমরা অবিচলিত থাক! মুহম্মদের কথায় কোন অভিসন্ধি আছে। আমরা শেষ ধর্মাদর্শে এরূপ কোন কথা শুনি নি' এই পর্যন্ত![১] [শেষ ধর্মাদর্শ বলতে ঈসা (আ)-এর ধর্মকে বুঝানো হয়েছে কারণ তারা বলে], 'আল্লাহ্ তিনজনের মধ্যে তৃতীয় জন'।[২] এ তো মনগড়া এক উক্তি মাত্র।[৩] তারপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন আবু তালিব।

১. কুরআন ৩৮ : ১—৬।

২. কুরআন ৫ : ৭৩।

৩. কুরআন ৩৮ : ৬।

সাহায্যের জন্য রসূল করীম (সা) সাকিফের কাছে গেলেন

আবু তালিবের মৃত্যুর পর কুরায়শদের শত্রুতা বেড়ে গেল। ফলে রসূল করীম (সা)-কে তায়েফ যেতে হলো সাকিফের সাহায্য লাভের মানসে। তাঁর মনে আরো আশা ছিল, তারা সবাই আল্লাহ্ প্রদত্ত তাঁর বাণী গ্রহণ করবে। একাই গিয়েছিলেন তিনি।

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল-কুরাজির সূত্রে ইয়াযিদ ইবনে যিয়াদ আমাকে বলেছেন: 'তায়েফে পেঁছানোর পর রসূল করীম (সা) নেতা ও প্রধান স্থানীয় কয়েকজন সাকিফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এর মধ্যে তিন ভাই ছিলেন, যথা আবদু ইয়ালায়ল, মাসুদ ও হাবিব। এরা সবাই আমর ইবনে উমায়র ইবনে আউফ ইবনে উকদা ইবনে ঘিয়ারা ইবনে আউফ ইবনে সাকিফের পুত্র। এদের একজনের স্ত্রী ছিল কুরায়শ গোত্রের বানু জুমাহ্ বংশের। তাদের সঙ্গে বসে রসূল করীম (সা) তাদের ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। দেশে তাঁর প্রতিপালকের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য তাদের সাহায্য ও প্রার্থনা করলেন। এদের একজন বলল, "তাকেই যদি আল্লাহ্ পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে সে আল্লাহ্র কসম নিয়ে বলছে সে কা'বার গিলাফ ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। অন্যজন বলল, 'প্রেরণ করার জন্য আল্লাহ্ তোমার চেয়ে আর ভালো কাউকে পায় নি?' তৃতীয় জন বলল, 'আল্লাহ্র কসম, তোমার সঙ্গে আমার যেন কোনদিন কথা বলতে না হয়। তোমার কথামতো তুমি যদি আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ হয়ে থাক, তাহলে তুমি খুব উঁচা মানুষ, তোমার কথার জবাব দেওয়া হবে বেয়াদবী। আর যদি আল্লাহ্কে নিয়ে তুমি মিথ্যা কথা বল, তাহলে তো তোমার সঙ্গে কথা বলা উচিতই হবে না!' রসূল (সা) উঠে চলে গেলেন। সাকিফের কাছ থেকে সাহায্যের আশা গুড়ে বালি, তিনি বুঝলেন।

আমি শুনেছি, তিনি তাদের বলেছিলেন, 'আপনারা যা ব্যবহার করলেন তা তো করলেনই, কিন্তু ব্যাপারটা দয়া করে গোপন রাখবেন।' কারণ তিনি চান নি যে এই ঘটনার কথা তাঁর আপন লোকজনের কানে যাক।

যদি যায় তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে তাদের সাহস আরো বেড়ে যাবে। কিন্তু তারা তাঁর কথা শুনল না, তাদের গুন্ডা ও ক্রীতদাসদের লেলিয়ে দিল তাঁর পেছনে, তারা তাঁকে অপমান করল, তার পেছনে পেছনে চীৎকার করে ধিক্কার দেওয়া শুরু করল। ফলে একটা ভীড় জমে গেল তাকে ঘিরে। তিনি তখন উতবা ইবনে রাবিআ ও তার ভাই শায়বার এক বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এই দুইজন তখন ওখানেই ছিল। গুন্ডাগুলো ফিরে গেল। তিনি এক লতাকুঞ্জের ছায়ায় গিয়ে বসে রইলেন। তাঁর এই বসে থাকাকে আড়াল থেকে প্রত্যক্ষ করল সেই দুজন লোক। তারা দেখল স্থানীয় ষণ্ডাদের হাতে কি লাঞ্ছনাই সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। আমি শুনেছি বানু জুমাহ্‌র সেই রমণীর সঙ্গে দেখা হলে রসূলে করীম (সা) তাকে বলেছিলেন, ‘দেখুন তো, আপনার স্বামীর লোকজন আমার কি হাল করেছে?’

আমাকে বলা হয়েছে, নিরাপদ স্থানে পৌঁছার পর রসূল করীম (সা) বলেছিলেন, “ইয়া আল্লাহ্! আমার দুর্বলতা, স্বল্প সহায়-সম্পদ এবং মানুষের নীচতার সম্পর্কে আমি আপনার কাছেই অভিযোগ করছি। হে পরম দয়ালু, আপনি দুর্বলের প্রভু, আপনি আমার প্রতিপালক। কার কাছে আপনি আমাকে সমর্পণ করবেন? দূরের কারো কাছে, যে অপব্যবহার করবে? অথবা এমন এক দুশমনের কাছে, আমার আমার চেয়ে যাকে অনেক বেশি শক্তি দিয়েছেন আপনি? আপনি যদি আমার উপর অসন্তুষ্ট না হন, তাহলে আমি কিছুতেই পরোয়া করি না। আপনার অনুগ্রহ আমার জন্য অনেক প্রশস্ত। আমি আপনার আলোর কাছে আশ্রয় নিচ্ছি, যে আলো সমস্ত অন্ধকার আলোকিত করবে, এই জগত ও পরকালের তাবৎ বস্তুতে শৃঙ্খলা আসবে, আর না হয় আপনার ক্রোধ, আপনার রাগ আমার উপর পতিত হবে। সন্তোষ আপনার কাছে, আপনি খুশি থাকুন। আপনি ছাড়া আর কোন শক্তি আর কোন সমর্থন নেই।”

উতবা এবং শায়বা সমস্ত ঘটনা দেখে ভাষণ অভিভূত হলো। তাদের করুণা হলো। আদ্দাস নামে তাদের এক তরুণ খৃস্টান ক্রীতদাসকে

ডেকে তারা একটা থালায় কিছু আঙুর দিয়ে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিল। আদ্দাস হুকুম তামিল করল। থালায় হাত রেখে খাবার মুখে দেবার আগে রসূল করীম (সা) বললেন, 'বিসমিল্লাহ্'। আদ্দাস তাঁর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলল, "ইয়া আল্লাহ্, এদেশের লোক তো এমন কথা বলে না।" রসূলে করীম (সা) তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন দেশে তোমার বাড়ি আদ্দাস? আর তোমার ধর্মই বা কি?' সে জবাব দিল, সে একজন খৃস্টান, বাড়ি নিনেভে। রসূল করীম (সা) বললেন, 'মাত্তালের পুত্র জোনা, ন্যায়পরায়ণ জোনার শহর থেকে।' আদ্দাস জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আপনি তাঁর সম্বন্ধে জানেন কি করে?' রসূল করীম (সা) জবাব দিলেন, 'তিনি আমার ভাই। তিনিও নবী ছিলেন, আমিও নবী।'

আদ্দাস নিচু হয়ে তাঁর মাথায়, হাতে আর পায়ে চুমু খেল।

এসব দৃশ্য দেখছিল দুই ভাই। একজন আরেকজনকে বলল, 'তোমার ক্রীতদাসের চরিত্র ও খারাপ করে দিল দেখছি!'

আদ্দাস ফিরে এলে ওরা তাকে বলল, 'বেটা বেতমিজ, ওর মাথায়, হাতে পায়ে তুমি চুমু খেলে কেন?'

সে জবাব দিল, 'তিনি এই দেশের সর্বোত্তম ব্যক্তি। এমন সব কথা তিনি বলেছেন, যা কেবল একজন নবীরই জানার কথা।'

তারা বলল, 'বেটা বদমাশ, তোমার ধর্ম থেকে ও যেন তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে, কারণ তোমার ধর্ম ওরটার চাইতে ভাল।'

সাকিফের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে রসূল করীম (সা) তায়েফ থেকে ফিরে এলেন। নাখলায়[১] পৌঁছে তিনি মধ্যরাত্রিতে নামায পড়ার জন্য উঠলেন। আল্লাহ্ বর্ণিত কয়েকজন জিন তখন ওদিক দিয়ে যাচ্ছিল। আমাকে বলা হয়েছে, ওরা ছিল নাসিবিনের সাত জন জিন। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর নামায পড়া শুনল। নামায শেষ হলে পরে

১. মক্কা থেকে একদিনের পথ।

ওরা নিজেদের লোকজনের দিকে ফিরে তাকাল, যা তারা শুনেছে তাতে সাড়া দিয়ে, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের হুঁশিয়ার করে দিল। আল্লাহ্ এদের কথা উল্লেখ করেছেন এভাবে, "এবং আমি যখন একদল জিনকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, যারা তোমার কুরআন পাঠ শুনছিল" এখান থেকে "এবং তিনি তোমাকে কঠিন শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করবেন" এই পর্যন্ত।[১] অন্যত্র, "বলুনঃ আমার কাছে প্রত্যাদেশ এসেছে একদল জিন শুনেছিল (কুরআন পাঠ করতে)।"

সমস্ত সম্প্রদায়ের কাছে হাযির হলেন রসূল করীম (সা)

রসূল (সা) মক্কায় ফিরে এলে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজন পূর্বের চাইতেও অধিকতর তীব্রতার সঙ্গে তাকে বাধা দিতে লাগল। কেবল নিম্নবিত্ত কিছু লোক যারা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা নিবৃত্ত রইল। (তাবারির ভাষ্যঃ তাদের একজন বলেছেন রসূল করীম আল-তায়েফ ত্যাগ করে যখন মক্কার পথে রওয়ানা হন, এক মক্কাবাসীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। তিনি তাকে তাঁর একটি সংবাদ বহন করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সে লোকটা রাযী হল। তিনি তাকে আল-আখনাস ইবনে শারিকের কাছে গিয়ে বলতে বললেন, 'মুহাম্মদ বলেছেঃ প্রভুর বাণী প্রচার করার জন্য আপনি কি আমাকে আশ্রয় দেবেন? সেই লোক সে বার্তা প্রদান করলে পরে আল-আখনাস জবাব দিয়েছিল যে, নিজস্ব সম্প্রদায়ের কোন সদস্যের বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁকে সমর্থন দেওয়া সম্ভব নয়। সে লোক এসে রসূল করীম (সা)-এর কাছে তা বলল। রসূল (সা) তাঁকে অনুরোধ করলেন সুহায়েল ইবনে আমরের কাছে গিয়ে একই ভাষায় তার আশ্রয় চাওয়ার জন্য। সুহায়ল বলে পাঠাল যে বানু কা'বের বিরুদ্ধে বানু আমির ইবনে লুআই আশ্রয় দেয় না। সেই লোকটিকে একই রকম অনুরোধ নিয়ে আল-মুতিম ইবনে আদির কাছে যেতে বললেন। অল-মুতিম জবাব

১. কুরআন ৪৬ঃ ২৯-৩১।

বললেন। আল-মুতিম জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, তাঁকে আসতে দাও।' সেই লোক এসে রসূল করীম (সা)-কে সেকথা জানাল। ভোরবেলা আল-মুতিম তার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রসহ মসজিদে গেলেন। আবু জেহেল তাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, আপনি তাকে আশ্রয় দিচ্ছেন নাকি তার ধর্ম গ্রহণ করছেন?' আল-মুতিম বললেন, 'কেন, আশ্রয় দিচ্ছি।' সে বলল, 'আপনি যাকে আশ্রয় দেন তাকে আমরা রক্ষা করি।'

রসূল করীম (সা) তখন মক্কায় এসে বসবাস করতে শুরু করলেন। একদিন তিনি যখন পবিত্র মসজিদে গেলেন তখন বহু-ঈশ্বরবাদী কা'বায় বসা ছিল। আবু জেহেল তাঁকে দেখল, বলে উঠল, 'এই হলো আপনাদের নবী, হে বানু আবদু মানাফ।'

উতবা ইবনে রাবিআ জবাব দিলেন, 'আমাদের নবীই যাক আর রাজাই যাক, তাতে তোমাদের কি আসে যায়?'

একথা রসূল (সা)-কে কেউ গিয়ে বলে থাকবে। কিংবা তিনি এমনিই লোকমুখে শুনে থাকবেন। তিনি তাঁদের কাছে এসে বললেন, 'আপনি উতবা, আল্লাহ্ কিংবা তাঁর রসূল করীম (সা)-এর হয়ে রাগ করেন নি, রাগ করেছিলেন নিজেরই জন্য। আর আপনি আবু জেহেল, আপনার উপরে এক মহাগজব এসে পড়বে, আপনি তার ফলে হাসবেন কম, কাঁদবেন অনেক বেশী। আর আপনি হে কুরায়শদের নেতা, আপনার উপরও গজব নাযিল হবে, আপনি যাকে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করেন তাই আপনাকে মহৎ করতে হবে এবং তা আপনার উপর চেপে বসবে।)

আরবদের সমস্ত সম্প্রদায়ের কাছে রসূল করীম (সা) মেলায় কিংবা যখনই কোন সুযোগ এসেছে, হাযির হয়েছেন। তিনি সবাইকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করেছেন। বলেছেন, তিনি একজন নবী, তিনি প্রেরিত হয়েছেন। তিনি তাদের তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য অনুরোধ করতেন, তাঁর রসূলকে যে বাণী দিয়ে আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন, তা তাদের

কাছে যতদিন আল্লাহ্ পরিষ্কার না করে দেবেন ততদিন তাঁকে রক্ষা করার জন্য অনুরোধ করতেন।

আমাদের এক বন্ধু আছেন, তাঁকে আমি সমস্ত সন্দেহের ঊর্ধ্বে স্থান দিই। তিনি যায়দ ইবনে আসলামের সূত্রে ও যায়দ রাবিআ ইবনে ইবাদ আল-দিলি অথবা আবু আল-জিনাদ বলে থাকবেন এমন একজনের সূত্রে আমাকে এই হাদীসটি বলেছেন। একই সঙ্গে এই হাদীস আমার কাছে বর্ণনা করেছেন হুসায়ন ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। হুসায়ন বলেছেন: 'আমি আমার আব্বাকে রাবিআ ইবনে আব্বাদকে বলতে শুনেছি যে, তিনি যখন ছোট ছিলেন তখন তাঁর আব্বার সঙ্গে মিনায় থাকতেন। রসূল করীম (সা) তখন আরবদের শিবিরের সামনে গিয়ে সবাইকে বলতেন যে, তিনি আল্লাহ্র রসূল। বলতেন, আল্লাহ্ তাঁদের আদেশ দিয়েছেন কেবল তাঁর উপাসনা করতে, তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক না করতে, তারা উপাসনা করে যে প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতাদের তাদের ত্যাগ করতে, তাঁর রসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে, তাঁকে কেন প্রেরণ করা হয়েছে, তা আল্লাহ্ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার না করা পর্যন্ত তাকে রক্ষা করতে। এমনি করার সময় তাঁকে সব সময় অনুসরণ করত একজন খুব চটপটে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন লোক, তার পরনে থাকত এডেনের পোশাক। রসূল করীম (সা)-এর আবেদন শেষ হলে পরে সেই লোক বলে উঠত, "এই লোক কেবল চায় তোমাদের ঘাড় থেকে আল-লাত আর আল-উজ্জাকে নামাতে, তোমাদের আর তোমাদের মিত্র বানু মালিক ইবনে উকায়শদের জিনদের ঘাড় থেকে। এটা সে চায় নিজের এই উদ্ভাবনীকে প্রতিষ্ঠা করতে। ওর কথায় কান দিয়ো না তোমরা, ওকে পাত্তা দিয়ো না।" আব্বাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, সব সময় রসূল করীম (সা)-এর কথার প্রতিবাদ করছে, লোকটা কে। আব্বা বলেছিলেন যে, লোকটা হলো তাঁর চাচা আবদুল উজ্জা ইবনে আবদুল মুত্তালিব। এ-ই আবু লাহাব নামে সকলের কাছে পরিচিত।

ইবনে শিহাব আল-জুহ্রি আমাকে বলেছেন, একদিন তিনি কিন-দার তাঁবুতে গিয়েছিলেন। সেখানে ছিল মুলায় নামে এক শেখ। তিনি সেখানে তাদের আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করলেন, কিন্তু তারা তাঁর কথায় ভ্রূক্ষেপ করল না।

মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে হুসায়ন আমাকে বলেছেন, একদিন তিনি কাল্‌বের তাঁবুতে বানু আবদুল্লাহ্ নামে এক গোত্রের কাছে গিয়েছিলেন একই বার্তা নিয়ে। ওখানে তিনি আরো বলেছিলেন, 'হে বানু আবদুল্লাহ্, আল্লাহ্ আপনার আব্বাকে বড় মহৎ এক নাম দিয়েছেন।' কিন্তু তারাও তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না।

আবদুল্লাহ্ ইবনে কা'ব ইবনে মালিকের কাজ থেকে শুনে আমাদের এক সহচর আমাকে বলেছেন যে, রসূল করীম (সা বানু হানীফায় গিয়ে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার পেয়েছিলেন।

আল-জুহ্রি আমাকে বলেছেন যে, বানু আমির ইবনে সাসা'য় গিয়ে-ছিলেন। ওখানে বায়হারা ইবনে ফিরাস নামের একজন বলেছিল : 'আল্লাহ্‌র কসম, কুরায়শদের কাছ থেকে এই লোকটাকে আমি নিতে পারলে আমি ওকে এবং তার সঙ্গে সমস্ত আরবদের গিলে খেতে পারব।' তারপর সে আবার বলল, 'আমরা যদি তোমার কথা শুনি এবং আল্লাহ্ তোমার প্রতিপক্ষের উপর তোমাকে বিজয়ী করেন তাহলে তোমার পরে আমরা কি ক্ষমতা পাব?' রসূল করীম (সা) বললেন, 'ক্ষমতা আল্লাহ্ যখন যেখানে খুশি ন্যস্ত করেন।' সে লোক তখন বলল, 'তার মানে তুমি চাও তোমাকে আমরা বুক দিয়ে আরবদের হাত থেকে বাঁচাই, তারপর আল্লাহ্ কারো বিরুদ্ধে তোমাকে জয় করুক এবং অন্য কেউ এসে তার ফল ভোগ করুক। তা হয় না, ধন্যবাদ!'

পরে বানু আমির তাদের এক পুরনো শেখের কাছে ফিরে গিয়েছিল। সে শেখ মেলায় আসতে পারেন নি। তাদের রীতি ছিল, ফিরে গিয়ে সমস্ত খবর শেখকে দিতে হতো। এ বৎসর কোন সংবাদ জিজ্ঞেস

করলে তারা জানাল যে, কুরায়শদের এক লোক, বানু আবদুল মুত্তালিবের লোক সে, ভান করছে সে একজন নবী, তাকে রক্ষা করার জন্য তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। বলেছিল তাকে সহযোগিতা দেওয়ার জন্য এবং তাঁকে তাদের দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেই বুড়ো লোক তখন বলে উঠলেন, 'হে বানু আমির, এমন না করলে কি চলত না? অতীতকে ফিরে পাবার কি কোন উপায় নেই? এযাবৎ কোন ইসমাঈলী মিথ্যে করে নবুয়ত দাবী করে নি। সেটা ছিল সত্য। কেন তোমাদের সাধারণ বুদ্ধি খুলে নি?'

যখনই মেলায় লোক সমাগম হতো অথবা যখনই কোন কেউকেটা ব্যক্তি এসেছে বলে রসূল করীম (সা) শুনতেন, তিনি তাঁদের কাছে চলে যেতেন তাঁর বাণী নিয়ে। তার কতিপয় শেখের উদ্ধৃতি দিয়ে আসিম ইবনে উমর ইবনে কাতাদা আল-আনসারি-আল-জাফারি বললে বরং আরো স্পষ্ট করা হয় তাকে—আমাকে বলেছেন, সেই শেখরা বলেছিলেন যে বানু আমর ইবনে আউফের ভাই সুয়ায়দ ইবনে আস-সামিত এসেছিলেন মক্কায় হজ্জ করতে। সুয়ায়দের চরিত্রশক্তি, কবিতা, সম্মান এবং তার বংশ-ঐতিহ্যের জন্য তার সম্প্রদায়ের লোকজন তাকে কামিল বলে ডাকত। তিনি বলেছিলেন:

অনেক মানুষ আছে যাদের তুমি বন্ধু বলে জানো, যদি জানো
গোপনে তোমার বিরুদ্ধে কতো মিথ্যা তারা বলে, তুমি চমকে উঠবে।
তোমার সম্মুখে তার মুখে মধু ঝরে,
তোমার আড়ালে তার তরবারি উদ্যত তোমার গলায়।
তার যা তুমি দেখতে পাও তাতেই বিগলিত তুমি, কিন্তু ভেতরে
সে এক প্রতারক পশ্চাৎ-নিন্দুক মজ্জা পর্যন্ত বের করে তার আঘাত।
কি সে লুকোয় তার চোখে তা ধরা পড়ে
তার সেই কু-দৃষ্টিতে সঞ্চিত থাকে হিংসা আর ঘৃণা।
সৎ কাজ দিয়ে আমাকে শক্তিশালী কর, অনেক দুর্বল তুমি আমাকে করেছ।
সর্বোত্তম বন্দুজন বলীয়ান করে, বলহীন করে না।

বানু সুলায়মের বানু জিব ইবনে মালিকের পরিবারের একজনের সঙ্গে তার একবার একশত উট নিয়ে এক বিবাদ হয়েছিল। সবাই মিলে এক আরব মহিলাকে বানিয়েছিল সালিশ। সে মহিলা রায় দিয়েছিলেন তার পক্ষে।

যখন দুই পক্ষের সময় হলো দুই দিকে চলে যাওয়ার, সুয়ায়দ তার সম্পত্তি ফেরত চাইল। সে লোক কথা দিল সে তা ফেরত দেবে। সুয়ায়দ জানতে চাইল, ওগুলো যে ফেরত দেওয়া হবে তার জামিন কে হবে। সে বলল, সে ছাড়া তার আর কোন জামিন নেই। সুয়ায়দ বলল, তার জিনিস না নিয়ে সে যাবে না। এক কথা দুই কথায় তখন হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। সুয়ায়দ তাকে পরাজিত করল। তাকে ভাল করে হাতে পায়ে বেঁধে নিয়ে গেল বানু আমরের দেশে। তার লোকজন এসে তার সম্পত্তি ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত সেখানেই তাকে আটকে রাখা হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে সুয়ায়দ কবিতা লিখেছিল :

একথা তুমি মনে করো না হে মালিকের বেটা ইবন জিব, যাকে তুমি
গোপনে ছল করে হত্যা করো, আমি তার মতো একজন।
আমাকে যখন আঘাত করা হলো, পুরুষের মতো আমি রুখে দাঁড়ালাম—
এমনি করে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মানুষ আপন অবস্থার বদল করে—
ওকে আমি বাম বাহুতে আটকে ধরেছিলাম
ওর গাল ছিল কাদার ভেতরে।

ওর কথা শুনে ওকে ইসলামের পথে আমন্ত্রণ জানালেন রসূল করীম (সা)।
সুয়ায়দ বললেন, 'আমার কিছু গুণ বোধ হয় আপনার মধ্যেও আছে।'
রসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, 'সেটা কি জিনিস ?'
সুয়ায়দ বলল, 'লুকমানের কিছু গিলু।
অর্থাৎ লুকমানের মেধার কিছু অংশ !
রসূল করীম (সা) বললেন, 'তাহলে ওটা আমার হাতে দিয়ে দিন।'

সুয়ায়দ তার হাতে তা দিয়ে দিল। রসূল করীম (সা) বললেন, 'এই সংলাপ খুব চমৎকার, কিন্তু আমার কাছে যা আছে, তা আরো সুন্দর। আমার কাছে আছে এক কুরআন, আল্লাহ্ তা আমার কাছে নাযিল করেছেন। সে হলো এক দিক নির্দেশক, এক আলোকবর্তিকা।

রসূল করীম (সা) কুরআন আবৃত্তি করে তাকে শোনালেন, তাকে ইসলামের পথে আসার জন্য আহ্বান জানালেন। সুয়ায়দ তা একেবারে অগ্রাহ্য করলেন না। বললেন, 'আপনার এই বাণী খুব সুন্দর।' তিনি চলে গেলেন মদীনায়। ওখানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করল খাযরাজ। তার পরিবারের কেউ কেউ বলতেন, 'আমাদের মনে হয়, তিনি মুসলমান হয়েছিলেন এবং সেটাই তার কাল হয়েছিল।' কিন্তু আসলে বু'আস্ যুদ্ধের আগেই তাকে হত্যা করা হয়েছিল।

আইয়াস ইসলাম গ্রহণ করলেন

মাহমুদ ইবনে লাবিদের বরাত দিয়ে আল-হুসায়ন ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আমর ইবনে সাদ ইবনে মুয়ায আমাকে বলেছেন যে আবুল হায়সার আনাস ইবনে রফি এসেছিলেন বানু আবদুল আশালের পরিবারের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে ছিল আইয়াস ইবনে মুয়াদ। এদের উদ্দেশ্য ছিল তাদেরই আত্মীয়-গোত্র খাযরাজের বিরুদ্ধে তারা কুরায়শদের সঙ্গে জোট বাঁধবে। রসূল করীম (সা) তাদের কথা শুনলেন। তিনি এসে তাদের সঙ্গে বসলেন। বললেন, তারা যে কাজে এসেছে তার চেয়ে ভালো কোন কাজ পাওয়া গেলে তা তারা করবে কিনা। তাদের প্রশ্নের জবাবে রসূল (সা) বললেন, তিনি আল্লাহ্র রসূল, তাঁকে মানবতার কাছে পাঠান হয়েছে সবাইকে আল্লাহ্র পথে আনয়ন করার জন্য, সবাইকে বলতে, যাতে কেউ আল্লাহ্র সঙ্গে কোন শরীক না করে এবং তিনি তাঁর কাছে এক কিতাব নাযিল করেছেন। তারপর তাদের কাছে তিনি ইসলামের কথা বললেন, কুরআন আবৃত্তি করে তাদের শোনালেন। আইয়াস ছিলেন এর মধ্যে যোয়ান বয়সের। তিনি বললেন, 'আল্লাহ্র কসম, আপনারা যার জন্য এসেছিলেন, এ যে দেখছি তার চেয়েও ভাল!'

তখন আবুল হায়সার মাটি থেকে একমুঠো ময়লা নিয়ে ছুঁড়ে মারল তার। মুখে বলল, 'চুপ! এর জন্য আমরা এখানে আসি নি।'

আইয়াস চুপ করে রইল।

রসূল করীম (সা) চলে গেলেন। তারাও চলে গেল মদীনা। এর পরে সংঘটিত হয়েছিল আউস ও খাযরাজের মধ্যে বুয়াসের যুদ্ধ।

এর কিছুকাল পরে আইয়াস ইন্তিকাল করলেন। মাহমুদ বলেছিলেন, 'মৃত্যুর সময় যারা তাঁর কাছে ছিল তাঁরা শুনেছে মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি অনবরত আল্লাহ্‌র নাম জপ করছিলেন। তাদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে তিনি মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন। সেই সাক্ষাৎকারে রসূলের কথা শুনেই তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ইসলামের দিকে।

আনসারদের মধ্যে ইসলামের সূচনা

আল্লাহ্ যখন মর্জি করলেন, তিনি প্রকাশ্যে তাঁর ধর্ম প্রকাশ করবেন, তাঁর নবীকে মহিমান্বিত করবেন, রসূলের কাছে প্রদত্ত তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণ করবেন। তখন এক সময় এক মেলায় রসূল করীম (সা)-এর সঙ্গে দেখা হলো একদল আনসারের। অভ্যাসবশত তিনি একদিন আপন সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করছিলেন, তখনই দেখা হলো একদল খাযরাজের সঙ্গে আল-আকাবায়। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল তাদের তিনি অনুগ্রহ করবেন।

আপন সম্প্রদায়ের কতিপয় শেখের নাম ধরে আসিম ইবনে উমর ইবনে কাতাদা আমাকে বলেছেন যে, তাদের সঙ্গে দেখা-হওয়ার পর রসূল করীম (সা) জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনেছিলেন খাযরাজদের এই দলটি য়াহূদীদের মিত্রভাবাপন্ন ছিল। তিনি তাদের তাঁর সঙ্গে বসতে আমন্ত্রণ জানালেন। তারপর তাদের কাছে ইসলাম ধর্ম বুঝিয়ে দিলেন। কুরআন শরীফ পাঠ করে শোনালেন। আল্লাহ্ তাদের ইসলামের জন্য তৈরী করে

রেখেছিলেন, কারণ তারা য়াহূদীদের পাশাপাশি বাস করত। এবং য়াহূদীরা ছিল গ্রন্থের মানুষ, জ্ঞানের মানুষ, আর তারা ছিল বহু ঈশ্বরবাদী ও পৌত্তলিক। ওরা প্রায়ই তাদের এলাকায় গিয়ে তাদের আক্রমণ করত। এমনি করে কখনও মন কষাকষি চললে, য়াহূদীরা তাদের বলত, 'শীগগির আসবেন একজন রসূল। তাঁর দিন সমাসন্ন। আমরা তাঁর পথ অনুসরণ করব, তাঁর সাহায্য নিয়ে তোমাদের হত্যা করব, যেমন করে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল 'আদ এবং ইরাম (তেমনি তোমরা শেষ হয়ে যাবে)।

কাজেই রসূল (সা)-এর বাণীর কথা শুনেই তারা বলাবলি করল, 'ইনিই সেই রসূল, য়াহূদীরা যার কথা বলে আমাদের হুঁশিয়ার করত। সাবধান, ওরা যেন তাঁর কাছে আমাদের আগে পেঁছিতে না পারে!

ওরা রসূলের শিক্ষা গ্রহণ করল, মসুলমান হলো। বলল, 'আমরা আমাদের লোকজনদের ত্যাগ করলাম। এত ঘৃণা এত হিংসা আর কোন সম্প্রদায়ে নেই। হয়তো আল্লাহ্ আপনার মাধ্যমে তাদের একত্রিত করবেন। তাহলে, চলুন আমরা তাদের কাছে যাই, আপনার ধর্মের দিকে তাদের আমন্ত্রণ জানাই। এই ভাবে তাদের যদি একত্রিত করেন তাদের আল্লাহ্ তাহলে আপনার চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ হতে পারবে না।'

এমনি করে কথা বলে তারা মু'মিন হিসেবে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করল।

আমাকে বলা হয়েছে এদের মধ্যে খাযরাজের লোক ছিল ছয়জন। বানু আন-নাজ্জার অর্থাৎ বানু মালিক...বংশের তায়ম আল্লাহ্ থেকে ছিলঃ আসাদ ইবনে জুরারা ইবনে উদাস ইবনে উবায়দ ইবনে সালাবা ইবনে গানম ইবনে মালিক ইবনে আন-নাজ্জার ওরফে আবু উমামা এবং আউফ ইবনে আল-হারিস ইবনে রিফা ইবনে সাওয়াদ ইবনে মালিক···ওরফে ইবনে আফরা।

বানু জুরায়ক ইবনে আমির ইবনে জুরায়ক ইবনে আবদু হারিসা ইবনে গাদব ইবনে জুশাম···থেকেঃ রফি ইবনে মালিক ইবনে আল-আজলান ইবনে আমর ইবনে আমির ইবনে জুরায়ক।

বানূ সালিমা ইবনে সা'দ ইবনে আলী ইবনে আসাদ ইবনে সারিদা ইবনে তাজিদ ইবনে জুশাম ছিল বানূ সাওয়াদ ইবনে গানাম ইবনে কা'ব ইবনে সালিমা গোত্রভুক্ত, ওখান থেকে ছিল : কুতবা ইবনে আমির ইবনে হাদিদা ইবনে আমর ইবনে গানম ইবনে সাওয়াদ।

বানূ হারাম ইবনে কা'ব ইবনে গানম ইবনে কা'ব ইবনে সালামা থেকে : উকবা ইবনে আমির ইবনে নাবি ইবনে যায়দ ইবনে হারাম।

বানূ উবায়দ ইবনে আদি ইবনে গানম ইবনে কা'ব ইবনে সালামা থেকে : জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে রিআব ইবনে আল-নুমান ইবনে সিনান ইবনে উবায়দ।

ওরা মদীনায় ফিরে সাবাইকে রসূলে করীম (সা)-এর খবর দিল, ইস-লাম গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করল। এমনি করে সবখানে রাষ্ট্র হয়ে গেল ইসলাম ছাড়া আনসারদের আর কোন বাড়ি নেই এবং তাঁর মধ্যে রসূলে করীম (সা)-এর আছে এক নির্দিষ্ট স্থান।

আল-আকাবায় প্রথম ওয়াদা এবং মুস'আবের মিশন

এর পরের বছর বারোজন আনসার আল-আকাবায় এক মেলায় মিলিত হলো। এটাই ছিল প্রথম আকাবা। ওখানে তারা রসূলে করীম (সা)-কে 'রজনীর ওয়াদা'[১] প্রদান করল। তখনো কিন্তু যুদ্ধ করার কোন দায়িত্ব দেওয়া হয় নি।

এরা ছিলেন : বানূ আল-নাজ্জার থেকে : আসাদ ইবনে জুরারা, আউফ ইবনে আল-হারিস এবং তার ভাই মুয়ায, এদের উভয়ের পিতা ছিলেন আফরা। বানূ জুরায়ক ইবনে আমির থেকে : রফি ইবনে মালিক ও যাকওয়ান ইবনে আবদু কায়স ইবনে খালাদা ইবনে মুখলিদ ইবনে আমির ইবনে জুরায়ক।

১. এই প্রতিজ্ঞায় কোন যুদ্ধ ছিল না।

বানু গানম ইবনে আউফ ইবনে আমর ইবনে আউফের যারা কাওয়াকিল ছিল তাদের মধ্য থেকে বানু আউফের : উবাদা ইবনে আল-সামিত ইবনে কায়স ইবনে আসরাম ইবনে ফিহর, ইবনে সালাবা ইবনে গানম এবং আবু আবদুর রহমান ওরফে ইয়াযিদ ইবনে সালাবা ইবনে খাজমা ইবনে আসরাম ইবনে আমর ইবনে আমমারা। ইনি ছিলেন বালি'র বানু গুসায়নার লোক, তাদের মিত্রজন।

বানু আল-আজলান ইবনে যায়দ ইবনে গানম ইবনে সালিম গোত্রের বানু সালিম ইবনে আউফ ইবনে আমর ইবনে আল-খাযরাজ থেকে : আল-আব্বাস ইবনে উবাদা ইবনে নাদালা ইবনে মালিক ইবনে আল আজলান।

বানু সালিমা থেকে : উকবা ইবনে আমির।

বানু সাওয়াদ থেকে : কুতবা ইবনে আমির ইবনে হাদিদা। আউসদের প্রতিনিধিত্ব করেন আবুল হায়সাম ইবনে তাইয়িহান। ইনি ছিলেন বানু আবদুল আশা'ল ইবনে জুশাম ইবনে আল-হারিস ইবনে খাযরাজ ইবনে আমর ইবনে মালিক ইবনে আল-আউস বংশের মালিক।

বানু আমর ইবনে আউফ ইবনে মালিক ইবনে আল-আউস থেকে : উয়ায়ম ইবনে সাইদা।

উবাদা ইবনে আল-সামিত সূত্রে আবদুর রহমান ইবনে উসায়লা আল-সানাযি ও তদীয় সূত্রে আবু মার্তাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-ইয়াসানি ও তদীয় সূত্রে ইয়াযিদ ইবনে আবু হাবিব আমাকে বলেছেন : 'প্রথম আকাবায় আমি হাযির ছিলাম। আমরা ছিলাম বারোজন। রমণীদের মত আমরা রসূল (সা)-এর কাছে ওয়াদা করেছিলাম। সে ছিল যুদ্ধের আগে। ওয়াদা করেছিলাম, আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক করব না, চুরি করব না, ব্যাভিচার করব না। আপন সন্তানকে হত্যা করব না। প্রতিবেশীদের নামে কোন গীবত প্রচার করব না। তাদের

ন্যায্য কথা অমান্য করব না। আমরা যদি এগুলো মেনে চলি, আমরা বেহেশতে যাব। আর যদি এইসব পাপকর্মের কোনটা আমরা করি তাহলে আল্লাহ্ তাঁর খুশিমতো হয় আমাদের শাস্তি দেবেন আর না হয় মার্জনা করবেন।[১]

আইযুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-খাউলানি আবু ইদ্রিস সূত্রে আল-জুহরি বলেছেন, উবাদা ইবনে আল-সামিত তাকে বলেছিলেন যে 'আমরা এই বলে রসূল (সা)-কে কথা দিয়েছিলাম যে আমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক করব না, চুরি করব না, যিনা করব না, শিশুসন্তান হত্যা করব না, প্রতিবেশীর নামে গীবত করব না, তাঁর ন্যায্য কথা অমান্য করব না; এবং তা যদি না করি তাহলে বেহেশ্ত হবে আমাদের। আর যদি এর কোন একটা অপরাধ আমরা করি তাহলে আমাদের যেন এই জগতে শাস্তি দেওয়া হয় এবং সে শাস্তিই হবে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত। আর আমাদের কোন পাপ যদি গোপন থেকে যায় কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাহলে আল্লাহ্‌ই ঠিক করবেন আমাদের শাস্তি দেবেন না মার্জনা করবেন।'

এদের প্রস্থানের সময় রসূল করীম (সা) এদের সঙ্গে মুস'আব ইবনে উমায়র ইবনে হাশিম ইবনে আবদু মানাফ......কে পাঠালেন। তাকে বলে দিলেন তাদের ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করার জন্য, তাদের কুরআন শরীফ পাঠ করে শোনানোর জন্য। মদীনায় মুসআবের উপাধি হয়ে গিয়েছিল 'ক্বারী' (পাঠক)। তিনি থাকতেন আসাদ ইবনে জুরারার সঙ্গে।

আসিম ইবনে উমর আমাকে বলেছেন যে, তিনিই নামাযে ইমামতি করতেন, কারণ তাদেরই একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ইমামতি করবে এটা আউস বা খাযরাজ কারো পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না।

মদীনায় জুমা নামায

মুহাম্মদ ইবনে আবু উসামা ইবনে সাহল ইবনে হুনায়ফ তার পিতার সূত্রে (এবং তার পিতা তা জেনেছিলেন আবদুর রহমান

১. কুরআন ৬০ : ১২-এর সঙ্গে তুলনীয়।

ইবনে কা'ব ইবনে মালিকের কাছ থেকে) আমাকে বলেছেনঃ 'আমার আব্বা কা'বের দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ার পর একদিন আমি তাকে হাত ধরে মসজিদে নিয়ে যাচ্ছিলাম। মসজিদে আসার পর তিনি আযান শুনলেন। তখন তিনি আবু উসামা আসাদ ইবনে জুরারার জন্য দোয়া করলেন। এরকম চলল বেশ কিছুদিন। আযানের ধ্বনি শুনলেই তিনি তার জন্য দোয়া করতেন, তাকে মাফ করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মিনতি করতেন। ব্যাপারটা আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হতো এবং এর কারণ তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনিই (আবু উমামা) তাদের সর্বপ্রথম নাকিউল-খাদিমাত নামে পরিচিত বানু বায়দার এলাকার নিম্নভূমি আল-নাবিতে[১] আনয়ন করেছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তারা কতজন ছিল। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, চল্লিশ।

উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আল-মুগিরা ইবনে মুআয়কিব ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম আমাকে বলেছেন, বানু আবদুল আশাল ও বানু জাফরের এলাকায় গিয়েছিলেন আসাদ ইবনে জুরারা। সঙ্গে ছিল মুস'আব ইবনে উমায়র। সা'দ ইবনে আন-নুমান ইবনে ইমরুল কায়স ইবনে যায়দ ইবনে আবদুল আশাল ছিল আশাদের ফুফু কিংবা খালার ছেলে। তার সঙ্গে তিনি ঢুকলেন বানু জাফরের এক বাগানে। সে বাগানটি ছিল মারাক নামক এক কুয়ার পাশে। তারা বাগানে বসল। নব্যদীক্ষিত কতিপয় মুসলমান এসে বসল তাদের সঙ্গে। তখন সা'দ ইবনে মুয়ায এবং উসায়দ ইবনে হুযায়র—এই উভয়েই ছিল বানু আবদুল আশাল গোত্রের নেতা। উভয়েই ছিল স্বজাতির নাস্তিকতার অনুসারী। ওদের কথা কানে আসার পর সা'দ উসায়দকে বলেছিলঃ 'এই লোকগুলো এসেছে আমাদের মধ্যে যারা দুর্বলচিত্ত তাদের আহাম্মক বানানোর জন্য। যাও তো, ওদের ঠেঙিয়ে বিদায় কর, আর বলে দাও এদিকে যেন আর কোনদিন পা না বাড়ায়।

১. আল সুহায়লের মতে হাযামুল নাবিত মদীনার অদূরে একটি পাহাড়।

তুমি তো জান এই আসাদ ইবনে জুরারা আমার আত্মীয়, তা না হলে তোমাকে বলতাম না, আমিই যেতাম। ও আমার খালাতো ভাই, ওকে আমি কিছু করতে পারব না।'

বর্শা হাতে উসায়দ গেল তাদের কাছে।

ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আসাদ মুস'আবকে বলল, 'এই যে আসছে, গোত্রের সর্দার ও, কাজেই ওর সঙ্গে কথা বলার সময় আল্লাহ্‌র নাম মনে রাখবে।'

মুস'আব বললেন, 'আমাদের সঙ্গে বসলে আমি ওর সঙ্গে কথা বলব।

ও এসে তাদের কাছে দাঁড়াল। ভীষণ ক্রুদ্ধ। জিজ্ঞেস করল—চীৎকার করে কেন তারা সাদাসিধা বন্ধুদের ঠকানোর জন্য এখানে এসেছে। এর অর্থ কি। বলল, যদি জীবনের মায়া থাকে তাহলে আমাকে বিরক্ত করবে না তোমরা।

মুস'আব বললেন, 'একটু বসে আমাদের কথা একটু শুনেন না। শুনে যদি ভাল লাগে, আমাদের কথা মানবেন, ভাল না লাগে চলে যাবেন।'

সে রাযী হলো, ঠিক আছে, এ তো অসঙ্গত কিছু নয়। মাটিতে বর্শা পুঁতে রেখে সে বসল। মুস'আব তাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করলেন। কুরআন আবৃত্তি করে শোনালেন তাকে। তারপর তাকে বলল (তাদের সম্বন্ধে শোনা বৃত্তান্ত অনুযায়ী), 'আল্লাহ্‌র কসম, ওর কথা বলার আগেই আমরা দেখছিলাম তার চোখে মুখে ইসলাম আপন রশ্মি বিকিরণ করছে।'

উসায়দ বলল, 'আহা কি সুন্দর! কি চমৎচকার কথা শোনালেন আপনারা! এই ধর্ম গ্রহণ করতে হলে কি করতে হয়?'

তারা তাকে বলল, অসু গোসল করে পাক-পবিত্র হয়ে কলেমা পড়তে হবে ও নামায পড়তে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাই সে করল এবং দুই রাকাত নামায পড়ল। তারপর বলল, 'আমার পেছনে একজন আছে

সে যদি এই ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে তার গোত্রের সবাই তা করবে। আমি ওকে আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো। আমি সা'দ ইবনে মুয়াযের কথা বলছি।'

বর্শা হাতে নিয়ে সে চলে গেল সা'দের কাছে, তার লোকজনের কাছে। ওরা সবাই তখন এক গোপন স্থানে বসে সভা করছিল। সা'দ ওকে দেখল। বলল, 'আরে উসায়দ আসছে, কিন্তু একি চেহারা তার! গেল একরকম, এল ভিন্ন চেহারা নিয়ে!'

কাছে এলে সে জিজ্ঞেস করল, 'কি ঘটনা ?'

উসায়দ বলল, 'আমি লোক দুটোর সঙ্গে কথা বলেছি। ওদের মধ্যে খারাপ কিছু দেখলাম না তো!' আমি বললাম, 'আপনারা চলে যান।' ওরা বলল, 'আপনি যা বলবেন, তাই আমরা করব।' আমাকে একজন বলল, 'বানু হারিসা নাকি আসাদকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তাকে হত্যা করার জন্য। কারণ সে তোমার খালার ছেলে, যাতে সবাই জানে তোমার অতিথিদের সঙ্গে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ।'

একথা শুনে সা'দ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। বানু হারিসার সম্বন্ধে বলা কথা তো বড় বিপজ্জনক সংবাদ। উসায়দের হাত থেকে কেড়ে নিল বর্শা সে। বলল, 'ইয়া আল্লাহ্, তুমি দেখছি কোন কাজেরই নও।'

ওদের কাছে গিয়ে দেখল, ওরা দিব্যি কথা বলছে। তখন তার মনে হলো, উসায়দ বোধ হয় চেয়েছে, সে তারা কি বলে শুনুক। তাদের একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। চোখে-মুখে আগুন। আসাদকে লক্ষ্য করে সে বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার আত্মীয়তা না থাকলে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করতে তোমাকে আমি দিতাম না। আমার বাড়িতে এসে আমরা পসন্দ করি না এমন কাজ তোমার করা কি উচিত ?' (এই আসাদ

মুস'আবকে বলেছিল, 'যে নেতাকে সবাই মানে, সে কিন্তু এসেছে। ও যদি আপনাকে অনুসরণ করে তাহলে তার পেছনে একজনও অন্যপথে যাবে না।')

উসায়দকে যা বলেছিল, সা'দ'কেও একই কথা বলল মুস'আব। মাটিতে বর্শা পুঁতে রেখে বসে পড়ল সা'দ। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। যেখানে গোপন বৈঠক হচ্ছিল তার লোকজনের সেখানে ফিরে গেল সা'দ। সঙ্গে উসায়দ। ওরা সা'দকে দেখে বলল, 'সাদেরও দেখি ভিন্ন চেহারা!'

সা'দ জিজ্ঞেস করল তাদের, 'কি হয়েছে তা কেমন করে জানে তারা?'

সবাই বলল, 'আপনি হলেন আমাদের প্রধান, আমাদের স্বার্থের দিকে সবচেয়ে বেশি নযর আপনার, বিচারবুদ্ধি সর্বোত্তম আপনার, নেতৃত্বে আপনি সবচেয়ে বেশি ভাগ্যবান।'

তিনি বললেন, 'তোমরা সবাই যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর উপর ঈমান না আন তাহলে তোমাদের সঙ্গে আর কোন কথা নেই আমার।'

ফলে বানু আবদুল আশালের সমস্ত পুরুষ-রমণী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল।

আসাদ ও মুস'আব ফিরে গেলেন আসাদের বাড়িতে। ওখানে থেকে যত বাড়ি ছিল সবখানে সবাইকে ডাকল ইসলাম গ্রহণ করার জন্য। তার-পর সমস্ত আনসার নারী-পুরুষ মুসলমান হয়ে গেল। হল না কেবল বানু উমাইয়া ইবনে যায়দ, খাতমা, ওয়াইল ও ওয়াকিফ। শেষোক্তরা ছিলেন আউস আল্লাহ্ ও আউস ইবনে হারিসার লোক। তার কারণ তাদের সঙ্গে ছিল আবু কায়স ইবনে আল-আসলাত ওরফে সায়ফী। তিনি ছিলেন তাদের কবি এবং নেতা। তারা সবাই তাকে মানত। সবাইকে তিনি ইসলাম থেকে সরিয়ে রাখতেন। রসূল (সা)-এর মদীনায় হিজরত, বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত তার এই শত্রুতা

মজায় ছিল। ইসলাম সম্বন্ধে তার ধারণা এবং সে ধারণার সাথে অন্যান্য মানুষের মতভেদ সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন :

মানুষের প্রভু, ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেছে।
জটিল সরল সব তাতে জড়িত আছেন।
মানুষের প্রভু, আমরা যদি ভুল করে থাকি,
আমাদের তুমি সৎপথে পরিচালনা করো।
আমাদের প্রভু না থাকলে আমরা য়াহুদী থাকতাম
য়াহুদীদের ধর্ম বড়ো সুবিধার নয়।
আমাদের প্রভু না থাকলে, আমরা খৃস্টান হয়ে যেতাম,
জলিল শৃঙ্গের[১] সমস্ত সন্ন্যাসীর সঙ্গে।
কিন্তু আমাদের যখন সৃষ্টি করা হলো, সে সৃষ্টি ছিল
হানিফ হিসেবে। আমাদের ধর্ম যুগ যুগান্তরের।
শৃঙ্খলে বেঁধে আমরা আজি উট কুরবানীর,
চাদরে আবৃত, কিন্তু তাদের কাঁধ উলঙ্গ।

আল-আকাবার দ্বিতীয় ওয়াদা

মুস'আব মক্কায় ফিরে গেলেন। হজ্জে গিয়েছিল বহু ঈশ্বরবাদীরা তাদের সঙ্গে মেলায় এল আনসার মুসলমানরা। রসূল (সা)-এর সঙ্গে দেখা হলো তাদের আল আকাবায় 'তাশরিকের[২] মাঝামাঝি দিনগুলোয়। তাদের সম্মানিত করার, তাঁর রসূলকে সাহায্য করার, ইসলামকে শক্তিশালী করার, নাস্তিকতা ও নাস্তিকদের লাঞ্ছিত করার জন্য আল্লাহ্ সেই সময়টাকেই বেছে নিয়েছিলেন।

বানু সালিমার ভাই মা'বাদ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক ইবনে আবু কাব ইবনে আল-কাযন আমাকে বলেছেন যে তার ভাই আবদুল্লাহ্ ইবনে

১. গ্যালিলি।
২. তাশরিকের দিন হলো কুরবানীর পরবর্তী তিন দিন অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ই জিলহজ্জ।

কা'ব ছিলেন আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানীগুণী মানুষ। তিনি তাকে বলেছিলেন যে, তার পিতা কা'ব আল-আকাবায় হাযির ছিলেন এবং সকলের সাথে রসূল করীম (সা)-এর কাছে আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। সেই কা'ব তাকে (আবদুল্লাহ্কে) বলেছিলেন, 'আমরা আমাদের আপনজন বহু ঈশ্বরবাদী হজ্জযাত্রীদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। হজ্জের নিয়ম শিখলাম এবং নামায পড়লাম। আমাদের সঙ্গে ছিল আমাদের প্রধান ও মুরুব্বী আল বারা' ইবনে মা'রূর। মদীনা থেকে যাত্রা শুরু করার সময় আল-বারা' বললেন, "আমি একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। তোমরা আমার সঙ্গে একমত হবে কি না জানি না। আমি এই প্রাসাদের (অর্থাৎ কা'বা) দিকে পেছন ফেরাব না, এবং আমি সেদিকে মুখ করেই নামায পড়ব।" আমরা বললাম, আমাদের রসূল করীম (সা) সিরিয়ার দিকে মুখ করে নামায পড়েন, আমরাও তাই করব। তিনি বললেন, "না, আমি কা'বার দিকে মুখ করেই নামায পড়ব।" আমরা বললাম, "কিন্তু আমরা তা করব না।" নামাযের সময় হলে আমরা নামায পড়তাম সিরিয়ার দিকে মুখ করে, তিনি পড়তেন মক্কার দিকে মুখ করে। এমনি করে আমরা মক্কায় এলাম। তাঁর এহেন আচরণের আমরা নিন্দা করলাম, কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। মক্কায় এসে তিনি আমাকে বললেন, "ভ্রাতুষ্পুত্র, চলো আমরা রসূল করীম (সা)-এর কাছে যাই, পথে আমি যা করলাম, তা ঠিক করেছি কি না তাঁকেই জিজ্ঞেস করি। তোমরা এত বাধা দিয়েছ, আমার খারাপ লাগছে।" আমরা রসূল করীম (সা)-এর সঙ্গে দেখা করার জন্য রওয়ানা হলাম।

কিন্তু রসূল করীম (সা)-কে আমরা কেউ এর আগে দেখি নি। মক্কার এক লোকের সঙ্গে দেখা হলো আমাদের। তাকেই জিজ্ঞেস করলাম। সে লোক প্রশ্ন করল, আমরা তাঁকে চিনি কি না। আমরা বললাম, আমরা তাকে চিনি না। "তাহলে আপনারা কি তাঁর চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে চেনেন?" আমরা বললাম, তিনি ব্যবসায়ী হিসেবে প্রায়ই আমাদের কাছে যান, তাকে আমরা চিনি।

লোকটা বলল, "মসজিদে ঢুকেই দেখবেন আল-আব্বাসের পাশে তিনি বসে আছেন।"

আমরা মসজিদে প্রবেশ করলাম। দেখলাম আমাদের রসূলে করীম (সা) বসে আছেন আল-আব্বাসের পাশে। তাঁকে সালাম দিয়ে আমরা বসলাম। রসূলে করীম (সা) আল-আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি আমাদের চিনেন কি না। আল-আব্বাস বললেন, চিনেন। তিনি আমাদের নামও বলে দিলেন। কা'বের নাম করতেই রসূলে করীম (সা) যা বললেন, আমি তা জীবনেও ভুলব না। তিনি বললেন, "কবি?"

আল-বারা বললেন, "হে রসূলুল্লাহ্, আমি এই পথ পার হয়ে এসেছি, আল্লাহ্ আমাকে ইসলামের পথে হিদায়ত করে নিয়ে এসেছেন। আমার মনে হয়েছিল, এই ঘরের দিকে পেছন ফেরা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমি এর দিকেই মুখ করে নামায পড়েছি পথে। আমার সঙ্গীরা আমাকে তাতে বাধা দিয়েছে। তখন আবার আমার মন খারাপ হলো। আপনার এ বিষয়ে কি মত, হে রসূলুল্লাহ?"

রসূল করীম (সা) বললেন, "আপনি যদি চান; তাহলেই আপনার একটা কিবলা থাকবে।"

তখন আল-বারা রসূলে করীম (সা)-এর কিবলায় ফিরে এলেন এবং সকলের সঙ্গে সিরিয়ার দিকে মুখ করে নামায পড়লেন। কিন্তু তাঁর আত্মীয়-স্বজন আবার খুব জোরের সঙ্গে বলে থাকে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি কা'বার দিকে মুখ করেই নামায পড়েছিলেন। তবে একথা সত্য নয়। সে বিষয়ে তাদের চেয়ে আমরা বেশি জানি।"

মাবাদ ইবনে কা'ব আমাকে বলেছেন যে, তার ভাই আবদুল্লাহ্ তাকে বলেছিলেন যে তাদের পিতা কা'ব ইবনে মালিক বলেছিলেন: 'তারপর আমরা হজ্জে গেলাম। ঠিক হলো,—তাশরিকের মাঝামাঝি দিনগুলোয় আমরা আল-আকাবায় দেখা করব রসূলে করীম (সা)-এর সঙ্গে। হজ্জ শেষ হলো। রসূল (সা)-এর দেখা করার নির্ধারিত রাত এল। আমাদের

সঙ্গে ছিল আমাদের এক প্রধান ও শরীফ জন আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে হারাম আবূ জাবির। আমাদের সঙ্গে যারা বহু-ঈশ্বরবাদী ছিল তাদের কাছে আমাদের এইসব কার্যকলাপের খবর গোপন রেখেছিলাম। তাকে আমরা বললাম, "আপনি আমাদের অন্যতম প্রধান এবং শরীফ লোক। আপনাকে আমরা আপনার বর্তমান সংসর্গ থেকে মুক্ত রাখব, যাতে কোন আগুনের ইন্ধন আপনি না হন।" তারপর তাকে আমরা ইসলাম গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলাম এবং আল-আকাবায় আমাদের বৈঠকের সংবাদ দিলাম। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন, আমাদের সঙ্গে আল-আকাবায় গেলেন, আমাদের একজন নকিব হলেন।

কারাভাঁয় আমাদের সমস্ত লোকজনের সঙ্গে আমরা শয়ন করলাম সে রাতে। রাতে তৃতীয় যামে আমরা চুপি চুপি বের হয়ে পড়লাম। রসূল (সা)-এর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য একেবারে আকাবার গিরিখাত পর্যন্ত গেলাম। আমরা ছিলাম তিয়াত্তুর জন মানুষ, এর মধ্যে মহিলা ছিলেন দুজন। মহিলাদের একজন ছিলেন নুসায়বা বিনতে কা'ব উম্মে উমারা। ইনি বানু মাযিন ইবনে আল-নাজ্জারের লোক। অন্যজন ছিলেন আসমা বিনতে আমর ইবনে আদি ইবনে নাবি। ইনি বানু সালিমার মানুষ, উম্মে মানি নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। আমরা গিরিখাতে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারপর রসূলে করীম (সা) এলেন। সঙ্গে এলেন আল-আব্বাস। আল-আব্বাস তখনো বহু ঈশ্বরবাদী। তবু তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের নিরপত্তার খাতিরে সমস্ত কাজে-কর্মে তাঁর সঙ্গে থাকতে চাইতেন। বসেই তিনি বললেন, "হে আল-খাযরাজের মানুষ (এই সম্বোধনে আরবরা খাযরাজ ও আউস দুই সম্প্রদায়কেই বোঝাত), আমাদের মধ্যে মুহাম্মদের কোথায় স্থান তা আপনারা জানেন। তাকে আমরা আমাদের সমস্ত লোকদের হাত থেকে রক্ষা করেছি। তারা এখন তাকে ঠিক আমাদের চোখ দিয়েই দেখে। সে আমাদের সঙ্গে আছে সসম্মানে ও নিরাপদে। তবে সে আপনাদের দিকে মুখ ফেরাবে, আপনাদের কাছে যাবে। আপনারা যদি মনে করেন, আপনারা তাকে যে ওয়াদা করেছেন তা রাখতে

পারবেন, প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে পারবেন, তাহলে যে দায়িত্ব নিতে চান তা নিয়ে নিন। আর যদি মনে করেন, আপনাদের কাছে যাওয়ার পর তার প্রতি বিশ্বাস অক্ষুন্ন রাখতে পারবেন না, ফলে তাকে ত্যাগ করতে হতে পারে তাহলে এক্ষুণি তাকে ছেড়ে দিন। কারণ তিনি এখন যেখানে আছেন সেখানে তিনি নিরাপদে আছেন।" আমরা বললাম, "আপনার কথা আমরা শুনলাম। আপনিই বলুন হে রসূলুল্লাহ্ (সা)! আল্লাহ্র ওয়াস্তে আপনিই বলুন কি করবেন।"

রসূল করীম (সা) কথা বললেন, কুরআন শরীফ থেকে আবৃত্তি করলেন, মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করলেন, ইসলামের প্রশংসা করলেন এবং তারপর বললেন, "আমি আপনাদের বশ্যতা দাবি করছি এই শর্তে যে আপনারা যেমন করে আপনাদের রমণী ও শিশুদের রক্ষা করেন, তেমনি করে আমাকে রক্ষা করবেন।

'আল-বারা' রসূল করীম (সা)-এর হাত ধরলেন। বললেন, "সেই তাঁর শপথ যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমরা যেমন করে আমাদের রমণী ও শিশুদের রক্ষা করি তেমনি আপনাকে রক্ষা করব। আমরা বশ্যতা কবুল করছি, আমরা যোদ্ধা জাতি, আমাদের অস্ত্র পেয়েছি আমরা পিতা থেকে পুত্রের হাত বদল করতে করতে।"

'আল-বারার কথার মাঝখানে বাধা দিলেন আবুল হায়সাম ইবনে আল-তাইয়িহান। বললেন, হে রসূলুল্লাহ্, আমাদের আরো অনেকের সঙ্গে সম্পর্ক আজ (তার মানে য়াহুদীদের সঙ্গে), তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক-চ্ছেদ হবে, আল্লাহ্ আপনাকে বিজয়মালা দেবেন এবং, তখন কি আপনি চলে আসবেন আমাদের ত্যাগ করে?"

'রসূল কীরম (সা) হাসলেন। বললেন, "না, রক্ত রক্তই, পণহীন রক্ত পণহীন রক্তেরই সমান।[১] আমি তোমাদের, তোমরা আমার। তোমাদের

১. অর্থাৎ রক্তের জন্য বদলা এবং তার দায়-দায়িত্ব উভয় পক্ষের জন্য সমান প্রযোজ্য হবে।

বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। তাদের সঙ্গে শান্তি যাদের সঙ্গে তোমার শান্তি।

কা'ব আরো বলেছেন: 'রসূল করীম (সা) বলেছেন, "আমার কাছে এমন বারোজন নেতাকে নিয়ে আস, যারা তাদের সমস্ত লোকের দায়িত্ব নিতে পারবে।" তারা আল-খাযরাজ থেকে নয়জন আর আউস থেকে তিনজন নিয়ে এল।

বারোজন নেতার নাম এবং আল-আকাবার বাকি কাহিনী

মুহম্মদ ইবনে ইসহাক আল মুত্তালিবির সূত্রে যিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল বাক্কাই আমাদের বলেছেন, সেই বারোজন হলেন:

আল-খাযরাজ থেকে: আবু উমামা আসাদ ইবনে জুরারা...ইবনে আল-নাজ্জার। ইনি হলেন তায়ম আল্লাহ্ ইবনে সালাবা ইবনে আমর ইবনে আল খাযরাজ। সাদ ইবনে আল রাবি ইবনে আমর ইবনে আবু জুহায়র ইবনে মালিক ইবনে ইমরুল কায়স ইবনে মালিক ইবনে সালাবা ইবনে কা'ব ইবনে আল-খাযরাজ ইবনে আল-হারিস ইবনে আল-খাযরাজ। আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা ইবনে সালাবা, ইনিও একই লাইনের। রাফি ইবনে মালিক ইবনে আল-আজলান ইবনে আমর...। আল-বারা' ইবনে মারুর ইবনে সাখর ইবনে খানসা ইবনে সিনান ইবনে উবায়দ ইবনে আদি ইবনে গানম ইবনে কা'ব ইবনে সালামা ইবনে সা'দ ইবনে আলী ইবনে আসাদ ইবনে সারিদা ইবনে তাজিদ ইবনে জুশাম ইবনে আল-খাযরাজ। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে হারাম ইবনে সালাবা ইবনে হারাম ইবনে কা'ব ইবনে গানম ইবনে কা'ব ইবনে সালামা......। উবাদা ইবনে আল-সামিত ইবনে কায়স ইবনে আসরাম...। সাদ ইবনে উবাদ ইবনে দুলায়ম ইবনে হারিসা ইবনে আবু হাজিমা ইবনে সালাবা ইবনে তারিফ ইবনে আল-খাযরাজ ইবনে সাইদা কা'ব ইবনে আল-খাযরাজ। আল-মুনযির ইবনে আমর ইবনে খুনায়স ইবনে হারিসা ইবনে লাউজান ইবনে আবদু উদ্ ইবনে যায়দ ইবনে সালাবা ইবনে আল-খাযরাজ, একই বংশধারার।

আল আউস থেকেঃ উসায়দ ইবনে হুদায়র ইবনে সিমাক ইবনে আতিক ইবনে রাফি ইবনে ইমরুল কায়স ইবনে যায়দ ইবনে আবদুল আশাল ইবনে জুশাম ইবনে আল-হারিস ইবনে আল-খাযরাজ ইবনে আমর ইবনে মালিক ইবনে আল-আউস। সাদ ইবনে খায়সামা ইবনে আল-হারিস ইবনে মালক ইবনে কা'ব ইবনে আন-নাহ্হাত ইবনে কা'ব ইবনে হারিসা ইবনে গানম ইবনে আল-সালম ইবনে ইমরুল কায়স ইবনে মালিক ইবনে আউস। রিফা' ইবনে আবদুল মুনযির ইবনে জুবায়র ইবনে যায়দ ইবনে উমাইয়া ইবনে যায়দ ইবনে মালিক ইবনে আউফ ইবনে আমর ইবনে আউফ ইবনে মালিক ইবনে আল-আউস।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু বকর আমাকে বলেছেন যে রসূল করীম (সা) সেই নেতাদের কাছে বলেছিলেনঃ "ম্যারির পুত্র যীশুর শিষ্যরা যেমন তাঁর কাছে দায়ী ছিল তেমনি তোমরা দায়ী থাকবে তোমাদের সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকের জন্য। আর আমি দায়ী রইলাম আমার উম্মতের জন্য (অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য।" তাঁর কথায় সকলেই সম্মত হলেন।

আসিম ইবনে উমর ইবনে কাতাদা আমাকে বলেছে যে রসূলের উপর গোপনে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য যখন সবাই চলে এল তখন বানু সালিম ইবনে আউফের ভাই আল-আব্বাস ইবনে উবাদা ইবনে নাদলা আল-আনসারি বলেছিল, 'হে খাযরাজের লোকজন, এই লোককে সমর্থন দেওয়ার যে ওয়াদা করেছ তার তাৎপর্য কি বুঝতে পেরেছ তোমরা? এই ওয়াদা হলে ছোট বড় সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ওয়াদা। যদি তোমরা মনে করো, তোমাদের সমস্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত হলে, তোমাদের সমস্ত খান্দান লোককে হত্যা করা হলে, তোমরা একে ত্যাগ করবে, তাহলে সেটা এখনি করে ফেলো, কারণ এখন না করে পরে করলে ইহকাল ও পরকালে তা তোমাদের জন্য লজ্জার কারণ হবে। আর যদি মনে কর তোমাদের সমস্ত সম্পত্তি হারিয়ে গেলে এবং তোমাদের সমস্ত খান্দান লোককে হত্যা করা হলেও তোমাদের ওয়াদার প্রতি তোমরা বিশ্বস্ত থাকবে

তাহলে এঁকে গ্রহণ করো। আল্লাহ্‌র শপথ, তাতে ইহকাল ও পরকালে তোমাদের মঙ্গল হবে।'

তাঁরা বললেন, তারা এইসব শর্তে রসূল করীম (সা)-কে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তার বদলে কি তারা পাবে, তা জানার ইচ্ছা প্রকাশ করল তারা। রসূল করীম (সা) বললেন, 'বদলে আছে বেহেশ্‌ত।' তারা বলল, 'আপনার হাত প্রসারিত করুন।' রসূল করীম (সা) তাই করলেন। তারা সবাই তখন ওয়াদা করল। আসিম বলেছেন, দায়িত্বের বন্ধন দৃঢ় করার জন্য আল-আব্বাস এহেন আচরণ করেছিল। আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু বকর বলেছেন যে, তিনি তা করেছিলেন কেবল সমস্ত লোকজনকে সে রাতে ওখানে আটকে রাখার জন্য। তার আশা ছিল এর মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সালূল হয়তো এসে যাবে এবং তাতে করে আপন লোকজনদের জন্য তার শক্তি আরো মজবুত হবে। এর মধ্যে কোনটা যে সত্য আল্লাহ্‌ই ভাল বলতে পারবেন।

বানু আল-নাজ্জার দাবি করেন, আনুগত্য স্বীকারের জন্য সর্বপ্রথম হাত প্রসারিত করেছিলেন আসাদ ইবনে জুরারা। বানু আবদুল আশাল বলেন, তিনি নন, আবুল হায়সাম ছিলেন প্রথম। মাবাদ ইবনে কা'ব আমাকে একটা হাদীস বলেছেন তার পিতা কা'ব ইবনে মালিকের সূত্রে আর সে হাদীস অনুযায়ী আল-বারা প্রথম ওয়াদা করেন এবং বাকিরা তাকে অনুসরণ করেন। আমরা সবাই যখন ওয়াদা করলাম, তখন আল-আকাবার চূড়ো থেকে বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে শয়তান চীৎকার করে উঠেছিল, ওহে মিনাবাসীবৃন্দ, ওর সঙ্গে যেসব দুশ্চরিত্র ধর্মত্যাগী আছে তাদের তোমরা চাও? ওরা জোট বেঁধেছে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে বলে।'

রসূল করীম (সা) বললেন, 'এ হলো পাহাড়ের ইজ্‌ব।[১] এ হলো আজিয়াবের পুত্র। আমার কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ হে আল্লাহ্‌র দুশমন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমাকে আমি খতম করব!'

১. ক্ষুদ্র ও ঘৃণ্য।

রসূল করীম (সা) তাদের নিজ নিজ কারাভাঁয় ফিরে যেতে বললেন। আল-আব্বাস ইবনে উবাদা বললেন, 'আল্লাহর কসম, আপনি যদি চান, কালকেই আমরা সবাই তলোয়ার নিয়ে মিনার লোকজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।'

রসূল করীম (সা) বললেন, 'আমরা সে আদেশ পাই নি। এখন নিজের কারাভাঁয় ফিরে যান।'

আমরা তখন ফিরে গেলাম। সারারাত ঘুমোলাম।

পরদিন ভোরে কুরায়শদের দলপতিরা আমাদের শিবিরে এল। বলল, তারা শুনেছে আমরা রসূল করীম (সা) কে তাদের ত্যাগ করে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হলে তাঁকে সমর্থন করব বলে ওয়াদা করেছি এবং সমস্ত আরবে আমরাই হলাম একমাত্র সম্প্রদায়, যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে একান্ত অনিচ্ছায় তারা তা করবে। শুনে আমাদের বহু-ঈশ্বরবাদীরা বলে উঠল, না, এমন ঘটনা ঘটেনি তো। তারা এর কিছুই জানে না। তারা তো সত্যি কথাই বলছিল। কি ঘটেছিল তার বিন্দু বিসর্গ তারা তো কিছুই জানত না। আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। তারপর সবাই উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াল আল-হারিস ইবনে হিশাম ইবনে আল-মুগিরা আল-মাখজুমি, পায়ে নতুন চটি। তাকে আমি এমন করে কিছু বললাম, যাতে মনে হয়, যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে আমি তাদের জড়াতে চাইছি। বললাম, 'হে আবু জাবির, আপনি হলেন আমাদের একজন প্রধান, এই ছোকরা কুরায়শের মতো একজোড়া চটি আপনি যোগাড় করতে পারলেন না? আল-হারিস আমার কথা শুনল, শুনেই পা থেকে চটি খুলে তা আমার দিকে ছুঁড়ে মারল। বলল, 'আল্লাহ্‌র কসম, তুমি নিতে পার এগুলো! আবু জাবির বলল, 'ধীরে চল, তুমি এই যোয়ান মানুষটাকে রাগিয়ে দিয়েছ। এবার ওর চটি ফিরিয়ে দাও।' আমি বললাম, 'দেব না, আল্লাহ্‌র কসম। এ এক শুভ ইঙ্গিত। ইঙ্গিত যদি সত্য হয় তাহলে ওর সবকিছু লুট করে নেবো।'

আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু বকর আমাকে বলেছেন, তারা সবাই আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইর কাছে গিয়ে কা'বের বর্ণনামতো সব ঘটনা বিবৃত করল। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই বলল, 'এ তো খুব গুরুতর বিষয়। আমাকে জিজ্ঞেস না করে আমার লোকজন এভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না, আর কি ঘটেছে, তা-ও আমি জানি না।'

একথা শুনে তারা চলে গেল।

মিনা ত্যাগ করার পর কিন্তু তারা এ বিষয়ে আরো অনুসন্ধান করে জানল যে ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য। তারা আমাদের লোকজনের পেছনে ধাওয়া করল। আযাকিরে সা'দ ইবনে উবাদাকে আর বানু সাইদার ভাই আল-মুনযির ইবনে আমরকে তারা পেল। এই দুইজনই ছিল প্রধান স্থানীয় লোক। আল-মুনযির পালিয়ে গেল। কিন্তু সা'দকে তারা ধরে ফেলল। দুই হাত ঘাড়ের উপর নিয়ে তা ঘোড়ার জিনের চামড়ার ফিতা দিয়ে শক্ত করে বাঁধল এবং এমনি অবস্থায় সারা পথ মারতে মারতে তার লম্বা চুল ধরে টেনে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে এল মক্কায়। (তার চুল খুব লম্বা ছিল)। সা'দ বলেছে, 'ওরা যখন ধরল আমাকে, বেশ কয়েকজন কুরায়শ তখন এসে জড়ো হলো। তাদের মধ্যে একজন ছিল লম্বা, ফর্সা, খুব সুন্দর, অমায়িক চেহারা। আমার মনে হলো এদের মধ্যে কোন ভদ্রতাবোধ থাকলে, এই লোকের কাছ থেকে তা পাওয়া যাবে। কিন্তু লোকটা আমার কাছে এসে আমার মুখে এমন জোরে এক ঘুষি লাগাল, ভদ্র ব্যবহারের সব আশা নস্যাৎ হয়ে গেল।

ওরা আমাকে টেনে হিচঁড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। একজন লোকের আমার উপর করুণা হলো। বলল, "আরে হতচ্ছাড়া, কুরায়শদের কারো কাছ থেকেই আশ্রয়ের অধিকার নেই তোমার?'

আমি বললাম, "আছে। আমি জুবায়র ইবনে মুতিম ইবনে আদি ইবনে নওফেল ইবনে আবদু মানাফ-এর ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করতাম, আমার দেশে কেউ তাদের প্রতি অন্যায় করলে তার

প্রতিকার করতাম। আল-হারিস ইবনে হার্ব ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদু শামস ইবনে আবদু মানাফের হেফাজতও আমি করতাম।"

লোকটা বলল, "বেশ তো, ওদের দুজনকে তুমি চীৎকার করে ডাকো না কেন, বলো তাদের সঙ্গে কি তোমার সম্পর্ক।"

আমি তা-ই করলাম। সে লোক ছুটে গেল, তাদের পেল কা'বা মসজিদের পাশে। আমার কথা তাদের সে বলল। বলল, আমি তাদের উপর আমার অধিকারের কথা বলে তাদের আমি স্মরণ করেছি। শুনে ওরা আমাকে চিনতে পারল। ওরা এসে আমাকে ছাড়িয়ে নিল।'

সুতরাং সা'দও বেঁচে গেল। তাকে মেরেছিল যে লোক, তার নাম সুহায়ল ইবনে আমর। সে বানু আমির ইবনে লুআইর ভাই।

হিজরত সম্বন্ধে প্রথম দুটো কবিতা রচনা করেন বানু মুহারিব ইবনে ফিহরের ভাই দিরার ইবনে আল-খাত্তাব ইবনে মিরদাস :

সা'দের কাছে গিয়ে আমি শক্ত করে ধরে ফেললাম।
মুনযিরকে ধরতে পারলে খুব ভালো হতো অবশ্য।
তাকে ধরতে পারলে তার রক্তপণ দিতে হতো না।
তাকে একটু অপমান করলেই হতো, বদলার কোন প্রয়োজন ছিল না।

হাসান ইবনে সাবিত তার জবাব দিয়েছিল :

মানুষের উট যখন দুর্বল ছিল, তখন
তুমি সা'দ কিংবা মুনযিরের সমকক্ষ ছিলে না।
আবু ওয়াহাব না থাকলে আমার কবিতা
আল-বারকার চূড়ায় উঠে পরে নেমে আসতো তীব্রবেগে।[১]
নাবাতের লোক রঙ করা চাদর পরে, আর
তোমরা পর সুতীবস্ত্র, তাই কি অহংকার তোমাদের ?

---

১. এর অর্থ দুরূহ এবং তা নির্ভর করে আবু ওয়াহাবের পরিচয়ের উপর। হাসানের কবিতার উপর ডক্টর আরাফাতের থিসিসে বিশদ বিবরণ আছে।

ঘুমিয়ে যে স্বপ্ন দেখে আছে সে সিজার কিংবা কোসরোসের শহরে,
তার মতো হয়ো না।
সাবধান থাকলে যে তার সন্তান হারাতো না
সেই শোকার্ত জননীর মতো হয়ো না।
হয়ো না সেই ভেড়ার মতো, সামনের পা দিয়ে
যে খুঁড়ে অনাকাঙ্ক্ষিত কবর।
চীৎকারের সেই কুকুরের মতোও নয় যে
অদৃশ্য তীরন্দাজের তীরকে ভয় পায় না, গলা বাড়িয়ে দেয়।
কবিতার বাণী যে আমাদের কাছে পাঠায়,
সে যেন খাইবারে খেজুরই পাঠায়।[১]

আমর ইবনুল জামুহ্-এর প্রতিমা

মদীনায় এসে তারা প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করল। এর মধ্যে কিছু শেখ নিজেদের মূর্তিপূজা বহাল রাখল। আমর ইবনে আল-জামুহ্ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে হারাম ইবনে কা'ব ইবনে গানম ইবনে কা'ব ইবনে সালামা ছিলেন এমনি একজন। তার ছেলে মুআয আল আকাবায় হাযির ছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি বশ্যতা স্বীকার করেছিল। আমর ছিল সম্প্রদায়ের অন্যতম বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি ও নেতা। ইনি নিজের বাড়ীতে মানাত নামে এক কাঠের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে এবং তাকে ভক্তির দেবতা নাম দিয়ে তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। বানু সালামা মুয়ায ইবনে জাবালের সমস্ত যেয়ান এবং এমন কি তার নিজের ছেলে মুয়ায পর্যন্ত আকাবার অন্যান্য সহযাত্রীসহ মুসলমান হয়ে গেল, তখন তারা রাত্রিবেলা আমরের ঘরে এসে সে প্রতিমা তুলে নিয়ে ফেলে দিত নোংরা গর্তে। সকাল বেলা আমর উঠে চীৎকার করে উঠত, 'হায় হায়! রাতে কে আমার দেবতা নিয়ে গেল?' তারপর সে যেত তাকে খুঁজতে। খুঁজে বের করে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে, সুগন্ধি

---

১. নিউক্যাসেলে কয়লা পাঠানোর মত।

মেখে-টেখে আবার তাকে প্রতিষ্ঠা করত স্বস্থানে। বলত, যদি জানতাম কোন্ বেটা এই কাজ করেছে তাকে আমি দেখে নিতাম! আবার রাত এলে আবার যখন গভীর ঘুমে মগ্ন হতো, আবার তারা এসব কাজ করত। পরদিন ভোরে আবার সে তাকে খুঁজে বের করে আনত। এমনি ঘটল কয়েকবার। তারপর আবার একদিন প্রতিমাকে ওরা যেখানে ফেলে দিয়েছিল ওখান থেকে খুঁজে আনল, পরিষ্কার করল এবং তার সঙ্গে একটা তলোয়ার বেঁধে রাখল। বলল, 'ঈশ্বরের দোহাই, কে ওসব করছে আমি জানি না। কিন্তু তোমার যদি বিন্দু মাত্র শক্তি থেকে থাকে, এই তলোয়ার দিলাম, নিজেকে রক্ষা করো।'

রাতে আবার সে যখন গভীর ঘুমে অচেতন, তারা এল, প্রতিমার গলা থেকে তলোয়ার খুলে নিয়ে তার বদলে গলায় বেঁধে রাখল এক মৃত কুকুর এবং সেই অবস্থায় প্রতিমাকে এক নোংরা নর্দমায় ফেলে দিল। সকাল বেলা আমর দেখল প্রতিমার জায়গায় প্রতিমা নেই। খুঁজতে গিয়ে দেখল এক নর্দমায় সে পড়ে আছে, গলার সঙ্গে এক মরা কুকুর বাঁধা। দেখে বুঝতে আর বাকি রইল না কারা একাজ করেছে। এদিকে গোত্রের মুসলমানরাও তাকে মুসলমান হওয়ার জন্য বারবার বলছিল। অতএব সে আল্লাহ্‌র অশেষ অনুগ্রহে ইসলাম গ্রহণ করে খুব ভাল একজন মুসলমান হলো।

তিনি কিছু কবিতা লিখেছিলেন আল্লাহ্ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান অর্জনের পর। তাতে সেই প্রতিমার নিষ্ক্রিয়তার কথা বলে বিভ্রান্তি ও অন্ধকার থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করেছিলেন।

একটি কবিতা নিম্নরূপঃ

তুই যদি দেবতা হতিস, আল্লাহ্‌র কসম,
গলায় মরা কুকুর বেঁধে নর্দমায় পড়ে থাকতি না,
ধিক! তোকে আমরা দেবতা মেনেছি, এখন
তুই ধরা পড়ে গেছিস, আমাদের বাজে বোকামো দূর হয়েছে!

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, মহান দয়াময়,
দানশীল, রেযেকের মালিক, সমস্ত ধর্মের মালিক,
তিনি যথাসময়ে আমাকে রক্ষা করেছেন,
কবরের অন্ধকার থেকে বাঁচিয়েছেন।

দ্বিতীয় আকাবায় ওয়াদার অবস্থা

আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিলে পরে দ্বিতীয় আকাবায় যুদ্ধের শর্তাবলী নির্ধারিত করা হলো। এগুলো প্রথমবারের আনুগত্য অনুষ্ঠানে ছিল না। তারা এখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল করীম (সা)-এর স্বার্থে ছোট বড় সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো এবং এমনি বিশ্বস্ত খেদমতের জন্য তিনি তাদের পুরস্কার হিসাবে বেহেশ্‌তের সুসংবাদ দিলেন।

উবাদা ইবনে আল-ওয়ালিদ ইবনে উবাদা ইবনে আল-সামিত তার পিতা ও তিনি তার পিতামহ তখনকার একজন নেতা উবাদা আল-সামিতের সূত্রে আমাকে বলেছেন, 'সম্পদে কি বিপদে, সুখে কি দুঃখে এবং সমস্ত বৈরী অবস্থায় রসূল করীম (সা)-এর উপর সম্পূর্ণ আনুগত্য সহকারে যুদ্ধ করার জন্য আমরা ওয়াদা করলাম; ওয়াদা করলাম যে আমরা কারো প্রতি অন্যায় করব না। আমরা সকল সময় সত্য কথা বলব। আল্লাহ্‌র কাজে কারো শাসনকে ভয় করব না।' উবাদা ছিলেন আকাবায় ওয়াদাকারী বারোজনের অন্যতম।

দ্বিতীয় আকাবায় উপস্থিত ব্যক্তিদের নাম

আউস ও খাযরাজের তিয়াত্তর জন পুরুষ ও দুইজন নারী ছিলেন।[১]

আউস থেকে ছিলেন ঃ

উসায়দ ইবনে হুযায়র......ইনি একজন নেতা। বদরযুদ্ধে ইনি ছিলেন না। আবুল হায়সাম ইবনে তাইয়াহান। ইনি বদরে ছিলেন। সালমা ইবনে

১. বিশদ বংশধারা দেওয়া হলো না পুনরাবৃত্তি পরিহারের জন্য।

সালমা ইবনে ওয়াকশ ইবনে জুখবা ইবনে জুউরা ইবনে আবদুল আশাল। ইনিও বদরে ছিলেন। মোট হলো ৩।

বানূ হারিসা ইবনে আল-হারিস থেকে...জুহায়র ইবনে রাফে ইবনে আদি ইবনে যায়দ ইবনে জুশাম ইবনে হারিসা। আবূ বুরদা ইবনে নিয়ার ওরফে নিয়ার ইবনে আমর ইবনে উবায়দ ইবনে কিলাব ইবনে দুহমান ইবনে গানম ইবনে যুবিয়ান ইবনে হুমায়ম ইবনে কামিল ইবনে জুহল ইবনে হানি ইবনে বালি ইবনে আমর ইবনে আলহাফ ইবনে কুদা। ইনি ছিলেন মিত্রপক্ষের লোক। আল-বদরের যুদ্ধে তিনি ছিলেন। নুহায়র ইবনে আল-হায়সাম। ইনি ছিলেন বানূ নাবি ইবনে মাজদা ইবনে হারিসা-র লোক। মোট ৩ জন।

বানূ আমর ইবনে আউফ ইবনে মালিক থেকে : সাদ ইবনে খায়সামা। ইনি ছিলেন একজন নেতা, বদর যুদ্ধে হাযির ছিলেন, রসূল (সা)-এর পাশে থেকে যুদ্ধ করে শহীদ হন। রিফা' ইবনে আবদুল মুনযির। ইনিও নেতা ছিলেন ও বদর যুদ্ধে হাযির ছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র ইবনে আল-নুমান ইবনে উমাইয়া ইবনে আল-বুরাক। আল-বুরাকের পুরো নাম ছিল ইমরুল কায়স ইবনে সালাবা ইবনে আমর। ইনি আল-বদরে উপস্থিত ছিলেন। ওহুদের যুদ্ধে রসূল করীম (সা)-এর হয়ে তীরন্দাজদের পরিচালনা করতে গিয়ে শাহাদত বরণ করেন। মান ইবনে আদি ইবনে আল-জাদ ইবনে আল-আজলান হারিসা ইবনে দুবাইয়া। বালি গোত্র থেকে আগত এদের একজন মক্কেল। ইনি বদর, ওহুদ খন্দক সহ রসূল করীম (সা)-এর সমস্ত যুদ্ধে হাযির ছিলেন। আবূ বকরের খিলাফতের সময় ইয়ামামার যুদ্ধে ইনি শাহাদত বরণ করেন। উয়ায়ম ইবনে সাইদা। ইনিও বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশ নেন। মোট ৫ জন।

সমস্ত আউস গোত্র থেকে মোট এই এগার জন ছিলেন।

খাযরাজ থেকে ছিলেন ঃ

বানূ আল নাজ্জার ওরফে তায়মুল্লা ইবনে সালাবা ইবনে আমর থেকে ঃ আবূ আইউব খালিদ ইবনে যায়দ ইবনে কুলায়ব ইবনে সালাবা ইবনে আবদ ইবনে আউফ ইবনে গানম ইবনে মালিক ইবনে আল-নাজ্জার। রসূল করীম (সা)-এর সঙ্গে সমস্ত যুদ্ধে ইনি অংশ নেন এবং মাবিয়ার সময়ে বায়জান্টাইনে শাহাদত বরণ করেন। মুয়ায ইবনে আল-হারিস ইবনে রিফা' ইবনে সাওয়াদ ইবনে মালিক ইবনে গানম। সমস্ত যুদ্ধে ইনি ছিলেন। ইনি ছিলেন আফরার পুত্র এবং এর ভাই আউফ ইবনে আল-হারিস বদর যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। ওর ভাই মুআইদও একই গৌরবের অধিকারী হন। তিনিই আবূ জেহেল ইবনে হিশাম ইবনে আল-মুগিরাকে হত্যা করেন। তিনিও আফরার পুত্র ছিলেন। তারপর ছিলেন উমারা ইবনে হাযম ইবনে যায়দ ইবনে লাউজান ইবনে আমর ইবনে আবদুআউফ ইবনে গানম। ইনিও সমস্ত যুদ্ধে ছিলেন এবং আবূ বকরের সময়ে ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। আসাদ ইবনে জুবারা। ইনি একজন নেতা ছিলেন। বদর যুদ্ধের পূর্বে রসূল করীম (সা)-এর মসজিদ নির্মাণের সময়কালে ইনি ইন্তিকাল করেন। মোট ৬ জন।

বানূ আমর ইবনে মাবজুল, অন্য নাম আমির ইবনে মালিক থেকে ঃ সাহল ইবনে আতিক ইবনে নুমান ইবনে আমর ইবনে আতিক ইবনে আমর। ইনি বদর যুদ্ধে ছিলেন। মোট ১ জন।

বানূ আমর ইবনে মালিক ইবনে আল-নাজ্জার। এরা ছিলেন বানূ হুদায়লা। এদের মধ্য থেকে ছিলেন আউস ইবনে সাবিত ইবনে আল মুনযির ইবনে হারাম ইবনে আমর ইবনে যায়দ মানাত ইবনে আদি ইবনে আমর ইবনে মালিক। ইনি বদর যুদ্ধে হাযির ছিলেন। আবূ তালহা যায়দ ইবনে সাহল ইবনে আল আসওয়াদ ইবনে হারাম ইবন আমর ইবনে যায়দ মানাত...ইনিও বদর যুদ্ধে ছিলেন। মোট ২ জন।

বানূ মাজিন ইবনে আল-নাজ্জার থেকে ঃ কায়স ইবনে আবূ সা'সা-এর অন্য নাম ছিল আমর ইবনে যায়দ ইবনে আউফ ইবনে মাবজুল

ইবনে আমর ইবনে গানম ইবনে মাজিন। বদর যুদ্ধে ছিলেন। রসূলে করীম (সা) সেই যুদ্ধে তাঁকে পশ্চাদভাগ রক্ষী সৈনিকদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমর ইবনে গাজিয়া ইবনে আমর ইবনে সালাবা ইবনে খানসা ইবনে মাবজুল...। মোট ২ জন।

বানু আল-নাজ্জারের মোট ১১ জন।

বানু আল-হারিস ইবনে খাযরাজ থেকেঃ সা'দ ইবনে আল-রাবি। ইনি একজন ইমাম ছিলেন। বদর যুদ্ধে অংশ নেন। ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। খারিজা ইবনে যায়দ ইবনে আবু জুহায়র ইবনে মালিক ইবনে ইমরুল কায়স ইবনে মালিক আল-আগার ইবনে সালাবা ইবনে কা'ব। ইনি বদর যুদ্ধে ছিলেন আর ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহাব, ইমাম, মক্কা অবরোধ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত যুদ্ধে রসূল করীম (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন। মুতায় রসূল করীম (সা)-এর অন্যতম সেনাপতি হিসেবে শহীদ হন। বশির ইবনে সাদ ইবনে সালাবা ইবনে খালাস ইবনে যায়দ ইবনে মালিক..., আল-নুমানের পিতা, বদর যুদ্ধে ছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দ ইবনে সালাবা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দ মানাত ইবনে আল-হারিস। বদর যুদ্ধে হাযির ছিলেন। কি করে আযান দিতে হয় তা একেই দেখিয়ে দেওয়া হয় এবং পরে আযান দেওয়ার জন্য রসূলে করীম (সা) তাঁকে আদেশ দেন। খাল্লাদ ইবনে সুয়ায়দ ইবনে সালাবা ইবনে আমর ইবনে হারিসা ইবনে ইমরুল কায়স ইবনে মালিক। বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে ছিলেন, বানু কুরায়জার সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় এক দুর্গের উপর থেকে তার উপর এক বিরাট পাথর নিক্ষেপ করায় মাথার খুলি ফেটে যায় এবং তাতেই তিনি শাহাদত বরণ করেন। অনেকে বলে থাকেন যে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, ইনি দুজন শহীদের পুরস্কার লাভ করবেন। উকবা ইবনে আমর ইবনে সালাবা ইবনে উসায়রা ইবনে উসায়রা ইবনে জাদারা ইবনে আউফ; ইনিই আবু মাসুদ, আল-আকাবার সর্বকনিষ্ঠ জন। মাবিয়ার আমলে ইন্তেকাল করেন। বদরে ছিলেন না। মোট ৭।

বানূ বায়দা ইবনে আমির ইবনে জুরায়ক ইবনে আবদু হারিসা থেকে ঃ জিয়াদ ইবনে লাবিদ ইবনে সালাবা ইবনে সিনান ইবনে আমির ইবনে আদি 'ইবনে উমাইয়া ইবনে বায়দা। বদরে ছিলেন ইনি। ফারওয়া ইবনে আমর ইবনে ওয়াজাদা ইবনে উবায়দা ইবনে আমির ইবনে বায়দা। বদরে হাযির ছিলেন। খালিদ ইবনে কায়স ইবনে মালিক ইবনে আল আজলান ইবনে আমির। বদরে ছিলেন। মোট ৩।

বানূ জুরায়ক ইবনে আমির ইবনে জুরায়ক ইবনে আবদু হারিসা ইবনে মালিক ইবনে গাদ্ব ইবনে জুশাম ইবনে আল-খাযরাজ থেকে ছিলেন ঃ রাফি ইবনে আল আজলান, ইমাম। যাকওয়ান ইবনে আবদু কায়স ইবনে খালদা ইবনে মুখাল্লাদ ইবনে আমির। ইনি রসূল করীম (সা) এর সঙ্গে বের হয়ে যান এবং মদীনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রসূল করীম (সা)-এর সঙ্গে মক্কায় বসবাস করেন. এইজন্য তাকে আনসারি মুহাজিরি বলা হয়। ইনি বদরে ছিলেন, ওহুদে শাহাদত বরণ করেন। আব্বাদ ইবনে কায়স ইবনে আমির ইবনে খালদা ইত্যাদি। বদরে ছিলেন। আল-হারিস ইবনে কায়স ইবনে খালিদ ইবনে মুখাল্লাদ ইবনে আমির, যার অন্য নাম ছিল আবু খালিদ। বদরে ছিলেন। মোট ৪ জন।

বানূ সালামা ইবনে সা'দ ইবনে আলী ইবনে আসাদ ইবনে সারিদা ইবনে তাজিদ…থেকে ঃ আল-বারা ইবনে মারূর ইবনে সাখর…ইমাম, বানূ সালামাদের মতে দ্বিতীয় আকাবার ওয়াদার সময় রসূল করীম (সা)-এর সামনে ইনিই প্রথম হাত প্রসারিত করেছিলেন। রসূল করীম (সা) মদীনায় আসার আগেই ইনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর পুত্র বিশর বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে ছিলেন এবং খায়বরে রসূল করীম (সা)-এর সঙ্গে বিষাক্ত খাসির গোশত খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। বানূ সালামাকে যখন রসূল করীম (সা) তাদের ইমাম কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তখন এর কাছেই সেই প্রশ্ন রেখেছিলেন। তারা জবাব দিয়েছিল, 'সমস্ত নীচতা সত্ত্বেও আল-জুদ ইবনে কায়স!' তিনি বলেছিলেন, 'নীচতার চেয়ে ঘৃণ্য অসুখ কি? বানূ সালামার প্রধান হচ্ছে শুভ্র কুঞ্চিত কেশ

বিশর ইবনে আল-বারা ইবনে মারূর।' সিনান ইবনে সায়ফি ইবনে সাখর ইবনে খানসা ইবনে সিনান ইবনে উবায়দ, ইনি বদরে যুদ্ধ করেন ও খন্দকে যুদ্ধ করে শহীদ হন। আল-তুফায়েল ইবনে নুমান ইবনে খান্সা ইবনে সিনান ইবনে উবায়দ একই ইতিহাস। মালিক ইবনে আল-মুনযির ইবনে সার ইবনে খুনাস ইবনে সিনান ইবনে উবায়দ, ভ্রাতা ইয়াযিদের সঙ্গে ইনি বদরে ছিলেন। মাসউদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে সুবায় ইবনে খানসা ইবনে সিনান ইবনে উবায়দ। আল দাহ্হাক ইবনে হারিসা ইবনে যায়দ ইবনে সালাবা ইবনে উবায়দ, ইনি বদরে ছিলেন। ইয়াযিদ ইবনে হারাম ইবনে সুবায় ইবনে খানসা ইবনে সিনান ইবনে উবায়দ। জুব্বর ইবনে সাখ্র ইবনে উমাইয়া ইবনে খানসা ইবনে সিনান ইবনে উবায়দ, ইনি বদরে ছিলেন। 'আল-তুফায়েল ইবনে মালিক ইবনে খানসা ইবনে সিনান ইবনে উবায়দ, ইনি বদরে ছিলেন।[১] মোট ১১ জন।

বানু কা'ব ইবনে সাওয়াদ গোত্রের সাওয়াদ ইবনে গানম ইবনে কা'ব ইবনে সালামা থেকেঃ কা'ব ইবনে মালিক ইবনে আবু কা'ব ইবনে আলকায়ন ইবনে কা'ব। মোট ১ জন।

বানু গানম ইবনে সাওয়াদ ইবনে গানম ইবনে কা'ব ইবনে সালামা থেকেঃ সালিম ইবনে আমর ইবনে হাদিদা ইবনে আমর ইবনে গানম, ইনি বদরে ছিলেন। কুতবা ইবনে আমির ইবনে হাদিদা ইবনে আমর ইবনে গানম, ইনিও বদরে ছিলেন। তার ভাই ইয়াযিদ, যার অন্য নাম ছিল আবুল মুনযির, বদরে ছিলেন। কা'ব ইবনে আমর ইবনে আব্বাস ইবনে আমর ইবনে গানম, যিনি আবুল ইয়াসার নামে পরিচিত ছিলেন, বদরে ছিলেন। সায়ফি ইবনে সাওয়াদ ইবনে আব্বাদ ইবনে আমর ইবনে গানম—মোট ৫ জন।

বানু নাবি ইবনে আমর ইবনে সাওয়াদ ইবনে গানম ইবনে কা'ব ইবনে সালামা থেকেঃ সালাবা ইবনে গানামা ইবনে আদি ইবনে নাবি,

১. অনেকে বলেন ইনি এবং এর আগে বর্ণিত ব্যক্তি এক ও অভিন্ন।

ইনি বদরে যুদ্ধ করেছেন। শহীদ হয়েছেন। আমর ইবনে গানামা ইবনে আদি' ইবনে নাবি। আব্‌শ ইবনে আমির ইবনে আদি বদরে ছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে উনায়স, কুদা'-র মিত্র একজন। খালিদ ইবনে আমর ইবনে আদি'। মোট ৫ জন।

বানু হারাম ইবনে কা'ব ইবনে গানম ইবনে কা'ব ইবনে সালামা থেকে ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর, ইনি একজন ইমাম ছিলেন, বদরে যুদ্ধ করেছেন, ওহুদে শহীদ হয়েছেন। তার পুত্র জাবির। মুয়ায ইবনে আমর ইবনে আল-জামুহ। ইনি বদরে ছিলেন। সাবিত ইবনে আলজিদ (আলজিদ হলেন সালাবা ইবনে যায়দ ইবনে আল-হারিস ইবনে হারাম) বদরে ছিলেন, আল-তাইফে শহীদ হন। উমায়র ইবনে আল-হারিস ইবনে সালাবা ইবনে আল-হারিস ইবনে হারাম, ইনি বদরে ছিলেন। খাদিজ ইবনে সালামা ইবনে আউস ইবনে আমর ইবনে আল ফুরাকির। ইনি বালির একজন মিত্র ছিলেন। মুয়ায ইবনে জাবাল ইবনে আমর ইবনে আউস ইবনে আদি ইবনে কা'ব ইবনে আমর ইবনে আদি[১] ইবনে সা'দ ইবনে আলী ইবনে আসাদ। বলা হয়, আসাদ ইবনে সারিদা ইবনে তাজিদ ইবনে জুশাম ইবনে আল-খাযরাজ বানু সালামার সঙ্গে বাস করতেন। সবগুলো যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, উমরের খিলাফতে সিরিয়ার প্লেগের বছর ইনি আমওয়াসে[১] মৃত্যুবরণ করেন। বানু সালামা তাকে তাদের লোক বলে দাবি করেন। কারণ ইনি মাতার সূত্রে সাহল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলজুদ ইবনে কায়স ইবনে সাখর ইবনে খানসা ইবনে সিনান ইবনে উবায়দ...ইবনে সালামার ভাই ছিলেন। মোট ৭ জন।

বানু আউফ ইবনে আল-খাযরাজ, পরবর্তীকালে বানু সালিম ইবনে আউফ ইবনে আমর ইবনে আউফ থেকে ঃ উবাদা ইবনে আস-সামিত, ইনি একজন ইমাম ও সমস্ত যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। আল-আব্বাস

১. পাঠান্তরে উধান।
১. বাইবেলের ইমাউস।

ইবনে উবাদা ইবনে নদলা…ইনি মক্কায় রসূল (সা)-এর সঙ্গে যোগ দেন, সেখানে তাঁর সঙ্গে বসবাস করেন ও তাকে একজন আনসারি মুহাজিরি বলা হতো। ওহুদে তিনি শহীদ হন। আবু আবদুর-রহমান ইয়াযিদ ইবনে সালাবা ইবনে খাজামা ইবনে আসরাম ইবনে আমর ইবনে আম্মারা, ইনি বালি'র বানু গুসায়না থেকে একজন মিত্র। আমর ইবনে আল-হারিস ইবনে লাবদা ইবনে আমর ইবনে সালাবা। এ'রা ছিলেন কুওয়াকিল। মোট ৪ জন।

বানু সালিম ইবনে গানম ইবনে আউফ, যার অন্য নাম ছিল বানু আল-হুবলা, সেখান থেকে: রিফা ইবনে আমর ইবনে যায়দ ইবনে আমর ইবনে সালাবা ইবনে মালিক ইবনে সালিম ইবনে গানম, ইনি আবুল ওয়ালিদ নামে পরিচিত ছিলেন। বদরে ছিলেন। উকবা ইবনে কালদা ইবনে আল-জাদ ইবনে হিলাল ইবনে আল-হারিস ইবনে আমর ইবনে আদি ইবনে জুশাম ইবনে আউফ ইবনে বুহতা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে গাত-ফান ইবনে সা'দ ইবনে কায়স ইবনে আয়লান, ইনি একজন মিত্র ছিলেন, বদরে ছিলেন। বর্ণিত কারণে একে আনসারি-মুহাজিরি বলা হতো। মোট ২ জন।

বানু সাইদা ইবনে কা'ব থেকে: সাদ ইবনে উবাদা, ইনি একজন ইমাম। আল-মুনযির ইবনে আমর, ইনিও ইমাম। ইনি বদর ও ওহুদে ছিলেন। রসূলে করীম (সা)-এর হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করার সময় বি'র মাউনায় শহীদ হন। এর সম্বন্ধে বলা হয় 'মৃত্যুর দিকে ইনি দ্রুত দৌড়ে গেলেন'। মোট ২ জন

দ্বিতীয় আকাবায় আউস ও খাযরাজ গোত্রের তিয়াত্তর জন পুরুষ ও দুইজন রমণী ছিলেন। সবাই আনুগত্য প্রকাশ করেন বলে সবাই দাবি করে। মেয়েদের হাত রসূলে করীম (সা) স্পর্শ করতেন না। তিনি কেবল শর্তগুলো উচ্চারণ করতেন, সেগুলো তারা গ্রহণ করলে তিনি বলতেন, 'যান, আপনার সঙ্গে আমার চুক্তি হয়ে গেল।'

দুইজন রমণীর মধ্যে নুসায়বা ছিলেন বানু খাজিন ইবনে আল-নাজ্জারের। ইনি ছিলেন বিন্‌তে কা'ব ইবনে আমর ইবনে আউফ ইবনে মাবজুল ইবনে আমর ইবনে গানম ইবনে মাজিন, উমারার আম্মা। তিনি এবং তাঁর বোন রসূলে করীম (সা)-এর সঙ্গে যুদ্ধে যান। তাঁর স্বামী ছিলেন যায়দ ইবনে আসিম ইবনে কা'ব, আর দুই পুত্রের নাম হাবিব ও আবদুল্লাহ্। ইয়ামামার হানাফি নেতা, মিথ্যাবাদী মুসায়লিমা হাবিবকে পাকড়াও করে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তুমি সাক্ষ্য কি দাও যে মুহম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল ?' সে বলল, হ্যাঁ, সে সাক্ষ্য দেয়। তখন সে আবার প্রশ্ন করে, 'তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে আমি আল্লাহ্‌র রসূল ? সে জবাব দিয়েছিল, 'কি বলছেন আমি শুনতে পাই না।' তখন মুসায়লিমা একে একে তার সমস্ত অঙ্গ কেটে ফেলল, এবং এমনি করে সে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। একই প্রশ্ন সে বারবার তার কাছে করেছে কিন্তু কোন উত্তর পান নি। নুসায়বা মুসলমানদের সঙ্গে ইয়ামামায় গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশ নেন। তারপর আল্লাহ্ মুসায়লিমাকে ধ্বংস করলেন। তিনি যখন প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তার সমস্ত দেহে তলোয়ার কিংবা বর্শার বারোটি আঘাতের চিহ্ন ছিল। এই কাহিনী আমাকে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে হাব্বান বলেছে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু সা'সা-র বরাত দিয়ে।

অন্য রমণী ছিলেন বানু সালামার উম্মে মানি, তার পুরো নাম ছিল আসমা ইবনে আমর ইবনে আদি ইবনে নাবি ইবনে আমর ইবনে সাওয়াদ ইবনে গানম ইবনে কা'ব ইবনে সালামা।

রসূল করীম (সা) যুদ্ধের আদেশ পেলেন

দ্বিতীয় আকাবার আগে কিন্তু রসূলে করীম (সা) যুদ্ধ কিংবা রক্তপাত করার অনুমতি পান নি। অনুমতি পেয়েছিলেন—মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্‌বান করার ও অপমান সহ্য করার ও অজ্ঞকে ক্ষমা করার। কুরায়শরা তাঁর উম্মতদের নির্যাতন করে, কাউকে তার ধর্ম থেকে ফুসলিয়ে নেয়

আবার কাউকে দেশান্তর করে। তাদের বেছে নিতে হতো তারা ধর্ম ত্যাগ করবে, নাকি স্বদেশে নির্যাতিত হবে, নাকি দেশত্যাগ করে আবিসিনিয়া না হয় মদীনা যাবে।

কুরায়শরা তখন আল্লাহ্‌র প্রতি আরো মারমুখো হয়ে গেল, তার মহান উদ্দেশ্যকে প্রত্যাখ্যান করল, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত করল। যারা আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর ইবাদত করত, তাঁর রসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাঁর ধর্মকে আঁকড়ে ধরেছিল, তাদের উপর কুরায়শরা অত্যাচার শুরু করল ও তাদের দেশান্তর করতে লাগল। তখন আল্লাহ্ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনুমতি দিলেন, যারা তাঁর প্রতি অন্যায় করছে, তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার করছে, তাদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য তিনি যুদ্ধ করতে পারেন।

উরওয়া ইবনে আল-জুবায়র ও অন্যান্য জ্ঞানীর কাছ থেকে আমি শুনেছি, এ বিষয়ে সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে; 'যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম। নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে তাদের অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে, 'আমাদের প্রভু আল্লাহ্।' আল্লাহ্ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে খৃস্টান সংসারত্যাগীদের উপাসনাস্থান, গির্জা, য়াহূদীদের উপাসনালয়, এবং মসজিদ যেখানে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করা হয়, সব ধ্বংস হয়ে যেতো। আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁর দীনকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শক্তিশালী, পরাক্রমশালী। আমি তাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎকার্য নিষেধ করবে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌র হাতে।[১]

এর অর্থ হলো: 'আমি তাদের যুদ্ধ করার অনুমতি দিলাম এইজন্য যে, তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়েছে, কারণ মানুষের বিরুদ্ধে

১. কুরআন ৩৯ : ৪১।

তাদের একমাত্র অপরাধ তারা আল্লাহ্র ইবাদত করে। তারা যখন প্রতিষ্ঠিত হবে তখন তারা সালাত কায়েম করবে যাকাত দেবে, দয়াধর্ম করবে এবং মানুষে মানুষে ভেদাভেদ বর্জন করবে অর্থাৎ রসূল করীম (সা) এবং তাঁর সাহাবা সকলের মধ্যেই। আল্লাহ্ তখন আবার তাঁর কাছে ইরশাদ করলেন, 'তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর যাতে তারা আর কোন ফুসলানোর কাজ করতে না পারে।'[১] অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত আর কোন বিশ্বাসী প্রবঞ্চিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ কর। 'এবং ধর্মটি হলো আল্লাহ্র অর্থাৎ যতক্ষণ না কেবল মাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা হয়।

আল্লাহ্ যুদ্ধের অনুমতি দিলেন। আনসারদের এই গোত্র ইসলামের পথে রসূল করীম (সা)-কে সমর্থন দেওয়ার এবং তাঁকে, তাঁর উম্মতকে, তাঁর শরণার্থী সমস্ত মুসলমানদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিল। তখন রসূল করীম (সা) তাঁর সাহাবীদের সমস্ত হিজরতকারীদের ও মক্কায় যারা তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাদের মদীনায় হিজরত করে তাদের আনসার ভাইদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। 'আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভাই তৈরী করে দেবেন আর তৈরী করে দেবেন নিরাপদ বাড়ি।' সুতরাং তারা দলে দলে চলে গেল। রসূল (সা) মক্কায় রয়ে গেলেন মক্কা ত্যাগ ও মদীনায় হিজরতের জন্য প্রভুর নির্দেশের অপেক্ষায়।

যারা মদীনায় হিজরত করলেন

রসূলের সাহাবাদের মধ্যে কুরায়শ বংশের যিনি সর্বপ্রসম মদীনায় হিজরত করেন, তিনি হলেন বানু মাখ্‌জুমের আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ ইবনে হিলাল ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর ইবনে মাখজুম। তাঁর প্রথম নাম ছিল আবদুল্লাহ্। আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় রসূল করীম (সা)-এর কাছ থেকে আসার পর তিনি আল-আকাবার ওয়াদার এক বৎসর-পূর্বে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি চলে গিয়েছিলেন, কারণ কুরায়শরা তাঁর প্রতি খারাপ ব্যবহার করত, আর তিনি শুনেছিলেন কিছু আনসার ইসলাম গ্রহণ করেছে।

১. কুরআন ২ঃ ১৯৮।

সালামা রসূলে করীম (সা)-এর স্ত্রী উম্মে সালামার সূত্রে সালামা ও তদীয় সূত্রে আমার পিতা আমাকে বলেছেন যে রসূল (সা)-এর স্ত্রী উম্মে সালামা বলেছিলেন: 'আবু সালামা যখন ঠিক করলেন তিনি মদীনা চলে যাচ্ছেন, তখন তিনি উটকে সজ্জিত করে তার পিঠে আমাকে চাপালেন, আমার কোলে দিলেন আমার কোলের শিশু সালামাকে। তারপর তিনি চললেন উটের আগে আগে। বানু আল-মুগিরা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর ইবনে মাখজুম তাকে দেখে তারা রুখে দাঁড়াল। বলল, 'তুমি যা খুশি করো, কিন্তু তোমার স্ত্রী? তুমি কি ভেবেছ তাকে তোমাকে নিয়ে যেতে দেবো আমরা?' উটের দড়ি ছিনিয়ে নিল তারা তার হাত থেকে, কেড়ে নিল আমাকে। আবু সালামার পরিবার, বানু আবদুল আসাদ এতে খুব ক্রুদ্ধ হলো। বলল, 'আমাদের বংশের লোকের হাত থেকে মাকে কেড়ে নিচ্ছো, আমরাও আমাদের ছেলেকে ছাড়বো না।' আমার শিশু পুত্রকে নিয়ে চলল দুই পক্ষের মধ্যে টানাটানি। টানাটানিতে তার একটা হাত ভেঙ্গে গেল। শেষে বানু আল-আসাদ তাকে নিয়ে গেল, আমাকে রেখে দিল বানু আল-মুগিরা, আর স্বামী চলে গেলেন মদীনায়। এমনি করে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম স্বামীর কাছ থেকে, পুত্রের কাছে গেলাম। রোজ সকালে আমি চলে যেতাম উপত্যকায়, ওখানে বসে বসে কাঁদতাম। বছর খানেক কেটে গেল এমনি করে। তারপর একদিন বানু আল-মুগিরার আমার এক সম্পর্কের ভাই ওদিক দিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে দেখলেন। আমার উপর তাঁর করুণা হল। আপন সম্প্রদায়ের লোকদের তিনি ডেকে বললেন, 'এই বেচারা মেয়ে মানুষটাকে যেতে দিচ্ছ না কেন, হ্যাঁ? স্বামী, স্ত্রী বাচ্চা সবাইকে আলাদা করে ফেলেছ তোমরা, কি কাণ্ড!' ওরা তখন আমাকে বলল, 'আপনি ইচ্ছে করলে আপনার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারেন।'

বানু আল-আসাদ আমার পুত্রকে ফেরত দিল আমার কাছে। আমার উটে জিন্ দিলাম, বাচ্চাকে নিলাম কোলে। এমনি অবস্থায় উটের উপর চেপে আমি রওয়ানা হলাম মদীনায় আমার স্বামীর উদ্দেশ্যে। কোন জন-প্রাণী

প্রাণী ছিল না আমার সঙ্গে। আমার ধারণা ছিল, স্বামীর কাছে যাওয়ার সময় পথে যার সঙ্গে দেখা হবে তার কাছ থেকেই কিছু খাবার চেয়ে নিতে পারব। তানিমে[১] পেঁছার পর দেখা হলো বানু আব্দুদ্দারের ভাই উসমান ইবনে তালহা ইবনে আবু তালহার সঙ্গে। তিনি কোথায় যাচ্ছি, একা যাচ্ছি কিনা জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাঁকে বললাম, আল্লাহ্ এবং শিশুটি ছাড়া আমার সঙ্গে আর কেউ নেই। তিনি বললেন—এমন অসহায় অবস্থায় আমার যেতে দেওয়া ঠিক হবে না। উটের দড়ি হাতে নিয়ে তিনি চললেন আমার সঙ্গে। এতো মহৎ কোন আরব আমি আর দেখিনি। যখন কোথাও থামবার প্রয়োজন হতো, তিনি উটকে হাঁটু গেড়ে বসাতেন প্রথমে। তারপর একটু দূরে চলে যেতেন এবং তারপর আমি নামতাম। বিশ্রাম নেওয়ার জায়গায় আমাকে নামিয়ে দিয়ে তিনি উট নিয়ে চলে যেতেন একটু দূরে, উটের পিঠ হালকা করে তাকে কোন গাছে বেঁধে রাখতেন। তারপর একটু দূরে গিয়ে কোন গাছের নিচে শুয়ে থাকতেন। সন্ধ্যা হলে তিনি উট নিয়ে এসে তাতে জিন্ চাপাতেন, আমার পেছনে গিয়ে উটে চড়বার জন্য বলতেন। জিনে ভাল করে বসার পর তিনি সামনে এসে উটের দড়ি হাতে হাঁটতেন। এমনি করে নিয়ে আসতেন পরবর্তী চটিতে। মদীনা পর্যন্ত এলাম আমরা এমনি করে। কুবা-য় বানু আমর ইবনে আউফ-এর গ্রামে এসে তিনি বললেনঃ এই গ্রামে আছেন আপনার স্বামী (আবু সালামা সত্যিই ওখানে ছিলেন) আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে ও গ্রামের ভেতরে যান আপনি।'

এই বলে তিনি ফিরে গেলেন মক্কায়।

তিনি (উম্মে সালামা) বলতেন আমি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে বলছি উম্মে সালামার মতো এতো কষ্ট আর কোন পরিবার ইসলামে করেছে কিনা

১. মক্কা থেকে মাইল ছয়েক দূরে ছিল বলে কথিত।

আমার জানা নেই।[১] আর উসমান ইবনে তালহার মতো এমন মহৎ মানুষও আমি আর দেখি নি।

আবু সালামার পর মদীনায় প্রথম হিজরত করেন বানু আদি ইবনে কা'বের মিত্রজন আমির ইবনে রাবিয়া, সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী লায়লা বিনতে হাসমা ইবনে গানিম ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আউফ ইবনে উবায়দ ইবনে উয়ায়জ ইবনে আদি ইবনে কা'ব। তাঁর পরে গেলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহ্শ্ ইবনে রিআব ইবনে ইয়ামার ইবনে সাবিরা ইবনে মুররা ইবনে কাসির ইবনে গানম ইবনে দুদান ইবনে আসাদ ইবনে খুযায়মা। ইনি ছিলেন বানু উমাইয়া ইবনে আবদু শামসের মিত্রজন। আবদুল্লাহ্‌র সঙ্গে ছিলেন তাঁর পরিবার ও ভাই আবদ। আবু আহমদ নামে পরিচিত ছিলেন এই আবদ। এই আবু আহমদ অন্ধ ছিলেন কিন্তু মক্কার সমস্ত অলিগলিতে যেতে পারতেন কারো কোন সাহায্য ছাড়া। ইনি একজন কবি ছিলেন। আল-ফারা বিনতে আবু সুফিয়ান ইবনে হারবকে তার স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে হয়েছিল। তাঁর মাতা ছিলেন উমায়মা বিনতে আবদুল মুত্তালিব।

তাঁরা যখন রওয়ানা হলেন তখন বানু জাহ্শের বাড়ির দরজায় তালা মারা ছিল। মক্কার উত্তর দিকে যাওয়ার পথে সেদিক দিয়ে তখন যাচ্ছিলেন উতবা ইবনে রাবিআ, আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব এবং আবু জেহেল ইবনে হিশাম। (এখন ওই স্থানে আছে আবান ইবনে উসমানের বাড়ি রাদমে)। উত্‌বা সেই বাড়ির দরজার দিকে তাকালেন, বাতাসে দরজা এদিক-ওদিক ধাক্কা খাচ্ছিল, ভেতরে জনমানুষ নেই। বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস নিক্ষেপ করে তিনি (উতবা) বললেন ঃ

যত দীর্ঘই হোক না সমৃদ্ধি কোন বাড়ির,
একদিন দুর্ভাগ্য আর বিবাদ এসে তাকে গ্রাস করবেই।

তারপর উতবা বললেন, 'বানু জাহ্শের বাড়ি এখন ভাড়াটেবিহীন।'

১. পরবর্তীকালে যুদ্ধে সমস্ত পরিবারটি শেষ হয়ে যায়। উমরের রাজত্বের প্রথম দিক উসমানও নিহত হন।

আবূ জেহেল জবাব দিয়েছিল, 'তার জন্য কিন্তু কেউ চোখের পানি ফেলবে না।'

সে বলে চলল : এ হলো এই লোকের ভ্রাতুষ্পুত্রের কীর্তি। আমাদের সমাজকে সে ছিন্ন ভিন্ন করেছে, আমাদের সব কিছু লণ্ডভণ্ড করেছে। আমাদের সকলের মধ্যখানে কীলক মেরে দিয়েছে। আবূ সালামা, আমির ইবনে রাবিআ আর আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহ্শ ও তার ভাই আবূ আহমদ ইবনে জাহ্শকে কুবা'-য় বানূ আমর ইবনে আউফের মুবাশ্শির ইবনে আবদুল মুনযির ইবনে জানবার-এর বাড়িতে জায়গা দেওয়া হয়েছে।

তারপর শরণার্থীরা এল দলে দলে। রসূল করীম (সা)-এর সঙ্গে বানূ গানম ইবনে দুজানের সমস্ত মুসলমান নারী ও পুরুষ একযোগে চলে গেলেন মদীনায় মুহাজির হিসেবে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন : আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহ্শ, তাঁর ভাই আবূ আহমদ, উকাশা ইবনে মিহ্সান, ওয়াহ্হাবের দুই পুত্র শুজা ও উকবা, আরবাদ ইবনে হুমাঈরা মুনকিয ইবনে নুবাতা, সাঈদ ইবনে রুকাইশ, মুহরিজ ইবনে নাদলা, ইয়াযিদ ইবনে রুকাইশ, কায়স ইবনে জাবির, আমর ইবনে মিহসান, মালিক ইবনে আমর এবং সাফওয়ান ইবনে আমর, সাকিফ ইবনে আমর, রাবিআ ইবনে আখসাম এবং আল-জুবায়র ইবনে আবিদ, তাম্মাম ইবনে উবায়দা, সাখবারা ইবনে উবায়দা এবং মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহ্শ।

তাঁদের সঙ্গে মহিলা ছিলেন জাহ্শের কন্যা জয়নাব ও উম্মে হাবিব, জুদামা বিনতে জানদাল, উম্মে কায়স বিনতে মিহসান, উম্মে হাবিব বিনতে সুমামা, আমিনা বিনতে রুকাইশ, সাখবারা বিনতে তামিম এবং হামনা বিনতে জাহ্শ।

আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর কাছে তাদের সম্প্রদায়ের বানূ আসাদ ইবনে খুজায়মার অভিগমন ও হিজরত করার হুকুম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সদলবলে হিজরত করা সম্বন্ধে আবূ আহমদ বলেছেন :

সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে যদি কসম খেতেন আহমদের জননী,
তার কসম অহলে সত্যি হয়ে যেতো।

মক্কায় আমরা হলাম প্রথম, প্রথমই ছিলাম,
তারপর মন্দ এসে দখল করল ভাল-র স্থান।
এইখানে তাঁবু ফেলল গানম ইবনে দুদান।
এখান থেকে চলে গেল গানম, কমে গেল এর অধিবাসী।
একজন একজন, দুইজন দুইজন করে তারা গেল আল্লাহ্‌র কাছে,
আল্লাহ্ আর রসূলের ধর্ম তাদের ধর্ম।

তিনি আরো বলেন ঃ

উম্মে আহমদ দেখলেন আমি বাইরে বসে আছি
গোপনে যাকে ভয় করি, শ্রদ্ধা করি সেই তাঁর আশ্রয়ে,
তিনি বললেন, 'যেতেই যদি হয় তবে
নিয়ে যাও যেখানে খুশি ইয়াসরিব ছাড়া।'
আমি তাকে বললাম, 'না ইয়াসরিব আমাদের গন্তব্য।
দয়াময় ইচ্ছা করবেন, তামিল করবে দাস।'
আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা)-এর দিকে আমি মুখ করলাম।
আজ যে আল্লাহ্‌র দিকে মুখ করেছে সে হতাশ হবে না।
কত বন্ধু যে পেছনে ফেলে এলাম আমরা,
ফেলে এলাম কান্নারতা হাহুতাশ করা রমণী যে আমাদের বাধা দিয়েছিল।
তুমি ভাববে প্রতিশোধের আশা আমাদের ঘরছাড়া করেছে,
কিন্তু আমরা বলি সুদিনের আশায় আমরা ঘুরে বেড়াই।
বানু গানমকে আমি রক্তপাত পরিহারের কথা বলেছিলাম
পথ যখন পরিষ্কার ছিল সবার কাছে, তখন সত্যকে মেনে নিতে বলেছিলাম।

আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে তারা সত্যের ডাকে সাড়া দিল,
সত্যের আর লক্ষ্যের, সবাই এক হয়ে এগোল সামনে।
সত্য পথ ছেড়েছিলাম আমরা ও আমাদের সহচর কিছু
তারা তাদের অস্ত্র দিয়ে অন্যদের আমাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করল,
ওরা দুই দলে ভাগ হয়ে গেল ঃ একদল সত্যের দিকে সাহায্য করল,

পরিচালিত করল মানুষকে,
অন্য দল আজাবের পথ বেছে নিল।
ওরা অন্যায় মিথ্যা আবিষ্কার করল।
ইবলিশ তাদের সত্য থেকে ছল করে নিয়ে গেল—তারা হতাশ হলো, ব্যর্থ হলো।
আমরা ফিরলাম রসূলে মুহাম্মদের বাণীর দিকে।
আমরা ভাল ছিলাম, হে সত্যের বন্ধুগণ, আমরা সুখী ছিলাম।
তাদের আমরা নিকটতম আত্মীয়।
কিন্তু বন্ধুত্ব বিরহিত হলে আত্মীয়তা থাকে না।
কোন্ বোনের ছেলে তোমাকে বিশ্বাস করবে ?
আমার পরে কোন্ জামাতার উপর ভরসা করা যাবে ?
আমাদের কারা সত্যকে পেয়েছি, তোমরা জানতে পারবে
সেদিন, যেদিন পৃথক ভাগ হবে, মানুষের অবস্থা পরিষ্কার হবে।[১]

উমর মদীনায় হিজরত করলেন, আইয়াশ ও তার কাহিনী

তারপর মদীনায় গেলেন উমর ইবনে আল-খাত্তাব ও আইয়াশ ইবনে আবু রাবিআ আল-মাখজুমি। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের মুক্ত দাস নাফে আমাকে বলেছে যে আবদুল্লাহ্ তাকে তার আব্বা নিম্নোক্ত কথা বলেছিলেন বলে জানিয়েছিল: 'আমরা যখন ঠিক করলাম মদীনায় চলে যাবো তখন আইয়াস, হিশাম ইবনে আল আস-ইবনে ওয়ালিল আল-সাহমি এবং আমি সারিফের[২] উপরে বানু গিফারের আদতের কাঁটা গাছের কাছে গিয়ে কথা বলব বলে মনস্থ করলাম। আমরা বললাম: "সকালে যদি ওখানে যেতে কেউ ব্যর্থ হয় তাহলে বুঝতে হবে কেউ তাকে জোর করে আটকে রেখেছে। কাজেই অন্য দুজন চলে যাবে।" আমি আর আইয়াশ ঠিকই গেলাম সেখানে, হিশামকে ওরা ধরে রাখল, ধর্মত্যাগের লোভের কাছে সে নতি স্বীকার করল।

১. মূলে হয় কুরআন ১০ : ২৯-এর প্রসঙ্গ টানা হয়েছে।
২. মক্কা থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে।

'মদীনায় পেঁছে আমরা উঠলাম কুবায় বানু আমর ইবনে আউফের ওখানে। হিশামের পুত্র আবু জেহেল ও আল-হারিস আইয়াশের কাছে এল। আইয়াশ ছিল তাদের মামাতো ভাই। রসূল করীম (সা) তখনো মক্কায় রয়ে গেলেন। তারা তাকে বলল, তার মা পণ করেছে—সে ফিরে না গেলে আর মাথার চুল আঁচড়াবে না, রোদ থেকে ছায়ায় যাবে না। শুনে আইয়াশ খুব দুঃখ পেল। আমি তাকে বললাম, "ওসব বাজে কথা। ওরা তোমাকে তোমার ধর্ম ত্যাগ করার জন্য বাহানা করছে। ওদের সম্বন্ধে সাবধান হয়ে যাও। কারণ আল্লাহ্‌র কসম, উকুনে অত্যাচার শুরু করলে তোমার মা চুল ঠিকই আঁচড়াবেন, আর মক্কার তাপ অসহ্য হলে তিনি ঠিকই ছায়ায় যাবেন।" কিন্তু সে বলল, "আমি আমার আম্মার পণ ভাঙাবো। আর ওখানে কিছু পাওনাও আছে আমার।" আমি তাকে বললাম, "কুরায়শদের মধ্যে আমি সবচেয়ে ধনী মানুষ, ওই দুই লোকের কাছে সে যদি না যায় তাহলে আমার সমস্ত টাকার অর্ধেক তাকে দিয়ে দেবো।" কিন্তু যখন দেখলাম সে যাবেই, তখন আমি বললাম, "যেতেই যদি হয় তাহলে আমার এই উটটা নিয়ে যাও। এটার স্বাস্থ্য ভাল, আর চড়েও খুব আরাম। তুমি ওর পিঠ থেকে নামবে না, যদি দেখো কোন শয়তানি করার চেষ্টা করছে, পালিয়ে এসো।"

'চলে গেল তিনজন। পথে আবু জেহেল বলল, "ভাতিজা, আমার উটে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আমি তোমারই পেছনে চলে আসি?" সে রাযী হলো। বদলাবদলির জন্য তাদের সবার উটকে নিচু করা হলো। মাটিতে নেমেই ওরা হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর, তাকে বাঁধল শক্ত করে। সেই অবস্থায় মক্কায় এনে ধর্মত্যাগ করতে বাধ্য করল।'

আইয়াশের পরিবারের একজন আমাকে বলেছে, তাঁকে বেঁধে দিনের বেলা মক্কায় আনার পর ওরা সবাইকে ডেকে বলেছিল, 'দেখো, দেখো, মক্কাবাসী আমাদের এই বন্ধুকে যেমন শায়েস্তা করলাম, তোমরাও তোমাদের বন্ধুদের এমনি করে শায়েস্তা [illegible]।'

উমরের. ভাষায় নাকের কাহিনীর বাকি অংশ নিম্নরূপঃ

'আমরা বলাবলি করছিলাম, যারা ধর্মত্যাগ করতে সম্মত হয়েছে তাদের কাছ থেকে আল্লাহ্ ক্ষতিপূরণ, মুক্তিপণ বা অনুতাপ কোনটাই গ্রহণ করবেন না—যারা আল্লাহ্‌কে একবার জানল এবং অত্যাচারের ভয়ে আবার সেই অবিশ্বাসের দিকে ফিরে গেল, তাদের কাছ থেকে কিছুতেই না।' সেকথা তারা নিজেদের সম্বন্ধেও বলাবলি করছিল। রসূল করীম (সা) মদীনায় এলে পরে আল্লাহ্ পাক তাদের, তাদের বক্তব্য ও নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা সম্বন্ধে ইরশাদ করলেনঃ 'হে আমার দাসবৃন্দ, আমার এই কথা ঘোষণা করে দাও, তোমরা যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে তারা নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ্ সমস্ত ক্ষমা করে দেবেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমাদের কাছে শাস্তি আসার আগেই তোমরা তোমাদের প্রভুর অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর। শাস্তি এসে পড়লে তোমরা সাহায্য পাবে না। অজ্ঞাতসারে তোমাদের উপর অতর্কিতে শাস্তি আসার আগে তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালক যে উত্তম কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর।[১]

আমার নিজের হাতে এই কথাগুলো একটা কাগজে লিখে আমি হিশামের কাছে পাঠালাম। সে বলল, 'আমার কাছে যখন এটা এল, আমি জু'তুবায়[২] তা পাঠ করলাম। একেবারে কাছে এক হাত ব্যবধানে এনে। কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। তখন আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্ আমাকে এটা বোঝার ক্ষমতা দাও।" তারপর আল্লাহ্ আমার হৃদয়ে এটা ঢুকিয়ে দিলেন যে, এটা নাযিল করা হয়েছে আমাদের সম্বন্ধে, আমাদের চিন্তা-ভাবনা এবং লোকে আমাদের যা বলে সে সম্বন্ধে। তখন আমি উটের কাছে ফিরে গেলাম, মদীনায় গিয়ে রসূল করীমের (সা) সঙ্গে আবার যোগ দিলাম।'

১. কুরআন ৩৯ঃ ৫৩-৫৫
২. মদীনার উত্তর দিকে।

মদীনায় মুহাজিরদের থাকার ব্যবস্থা

সপরিবারে উমর, তাঁর ভাই যায়দ, আমর ও আবদুল্লাহ্ ইবনে সুরাকা ইবনে আল-মুতামির, খুনায়স ইবনে হুযাফা আস-সাহমি [ইনি উমরের কন্যা হাফসাকে বিয়ে করেছিলেন এবং এর মৃত্যুর পর হাফসাকে রসূলে করীম (সা) শাদি করেছিলেন]। ওয়াকিদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আত-তামিমি তাদের একজন মিত্র ছিলেন, আরো দুজন মিত্র খাউলি ও মালিক ইবনে আবু খাউলি, আইয়াস, আকিল, আমির ও খালিদ—এই চারজন আল-বুকায়রের পুত্র এবং বানু সাদ ইবনে লায়ছ-এ তাদের মিত্রগণ—এরা সবাই মদীনায় পেঁাছে, কুবা-য় বানু আমর ইবনে আউফের অন্তর্গত রিফা' ইবনে আবদুল মুনযির ইবনে জানবার-এর বাড়িতে অস্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য উঠেন।

এর পরে বলে একটার পর একটা হিজরতের তরঙ্গঃ তালহা ইবনে উবায়দ ইবনে উসমান ও সুহায়ব ইবনে সিনান বাসা নেন আল-সুন্হে বানু আল হারিস ইবনে আল-খাযরাজের ভাই খুবায়ব ইবনে ইসাফের বাড়িতে। কেউ আবার এটা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন তালহা বাসা নিয়েছিলেন বানু আল-নাজ্জারের ভাই আসাদ ইবনে জুরারার সঙ্গে।

কুবায় বানু আমর ইবনে আউফের ভাই কুলসুম ইবনে হিযমের বাড়ীতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হচ্ছেনঃ হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব, যায়দ ইবনে হারিসা, আবু মারছাদ খান্নাজ ইবনে হিসন, তার পুত্র গানি সম্প্রদায়ের মারছাদ, যিনি হামযার মিত্র ছিলেন, রসূল করীমের (সা) মুক্ত দাস আনাসা ও আবু কাবাশা। অনেকে বলেন, এরা সাদ ইবনে খায়সামার বাড়িতে ছিলেন, আর হামযা ছিলেন আসাদ ইবনে জুরারার বাড়িতে।

কুবায় বানু আজলানের ভাই আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের নামঃ উবায়দা ইবনে আল-হারিস ও তাঁর ভাই আত্-তুফায়ল, আল-হুসায়ন ইবনে আল-হারিস, মিসতাহ্ ইবনে উসাসা ইবনে আব্বাদ

ইবনে আল-মুত্তালিব, সুওয়ায়বিত ইবনে সাদ ইবনে হুরায়মিলা, ইনি বানূ আবদুদ্-দারের ভাই, বানূ আবদ ইবনে কুসাই-এর ভাই তুলায়ব ইবনে উমায়র এবং উতবা ইবনে গাজওয়ানের মুক্ত দাস খাব্বাব।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ কিছু পুরুষ মুহাজির নিয়েছিলেন বানূ আল-হারিস ইবনে আল খাযরাজের গৃহে তার ভাই সাদ ইবনে আল-রবীর সঙ্গে।

বানূ জাহ্‌জাবার বাড়ি আল-উসবায় মুনযির ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উকবা ইবনে উহায়হা ইবনে আল কুলাহ্-এর সঙ্গে ছিলেন আল জুবায়র ইবনে আল-আউয়াম এবং আবু সাবরা ইবনে আবু রুহম ইবনে আবদুল উজ্জা।

বানূ আবদুল আশালের ভাই সাদ ইবনে মুয়ায ইবনে আন-নুমান এর সঙ্গে তাদের আবাসগৃহে ছিলেন বানূ আবদুদ্-দারের ভাই মুস'আব ইবনে উমায়র ইবনে হাশিম।

বানূ আবদুল আশালের বাসগৃহে তাঁর ভাই আব্বাদ্ ইবনে বিশ্‌র ইবনে ওয়াক্‌শের সঙ্গে ছিলেন আবু হুযায়ফা ইবনে উতবা ইবনে রাবিআ এবং তাঁর মুক্ত দাস সালিম এবং উতবা ইবনে গাজওয়ান ইবনে জাবির।

হাসান ইবনে সাবিতের ভাই আউস ইবনে সাবিত ইবনে আল-মুনযিরের সঙ্গে বানূ আল-নাজ্জারের বাসগৃহে ছিলেন উসমান ইবনে আফফান। এইজন্য উসমান এত প্রিয় ছিল হাসানের, তাকে হত্যা করা হলে এমন মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিলেন শোকেও তা প্রকাশ করেছিলেন।

বলা হয়ে থাকে, অবিবাহিত মুহাজিররা থাকতেন সাদ ইবনে খায়সামার সঙ্গে। কারণ তিনি চিরকুমার ছিলেন। এর সত্যমিথ্যা আল্লাহ্ ভাল জানেন।

[illegible]—86-8[illegible]-P/3635—3250—[illegible] 1987